

KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. KI MLGK 2007	Place of Publication ২৩ নং আড়লানন্দ স্ট্রিট, কলকাতা
Collection KI MLGK	Publisher: অদ্বৈত চন্দ্র সঙ্কর
Title প্রবন্ধ	Size 7"x9" 17.78x22.86 c.m.
Vol. & Number: ৩/১	Year of Publication: বৈশাখ, ১৩৬২
	Condition: Brittle Good ✓
Editor: সত্যেন্দ্র চন্দ্র	Remarks:

C.D. Roll No. KI MLGK

প্রবন্ধ

১ ১৬-৩২ (প্রচ্ছিন্ন)

অতিলাল রায়

প্রবর্তক

(সচিত্র মাসিক)

প্রথম বর্ষ (নব পঞ্চায়)

১৩৩২

সম্পাদক—শ্রীমতিলাল রায়

প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস

২৯ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশ প্রেস—৬৬ নং ম্যানিকতলা স্ট্রীট,

কলিকাতা।

বর্ণানুক্রমিক সূচী

—:০:—

নিম্নলিখিত সূচী

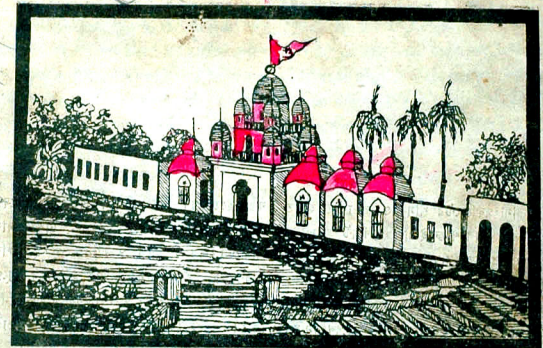
অ	খ	গ	ঘ
অক্ষয় তৃতীয়ার মেলা	৬০	খোকার গান	৬৮০
অঙ্গবন্দ	১১৫		
অনুবন্ধ	৫২১	গ্রামের চিহ্ন	৩৭
অনুর	৫২৫	গ্রামের ছবি	১০৫, ১৩৩, ২২৮, ২৭৮
অগ্নিহোত্রীর দল	৫৭৭	গাঙ্কি ও চিত্তরঞ্জন	৫৭৬
অর্থ (কবিতা) শ্রীনরেশ্বর ভট্টাচার্য	৬৩২	গান	৬১০
অভয় আশ্রম	৬৯৬	গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন	৭০৩
অ।	চ	ছ	জ
আশ্রম সংবোধ	৬২, ৫২২	চিত্তরঞ্জন (কবিতা) শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম. এ	
আমাদের কথা	১২২		১৬২
আবুল করিমের বাণী	২২৫	চরকা ও কুটির শিল্প	২২২
ঐ অভিজ্ঞান	২২৬	চণ্ডী	৩৫২
আমার দুর্গোৎসব	৫২১		
উ	ঝ	ঞ	ট
উপসংহার ('স্মৃতি', অগ্নিবন্দ, চিত্তরঞ্জন, গাঙ্কী	৬৩৭, ৫৮২	জীবন বেদ (উপক্ৰাস) ১১, ১১১, ১৬৭, ২২৫, ২৮৪, ৪০৫, ৪২৫, ৬০২, ৭৭৭, ৭৪৩	জাতি-দর্শন
উপাসনা	৪৭২	জাতিগঠনের নির্দেশ	৪৬৭
ক	ড	ঢ	ণ
কাহিনী	৩৬	ডুবো জাহাজ	৪৮৮
কর্ণধরীর মুখ (কবিতা) শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী	৪৬	ডাকাত বাদ্দালী—শ্রীধলাই দেবশর্মা	৬৫৭
কর্ণকেশ	৭৬		
কাশীপুর	৫৭৭	তত্ত্বের কথা	৩১৫
কৃতজ্ঞতা	৬২৩	তত্ত্বের কালী	৩২২
কর্তৃত্ব	৬২৪	তত্ত্বের প্রণবতত্ত্ব	৩৩১

দ	প্রতাবনা	৬০
দেশগঠন	১২৩	প্রবর্তক আশ্রমে মহাত্মার অভিনন্দন	১১২	১১২
দশমহাবিদ্যা	৩৪৩	প্রবর্তক আশ্রমে পরিণয়	১৪৩	১৪৩
দক্ষিণেশ্বর	৩৬৭, ৫৩২	পল্লীর দুর্দশা	২২১	২২১
দমাঙ্কাস	৪৪১	প্রতীকার	২০২	২০২
দীপাবলী	১২৭	পরিশিষ্ট	৩১৫	৩১৫
দেশবন্ধু তর্পণে	১৭৫	পাট	৫০৩	৫০৩
দেশবন্ধুর বাণী	১৭৮	পারস্তের আগরণ	৫১৭	৫১৭
দেশের কথা	৫০৫	পরিচয়	৫৩৩	৫৩৩
দিগ্ভিক্ষা	৫৬২	পাপুলের খেয়াল	৭৮	৭৮
ঐচ্ছিকেন্দ্রনাথ	৬৩৬			
দোল দুর্গোৎসব	৬৫২	ভাগবৎ মহাত্মা	৩১	৩১
দেশবন্ধু পল্লীসংস্থার সমিতি	৬৮৪	ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা—শ্রীরাখাললাস		
ধ	ধ	ধ	ধ	ধ
ধর্মগুরু মণ্ডল	১২, ১৩৬, ২০৬, ২৬৮, ৪০৬, ৫৮৭	বন্দোপাধ্যায়	৫২	৫২
ধর্মকেন্দ্র	২১৭	ভারতের নতুন রহস্য	২৪৫	২৪৫
নি	নি	নি	নি	নি
নির্ধাণ	৫	ভবিষ্যৎ	২৫৭	২৫৭
নির্ধাণ বন্ধ	১৫	ভূমির উপর অধিকার	২২৩	২২৩
নির্ধাণ কেন্দ্র	৬৫	ভারতের কাজ	৫৭৪	৫৭৪
নৃত্যের আবাহন	৬২			
নির্ধাণ বন্ধ	১২	মহাত্মার আগমন	৬৩	৬৩
নাম	২৪০	মূলমান সংগঠন	১১৮	১১৮
নবসাজি	৩৩১	মহাত্মার উত্তর	১২২	১২২
নৃতন বজলটি	৪৪৬	মূলমন্ত্র	১৩০	১৩০
নবজীবন	৫৬৩	মহাপ্রাণ (দেশবন্ধু)	১৭০	১৭০
নাটোরের মহারাজা	৬৪৬	মহাত্মার অভিমত	২৩৭	২৩৭
নৃতন মাহু	৬৪২	মহামিলন	৫৫২	৫৫২
নারীর কথা	৬৩১	মাম্বালয়ের চিঠি	৬৬৮	৬৬৮
নারীর বাহাজুরি	৭৩১			
প	প	প	প	প
প্রশান্তি	১, ৩৭৫	যৌবন (কবিতা) শ্রীপারীমোহন সেন গুপ্ত	৩৩	৩৩
প্রবর্তক	১২	যুগের ডাক	৪৫৫	৪৫৫
		যোগ জীবন	৪৬১	৪৬১

যোগবিজ্ঞা	...	৭১৫	বিদায় বাণী (কবিতা) শ্রীমতী বিজ্ঞানবাণী দেবী	৬৭৫
রামপ্রসাদ	...	৩৫০	বাংলার মত্তিকরুতি	৬৮৫
রামমোহন	...	৩৬০	মুড়োরুড়ী	৭০১
রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের আত্মকাহিনী	...	৫০৬	বাঙ্গলার স্বাধীনতা যোদ্ধা—শ্রীবালাই দেবগুপ্তা	৭০১
রাজমাতা আলেকজান্দ্রা	...	৫১২	বর্ষ বিদায় (কবিতা) শ্রীমতী শ্রীমতী প্রমুখমতী দেবী	৭২৫
রাজবন্দী উপেন্দ্রনাথ ও অতুল	...	৬০৬	শুভবিবাহ	৬০
রাজবন্দীর মুক্তি	...	৭৫৪	শ্রীশ্রীগ্রামরক্ষণ কথামৃত—শ্রীমঃ ৮, ১৯৬, ১১, ৪২৮	
ববীন্দ্রনাথের অভিভাষণ	...	৭৫৫	শিবাজী ও বাজী (কবিতা) শ্রীমতী প্রমুখমতী দেবী	১০২, ২৮৭
লাহিতার পরিণাম	...	২০৭	শ্রীশ্রীগ্রামরক্ষণ কথামৃত—শ্রীমঃ ৮, ১৯৬, ১১, ৪২৮	১৮৪
লওনে স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত	...	২০০, ৪২৩, ৪৭২, ৬১৩, ৬৬১	শ্রীশ্রীনাগ মহাশয়	৪৫০
বর্ষমাস ভারত	...	৮	সামান্যতঃ	২৩
বৈষ্ণব তীর্থ	...	২৬	সমালোচনা	৫২, ১২৬, ২৪৪, ২২৯, ৪, ১, ৫০২, ৬৮
বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা	...	৪৮	সামান্যতঃ	২২, ১৫১, ১১৩
বঙ্গ পরিচয়—শ্রীমলিনীকান্ত গুপ্ত	...	৯৬	স্বদেশনাথ	২৪২
বঙ্গ সাহিত্যে সমাজতত্ত্বসম্বন্ধে	...	১০০	সঙ্গীত সাধনা	২৬২
ডাঃ কুপেন্দ্রনাথ দত্ত এম. এ. পি. এইচ ডি	১৫৪, ২২১, ২৭০, ৩২৭, ৪৮২, ৫০৩, ৬৬২, ৭০৭		সমাজের অবনতি	২৮২
বিজ্ঞান	...	১১৬	সেবা	২৯০
বঙ্গ-ভঙ্গ (কবিতা)—শ্রীমতী প্রমুখমতী দেবী	২৮০		স্বাধীন বাঙালার গণশিক্ষা	৩০৪, ৪২১, ৫২৭
বঙ্কিমচন্দ্র	...	৩৬৪	সত্যধর্ম	৩১১
বিজ্ঞান	...	৩৬৬	সাদক কদলাকান্ত	৩৬০
বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য	...	৪১১	সঙ্গ	৩৭০
বৈদিক ধর্মোপদেশ—শ্রীমলিনীকান্ত গুপ্ত	৪২২, ৩০৭		স্বভাষ্যচন্দ্রের চিত্র	৪১৭, ৬১৫
বিভক্ত ধর্ম	...	৪৪০	স্বপ্নময়ী (কবিতা) শ্রীমতী প্রমুখমতী দেবী	৪৮৫
বিলাতে কমিউনিষ্ট	...	৫১৫	সে যুগে	৫২৯
বাণী	...	৫১৩	সাগর তীর্থ	৬০১
বঙ্গীয় সমাজ	...	৬১৮	সত্যের গুণ	৬৪২
বাঙালার মালমসলা	...	৬৩৫	নিষ্ক মন্ত্র	৭১২
বাঙালার রেনাসাঁস	...	৭১২	স্বরাজ্যবাদের কাউন্সিল ত্যাগ	৭৬০
			সম্মত	৭৬৫

হ	হিন্দু মুসলমান	...	৪১০	
হিন্দু মহাসভা	...	৪০	হিন্দু নারীর স্বাধীনতার গ্রহণ	৬৮০
হিন্দু সমাজের ধারা	...	২০১	হিসাব নিকাশ	৭০৫
হিন্দু সমাজের সংস্কার	...	২৬৫, ২৭৩	হিন্দুধর্ম ও মহাসভা	৭৪২
			হিন্দু মুসলমান দ্বারা	৭৬৬
<hr/>				
চিত্র সূচী				
অ	অশোকের আদি লৌহ পুস্ত (দিল্লী)	২৭০	মহাপ্রস্থান	১৮০
শ্রীমদবিষ্ণু	১৭২, ৩৭৮		শব্দদেহ	১৮২
আ	আবুল করিম	২২৪	শোভাযাত্রা	১৮৪, ১৮৫, ১০৭, ১৮২, ১২০, ১২১
আলেকজান্দ্রা	...	৫১৩, ৫১৪	চণ্ডীর অবতরণ	৩৫১
ও	ও প্রণব	৩০৫	জ	
ক	কুলিয়া গ্রামের মেলা	২৭	জাতীয় সাধন মন্দির (প্রাথমিক-সংস্থা)	৩৭২
	দেবানন্দ ও ভক্তগোপালের সমাধি	২৮	জগদীশনাথ রায়	৬৫৮
ঐ দ্বাদশ বকুল	২৯		ড	
ঐ গৌর নিতাই	৩০		ডুবোঝাহাজ	৪৪৮
কুরুক্ষেত্র	৭৫		ত	
কমলা	৩৪৮		তন্ত্রের কালী	৩০১
কমিউনিষ্ট (বিলাতে)	৫১৫, ৫১৬		দ	
গ	গিরীশচন্দ্র ঘোষ	৫৬২	দশমহাবিঘ্না	৩০২, ৩০৪, ৩৪৪, ৩৪৬
ঘোষপাড়ার মেলা	৬২৫, ৬২৬, ৬২৭		দামসাকাস	৪৪০
চ	চিত্তরঞ্জন (সন্ন্যাস)	১৭০	দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির	৪৪০
	(কারাগারের পর)	১৭৭	কালীবাড়ীর ফটক	৪৪২
	অক্ষকোণ্ডে	১৭৮	বেলতলা	৪৪৩
	(দেখবন্ধ)	১৭৯, ৩৭৯	পঞ্চবটী	৪৪৪
			সাধন সূচীর	৪৪৫
			শিবেশ্বরনাথ	৬৬৬
			ধ	
			ধর্মগুরুমণ্ডল	১০৭, ৪৫৮, ৫৮২
			ধুমাবতী	৩৪৭

নতন বড়লাট	৪৪৭	শক্তিগণের অবতরণ	৩২৭
নিবেদিতা	২৭২	শ্রীশ্রীনাগ মহাশয়	৪৩১
		শ্রীমা	২৬৭
প্রবর্তক সম্মেলন কৃষিক্ষেত্র (হন্দারবন)	১৮,১২,২১,২২	স্বামী বিবেকানন্দ	৮৪,৩০২,৬৪৭,৬৪৮,৬৪৯, ৬৫০,৬৫১,৬৫২
" মুদ্রাঙ্ক (চন্দ্রনগর)	৮০,৮১		
প্রবর্তক আশ্রমে মহাত্মা	১২০	ব্রহ্মসনাথ (অম্বিশ শয্যা)	২৫০
প্রবর্তক নারীমন্দিরে মহাত্মা	১২১	ঐ বাটী	২৬১
		ঐ মৃত্যুর পর	২৫২
বুদ্ধদেব ও অজিতা	৪৬৮	ঐ স্থানে	২৫৩
বহির্মুখ	৩৬৪	ঐ বাটীতে জনসংগী	২৫৪
বেলুচ মঠ	২৬৩	স্বভাষচন্দ্র	৪৬৮
" স্বামীজীর ঘর	২৬৫	স্বামীজীর মাতা	২৫৪
বুড়ো বুড়ী	১০১	স্বামী ব্রহ্মানন্দ	২৫৩
			২৫৩
ভারতবাসী	১৩	" রামকৃষ্ণানন্দ	২৫৪
		" অভয়ানন্দ	২৫৪
মা বা হইয়াছেন	৭৪,৩৬৬	" ত্রিগুণাতীত	২৫৪
মাতৃপুত্র	৩১৪	" প্রেমোদয়	২৫৫
মাতঙ্গী	৩৪৮	" সারদানন্দ	২৫৫
মা বা ছিলেন	৩৬৫	" অদ্বৈতানন্দ	২৫৬
মা বা হইবেন	৩৬৬	" ব্রহ্মোদয়	২৫৬
মহাত্মা পাণ্ডী	১৮১	" যোগানন্দ	২৫৭
		" অকুতানন্দ	২৫৭
		" তুরীয়ানন্দ	২৫৮
মমতাজ	...	" বিজ্ঞানানন্দ	২৫৮
মসিলা কয়েনিয়	...	" নিরঞ্জনানন্দ	২৫৯
রামপ্রসাদের ভিতা	৩১৪	" শিবানন্দ	২৬০
ঐ পঞ্চবটী	৩৫৮	" অখণ্ডানন্দ	২৬০
রাজা রামমোহন রায়	৩৬১	" নিখিলানন্দ	২৬০
রোজা ষা	৩৬৮	" সাগরের পুত্র	২৬১
রামকৃষ্ণের শয্যাগৃহ	৩৭১	" মেণা	২৬২
			২৬২,২৬৩,২৬৪
স্বামীজীর কাউন্সিল তাগ	২০,৩৬২,৫০৮		২৬৩



প্রথম বর্ষ]

বৈশাখ, ১৩৩২

[১ম সংখ্যা

প্রশান্তি

যিনি স্বপ্নত অর্থাৎ স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদরহিত, নিরাহ—ধারার কিছুই প্রার্থনা নাই, যিনি কামনারহিত, বিধি, বিধু, মনোবশের জেয় প্রশংসাপত্র শব্দব্রত, যোগীগণের ঘোচ, অবিহীত, পণ্ডিতগণ, স্বপ্রকাশ, যিনি সর্বদাপূর্ণ, নিত্য জ্ঞান ও আনন্দময়, সত্যবশব্রত, সেই নিখিল ভুবনের একমাত্র কারণ, হৃদয়কমলদলে নির্মীত দীপশিখার মত জ্যোতির্গর্ভ চিদ্রাজ্যকে স্বরূপ করিয়া, আমরা “প্রবর্তকের” নবপরিচয় আরম্ভ করিলাম।

ও নমস্তে পরমং ব্রহ্ম নমস্তে পরমাখন্দে ।

নিশ্চয় নমস্তেভ্যং সজ্জনায় নমোনমঃ ॥

তুমি পরম ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার। তুমি পরমাখা, তোমাকে নমস্কার। তুমি সজ্জাতীত, তোমাকে নমস্কার। তুমি স্ববশব্রত—তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ।

পরমেশ্বরায় বিজ্ঞে,

পরমেশ্বরায় দোষহি—

তুমি ব্রহ্ম প্রচোদায়াং ॥

আমরা পরমেশ্বরকে বোধন্য করি; পরমেশ্বরের চিন্তা করি, সেই ব্রহ্ম আমাদের স্বর্গ, অর্থাৎ, কাম, মোক্ষ চতুর্দিকে বিনিয়ুক্ত করদ । ও শান্তিঃ! ও শান্তিঃ! ও শান্তিঃ! ॥

মর্শকথা

ফরাসী গবর্ণমেণ্টের শাসনদণ্ড প্রত্যাহত হইতে না হইতেই প্রবল শক্তি ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আমাদের উপর গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ৬ই মার্চের সরকারী গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যা “প্রবর্তক পুস্তক প্রকাশ” বিভাগ হইতে প্রকাশিত ও “সামান্য” প্রেস হইতে মুদ্রিত বাতায়ন পুস্তক, ইংরাজ রাজ্যে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে। আমাদের নত অবস্থার ইহা এক প্রকার মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা। এই দারুণ জীবনসংগ্রামের মুখে, অর্ধসম্মুখে পড়িয়া হঠাৎ আমাদের গহিতে পারি না, একবারে না হউক তিলে তিলে আমাদের মরিতে হইবে।

সবলেই অসুখত আছেন, ২২০ জীর্ণদের পর, স্বদেশ ও স্বজাতি সেবার মুক্ত ক্ষেত্র নির্মাণ করে কাহারও সুখাশঙ্কী না হইয়া শতাব্দি তরুণ যাহাতে সনাতন ধর্মজীবনের ক্ষেত্রে ঈর্ষাহীন স্বাবলম্বী হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে আমাদের একলক্ষ মুখ্য ঋণ করিতে হইবে। বিগত পাঁচ বৎসরে পরাধীন জাতির জীবন যখন করিয়া, ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে যে বেগ সহিতে হইয়াছে, তাহা কর্ম্মক্ষেত্রে বাধারা আছেন তাঁহারা অনায়াসেই মুক্তিবেন। যে জাতির কর্ম্মক্ষেত্রে দলজনে দগুনি একাত্মের অটুট রাখিতে সর্ব্ব নয়, সে জাতির জীবন যখন করিয়া শত কর্ষণ জীবন গঠন, স্বপ্নকৃত অর্থে একরূপ অদম্য ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ঈশ্বরের রূপায় আমাদের সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। অতঃপর ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা

করা হইতেছিল। এই সন্ধিক্ষেপে গবর্ণমেণ্ট আমাদের বিপন্ন করিয়াছেন—অস্বাভাবিক ২৫০০০ টাকার দায় আমাদের ঘাড়ে পড়িয়াছে ও মাসিক ৩০০ টাকার অধিক আয় হইতে আমরা বঞ্চিত হইয়াছি—সমুখে চৈত্র মাস, স্বাধীনতার স্নান ও কর্ম্মাশ্রমের প্রাঙ্গণদানের কি যে ব্যবস্থা হইবে, তাহার সুল কিনারা নাই, সত্যি আজ আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

অনেক ভাবিয়াছি—জ্ঞাতসায়ে কিবা অজ্ঞাতসায়ে রাশকস্তির বিকল্প কিছু করিয়াছি কিনা—অতীত ও বর্তমানের সকল ঘটনাই বিবেকের সমুখে তরু তরু করিয়া ধরিয়াছি—কেনও সাধনা পাই নাই। সাহিত্যের মধ্য দিয়া ইংরাজ জাতির অগ্রিমত্তাখন হওয়ারই সম্ভাবনা—“কানাইলালের” চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে গিয়া সত্যের ঝড়ের অনেক অপ্রিয় সত্যের অবতারণা করিতে হইয়াছে, প্রকাশকের কতি অল্পসংখ্যক পুস্তকের মলাটে কানাইয়ের চরিত্র প্রকট করার প্রচেষ্টা সংশয়ের আরও একটা কারণ। আমরা ইহার জন্ত অসুস্থ, কেননা যাহা অন্তরের ইচ্ছা নয়, ঘটনায় স্রোতে তাহা যদি হয়, তাহা হইলে মর্ম্মপিড়া স্বাভাবিক, আমরা ঐ ক্রটি বহুবার স্বীকার করিয়াছি। তারপর “প্রবর্তক মিনন” নিছক অধ্যাত্ম মিলনের জীবনক্ষেত্রে নির্মাণের যে অর্থ্য বাণী প্রচারে উদ্ভূত, তাহার মাঝে রাষ্ট্র-চর্চার কটাকটিতে মূল উদ্দেশ্য চাশা পড়িয়া গিয়াছে; আমাদের লক্ষ্য আমাদের নিকট যত পৃষ্ঠ ও পরিস্ফুট, বাহিরের দৃষ্টিতে তাহা সশয্যায় হইয়া পড়িয়াছে—

আমাদের জীবন মিমা এই অগ্নিপরাঁকার উত্তীর্ণ হইতে হইবে। এই হেতু আবারের বাধা লইয়া অধিক আন্দোলন না করিয়া, আত্মপ্রকাশের ক্ষুদ্রপথে জীবনকে ছুটাইয়া চলিতেই আমরা দৃঢ়সংকল্প। সত্যকে অস্বীকার করা কালের ধর্ম্ম নয়, আজ না হউক, জীবনে অথবা মরণে, আমাদের সাধু উদ্দেশ্য একদিন সার্থক মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইবে।

আমরা চাহি না বিপ্লব, আমরা চাহি না অশান্তি, আমরা চাহি না উত্তেজনার কষাঘাতে তরুণ জাতিকে লক্ষ্যহীন পথে দৌড় করাইতে। ভারতের অতীত বাহাদের অন্তরে জাগ্রত, ভবিষ্যতের পথ তাহাদের নিকট অস্পষ্ট নয়—ভারতের তাগে তপস্বী, ধর্ম্ম কর্ম্মে, আচারে অল্পভ্রান্ত, তীর্থে মনিয়ে ভবিষ্যতের সঙ্কেত বিভ্রমান, আমরা তাহার সন্ধান পাইয়াছি। বর্তমানের ধুম্রাচ্ছন্ন সমস্যাসমূহের চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য বিপুল জাতির যাত্রার পথে যত আবর্ত, তাহাতেই আমাদের ঝাঁপ দিতে হইয়াছে। এইরূপ অসংখ্য উত্থান পতনের ঘূর্ণাবর্ত্তে সাধারণ জীবন হইলে আজ ইংপাইয়া মরিত, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে একটা অসাধারণ জীবনের আশা পাইয়াছি, অসুখপথের যাত্রী মুহূর্ত্তকে জয় করিয়া জীবনের আশা দম্বা মহা-মাজকই প্রদান করিব। এ অভিব্যক্তি শুধু ভারতের মুক্তি আদেশ আরজ নয়, বিশ্বমানবজাতির মুক্তি, সিদ্ধি, শান্তি, তৃপ্তি লক্ষ্যে যাত্রা ভারত গিয়াছে, এ জগতের হিসাব বিশ্ববিশ্বের কলকে মুখ ঢাকিয়া আর ভূমি-শয্যা গ্রহণ করিব না। কত ভূমি আমি সে—কাল ফুরাইলে, কার্য্য ফুরাইলে নিশেষ হইবে, অন্যাহত জীবনের স্রোতে কিন্তু আর রুদ্ধ রহিব না। এ বল-তরু রেখিয়ার শক্তি পৃথিবীর নাই। দেবতা গিয়াছেন, দিব্যশক্তির জয় তোমরা অব্যাহত রাখিও।

যাহা গিয়াছে—তাঁহা আর ফিরিবে না। নবদীপ

ঘুমাইয়াছে, স্মৃতিস্তম্ভ আগুলাইয়া রাখা ছাড়া আর সেখানে অস্ত্র কাজ নাই, নিমাই আর ফিরিবে না। হালিসহর ভুবিয়াছে, সে চিত্তার বেড়া নাই, সে পঞ্চমণ্ডী নাই, রামপ্রসাদের কণ্ঠ আর বাজিবে না। দক্ষিণেশ্বর চিরদিন অতীতের স্মৃতিতীর্থ হইয়া থাকিবে, ঠাকুরের অমৃতশীতল কণ্ঠের মাতৃনাম আর কেহ শুনিবে না। সিংগ্রাব নরেন্দ্রের কণ্ঠ নীরব হইয়াছে; সে কণ্ঠের প্রতিধ্বনি অল্পকালের প্রায়শ কৌতূহল বুদ্ধিই করে, প্রাণে আশ্রয় জালে না। তরুণ স্বর্ষি বিশ্ববিশ্বের মাতৃমুখে আর সে শক্তি নাই, স্বদেশীর প্রভাব যুগ, বিপ্লববীজ শক্তিশীন, উৎসর্গক্ষেত্রের গোমানল নির্ম্মাণিত। যুগধর্ম্ম—নিজা নয়, জাতীয় জীবনসংক্রম-বিকাশের বিবর্তনযাত্রায় যত কর্ম্ম, সাধনা, তাগ, তপস্বী, তরুণস্রোতের মত আসে—সবই চলিয়া যায়। আমাদের যৌবন দিয়া, কহাল যুগে কহাল যুগের উপাসনা, জাগ্রত সত্যের আরাধনা নাই। তাই আমরা সকল যুগের কর্ম্ম ও সাধনার মূলে জগতের অক্সিম শ্রদ্ধাঞ্জলীর তর্পণ অতীতের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়াই চলিয়াছি। বিপ্লবের সমাধি হইয়াছে ১৩২ জীর্ণদে। ভবিষ্য-জাতির হস্তে পিও না পাইলে যুগ শক্তির অসুখ প্রভাব কার্য্য করে, বিপ্লবযাত্রীগণের প্রতি আমাদের যেটুকু শ্রদ্ধা নিদর্শন দেখান হইয়াছে, তাহা যে অস্ত্রিয় সৎকার একথা বুঝান দায়, আর নিজের জাতিই যখন হস্ত দর্শনে বঞ্চিত, তখন বিদেশীয় রাজ-শক্তির নিকট এ দাবী যে গ্রাহ্য হইবে না, তাহা খুবই স্বাভাবিক। কাজেই বোম্বাইবির অত্যাচার, শুধু রাষ্ট্রে নয়, সর্ব্ব গুণেই আমাদের নিখাতন সহিতে হইতেছে, নিখাতনের যথায় যতই নিরাশ্রয় হউক, অন্তর্জাতীয় নিকট বড় ঝাঁপ আছি, নিখাতর ভান, আত্মপ্রসাদের চাতুর্য্য নাই—জয় তাই অবশ্যজারী। “প্রবর্তক”ের জ্ঞানান্তর জাতিরই নব পর্য্যায়। কেবল যে বিপ্লবনাতীর অস্ত্রোত্তীক্রিয়া শেষ হইল তাহা নয়, প্রচলিত রাজ-

নীতিক ব্যবস্থাও অদূর ভবিষ্যতে অচল হইবে, সামাজিক রীতি নীতিরও পরিবর্তন আসিবে, ভারতের ধর্মগণ্ডিতে একটা ওলট পালট হইয়া যাইবে। এটা বিপ্লবেরই যুগ, কিন্তু রক্ত বিপ্লব নয়। হত্যার খড়্গা যদি কোথাও দেখ, তবে স্থির জানিও, ইহা বিকৃত নৃসিংহের কর্ম—এ বিপ্লব অন্তরবিপ্লব, ধর্মবিপ্লব, সমাজ-বিপ্লব, মানব জীবনের আমূল পরিবর্তনের বিরাট সংগ্রাম।

শিশু শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ—অতীতের আবর্জনাশূন্য পূজাইয়া ছাই করিতেই শেষ হইল। অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে নতুন ভারত গড়িয়া উঠিবে। ভারতের ভাগ্যে বর্তমান শতাব্দী—অজাবনীর পরি-বর্তনের যুগ। এক একটা প্রতিষ্ঠিত বিপুল ধর্ম-সম্প্রদায় বিলুপ্ত হইবে। ভারতে এক ধর্ম, এক সভ্যতা, এক জাতি প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।

সে ধর্ম হিন্দুর হইবে কি মুসলমানের হইবে তাহা বলা যায় না, সে সভ্যতা প্রাচ্যের কি প্রতীচ্যের তাহার কোন ঠিক নাই—মামুষ স্বভাববশে নিজ নিজ বস্তু সংরক্ষণে যত্নবান হইবে, সম্প্রদায়ের প্রাকার পাথর দ্বারা গাথিয়া তুলিবে, ভগবানের বজ্র কিন্তু কোনও দ্বন্দ্ব মানিবে না, সব একাকার করিবে। এক সত্যে ভারতকে উদ্ভূত করিয়া একটা নতুন জাতির স্রষ্টি করিবে। সে জাতি ভারতের কল্যাণে শুধু স্বার্থে জাগিবে না, উঠিবে না, সে জাতির জাগরণের পক্ষেতে থাকিবে বিশ্বনিরন্তর হস্ত, তিনি বিশ্বমুক্তির অস্বার্থ অন্তরগত ভারতকে গ্রহণ করিবেন, ভারত ভাগবত কর্মসাম্রাজ্যের সিদ্ধ যয় স্বরূপ ঈশ্বরের হাতে শোভা পাইবে।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ নব যুগপ্রভাবের কালরাত্রি—মামুষ কত গুরুত্ব দেখিবে, কত কল্পনা করিবে, আশ্রয়স্থান বিকল প্রায় করিবে, কিন্তু প্রভাতের আলোর প্রতিদিন প্রকাশ হইয়া পড়িবে সত্য মিথ্যার

পার্থক্য, সভ্য কোথাও মরণের আবেষ্টন নতুন ছন্দে ও ভঙ্গিতে মিথ্যাকে জয় করিবে, কোথাও সামল্যের স্বর্ণ-কিরীট মাথায় পরিয়া মিথ্যার হুকু ইট্ট গাড়িয়া বলিবে, মামুষের কল্পিত, আকাঙ্ক্ষিত কোন অবস্থাই প্রোতের আঘাত সহিয়া টিকিবে না, ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্মুখেই বিজয়শক্তিভেদে আশুপ্রকাশ করিবে। ইহাই হইবে ভাগবত নির্দ্বন্দ্ব—ঈশ্বরের প্রত্যাক্ষ ইচ্ছার স্তূপ রূপ।

“প্রবর্তক” এই বিপুল প্রবাহে গা ভাসাইয়াছে, অতীতের আবেষ্টন তার নিরাময় স্তূপ, ভবিষ্যতের দিবা স্রষ্টার অবিবর্তন উপযোগী আধার। বিগত পশ্চিম বংসর, শত শতাব্দীর ধর্ম ও কর্ম সমস্তের বোকা বহিয়া সে শ্ববেদের সাধনা করিয়াছে, আজ খিলখিলে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়া ভারতের কর্মক্ষেত্রে পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইবে।

ধর্মবিজ্ঞানের মণিকোটায় দাঁড়াইয়া, দিবা জ্বরের স্পর্শে, “প্রবর্তক” এইবার সত্যের রাজ্যকে মুক্তিভাঙলে প্রোথিত করিয়া, দিবা পরিবার গঠনে উদ্ভূত—দক্ষিণেশ্বরে যে রক্ত বর্জনে শোষিত করার বিজ্ঞাপিকা ধর্ম তুলিয়াছিল, “প্রবর্তক” সে বস্ত্র গ্রহণে সিদ্ধ করিয়া জাতিকে সার্থক করিবে। অন্তরানুসংঘর্ষে আজিকার অপেক্ষা আমরা যত্নে আরও বিপন্ন হইব, কিন্তু জাতিনির্দ্বন্দ্বের পথে অন্ধ অন্তরায় আমাদের গতি সমধিক শক্তিসম্পন্ন হই করিবে। আমরা দেশের অপূজ্যতাকে দূর করার বিধি, উপদেশের আসনে বসিয়া কেবল উত্তেজনার মধ্যে তথ্যকে উদ্ভূত করিয়াই ক্ষান্ত হইব না, জীবনের দিশে ইহা কার্যে পরিণত করিব; আমরা চাতুর্সূর্যকে জয়গত অধিকারের সর্গে বিভক্ত করিয়া একটা অভিনয়ের আয়োজন করিব না, পরন্তু ভেদের বাধা টুটাইয়া, দিবা প্রকৃতির প্রকাশের ছন্দে ছুটাইয়া তুলিব, সে বর্ষ গুণভেদে বিভিন্ন হইলেও, সামাজিক আদান প্রদানে অন্তরায়ের প্রাচীর তুলিবে

না; আমরা ধর্মের দেউলে জাতিভেদ স্বীকার করিব না—যেখানে এই ক্ষুদ্র প্রাণ সামসাইতে গিয়া সত্যকে স্বীকার করিত হয়, সেখানে আশুপ্রাণ বলি দিয়াই ভারতের দেবতাকে পরিপূর্ণ করিব।

নির্দ্বন্দ্বের বনিয়াদে সামর্থ্যের অবদান—সম্পদের অধা—বড় কথা নয়, জাতি যে নির্দ্বন্দ্ব চায়, সেখানে হিন্দুর হিন্দুত্ব, মোসলমেনের মুসলমানত্ব, খ্রীষ্টানের খ্রীষ্টানত্ব বলি দিতে হইবে। এই বড় অহংকারের সূলে আঘাত বাজিলেই শুধু হিন্দু নয়, ভারতের হস্তবুদ্ধি সমগ্র জাতিই দিশপ্রায় হইয়া উঠিবে। কেহ যে

কাহারও গাভী ছাড়িতে চাহে না। যে মহান, উন্নত, ব্রহ্মদর্শী, সেই প্রথম পথ প্রদর্শন করুক, সে হিন্দু কি মুসলমান, সে কথার উল্লেখ করিয়া গুরুবোধ জাগ্রত করার প্রয়োজন নাই—ভারতের সত্যায় যে প্রকৃত্যানের হুঁর চাপা গলায় জাতিকে মোহিত করিয়াছে, তাহা পূরণ করার স্পর্ধা বাহার আছে তাহাকেই সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে বলি—সে তো কোন জাতি নয়—সেই যে ভারতের দিবা সভ্য, সেই যে খ্রীষ্টান ভারতবর্ষ—নব জাতীয়তার দৃঢ়তত্ত্ব।

নির্দ্বন্দ্ব

জাতির অমর সভ্য, সহস্র বাধাবিপত্তির মধ্যে দিয়াই জাগিয়া উঠে—এ জাতি ত মরিবার নয়। মরণের বিষ মখন করিয়াই সে হুহা আহরণ করে, জীবনের নুক্ত প্রবাহ চির দিনের জন্ত রুদ্ধ হওয়া—সে অসম্ভব। আজ আমরা একটা বিরাট জাতি—আশ্চর্যবৃত্ত, মরণের অধিক জীবদ্রুত হইয়া পড়িয়া আছি—এ জাতির যেটুকু জীবনের সাক্ষ্য, সে গুরুত্বীয় উত্তেজনা না অমর আত্মার জাগরণের স্পন্দন। উত্তেজনার চেউ উঠিয়া আবার পরম্পরে মাটির হুকু আছাড় খাইয়া পড়ে, এই গতি বিশ বংসর ধরিয়া বাঙ্গালীর জীবন আন্দোলন যদি অন্তরচেষ্টার আদ্যেই আশ্রয় গ্রহণ করিত না হইয়া থাকে, বাঙ্গালী জাতি যদি এখনও হুহু থাকে, দেবতার উদ্দেশ্যে মর্মেণের পরতে পরতে নতন উবার পলক পরশ না পায়, তবে এই দীর্ঘ সাধনা শুধু মনের খেয়াল, কল্পনার গুর

অতিক্রম করা মাত্র—আসলে তারা একপদও সভ্য অসহৃদতির পথে আগায় নাই, শুধু স্বপ্নের খোঁরে মুক্তির দেয়লা দেখিয়াছে। বাঙ্গালীর জীবন-নাট্যে বতঙলি নতন অক্ষপাত হইল, সবই কি শূন্যগর্ভ মায়া মৌচিকি, যেখানে কি ঝাঁট সভ্য এতটুকুও নাই? বাঙ্গালীর গভীর মর্মহ্রস্টন, বুকভরা বাধার উচ্ছ্বাস যুগযুগী প্রাণ দেওয়ার সাধনায় আশুপ্রকাশ করিয়া তারপর ক্ষণিক বিদ্রোহবিকাশের মতই আকাশের কোলে মিলাইয়া গেল! এ মিথ্যার প্রহেলিকা—ইতিহাসের বার্যতাময় আলোচনাপটে স্মৃতির তুলিকা টানিয়া তবে আর আশার কৃৎক রচনা করে কেন?

বাঙ্গালী মরে নাই, তার জীবন সাধনা—সে ভগবানের ইচ্ছাকল্পিত, মামুষের দ্বন্দ্বের যে ভাষ-সম্ভার হয়, তার পিছনে থাকে ভগবানের হাত, মহানদেরই

গতময় প্রেরণা। বাঙ্গালী জাতির বিজ্ঞানময় আশ্র-
চেতনায় নবজন্মের বিদ্যাময় বৈদ্যন হইতে বৈদ্যন
গিয়াছে, সেইদিন হইতে বাঙ্গালীর জাগরণ। এখানে
মানব যোগ্য কি আছে? বাঙ্গালীর মনোঃশ্রে
ঐক্যের বিষয় রাগিণী বাজিয়াছে, যোগী ঋষির কণ্ঠে
ঠাইই পাণ্ডুল্লভ শঙ্করনি—সে সঙ্গীত কি নীরব
হইবে? অমর ভারের উৎস থর রবিতাপে শুকাইয়া
যাইবে? সত্য কি এমনই দীন কাশাল, এমনই
বীধাহীন পল্ল হইয়াছে? না, না, অমৃতের সন্ধান—
অনন্ত লোকের যাকী আমরা, কুরধার চূর্ণম পথে বাধা
বিষে অপ্রতিহত, শ্রদ্ধা, ধৃতি, তপোবল মাত্র মঙ্গল
লইয়া আমরা চক্ৰবাহু সাহসে চিরদিন চলিয়াছি ও
চলিব—আমাদের স্বপ্ন, সত্য, দীপ্ত জীবনপ্রকাশ,
অধিকতর মুক্ত, দিব্য, পরিশুদ্ধ গতিচ্ছন্দ আবিষ্কার
করিয়া, ভারতে নূতন জাতি, জগতে নবীন মানব-
সভ্যতারই পত্তন করিবে।

আমরা চাই কি? চাই মানবতার নূতন
আবহান—মায়ত্র ও সমাজের নবজন্ম। মায়ত্রের
চিন্তা মন আজ বড় নীচ অসুখার, আধার ঘট্টা অশুদ্ধ
মলিন, কলুষিত, স্বার্থভেদ অস্ত্যকরণে নির্দল উদার
ভাব সহজে স্থান পায় না, বিকৃত স্বভাব মশমেয়ে,
কুটলতা, গল্পতার অভাবে গ্রীষ্ম, আবর্জনা, পুণ্য
সেখানে মুক্তির সরল স্রোতনা আসে যেন ক্ষুদ্র হয় না।
তিতট্টা মানব জাতির একেবারে পট্টা গিয়াছে
হাড়ে হাড়ে গুণ ধরিয়াছে, এ মড়া বাটীয়া হো সত্য
উদ্ধার হয় না। তাই চাই পুরাতনের পরিবর্তন,
অজীত সংস্কার আবুল বিলাপ করিয়া, মানব চেতনার
ভাবান্তর ও রপান্তর, ব্যক্তি ও সমষ্টি মায়ত্রের
প্রকৃতই একটা অধ্যায় নবজীবন। ইহাই স্বপ্ন
তব—নব নির্মাণ। ভারতে এই সৃষ্টি ময়ের
জয় পতাকা উড়াইয়া, আমরা নূতন জাতি, সমাজ,

ধর্ম, সভ্যতা ও সাধনার বৈদ্যনতা করিতেই
চাই।

নির্মাণ আমাদের জীবনময়। প্রকৃতির আশ্রপে
আচ্ছাদিত দেওয়া, বাঙ্গালী জাতি যতটুকু
আশ্রয়প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছে, সেই
তামস ও রাজস অভিজ্ঞতার উপর ভর করিয়া
বিস্তৃত সবশ্রমে নির্দেশ এই জাতির জীবন দিয়াই
সিদ্ধ করিতে হইবে—জাতিকে ভাঙ্গন ছাড়িয়া
এবার গঠনকেই একমাত্র ব্রত করিতে হইবে। আজ
গঠনই আমাদের মন্ত্র হউক, তন্ত্র হউক, নীতি,
ধর্ম, সর্বত্র হউক—জাতি-রূপে ভগবানই যে
স্বুটেতে চাহেন, সেই পরম সৃষ্টির চাওয়াই আমাদের
কিছুতেই আমাদের ভুলিলে চলিবে না। বাঙ্গালী
এ যাবৎ যেমন স্থল স্থল নানাচ্ছলে ধ্বংসযজ্ঞেই
আচ্ছাদন করিয়াছে, প্রকৃতির বিশিষ্ট, সাময়িক
প্রেরণাকে উদ্যাপন করিবার জন্ত কোনও কৃতি
শক্তি, আশ্রয়বিবরণকেই সেখানে সে প্রেরণ দেয়
নাই—আজ রুদ্রের সে চণ্ড নীতি, পাণ্ডপত অঙ্গ
মঙ্গলের দেবতা পুরাধন্যের সহরণ করিয়া বহুতে
চাহেন—কালের এই পরিবর্তন ইঙ্গিত আমরা চাই
পূর্ণ হইতেই পাইয়াছি। জাতির অশুদ্ধ সংস্কার মখন
করিতে গিয়াই বাঁধার আশ্রয়প্রাপ্তকে স্বভাবোচিত
পূর্বিকারের পথে ছাড়িয়া দিতে পারি নাই।
আজিকার ভাণ্ড আর কোনমতেই ব্যর্থ হইতে দেওয়া
হইবে না, বাঙ্গালীর স্বভাবনিহিত যে শুদ্ধ সৃষ্টির দিব্য
প্রেরণা, সেই ভাবিত ইচ্ছাশক্তি-কেই আজ মুক্তস্রোতে
জাতির মুখে সহস্র ধারে বর্ষায়া দিতে হইবে।

এই এতদিনের জীবনভিজ্ঞতায় জাতি যে পরিশুদ্ধ
আশ্রয় পাইয়াছে, তাগাতে দেখিয়াছে, ভাঙার ত
শেষ নাই—ভাঙার প্রয়োজন থাকিলেও, ভাঙার পরে

যে গড়া, সে ত শুধু কথার কথাই থাকিবে। যাহা,
ভাঙিতে ভাঙিতেই জাতির যতটুকু গঠনসাধনের
পূঁজি তাহাও বৃষ্টি নিমেষে ফুরাইয়া যায়—তা' ছাড়া
গড়িবে যাহারা, যে যুক্তি ও মন, যে স্বপ্ন ও
জীবনীশক্তি লইয়া, তাহাদের সে যুক্তি, মন, স্বপ্ন
ও প্রাণ এমনই ভাঙ্গের উত্তেজনায তরপুর, অধীর,
অস্থায়ী রাগ-চঞ্চলপূর্ণ থাকে, যে উদাহরণকে
বিপরীত অভ্যাসে স্থির করিয়া, স্বপ্ননের মুখে মোড়
কিয়াই ধরা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে। ভাঙার
দিনে যে সব বৃত্তান্ত লইয়া, গড়ার দিনে আর
সেগুলির সার্থকতা বুঝিয়া পাওয়া যায় না। বরং ধ্বংসের
স্বভাব ও বৃত্তি, গঠনের অস্বকূল না হইয়া, গতানুগতিক
অভ্যাবশ্যে তাহা একান্ত প্রতিফলিত করিবে। এবার
তাই গড়ার স্বপ্ন অনন্ত ব্রতে জীবনে ধারণ করিয়া,
জাতিকে আমাদের নবীন অভিযানে সংযোজী হইতে
বলি,—গড়া বাঙ্গালী গড়, চিরদিন অনেক ভাঙিয়াছে,
সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র আজ একটা কিছু ব্যাধী, দুট,
নিরেট আশ্রয়প্রাপ্ত করিয়া তোলা—বনিয়াদ
কর, যাহার উপর ভর করিয়া ভবিষ্যতের স্বপ্ন
দেউল করিয়া তাহা উঁচু করিয়া ঠাড়াইতে—অন্যগত
উত্তর বংশের জন্ম নব জাতীয়তার বিম্ব-প্রসাদ
স্থাপন করিয়া দাও।

জানি, জাতির সংস্কার-মুক্তি এখনও সবধাণি
হয়ত ঘটে নাই, জাতির মর্মে যে নির্মাণের বীজ,
যে তার ধর্ম, কর্মে, সর্বগত জীবনসাধনার নিম্ন-
রূপ লইয়া সৃষ্টিয়া উঠিতে এখনও অবাধ ক্ষেত্র
পাইতেছে না, কিন্তু গঠনকে চিরদিন মূলতরী রাখিলে
ত আর গঠনশক্তি শুল্কতায় জমালাভ করিবে না।
তাই শক্তির চান্দনাতেই শক্তিসৃষ্টি, গড়িতে গড়িতেই
গড়িবার সিদ্ধ প্রেরণা নব নব উপায়ে প্রকাশপ
মুক্ত করিয়া লইবে—এই স্বপ্নবৃত্তির উন্মেষের সঙ্গে

সঙ্গেই নব জাতির কলকায় জীবনপ্রবাহ শত সহস্র
প্রণালী গুলিয়া, ধর্ম, চিন্তা, সাহিত্য, শিল্পসাধনা
সর্বক্ষেত্রেই উর্ধ্বর ঋতুসিদ্ধি পূর্ণ করিয়া তুলিবে—
জগতে নব সমাজ ও নব রাষ্ট্রের আদর্শ স্থাপন করিয়া,
ভারতের মধ্য দিয়া সারা মানবজাতির জীবনে
যুগান্তর উপস্থিত করিবে।

তাই আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য মানব-মুক্তি।
ভারতের জীবন চিরদিন বিধিহিতের জন্ত, মানব-
জাতির কল্যাণ মস্ত্রে ভারতের দীপা, ভারতের যোগ,
ভারতের সনাতন ব্রহ্মসাধনা, ভারতের অধ্যাত্ম মুক্তি,
সর্বমানব-জাতির মুক্তি ও কল্যাণ বিধান যদি প্রযুক্ত
না হয়, সে ব্যর্থ হইবে—ভারতের জাগরণ আশ্র-
মুক্তির জন্তই নয়, বিশ্বমুক্তি ও সর্বকল্যাণের জন্ত।
এই মহান লক্ষ্য নিয়ত শ্রমণ রাখিয়া, আজ আমাদের
উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে—যুগান্তর জাতির কর্তব্য ডাক দিয়া
তাহাদের বিলুপ্ত আশ্রচেতনা ফিরাইয়া আনিতে হইবে—
এ জাতির অন্তরে যে দিব্য জীবনের চাবিকাটি দেবতা
লুকাইয়া রাখিয়াছেন, তাহার সন্ধান আর ত গোপন
রাখিলে চলিবে না। গীতার যুগ হইতে আজ পর্যন্ত যে
মহাযোগের মর্মসংস্কৃত পরতে পরতে ভারতের যুগে
সৃষ্টিয়া উঠিয়াছে, একটার পর একটা নূতন অধ্যায়
যোজনা করিয়া, ঐক্যের মহাবাহী সার্থক করিবার
সমস্ত সমস্ত শতাব্দীব্যাপী অধ্যাত্ম ও ভৌতিক
আয়োজন ভারতের ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে—সে
গুণ ইঙ্গিতেই সত্য মর্ম আজিও সম্পূর্ণ অব্যাহত হয়
নাই, তবে তাহা পূর্ণরূপে উপনীত করাইবার জন্তই
জাতি-বিগ্রেহের মূল্যধারে পুনঃ পুনঃ আঘাত হানিয়া,
সত্য চেতনার পুনরাবর্তনের চেষ্টা চলিয়াছে। বিধাতৃ-
নির্দিষ্ট সেই যুগান্তরের অনাহত প্রেরণা—আশ্রমমর্পণ
যোগ্য শাখকসমষ্টির জন্মে বীজরূপে অঙ্কুরিত হইয়া,
ধীরে ধীরে মানবজীবনকে দিব্য জীবনে পরিণত

করিয়া তুলিতেছে, এই যোগ সাধনেই মানব বিজ্ঞান ও আনন্দ লাভ করিবে, মুক্তি ও অমরত্বের ভোক্তায়া পুঙ্খানুপুঙ্খ হইয়া, দিব্য সৃষ্টির পথে নির্ভয়ে আগাইয়া চলিবে—এই সৃষ্টির পথে কোনও বাধা জার সে মানিবে না। ইহা যে ভাগবত নির্ধাণ। আবার বলি, লক্ষ্য আশ্বাসের মানবমুক্তি, তাহার স্রষ্টাই আমাদের চাহিয়াছি দেবজীবন—এই ভাগবত জীবন লাভের উপায়—আত্মসমর্পণ যোগ। এখানে আর কোনও অস্পষ্টতা, অপ্রাণ বা ব্যাভিচার আমাদের নাই।

বাসানী, আজি এই আত্মসমর্পণের সিদ্ধ দোষ তোমার বাঙি জীবনে আরম্ভ করিয়া, সমগ্র জীবনে

তাহারই বিপুল ভঙ্গী শরণর ক্রম রচনা করিয়া প্রকাশ কর। ব্যক্তির পরের ক্রম যেমন সত্য, তেমনি সত্যের পরের ক্রম জাতি—এমনি অনাহত ক্রমপরম্পরায়, দিব্য জীবনের দিক্‌চক্রবাল আবর্তনে আবর্তনে অনন্ত বিবৃতি লাভ করুক—আত্ম-চেতনার সকল ক্ষুদ্র ক্রম, ক্ষুদ্র গভী ভাষিয়া অগ্রসর হও—কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শব্দ, রামাহরণ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, শ্রীমদ্রবিন্দের জাতি, উত্তরাধিকার হইবে যে ভাগবত অমৃত্তির ক্রম টানিয়া এত দিন পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে, আজ তাহারই সিদ্ধ পর্বায়ে দেখক, জাতিকে, সমাজকে উঠাইয়া, নব নির্ধাণ যুগের, কৃতসৃণের আনন্দরাজ্যের প্রথম আদর্শস্রষ্টি প্রবর্তন কর।

বর্তমান ভারত

ভারতের সমগ্রতা ও বৈশিষ্ট্য—ভারতের প্রকৃতি, ভারতীয় ধারা পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিবার হান বর্তমান ভারতে নাই, ইহা ভারতের হুজুগ।

বর্তমান অবস্থায় ভারতবর্ষ নির্বণ আশ্রের স্রষ্টা, মুগ্ধক অচল বটোঁরা—ভারতের বর্ণরূপ-নির্ণয়ে আজ কত মহাপ্রাণই না উজান-পথ অবলম্বন করিয়াছেন। ভারতের বর্ণরূপ—বর্ণ, ধর্ম, জাতি—অস্পষ্ট, বিশিষ্ট; তাই জনে জনে বহুপথ অবলম্বন করিয়া ভারতের অভ্যুত্থানে কর্মরত। তাঁহাদের ভারত-চিত্র ভারতবর্ষের বর্ণরূপ নহে, বর্ণরূপ-নির্ণয়ের বস্তুভাষ্য; আর ভারতবর্ষের প্রকৃতি চাহিয়া আশ-যে রাষ্ট্র-সমাজ ও মনুষ্যজাতি ভারতকে লোকারণ্য ও কর্ম্মারণ্যে পরিণত করিয়াছে,

ভারতের প্রকৃত কর্তৃক যাহার ফলে আজ বিধিরপ্রায়, তাহাই বর্তমান ভারতবর্ষ—ভারতের অতি বিকৃত বহিরাবরণ; ইহাকে ভেদ করিয়া বর্তমানে ভারতের বর্ণরূপী নির্ণয় করিতে যে-যে মহাপ্রাণের উত্তর হইয়াছে—যে-যে ঘটনা সম্পন্ন করিয়া তাঁহারা ভারতের বিস্তৃত দৃশ্যে ‘ভাবের’ অঁকির কাটিয়া বাইতেছেন, তাঁহারা ও তাঁহাদের পুণ্যপূর্ণ-বটনাসহ ভারতকে তার জীবন-পথেই পরিচালনা করিতেছে, অতি সাবধানে বর্তমানের এই সব বিশিষ্ট আধার ও বিঘ্নগুলি পর্যালোচনা করিয়া যদি পুণ্য-পাথা সৃষ্ট হয়, তাহা হইলে আমরা ভারতকে ফিরিয়া পাইব। এইরূপ পুণ্য-ভারত ক্ষম্ভ-প্রবাহে জীবন-ধারা বহন

করিতেছে, সেই জীবনকে আজ বহির্জীবন মুচুটাইয়া তুলিতে হইবে। ইহাই আবার বর্তমান বিস্তৃত ভারতবর্ষ।

আমরা এই ভারতবর্ষের উপাসক; প্রতি পলে, প্রতি ঘটনায়, প্রতি ভারত-প্রাণের আত্মদানে টোঁহার বহিসীমা ‘নিণীত’ হইতেছে—ভারতের সনাতন চতুঃসীমা হিমাশ্ব-কঙ্কাজুয়ারী, দিব্ব ও জ্যোতিষপুত্র, কিন্তু ইহাকে বেটন করিয়া সময়ে সময়ে এক একটা সীমায় এক একটা স্থান কেন্দ্ররূপে কর্তৃত্ব হয়, চারিদিকের চারি কেন্দ্রে যখন বিবিধ সমতা জাগিয়া উঠে, তখন স্রষ্টা মহাবিন্দু—ভারতের অন্তরাখা—কাঁশিরা কাঁশিরা অনেকেই চিনাকিগে মহা-অন্তরে স্রষ্টা করে, এ কথা কিছুই নহে, ভারতের দীর্ঘধাষ! ভারতের মরা-প্রাণের এই গভীর দীর্ঘধাষ ধারণ করিয়া হাঁহারা ভারতের সত্য নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে সক্ষম, তাঁহারাও ভারত-যুগের প্রবর্তক; এ যুগ এখনও স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই—ভারতের চারিদিকে চারিসীমায় এখনও মহাঅজ্ঞ ঘনাইয়া উঠে নাই, এখনও সে প্রাচীন সনাতন সীমাই বহন করিতেছে। তবে পশ্চিম প্রান্তে সিন্ধু নদের সীমায় একদিন অমৃতসর-জাগিচান-ওয়ালা কেন্দ্ররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহার পরিবর্তে কোহাট এবং উত্তর সীমায় ইহারই উপগ্রহ স্বরূপ সাহায়াপুত্র ও দিল্লী ভারতের হুজুগরূপে দেখা গিয়াছে—দক্ষিণ প্রান্তে সুমারিকা মুখ লুকাইয়াছেন, কেন্দ্র-প্রাণের ‘ভাষ্যকাম’ এখন দক্ষিণ দিক ছুঁিয়া বসিয়া আছে। এইরূপে ভারতের চতুঃসীমায় কোথাও কোথাও যে অনর্থের পটপরিবর্তন হইতেছে, তথাই সম্ভা-ভারতের প্রাতিজ্ঞবিশ্বরূপ যে-সব মহাপ্রাণ প্রাণ দিয়া ভারতের মধুরতা ব্যক্ত করিতেছেন, তাহাই আবার ভারতের কেন্দ্র-মতের পরিকল্পণে নূতন-সীমা নির্ণয় করিতেছে—একরূপ প্রাচীন ও নূতন, বিস্তৃত ও সত্যের ঘাত-প্রতিঘাতে আমরা যে বর্ণ-ভারতের তরঙ্গ-

হিলোল অমৃত্তব করিতেছি, তাহাকে যদি এই জীবনে ভিতরে ও বাহিরে সুপ্রকাশ করিয়া তুলিতে পারি, তাহা হইলে আমরা ভারত-সাধনা গ্রহণ করিবার উপযুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিব।

গোবর্ধন এখনও ভারতে সে শুভকণের অভ্যুদয় হয় নাই, নচেৎ ভারতের এ মহা-অমৃত্তবিত্তি আত্মপোষন করিয়া যেন নবগত সম্প্রদায়গণকে ভারতপ্রকৃতির রহস্ত উপলব্ধি করিবার যোগ্যবর্গদ্বারা নিজেকে প্রচলিত হিন্দুধর্মে সুরক্ষিত করিতেছে। আবার ভারত-ভোগেরই কোন কোন মুসলমান উল্লেখ্য সাম্প্রদায়িক বিশেষ প্রকাশ করিয়া বিশেষী মুসলমানের সহিত নূতন করিয়া ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ-ভুক্ত প্রকাশ করিতেছেন, ভারত-যোগেরই অনেক হিন্দুনেতাও মুসলমান-নিবেদী হিন্দু সংগঠনী হইয়াছেন—ভারতবর্ষ হইতে ভারতীয় বিশেষত্ব চলিয়া গিয়াছে, ভারতীয় সভ্যতার যুগোপ-যোগী নব উন্মেষের নব-বার্তা বহন করিবার অগ্র-দূতগণ এখন কোথাও প্রচলিত হিন্দু ও কোথাও প্রচলিত মুসলমান সম্প্রদায়ের সৈনিকরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। ইহা বর্তমান ভারতের অতীব রমণীয়; এ সময়ে হিন্দু ও মুসলমানের পরস্পর বিরোধী বার্ষ-সম্বন্ধকে ও সাম্প্রদায়িক ভাবমতটিকে কোনরূপে সামঞ্জস্য করিয়া ভারতকে হিন্দু-মুসলমান-অনুগতি নিবিরোধ ভারতবর্ষে পরিণত করাই একমাত্র কার্য হইয়া পড়িয়াছে। ভারতীয় অভ্যুত্থান—ভারত-সৃষ্টি দিয়া স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক পরিচালিত করিয়া নবনিষ্ঠা-দোষায়, সমাজদুঃস্বারে, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নতিতে ভারতকে যে একান্ত ভারত-জাতির জীবনযন্ত্ররূপে পরিণত করা ইহা এখন লজ্জা অথচ অবগুণ্টিত করিয়াছে। সত্যই হিন্দু ও মুসলমানে যদি ক্ষণেকের একরূপ প্রাণঘাতী লড়াই বাধিয়া যায়, সত্যই যদি হিন্দুর শিথিল ধর্মচারা, শোকমত, সম্প্রদায়, জাতি ও উপজাতি সম্ভার-হিন্দুর মধ্যে অস্পৃষ্ট জাতি ও উপজাতির স্থান,

Handwritten signature/initials

দান করিয়া নিজে এখনও সনাতন ও নিরাময় বলিয়া ভাবিতে পারে, তাহা হইলে সেইরূপ মুসলমান ও হিন্দুর অনেক শোধান বা শুদ্ধির দরকার, যাহারা তাহার নিজ নিজ ধর্ম্মিক ও সর্ব্বাঙ্গ দৃষ্টি তাগ করিয়া এক ভারতীয় দৃষ্টি দিয়া নিরিবিলিগের স্বরূপ ও ভবিষ্যৎ নির্ণয়ে সক্ষম হইবে।

বর্তমান ভারতে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে এখন সেই শোধান বা শুদ্ধির আবশ্যক হইয়াছে। আমরা কাহারও সম্বন্ধে এ সংখ্যায় অধিক কিছু বলিব না, কি হিন্দু কি মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আজ যে সংগঠন কাৰ্য্য আত্মপ্রকাশ করিতেছে তাহার মধ্যে সম্প্রদায়িক ভাবই প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে—প্রত্যেক সম্প্রদায়ই যেন একরূপ সংগঠিত হইতে চাহেন, বাহাতে এক সম্প্রদায়ের ক্রুহুট বা বিরোধ তাহার উন্নতির পথে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করিত না পারে; সর্ব্ববিধে নিজে সম্প্রদায়ের তুল্য-পরিণতিই এই সংগঠন-কার্য্যসমূহের মূলমন্ত্র। এইরূপে ঐতিহাসিক পরিপন্থি হইলে, অনেকে যোগাণ করেন, ভারতবর্ষ শক্তিশালী হইতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষকে মনে প্রাণে স্বীকার করিয়া লইলে, দেশাচার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে, সম্প্রদায়ের অনেক ভাবেরই পরিবর্তন অবশ্যস্বাভাবিক—দেশাচার দেশমধ্যস্থ প্রত্যেক ধর্ম্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, আচার ও অনুষ্ঠানের উপর একটা অধিকার বিস্তার করিয়া আছে, তাহার দাবী দিয়া ও অঙ্গজ্ঞা, আমরা অনেক সময় সম্প্রদায়িক ভাবে বিভীর্ণ হইয়া দেশাচারকে সম্প্রদায়িক ভাবের অধীন করিয়া দেশকে সাম্প্রদায়িক স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত করিতে চাহি—মুসলমান প্রকৃতি ভারতবাসী বাহাদের ধর্ম্মক্ষেত্র ভিন্নদেশ এবং শাসকজাতি বাহাদের জন্মভূমি অজ্ঞাত, তাহার এইরূপে ভারতের বিশেষণে সংঘত বা উদার হইতে অনেক সময়ই স্ক্রম হইয়া পড়েন। শুধু স্ক্রম হওয়া নহে, এখন

তাঁহার ভারতের ভবিষ্যৎ সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ও তাহার স্বার্থমূলক সামর্থ্যের উপর দৃষ্টি করিতে বেশ সাহসী হইয়া উঠিয়াছেন—হিন্দুকে অগতাই এখন তাঁহাদের পথ অনুসরণ করিতে হইতেছে, হিন্দুর মধ্যেও ত অজ্ঞতা কম নহে, হিন্দুর মধ্যেও পরস্পরদায় বিবেচ্য একবারে স্তম্ভ নহে, তজ্জন্ম তাঁহার তাঁহাদের সমগ্র দোষজটিল সহিত সংগঠন কাৰ্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ভারতবর্ষ হিন্দুর দেশ, এই গর্বে তাঁহার একমুখে দেখিতেছেন, যে একদিন সমগ্র ভারতবাসী হিন্দু হইয়া যাইবে।

ভারতবর্ষ যে হিন্দুরই দেশ নহে, ভারতে যে কেবল হিন্দু-ধর্ম্মই প্রাধান্য বিস্তার করিবে না, তাহা ব্রহ্মমুণ্ডি দিয়া মুসলমান স্বাধীয়া দিয়াছেন—শাসক জাতিও বহুবিধ উপায়ে তাঁহাদের অস্তিত্বকে বেশ প্রকট করিয়া তুলিয়াছেন। ভারতবর্ষ হিন্দুদেরই দেশ না হইলেও হিন্দুদের ভারত ভিন্ন গতি নাই, তজ্জন্ম হিন্দুত্বমূল ও ভারতমূল্য অনেক হিন্দুর নিকট এক-পদবাচ্য। কিন্তু বর্তমানে হিন্দু ও ভারতবাসী একই বস্তু নহে, ইহার পার্থক্য দ্রব্ধরূপ না করিয়া অনেক হিন্দু ভারতবাসী বা ভ্রাশনেলিষ্ট হইয়া পড়েন, আবার অনেক ভ্রাশনেলিষ্টও ভারত জাতীয়তার স্থান নির্ণয় করিতে না পারিয়া হিন্দু সংগঠন কাৰ্য্যে আত্মনিয়োগ অথবা হিন্দু-মুসলমান প্রকৃতি সম্প্রদায়দিগের স্বার্থসামঞ্জস্য বিধান করিয়া কাহলঙ্গ করিতেছেন।

বর্তমান ভারতে ভ্রাশনেলিষ্ট ও ভ্রাশনেলিষ্টদিগের এই যে দ্বর্গগতি, ইহার পরিণাম বাহাই হউক, এই সময়ে তাঁহারাই সময়ের পূর্ণ ব্যবহার করিতেছেন, বাঁহারা হিন্দু ও মুসলমান মিলনের উত্তেজনা পোষণ করিয়া ভারতে ধর্ম্মবিরোধ ও সমাজবিরোধে শাস্তি-তৈল নিক্ষেপ করিতেছেন; কিন্তু বর্তমান ভারতে যে উত্তম একবারে ব্যর্থোত্তমে পরিণত হইতেছে, ভারত হইতে ভারত-পুষ্টি যেন অপলুপ্ত হইয়াছে, হিন্দু ও মুসলমানসাধারণ

অজ্ঞতা ও উত্তেজনায় পথভ্রান্ত হইয়াছে, সমুদ্রদেশ গ্রহণ করিতে তাহার একান্ত অক্ষম—ভারতবর্ষের বৌদ্ধীতলে প্রাচ্যক সংঘত উদার ও অভিন্নময় হইবার জন্মই যে তাহার ভারতে স্থানলাভ করিয়াছে তাহা যেন সকলে বিশ্বস্ত হইয়াছে। এই ভ্রান্ত ও বিমূঢ়কে সমবেশে পরিচালিত করিবার কাৰ্য্যও অনেকে গ্রহণ করিয়াছেন—ত-র-বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত, স্বর্গ ভারতের ভবিষ্যৎ চিত্রে বিমূঢ়, হিন্দু-মুসলমান-গুণীন প্রত্যেক ভারতবাসীর প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন, শুদ্ধ বুদ্ধি সমাহিত কতিপয় ভারত-প্রাণ, নবশিকারীকায় নব ভারতসমাজের স্বাধীন ভিত্তি প্রতিষ্ঠা না করিয়া, স্ব স্ব সম্প্রদায়ের কল্যাণ কামনায় তাহার শোধান বা “ভুদ্ধিত” আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

ইহাদেরই আত্মদান ও কল্যাণ আশীষে হিন্দু-সংগঠন এবং বোধ হয় মুসলমান সংগঠনও নবরূপ ধারণ করিতেছে, হিন্দুদের অতি গভীর প্রবেশে দৃষ্টিলাভ করিয়া ইহারা হিন্দুদের নব বাধ্যায় অশুশ-বিসের প্রাণে নব-আশার সঞ্চার করিতেছেন,—দক্ষিণ ভারতের অশুশ যদি দেববর্শনের অধিকার পায়, দক্ষিণ ভারতের হিন্দু যদি বুদ্ধিতে পারে বিভিন্ন জাতি-ও-জাচারের মধ্যে আমরা এক-জাতিত্বকেই পুষ্টি করিতেছি, তাহাই হইলে বিশ্ব শুদ্ধ ভারত-প্রাণ ভারত-মহিমায় উদ্ভূত হইয়া যে-কাৰ্য্য গ্রহণ করিবেন,

কিছু নতন আকার ধারণ করিবে—এই যে নব-উদার জন্ম নতন আকার ধারণ করিবে—এই যে নব-উদার

স্বর্গ-ভূটা, ইহা অবলোকন করিতে অবশ্য বিশেষ সূক্ষ্ম দৃষ্টির আবশ্যক।

কিন্তু প্রতি ভারতবাসী তাঁহার ব্যক্তিত্বের ভোগ কৃপা বর্জন করিয়া প্রদেশ-ধর্ম্ম-ও-সম্প্রদায়গত বাধ্যদান অতিক্রম পূর্ব্বক যদি প্রত্যেকে অস্পৃহ ভারত-প্রাণের প্রতিষ্ঠা লাভ না করেন, তাহা হইলে ভারত-আত্মার উদ্বোধন অসম্ভব হইবে। আজ যে জনকয়েক মহাত্মা ভারতের মধ্যে একাত্ম স্বর্গ দৃষ্টিলাভ করিয়া বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক সেবা-কাৰ্য্য ও সম্বন্ধগঠনে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের অন্তরে নব উদার স্বর্গ-ভূটা বিরাগ করিতেছে; তাঁহাদের অন্তরে অন্তর মিলাইয়া ভারত-সেবক যদি জনসেবার প্রবৃত্ত হইবে, ভারতের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইবে—হিন্দু মুসলমান, শাসক শাসিতের কোন বন্ধনেই যে ভারত আবদ্ধ থাকিবে না, তাহার মুক্তি ও প্রকাশ দিবালোকের স্রাঘই স্পষ্ট—বর্তমান ভারত বড় জটিল ও উজান-পথে মুক্তির কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, ভবিষ্যৎ ভারতের নিম্ন পথ এখনও স্থিতিত হয় নাই। এখন আমাদেরই তাহার দিন গণিতে চইতেছে। সেই লক্ষ্যই বর্তমান ভারতে বিতর্ক ভারতীয় ধারায় জাতি-গঠনের স্থান নাই, হিন্দু ও মুসলমান সংগঠনেই তাহাকে আবদ্ধ করিয়াছে! ভারতবাসী, এই আবদ্ধ ভারত-আত্মাকে মুক্ত করিবার শুভ মুহূর্ত্ত অবেশন কর, বর্তমান ভারতের ইহাই একমাত্র কর্তব্য—পূর্ব্বোক্ত সংগঠনে আত্মনিয়োগ করিয়া অথবা নব ভারত গঠনের শক্তি অর্জন পূর্ব্বক আমাদেরই ভবিষ্যৎ ভারতের পথ উন্মুক্ত করিতে হইবে, এই কাৰ্য্যের অগ্রণ ও মনন এখনই আরম্ভ হউক

প্রবর্তক

“প্রবর্তকের” সাধনা যাহারা গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের উপর কঠোর অগ্নিপরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। “প্রবর্তকের” ছায়াতলে এতদিন যে ব্যক্তিদের অহঙ্কার অব্যবস্থাপিত স্রবোণ পাইয়াছিল—এ পরীক্ষার সে স্রবোণ বিপদের কারণ হইয়াছে, বিশদ বরণ করিয়া চূর্ণকৃত পালনের জন্ত জীবন অহঙ্কারের আবরণে দ্বন্দ্বিত, তাই অনেকের মাথা হইতে এ বোঝা খসিয়া পড়ে; জয় তো কর্মের নয়, বশু জীবনের নয়, জয় বিবাদের, বিবাসী জীবনগুলিই পরীক্ষার কঠিন পাকের বাচাই হইয়া, মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় পরাশরোজ্ঞ হইয়া উঠিতেছে, উৎসর্গক্ষেত্র হোমকুণ্ড লক্ষ শিখা বিস্তার করিয়া প্রজ্জ্বলিত, সত্য হিরণ্ময় মুকুট মাথায় পরিয়া উজ্জ্বলিত—আমাদের জীবন অধ্যায়িত জয়মুকুট হইবে।

জানি—অসত্য অজ্ঞানের বন্ধ বিদীর্ণ করিয়া স্রাব-দগ্ধ চিরদিন চলে—আবাত নির্মম হইলেও তাহাতে ইষ্ট বৈ আনন্দ হয় না, দগ্ধ এখানে প্রলয় সাধন করে। সত্যের মন্তকে বিচারকের বৈরাগ্যতা ইতিহাসের পৃষ্ঠার অভিনব না হইলেও—ইহার পশ্চাতে বিবাতার যে রহস্যময় বিধান লুকাইয়া আছে, তাহা সহজে চক্ষু পড়ে না, কাজেই হতভম্ব হইতে হয়। জ্ঞানঃ অমঙ্গল সৃষ্টির বীজ উপাধিয়া স্তব প্রতিকার আধোজনে উদ্ভূত—“প্রবর্তক” অপ্রত্যাশিত আঘাতে কিছু যে বিচলিত না হইয়াছে তাহা নহে; কিন্তু সে দুর্ভাগ্যের বিক্ষুব্ধতা অতিক্রম করিয়া, ঈশ্বরের আশীর্বাদ ইন্দ্রনরপে প্রদোষের পীড়নে অন্তরবিধাশকে অধিকতর প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে,

অবলামর্ষের অপচয়ের মাত্রা—জীবনের তুলনায় প্রাণবাহী হইলেও—বিবাদের উত্তাপে প্রাণ তাড়া, ক্ষয়ের বল বাড়িয়া গিয়াছে, অসত্য অজ্ঞান পুড়িয়া ছাই হইবে, সত্য নিষ্ঠা অমরার সম্পদ। যে তগবান! আরামচাকা প্রাণে আবাত দিয়াই ইহার সীমা ঘুটাত, অক্ষরন্ত গ্রাণের সন্ধান দাত, আবাত দিয়াই জীবনকে সুরে ভিড়াইয়া তোল।

কিন্তু আবাতে প্রত্যাঘাতের সৃষ্টি ঘেন কোথায় না হয়। বাংলালী চাহিয়াছে দেবজ্ঞান—সে সফল-গির্জার কাণে—সকল ঘটনার অবতারণা; উপলক্ষ সর্বক্ষেত্রে চক্ৰবর্তন না হইলেও, আমরা যেন স্মরণ রাখিতে পারি—তুমি এগবের পশ্চাতে আছ—তুমি আছ বলিয়াই আবাতে আবাতে অমৃত বর্ষণ করে, জীবন সার্থক হয়, দগ্ধ হয়। তুমি আছ বলিয়াই অমৃত্যুর নিষ্ঠুর প্রহার বন্ধ পাকিয়া সহিব্যার মত বোধ্য পাই, সাহস পাই, বৈধা ধরিতে পারি। যে প্রভো! নিমসহায় কাঙ্গাল, তবুও ভরসা পাই তোমার বাণী বহন করিয়া দেশের ছায়ে ছায়ে পৌছাইয়া দিব, কত স্বপ্ন, কত উৎপাত মাথার উপর দিয়া বহিয়া যায়, সমুখে বিরুদ্ধ শক্তির ভায় তরল আমাদের মুখিয়া দিতে চায়, ভোমারাগার জীবনের পক্ষে ইহা মৃত্যু-বন্ধ—কিন্তু নবম নবম থাক যাক—মরকটে তোমার অমৃত বাণী শেষ দুর্ভাগ্য পথ্য-বলি, মাত্রার পরত পরতে তোমার মহিমা গাথিয়া দিব। ভারতের কল্যাণকে যে ফল কলিবে—তাহা অথবা সৃষ্টি করিবে, মানুষ অমর হইবে, দুর্ভাগ্যের প্রাণে অনন্তধর্ম এই জাগৃত কলনা বড়

সাধনা দেখ, নতুবা প্রাণ দিয়া সত্যরক্ষায় কে রত্নী হয়!

এই দেশ, এই তোমার জাগৃত মূর্তির সমুখে ঠাড়াইয়া চিরদিন উজ্জ্বল যেন সত্যাহুতি নির্জয় ব্যক্ত করিতে পারি, পরীক্ষার বিভাবিকাষ কণ্ঠ কাতর হইয়া যেন উচ্চৈঃস্বরে না পড়ে—এই আন্তরিক প্রার্থনা তোমার চরণে জানাইয়া রাখিলাম।

দেশ, দেশ আমাদের ভারত, ভারতের শত্রে অমৃত সমীরণে যে প্রাণ গড়িয়া উঠে, সম্প্রদায়ভেদে বিচিত্র হইলেও, আমাদের বিস্তৃত চরিত্র স্বভাবতঃ একই গতা প্রকাশ করিতে উজ্জত হয়, সে সত্য নির্ঘাতনের আতঙ্কে যদি মুখিয়া ফেল, চাতুর্য করিয়া সে আশ্রয় যদি বুকের মধ্যে ঢালাইয়া ধর, আশ্রয়িত হইবে—অথবা

তিথ্যকভাবে ইহার প্রকাশ প্রত্যক্ষ কল্যাণ সাধনে নির্বীণ্য হইবে। ভারতের সত্য সার্বভৌম, উদার, অপরোচিত অমরণের ইহা নিদান নয়, কালচক্রে মাহুই ইহাকে যতই কলিষ্ঠ বিস্তৃত করিয়া দেখুক, সত্যের উৎসাহ রুদ্ধ গুহ হইবে কেন—সে অক্লান্ত যথার বিদ্যে ধারা মানুষের মনের মলা বিধৌত করিবার জন্ত চারি উৎসাহিত হইবে।

“প্রবর্তকের” ভাবধারা ভারতের সনাতন সত্যের একটা নিম্নর, অমরণ অনাহত প্রবাহে বহিতে চায়—গতি অপ্রতিহত নয়, বাধা যে অন্তর্যামী। সমুদ্র পথের বাতী এ ভাসি পাহাড়ের আড়ালে কি অস্তিত্ব হারাইবে? আড়াল—উপহাস, সত্য প্রবাসের বেগ পরীক্ষা করিতে চায়, সত্য মন্ত্রের উপাসক—কলনার ছায়া লইয়া যদি না মজিয়া থাকে, তাহার নিকট বাধা অমৃতের মতই উপাদেয়। হইবে, জীবনের ব্যাধ সম্পদ গোবর বাধার সংঘর্ষেই ফলে, জীবন মরণের এমন কোলাকুলি কলজনের ভাগ্যে ঘটে!

পড়াপাঠী জীবনের দায়ে নিজের বুলি বলে। ভগবানের নাম যার জীবনে গীতা—জীবনে মরণে সে

নাম তো ভোলা যায় না—সম্পদে বিপদে সেই এক-তারার গানই স্বর্গাঙ্গ দিয়া উঠে। “প্রবর্তকের” বাণী অবস্থার দায়ে বিস্তৃত সুরের অভিনয় করিবে কেনন করিয়া? প্রহার কর, কণ্ঠ ঢাণিয়া ধর, নাম তুলিবে না, এই সুরেই যে জীবন ভরিয়া আছে। রসনা উপাধিয়া দাত, খাসে প্রবাসে সে বাণীই ঘোষণা করিবে, মরণে যন্ত্রে জীবন চূর্ণ কর, জীবনের দুখ ঘূর্ণিয়া যাইবে, বিবাহার দরবারে এ কণক কল্যা বড় মর্যাদিতিক সুরে স্বর্গার দিবে, এ গান বহু হইবার বড়

প্রভাতের পানী যেমন বৃষ্টি চিরিয়া আলোর কীর্তন করে, “প্রবর্তক” তেমনই নবযুগের আরাধনালীতে স্তম্ভদান করিয়াছে—মানুষের ভাষা নয়, তাই এ গান তোমরা বোঝ না; বোঝ না বলিয়া, অথবা কলকে দেবতার বলনা বিস্তৃত অর্থে মনোবৃত্তি চিত্রিত করিও না, সত্যের অলপলপ বিধাতা কোন যুগে সফল না; ভগবানের বাণী শত শতাব্দীর আচ্ছাদিত চৈলিয়া বিদ্যাপ্রবাহে বাহির হয়, সে বাণীর উপেক্ষা দেবতার অশমন। গর্ভগ্রাম নির্যাসক দৃষ্টি দিয়া চিরিয়া—চিরিয়া গানের মর্ম জয়স্বয় কর—দেবের ইহা বিশ্বমঙ্গলের গারতির বাহু, ধূপ ধূনার পূণ্য গুণ, অনাঘাত কুসুমে বিনম্র সৌরত, চিত্ত পবিত্র হইবে, অমলিন হিয়ায় প্রেমের বান ডাকিবে। ভারতের মন্ত্র ও সাধন ধর্মসংস্থাপন। এ বজ্রবাণী পাঁচ হাজার বৎসর আকাশে আকাশে ঘুরিতেছে; ধর্মের সত্য মর্ম নির্ভুতভাবে কেহ বুঝিল না, কিন্তু ধর্মের নামে অধর্মের প্রস্রাব এ দেশের ধাতে নাই। ধর্ম আশ্রয় করিয়া এ জাতি অধর্মকে কোন দিন পুষ্ট করে নাই। কিন্তু এই ধর্ম বৈদ্যতিক প্রভাবসম্পন্ন, বাহ্য নিজেস্ব শক্তির বেগে পুণিবী জয় করিয়া লয়। ভারতের ধর্ম বলিতে হাধা তোমরা বোঝ, তাহাই সম্বধান নয়। যন্ত্রপাড়া গদ্যর মত রক্তবর্ণ আকাশ দেখিয়া বিকলিত হওয়া বীরয়ের পরিচয় নয়। সুবর্ণ ভারত আশ্বকরা জজ হিংসানীতি

ছাড়া অধ্যাত্ম তপস্যায় যদি আগিতে চায়, তাহার আত্মপ্রকাশের পূর্বস্ফী, সংশয়ের তীক্ষ্ণচুরি শূন্য করিয়া তাহাকে হত্যা করা নিরুপদ্রব—ধর্মের পথ ধর্য্যন রহস্যময়, কিন্তু ধর্মসাধনায় উজ্জ্বল সাধকের জীবন বিদ্যা বিশ্বের অন্তিই সম্ভাবনা যে আদৌ নাই, একথা আঁধার করিয়াই বলি—এখানে চলিয়াছেন বাহারা তাহারাই অত্যাচার সহিয়াছেন, আজও কি সেই একই ইতিহাস লিখিত হইবে জগতের এই উন্নত যুগে, ধর্মপথের পবিত্র কি এতটুকুও নির্ভয়চিত হইয়া চলিবার সাহস পাইবে না? কুলানুলুপ ধর্মের কাটা বাসে—তরুণ জাতির জীবনশ্রোত না মাইয়া দিলে ধর্মের পন্থা ঘুচিবে না। ভারতের ধর্ম সনাতন, সহস্রাব্দী, বিচারের পরিমাণে ইহা ধরা সম্ভব নয়। কুরুক্ষেত্রে ঈশ্রুক্ষেত্র পাঞ্চজন্যে যে ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল, পার্শ্বনাথের জীবনসাধনায় তাহা হইতে ভিন্নরূপেই ফুটল—শ্যাক্যসিংহ হিন্দুর প্রতিপাত্ত বৈশ্বাচারের মধ্যেই ধরা দিলেন না, কিন্তু বুদ্ধের ধর্মপথের ভারতকে কি প্রবুদ্ধ করে নাই? যুগে যুগে ধর্মগুরুর জীবন-বেদ, নব নব রূপে ধর্মগ্রন্থের পুষ্টি বিধান করিয়া চলিয়াছে ধর্মের পরম স্থানে আজও জাতি পৌছায় নাই। বাজীর সংখ্যা বাড়িতেছে, কিন্তু ভারতের সনাতন পতাকা আরো, ভারতের নবনীর সমকক্ষে আজও সর্বদ্বন্দ্ব সমুদ্রের জয় ঘোষণা করেন নাই। ভারতের জাগরণে এই প্রায়শই দিন দিন ফুটতর হইয়া উঠিতেছে—বৃথা সংশয়ে এগতি রুদ্ধ করা সমীচীন হইবে না।

ভারতের জীবনঅভ্যুদয়ের মূল আছে এই ধর্ম-ভেদ। ভারত যদি সার্থক হয়, তবে তাহার ধর্মভেদ অপসারিত করা চাই; নতুবা ভারতের বৃত্তিত ভিদ্ধির জীবনসমষ্টি, স্বতঃ স্বতঃ আকারে পার্থক্যে বিনিময়ে জন্ম বিক্রয়ের বিপজ্জী হইয়াই রহিবে, জগতের হাটে ভারতের তীর্থস্থান প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ভিন্ন অজ্ঞপ্ত পূজা পাইবে না।

কিন্তু নিছক ধর্মবুদ্ধিই ভারতের সম্বন্ধি রূপ নয়, ভারতের সত্য “প্রবর্তকের” প্রচ্ছদ পটে অমর কবির স্বর্ণ তুলিকায় দিব্যরূপে ছুটয়া উঠিয়াছে। ভারতের প্রাণে আজ যে অশুট গুরু গর্জন স্রুত হয়, তাহা ভারতসত্তার মর্মবাণী—তাহার স্পষ্ট অর্থ কবি তুলির অঁচড় ছুটাইয়াছেন, চিত্রের সাহায্যে ভারতের বৈদ্য রচনা করিয়াছেন, প্রতিমার আশে প্রত্যঙ্গে তাহার উৎস ছুটাইয়াছেন। চিত্রে, সাহিত্যে নবযুগের অপূর্ণ সৃষ্টি—আমরা কবিকে প্রণাম করি।

ভারত চায় শিক্ষাদীকার অধিষ্ঠাতা দেবীরূপে জগতে শান্তি ও আলোর নিব্বার সৃষ্টি করিতে, ভারত চায় অন্নপূর্ণার বেশে বিশ্বকে অগ্নে বস্ত্রে প্রতিপালন করিতে, ভারতের গুপ্তধারায় পালিত সম্ভ্রান্ত মায়ের এতশনি মহিয়ার পরিচয় না পাইয়া নিজেদের অন্ধম ঘর্ষন, হীন স্বার্থের কুংকম স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছে, ভারত মায়ের পরিচয় বিনা জাগিবে না, জাগিতে পারে না। মাতৃবৎসল সম্ভ্রান্ত বিত্তজ্ঞ মাতৃমন্ত্র ভারতকে জাগাইবার জন্তই “বন্দোবস্তের” মন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। মাতৃপ্রেমের রসাতলিময়ে কামানর দেহ দ্রব না হইলে বিত্তজ্ঞ জাতীয়তার প্রচার সম্ভব হয় না। বাঙ্গালী মাতৃত্ব সাধনের আজ যথার্থ অধিকারী হইয়াছে, নির্মাণের মন্ত্রে তাই বাঙ্গালীর প্রাণ উজ্জ্বল, স্ব স্ব স্বার্থ চরিতার্থতার হেতু ধরিয়া নহে, মায়ের দান-মাগের যে নিত্য ত্রুত, মাঠে তাই সোণা ফলিবে, কার্ণালের ক্ষেতে বরলক্ষীর স্তব আসন বিস্তার হইবে—জগতের জীব হাত পাতিবে, ভারতের কার্ণায়া নাই, প্রাচুর্যের লক্ষণে মা আমাদের পূর্ণাঙ্গী—অন্নপূর্ণা অকাতরে অশন বসনের দায় হইতে বিশ্বকে রক্ষা করিবেন, কষ্টে কষ্টে কীর্তিত হইবে—

“জন্মা জননী, জগৎপালিনী, জগদ্ধাত্রী ভারতবর্ষ”
আর আমাদের বসনেতে স্পষ্ট দিনের মত দেখা যাই, শ্রোতবিনার কুলে, কুটীরে কুটীরে শবির কণ্ঠে প্রশংসা

ধ্বনি—প্রকৃতির বিশ্ববিজ্ঞানে বিশ্বের শিক্ষাবী ভিড় করিয়া বসিয়াছে। হিন্দু নাই, মুসলমান নাই, খ্রীষ্টান নাই, ভারত পুরোবস্ত্রের লীলাভূমি, ঈশ্রুক্ষেত্র—সেখানে জাতি নাই, বর্ণ নাই, ভেদ নাই, পরাংপর পুরুষের চরণপ্রাণে বিশ্ববানবজাতির মেলা বসিয়াছে, সত্যের হোমকুণ্ড অনিয়াছে, লক্ষ লক্ষ শিশু আকাশ স্পর্শ করিয়াছে। ভারতের সে গৌরবযুগের বদ-কথাই তো বাজ করিতে “প্রবর্তকের” জন্ম। “প্রবর্তকের” দ্বায়েই বসিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ রচনার সিদ্ধ মন্ত্র কত তরুণ ঘে লুপ্ত করিল, আজ তাহার সংখ্যা করাও চূড়ামা। “প্রবর্তকে”র ভাব লইয়া দেশে কত প্রতিষ্ঠান যে গড়িয়া উঠিল, তাহার ইয়ত্তা নাই, আজও কত সাধক জ্ঞানে অজ্ঞানে “প্রবর্তকের” মন্ত্র সিদ্ধ করিতে কর্মক্ষেত্রের সুযোগ ব্রিজিতেছে—“প্রবর্তকের” চলা পথে ভবিষ্যতের অল্পসংখ্য অব্যর্থ ভাবে জাতিকে সার্থক করিবে।

অতএব “প্রবর্তকের” কথনির্দেশ তো হৌরালী-পূর্ণ নহে—সাধনানীতি রহস্যময় বটে, ইহা তো বস্তু-জগতের ধন নয়, তাই ইহার অবিস্কৃত অল্পবাদ প্রকাশ সম্ভব হয় না। ইহা তব উৎসর্গাকৃত জীবনেই ফলে। বাহিরে প্রবেশিকার মতই দেখায়, কিন্তু “প্রবর্তকে”র মন্ত্র গড়া মানুষের চরিত্র বিলম্বণ করিয়া নিম্নক পুনরীকাতর ব্যক্তির পরবাদ সম্রাট্য দেখিও, কি উদার মনঃ জীবনের বীজ বৃক করিয়া তাহার উদ্ভাৱ হইয়াছে; সে কল্যাণ কামনার পুণ্য-মন্দিরে হিসাববিষয়ের রক্ত ছুরির আদৌ স্থান নাই।

“প্রবর্তক” আজ আর কোন দলের মুখপত্র নয়, সমস্ত বিশেষের বাণী বহন করিয়া পরিতৃপ্ত নয়। “প্রবর্তক” আজ দেশের ডাকে সাড়ে চার কোটি বাঙ্গালীর জীবনবেদ উদ্ধারে উত্তত, পল্লীজননীর শ্রায়াঞ্চলের বেগাবরণ মুক্ হইয়া, কটপঙ্ক কাপড় জড়াইয়া, বিবৃত কর্মক্ষেত্রে গিয়া ঠাঁড়াইল—বঙ্গজননীর মেধাশীর্ষাণ্ড সাড়ে চার কোটি ভাই বোনের প্রীতি সম্ভ্রামণ, আমাদের দ্বায়ে উৎসাহের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করুক।

“প্রবর্তক” তাহারাই বাহারা ঈশ্বরবিশ্বাসী—এক দেশ ও ভগবানের উপাসক—ভাতৃব্রাহ্মণের দ্বিহাস-লজ্জাক্রান্ত নহে, একা প্রতিষ্ঠায় শত্রুজ্ঞ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিৎ, পরোপকারপরায়ণ, সদাশয়। তাহাদের চরিত্র দৃঢ়, সংযত, একনিষ্ঠ—তাহার ব্যাভিচার-পরায়ণ হইবে না, মানবজাতির উত্তম লোকবাত্তা ও সমাজের যথার্থ মঙ্গল বিধানো সত্য বরদান থাকিবে—সে যে জাতিই হউক, যে সম্প্রদায়ভুক্তই হউক, “প্রবর্তক” একই আমনে তাহাকে স্থান দিবে, একই মন্দিরে ঈশ্বরের আরাধনায় সম্মিলিত হইবে, সমাজের সর্বত্র তাহার স্থান অধ্যাহৃত রাখিবে। ধর্ম, কর্ম, সমাজে সর্বত্র এই দ্বিবা চরিত্রের নারী পুরুষের মিলনতীর্থই ভবিষ্যৎ ভারত। “প্রবর্তক” এই নূন ভারত নির্মাণের ত্রুত জীবনপথে পালন করিবে—ভারতের এক ধর্ম ও এক জাতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত “প্রবর্তকের” মরণ নাই, “প্রবর্তক” কর্ম-বিমুখ হইবে না।

নির্ণাণ-যজ্ঞ

সুন্দরবন

যে কথা দ্বন্দ্বের বিধে, তার আলা যতন ন।
জুড়াইয়া যায়, মন পড়িয়া থাকে সেইখানেই। মুখে
রক্ত তুলিয়া আমরা নির্মাণযজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে
যে দিন ঘরের বাহির হইলাম, সে দিনই শপথ
করিয়াছিলাম, বিপ্লবনোতি জীবনে কোন দিন গ্রহণ
করিব না, বরং বিপ্লবকে তরুণ প্রাণ হইতে উপাড়িয়া
কলসার প্রাণপণ প্রদান করিব, এবং ইহার জন্ত শুধু
দার্শনিক তত্ত্ব ও সাধনার নীতি ধারাবাহিক প্রচার
করিয়াই আমরা ক্ষান্ত হই নাই, তরুণ জীবনে কর্ণের
বীজ বপন করিয়া, একটা নূতন ধরণের অর্থনীতিক
ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেও উদ্বুদ্ধ হইলাম। যখন চতুর্দিক
দিয়া আমাদের কর্ণ ফলপ্রসূ হওয়ার হৃদয় দেখা
দিল, সেই দিনই বজ্রের মত অকস্মাৎ চতুর্দিক
হইতেই অজাবনীর বায়ব আমরা বিপন্ন হইয়াছি।
রাজধণ্ড ও বরণ করার সাধাইকুই আত্মক্ষার পক্ষে
আজ আর যথেষ্ট নয়, গৃহশজ্ঞা বিভীষণের উৎপাত
উদাসীন হইতে না পারিলে কর্ণক্ষেত্রে পা বাড়াইবার
উপায় নাই। অভিনন্দনের যুগে শুধু রাজা নয়,
পরশ্রীকান্তর স্বদেশবাসীও ভাল অপেক্ষা মনের
কাননিক লক্ষণ অবিরামে গ্রহণ করিয়া সত্যের মর্যাদা
স্মরণ করিতেছেন। আমাদের কথা, কোন ধারণা—
আততায়ীর মুখের কথার বহুল কবীর অপেক্ষা,
অভিস্রুত ব্যক্তির প্রতিবাদ নিরপেক্ষ বিচারে গ্রহণ
করা উচিত। জাতীয় জীবনে সত্যের আলো

ভবিষ্যতে হলোহল উদীর্ণ করিবে, বিগত পৃষ্ঠি
বঙ্গবরের দেশহিতৈষী সাধনের গভীর অভিজ্ঞতা
দেশ যদি কাণ পাতিয়া শুনে, অনিষ্ট অপেক্ষা ইষ্টের
সম্ভাবনাই অধিক।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে দেশপ্রাণ কয়েকজন ত্যাগী
সাধকের জীবনে স্বাবলম্বনপূর্ণ জাগাইবার জন্ত,
একান্ত নিরর্থন, কেবল ঈশ্বরপ্রেরণার উপর অটুট
প্রত্যয় স্থাপন করিয়া, ঋণের অর্থে বাহাদুর হইতে
বড় বড় কার্ণাভার প্রদান করিয়াছিলাম, সর্বক্ষেত্রেই
তাহারা বার্ষমনারোথ হইয়া আসিয়াছে। কোথাও
আত্মপ্রত্যয়ের অভাবে, কোথাও স্বার্থ বড় হওয়ার মূল
প্রেরণার আত্মহুল্যে বঞ্চিত হইয়া কোথাও বা
অভিজ্ঞতার হেতু এইরূপ ষটীয়াছে—মানুষ আসিয়াছে
গিয়াছে, কিন্তু শক্তির অনর্গল প্রায়স্কন্ধ হয় নাই।
ইহা দেশাত্মার অমর প্রেরণা, বাহা ক্ষমতাবাহের
মত আমাদের মধ্যেই নিবন্ধ ছিল, হাও ধোনে মহাত্মা
গান্ধীরও জীবনধারায় তাহাই প্রকাশ হওয়ার
নির্ণাণনোতি জাতির জীবনে দৃঢ় শিকড় পাড়বার
উপক্রম করিয়াছে। ছয় বঙ্গবরের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও
বিচিত্র বিদ্যে বিপর্যস্ত হইয়াও, দেশের সত্তা আজ
ইহাই চাহে জানিরা, আমরা নিরতিশয় উৎসাহ ও
উৎসাহিত হইয়াছি। জাতীয় জীবনে কণ্ঠধারা অম-
বঙ্গমস্তার সমাধানে প্রসারিত প্রবাহে যদি বাহ্যতঃ
ক্লম হয়, তাহা হইলে এই জাতির যে কল্যাণ নাই,

বৈশাখ, ১৩৩২]

সুন্দরবন

১৭

তাঁহা আমরা মুক্তকণ্ঠে চৌৎকার করিয়া বলিব।
বাংলার উদীয়মান তরুণ জাতি সহিতবন্ধ হইয়া, স্বর্ণ-
প্রসবিনী ভারতের গর্ভতল উন্মোচন করিয়া যদি অম-
সঞ্চয় না করে, দৈহিক সামর্থ্যের দোহনে, লজ্জা-
নিবারণের বহুতরু যদি কোমরে জড়াইবার যোগ্যতা
অর্জন না করে, এই পরকুৎসাপ্রাণের হতভাগ্য জাতির
ভবিষ্যৎ আত্মকলহে যত্নবশবস্ত্রের মত আত্মবাতী
হইয়া মরিবে।

আজ কর্ণের যুগ, এই কর্ণশক্তি সঞ্চয়ে ও স্বাবলম্বী
হওয়ার সাধনার চলিতে হইবে, পরবিষয়ের বিযুক্ত
বহিঃসিদ্ধি ইহা যেন নিবৃতি না পায়, তাহার জন্ত
জাতির ভবিষ্যৎ তরুণমণ্ডলকে আমরা সাধনার
করিয়া দিই। বাহ্যার কর্ণোত্তম তাহাদের জীবনে
অক্লান্ত নির্দেশ দিবার জন্তই ইহা বলিতেছি—অতীতের
অসংখ্য বিবর্তন আমাদের জীবনে প্রাদিগ্ভ হইয়াছে,
এই পথে অতঃপর ভবিষ্যৎজাতি কম বাধা পাইবে—
তবে পথ দ্রষ্টা, সহজভাবে ইহা সিদ্ধ হইবে না।

দ্রষ্টা এই জন্ত, গাতঃগতিক জীবনের ভিত্তির
উপর ভবিষ্যতের নির্মাণনোতি স্ক্রুতকার্য হইবে,
নূতনশক্তি সন্ধানরুদ্ধ জীবনে তাকন সৈকতে বারিবিমূর
মত সোয়াতি হইবে। চাই জীবনের একটা নূতন ভিত্তি,
যে ভিত্তি রচনার মূল আছে একটা কঠোর তপস্বী,
তাঁহা সিদ্ধ না হইলে আমাদের নির্দেশ সফল হইবে
না— তবে এই পথে সকলেই যে আশঙ্কিত ফল পাইবেন,
সে বিষয়ে আমাদের ঐক্য বিখাল আছে।

প্রত্যেক কর্ণকে স্মরণ রাখিতে হইবে, তাহার
জীবন তাহার জন্ত নাহে, শুধু মনে রাখিলেই স্ববশা
হইবে না, সেইভাবে জীবন গড়িয়া তুলিতে হইবে।
বাহ্যতঃ জীবনের সকল প্রকাশ দেশের হিতে দিতে
হইবে। অস্বাভাব্য ঈশ্বরমুক্ত হইবে। এইরূপ চরিত্রের
সমষ্টি গঠন নির্মাণ নীতির সর্বপ্রথম ভিত্তি।

তার পর, এই সহিত ব্যষ্টির অহং-ত্যাগের মত

সমষ্টির অহং পর্যন্ত পরিভাগ্য করিবে, দেশহিতৈষী
সকল সমষ্টিকেই জীতি ও শ্রদ্ধার চক্রে দেখিবে,
পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিবে না—এইভাবে
উদার-স্বভাব বিশিষ্ট ব্যষ্টিচরিত্রের সমষ্টি নিজেদের
জাতির সহিত পরিচয় স্থাপন করিবে ও সকল কর্ণই
জাতীয় উন্নতির অঙ্গুল করিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে।
তখন দেশ শুধু দেশের জন্ত নয়, সমগ্র জগতের জন্ত—
আদর্শের পরিধিচক্র কোথাও বর্ধন করিবে না, উহার
বিষাট আকার ধরিলোকে বিরিয় জীবনকে উদ্বুদ্ধ
করিবে।

এইভাবে কথা শুনিয়া অনেকের মনে প্রশ্ন আসে
তবে কি ভারত, ভারতের জন্ত কিছু করিবে না—
ইহা স্বাভাবিক, মননে পর্যায়দোষে সচল হইবার
নয়। ইহার সহজতর—স্বাধীনতার কণ্ঠে যেদিন বাণী
উঠিয়াছিল ভারতবাসীকে স্মরণ করাইয়া দিতে, যে
তাহাদের জীবন তাহাদের স্বথভোগের জন্ত নয়,
পরন্ত জননী জম্মভূমির জন্ত, তখন কি কাহারও জীবন
পণ্য হইবে, এরূপ কল্পনা মাথায স্থান পাইয়াছিল,
বরং জীবন এই প্রশস্ত ক্ষেত্রে অধিকতর উন্নত ও
জ্ঞানশালী হওয়ার আশাই জাগিয়াছিল। ভারত
বিষয়ের জন্ত, এই আদর্শ পালনের উদ্বুদ্ধতায় ভারত
সাময়িক স্বাধা ও শক্তি সম্পন্ন হইবে। ভারতের
আত্মবশা প্রস্তুতি জাগ্রত হওয়ায়, নিঃস্বার্থ জাতীয়
জীবনে স্বর্ণের ময়াকিনী নামিয়া আসিবে, ব্রহ্মতের
কল্পনায় জাতি অগতের সাধনা করিবে।

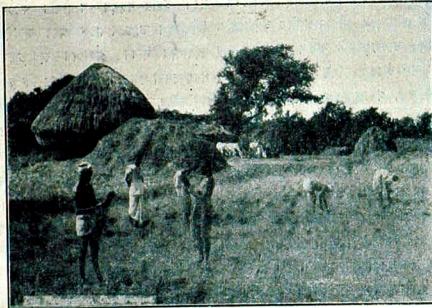
মনে রাখিতে হইবে—সমষ্টি একটা শক্তি, কোন
বিশিষ্ট রূপ নয়, রূপের ভারতমা ঘটে, শক্তি অনর্গল
গ্রহণে বাহে। জাতীয় জীবনে সমষ্টির সৃষ্টি জাতিকে
সত্য সৃষ্টি দিবে, যে সৃষ্টির মৌলিক উপাদান যদি
যেবিষয়বস্তুজ্ঞিত হয়, তাহা হইলে এই অভিনব
জাতি গঠনের পরিণাম অমঙ্গল স্বপনের আশঙ্কা সৃষ্টি
করবে না। এই কথাটাও আজ স্মৃতি করিয়া বলা

প্রয়োজন হইয়াছে, “প্রবর্তক সংজ্ঞা” যে ইহারই একটি আদর্শবৃত্তি, ইহা বলাই বাহুল্য।

এইবার কালের কথা বলি। বিপুল দেশের অভাব-পূরণের কামনা জীবনে অসংখ্য কল্পনার স্বপ্নন করে, ভাবিতে ভাবিতেই জীবন স্রাব্য, কার্যকরী শক্তি আকার লইয়া জাতির প্রাণে উৎসাহে সঞ্চার করে না। তাই আমরা আমাদের সমগ্র জীবনের অভাব-পূরণের প্রয়াস লইয়া কর্মে অবতরণ করি, ইহাতে দাবিয যেমন ঘনীভূত ভাবে মাথায় জাঁক দিয়া বেদে, তেমনই সাফল্যের লক্ষ্যে দ্রুতপদে অগ্রসর হওয়ার উৎসাহটুকুও সর্বদা জাগ্রত থাকে। গ্রন্থের বিষয়, এজাতির বৈশিষ্ট্য বিবাদের অগ্নিশিখা বড় স্তিমিত, trust ভর করিতে ইহার তাই এত দিকহীন, কোন

উদ্দেশ্য সার্থক করার সংকল্প শেষ পর্যন্ত ধরিয়া রাখা এজাতির পক্ষে সম্ভব হয় না। আমরা একথা হাড়ে হাড়ে বিশ্বাসি—দৌড়াখা আবাদের, শক্তির সন্ধান সর্বপ্রাণে পাইয়াই কর্মে অবতরণ করিয়াছিলাম, তাই কর্মীর মনোভঙ্গ কখনোই স্বেচ্ছা বিলম্বিত হইতে পারে, কিন্তু বার্য হইবে না, এই আশাশ্রুত পথ জোর গলায় দেশকে দিবার স্পর্ধা আমাদের জন্মিয়াছে।

সম্ভবের সমুদ্র—অন্নের আর বঙ্গের। বঙ্গশিল্পের কর্মবৈদী স্রবন করিয়া অন্নসুখার দেউল রচনায় আমরা প্রবৃত্ত হই। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে, স্বন্দরবনে জমি খরিদ করা হয়। সারা জীবনটাই ছিল adventurous, কাজেই নিকটবর্তী স্থানে আবাদী জমির সন্ধান না করিয়া, একেবারে স্বন্দরবনেই গিয়া



আমাদের কৃষিক্ষেত্রের এক অংশ ও উহার পাশে বড়ের বাড়ী।

আমাদের উচিত্তে হয়। আমাদের এক্ষণে জমির পরিমাণ অসামান্য ২০০ শত বিঘা, স্বন্দরবনের ইহা শেষ প্রান্ত, তিন দিকেই ভরপূর্ণ সমুদ্র, একদিকে বঙ্গবন্দরী ঝামল অঙ্গল ছুলাইয়া লৌলারত, বিঘাত ফ্রেজার-

গরের অন্তর্গত মজীপুর গ্রামের ইহা অন্তর্গত। মিঃ সেভানসন বহু অর্থব্যয় করিয়া বার্ষিকের হইয়া যে স্থান হইতে ফিরিয়াছেন, বিঘাতার নির্লক্ষ্যে আমাদের কর্মক্ষেত্র সেই স্থানেই নির্দেশিত হইয়াছে।

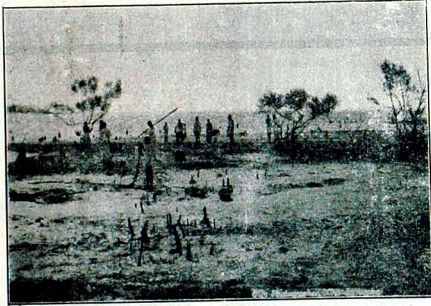
স্বন্দরবন শান্তিপ্রদ, তপতাপ স্থান। উল্লস দিয়া বাসা বাঁধে। রাজ্যে ব্যাঘের ভয়, হবিধা পাইলে প্রকৃতির চঞ্চল নৃত্য সাধকের চিত্ত আকর্ষণ করে। যখন স্বন্দরবনে সাধকেরা প্রথম উপনীত হয়, লোনা হাওয়ায় শরীর অসুস্থ হয়। সকল বিষয় অতিক্রম তখন আশ্রয় ছিল না বলিলেই হয়। ভয়প্রায় ক্ষুদ্র করিবার শক্তি যিনি দিয়াছেন তিনিই যে আমাদের নেতা, পথপ্রদর্শক, আজ এই অচিন্তনীয় বাধার সম্মুখে ইহা আরও ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতেছি।



আমাদের ধান ছেলেরা মাপ করিতেছে।

আমাদের জমি হইতে বাজার ২০ মাইল দূরে, ইহার মধ্যে তিনবার নদী পার হইতে হয়। বর্ষাকালে স্থানের নাম নামখানা—বালের উপর দিয়া রাস্তা, পথ বদ্ধ, স্রুতরা আহার্য জব্যের যে কি অভাব তাহা

সহজেই অনুমেয়। গ্রামে সপ্তাহে একদিন হাট বসে, খুচরা জিনিষ, খালে জাল দিয়া মাছ ধরা, আর কেষ্টের সেখানে পাওয়া যায় নন, তেঁতুল, হুশারী প্রভৃতি খান কুটির চাউলের ভাত—তবে এক্ষণে গাভী

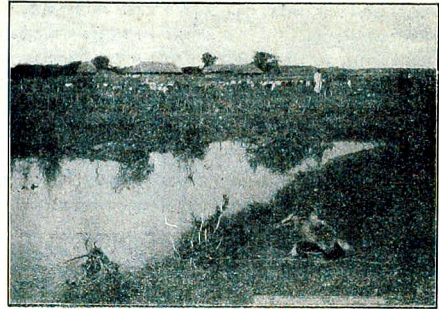


সমুদ্রের একধারে ছেলেরা জাল ফেলিয়া মাছ ধরিতেছে।

পালনে ছুন্দের ব্যবস্থা হওয়ায় কর্মীদের কিছু সুবিধা হইয়াছে।

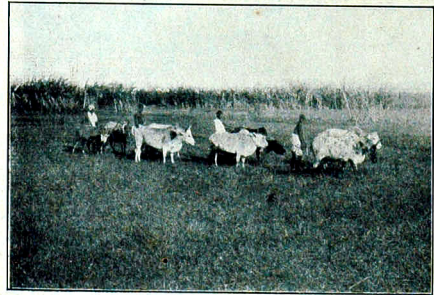
হুন্দরবনে প্রথম দুই বৎসর দিনের বেলায় মশারী না ফেলিয়া স্থির হইয়া বসিবার উপায় ছিল না, মশা-গুলির আকারও বড়, ভলও লম্বা। একবার অঙ্গে কি-দিলে আধ ঘণ্টা জ্বালা ধামে না। হুন্দরবনে জমি প্রস্তুত করিতেও আমাদের প্রাণান্ত পরিস্থিতি হইয়াছে। বটগাছ কাটিয়া শিকড় উপড়াইয়া লোনা জল ঢুকিবার পথে বাধ দিয়া, জমিকে কৃত্রিম উপযোগী করিতে অকাতর

শ্রমের সঙ্গে ১৫০০০ টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছে। আমরা বারবার বলি, ছয় বৎসরের অনাথবৃত্তিক পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের ফলস্বরূপ আমাদের আদ্যের অবস্থার আমাদের মাথায় বজ্রপাত বড় নির্ধন হইয়াছে। আমাদের কার্য ও আদর্শ কোথাও তো অস্পষ্ট নাই, তাই সংশয় হয়, প্রভুদেউ কি প্রাণত্যাগী শ্রম দ্বারা জাতিকে স্বাধীন করার যথার্থ সাধনা পছন্দ করেন না? তাহা যদি হয়, আমরা জোর কলমেই লিখিয়া দিই, ভারতের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়াজ্বর



ছেলেদের থাকিবার ঘর, ধানের শুধান ও বাটার সমুখে গোচারণ ভূমি।

ছিল যেখানে অরণ্য, বাদা লোনা জলের বিদ্যাক্ষ মজুতুমির বৃকে প্রস্রবণের মত স্বপচিত্র—দেখিলে বাদ, আজ সেখানে গড়িয়া উঠিয়াছে বিপুল ধাতু- “প্রবর্তক সম্বন্ধ” কি করিয়াছে, তাহার সম্বন্ধ আর প্রশ্ন কেষ্ট, বিপুল বস্ত্র বস্ত্র। বালুর বৃক চিরিয়া হুণেয় থাকে না। জলের পুকুরটি, চল্লিশটা গাই ও বগদ,—স্বস্তির স্তব্ধ ভিত্তি খেনা জমির সহিত সমুদ্রতটে উচ্চ বাধ দিয়া



অশর দিক সমুদ্র তটে “বালুঘারা” বাগান।

যেহা “বালুঘারা” নামক বৃহৎ বাগান গড়া হইয়াছে, হরিণের উপায়বে শযা রক্ষা হয় না, তাই এই অবস্থায় ২০০০ হাজার বাড়ি করা গাছ, বাগানের প্রধান অঙ্গ। পুনরায় ব্যয় করিয়া আমাদের বেড়া দিতে হইয়াছে;

তিল, কুমড়া, পেঁপে, লাউ, বেগুন, আউস ধান প্রাকৃতি উৎপাদন করার চেষ্টা হইতেছে।

নিজেদের কথা এত করিয়া বলা সত্ত্বেও আমরা দেশে এত অশুভ জীবন বহিয়া থাকি, তাহার কারণ আমাদের সাফল্য। দেশ স্বস্তির উদ্দেশ্যে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছে, এমন সর্গাঙ্গীন উন্নতি সাধন কোথাও বড় দেখা যায় নাই। সত্য বটে আমরা দেশের নিকট ঋণী, কিন্তু সে ঋণ পরিশোধের সংকল্প আমরা দ্বিধা-লাভের চেষ্টায় বড় বহিয়া ধরিয়াছি, দেশ আমাদের উপর

যে টাট করিয়াছে, তাহার ক্ষতি করিতে যদি আমাদের প্রাণ দিতে হয়, তাহাতেও আমরা কৃত্তি হইব না।

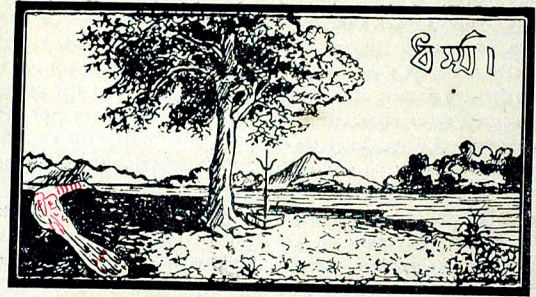
পরিশেষে আমাদের বক্তব্য, আমরা চাই দেশে এক একটা সমষ্টিরূপে পরিবার গড়িয়া তোলা। এইরূপ পরিবারমণ্ডলী স্বাবলম্বী হওয়ার সাধনায় যদি দিল্লিকাম হয়, আত্মস্থ হইয়া নিজেদের নিরাময় কাম-সম্বলবর্জিত করিয়া তোলে, তাহা হইলে কি বৈদিক যুগের মত মণ্ডলী মণ্ডলীর সম্বায়ে দেশে একটা দিবাযাত্রির অভ্যুত্থান সম্ভব হইবে না? আমাদের



আমাদের চাষের ধান ভানান হইতেছে।

আদর্শ ও উদ্দেশ্য নানা ছন্দে নানা ভাবে ব্যক্ত করিতেছি, কত্থমে যেমন কীট আছে, বজ্রপ সহজনের বিরুদ্ধে বিনাশশক্তি আছে, সে শক্তির প্রয়াস নানা কুটিল নীতি অবলম্বন করিয়া আমাদের ক্ষেয় করিতে চায়। আমরা কি প্রার্থনা করিতে পারি না, দেশের কাছে ও রাজশক্তির কাছে, এইটুকু প্রত্যয়ের যাচণা করার অধিকার কি আমাদের নাই, যে মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ্য জীবনের কথা যথা বক্ত করি, তাহার অন্তরালে স্তম্ভ কেনও ভাব বা উদ্দেশ্য আমাদের নাই, যদি ইহার বিপরীত প্রচার বা প্রচারণা কোথাও চলে, উদারচরিত্র চাফনিষ্ঠ আমাদের দেশবাসী ও রাজশক্তি আমাদের নৃপ হইতে তাহার উত্তর না

লইয়া যেন সে ধারণা গোপন না করেন? আমরা চাই, দেশের উদীয়মান শক্তিটাকে মণ্ডলে মণ্ডলে নব নব ভক্তির উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিয়া, জাতিকে রক্ষা করিতে। জাতির জীবনে যদি স্বাধা ফিরে, তাহা হইলে আজ এই জাতীয় শক্তির উত্থানকালে যে রাজশক্তি সাহায্যত প্রচারিত করিবে, সে শক্তি বৈদেশিক হইলেও, এই জাতি কি এমনই অকৃতজ্ঞ হইবে যে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে? এই সংশয় হইতে আমাদের মুক্তি দিন, ভগবানের নিকট আমাদের এই প্রার্থনা—জাতিকে নিষ্ঠারের সত্যপথ দেখাইবার অবাধ জীবন যেন যথার্থ হয়—জাতিকে এই দিকে দৃষ্টি রাখিতে অনুরোধ করি।



সাধন তত্ত্ব

উপকর্মমিকা।

আমরা জিনিষটি ভারতে। অনিতে পাই, ভারতের ধর্ম সনাতন। সনাতন ধর্ম সর্বজনপুঞ্জ, ভেদ ও ব্যবধান ইহা জ্ঞান নহে, সর্ব ধর্মের সম্মান যাহাতে, তাহার সহিত কিছু বিরোধ থাকিতে পারে না, সমুদ্র বন্ধ অসংখ্য নদী কি স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় কলহ করে? অর্থাৎ অসীমে, অগভীর সীমার বস্তু বন্ধন-মুক্ত হয়, জগতের সকল ধর্ম সনাতনে আত্মদান করে, ভারত তাই জগতের তীর্থ, সর্ব জগতের ধর্ম গুণ।

সনাতন ধর্ম রত্নগর্ভা—সত্য প্রেম শক্তির গণ্ডাজী মানবসভ্যতার আদিজননী ভারত আজ মক্কামি, বিশ্বের শান্তি কল্যাণের শিকড় কৈলাশনিধির আজ বজ্রাহত, সে রাম নাই, সে অযোধ্যাও নাই,

আমের সঙ্গে রত্নাবনের অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়াছে, আছে স্বাতি, আছে বেগ উপনিষদ—ভারতের অদ্বাদ্ব সাধনায় অমর ইতিহাস। প্রাণশক্তি তিমিত নতমুখী—স্বপ্নকে জাগ্রত, মৃতকে সঞ্জীবিত করার তপতা কল্যাণ, এ জাতি বাচিয়া আছে কেন, কে জানে?

বাচিয়া আছে, এ কথা সত্য। শুধু বাচিয়া নাই, ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে। দীর্ঘ রাজির গভীর নিদ্রা—তন্ত্রাত্মক নয়ন এখনও আলোর কাজলে উজ্জ্বল হয় নাই, এখনও জাগরণের উৎসাহে প্রাণে প্রাণে বিদ্রোহশক্তি সঞ্চারিত হয় নাই, এখনও চেতনায় জাগে নাই, কিসের জ্ঞতা তাহার জাগরণ, কিসের জ্ঞতা ভারতের পুনরুত্থান।

উঠিতে গিয়াই শ্মশানবন্ধনের বাধায় সে কাতর হইল। অমৃত্যুর তীব্র পরশ তমসাজ্বর জীবনের প্রথম প্রভাতে রাজসিকতার রক্তরাগ ঝলসিয়া তুলিল, কিন্তু আলোর অরণ্য বিধেত হইল রক্তিত হৃদয়ের কণ্ডাহা মলিনতা, দীপ্ত সূর্য্যের তপ্ত কিরণ অক্ষরে অক্ষরে সত্যের দীপ্য ভারতের মর্মে অঁকিয়া দিল, দীক্ষিত ভারত বুলিল—কেন তার আগমন, কেন তার উত্থান।

হিমালয়ের শিরে সত্যের অনলমুকুট শোভা পাইল, কিন্তু গহবরে গহবরে যুগ যুগান্তের তমিহ্রা বুর হইল না, মনের বিকার থাকিতে তো, সত্য ধর্মের সংখ্যান প্রকাশ হয় না, তাই কত প্রকার আরাধনা উপাসনার বিধান প্রস্তুত হইল, যোগযজ্ঞ তপস্যার হোমানল জলিল, স্তুতি, তন্ত্র, পুরাণের অহুমান বাধা তুলিয়া ঠাড়াইল, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কেন্দ্র উদ্ভিল, বর্ষাশ্রমের ভয় দেউল পুনঃ সংস্থারে মাহুয় উদ্ভূত হইল, কিন্তু যদ্যোরে অবশ্য বিলুপ্ত হস্ত সনাতন ধর্মের জন্ম বেনী গড়িয়া তুলিল না—বাড়াইল ভেদ, আলিল বিবেচনের বাড়াবানল, ধ্বংসের ভয়গুণ বাড়িল, জাগ্রত চেতনার শিখা ভারত আলো করিয়া আলিয়া উঠিল না, বরং চাপা পড়িয়া গেল।

অল্প দিকে সামান্য বিচিত্র নীতি জীবন ছাড়াই ফেলিল, হঠযোগ, রাজযোগ, জ্ঞানভক্তিপ্রদ—তন্ত্রিক, বৈদিক প্রভৃতি যোগে আত্মশুদ্ধির যুগ গড়িয়া গেল, ফলে হইল কি—তেমন কিছুই নয়। কেন এমন হইল? আন্তরিকতার অভাবে নয়, জীবন চলিয়া সামান্য পথে বহু আয়ান ব্যর্থ হইল, কারণ সামান্য স্বাভাবিক রূপের পরিমার্জন সাধক সামঞ্জস্যের পথ ধরিল না, মাহুয়ের কতকগুলি সম্ভবিত্ত উন্মেষ হইল মাত্র, পরন্তু যোগলিপ্সা সফল হইল না, জীব্য ব্রহ্ম যোগ হইলে, জীবনের ত্রিবিধ তরে যে দ্বিগুণদুর্ভিক্ষ প্রকাশ হইবে, নরদেহে নারায়ণের যে লীলা প্রকটিত হইবে, তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না। হঠযোগী স্থল শরীরে

ভাগবত প্রকৃতির অনির্বচনীয় বিহীত দর্শন করিয়াই মাতিয়া রহিল, রাজযোগী চিত্ত স্থির করিয়া সমাধির অপূর্ণ আশাধে তন্ম হইল, জ্ঞানী বিচার বিবেকের তীক্ষ্ণ অস্ত্রে মায়ার বাধন খণ্ড খণ্ড করিয়া, নিশা, শাশ্বত ব্রহ্মে আত্ম হইল, ভক্ত হর্ষ পূজকের যুগ কল্পনে জন্ম দোলাইয়া ইষ্টের গ্রেসে দ্রব হইয়া গেল, কর্তা কর্ম ও কর্তকল ভগবানে উৎসর্গ করিয়া নির্লিপ্য লাভ করিল,—তন্ত্র, বেদান্ত, ভারতের সকল ধর্মানাই কৌশলে প্রকৃতির বাহিরে গিয়া জীব বাহাতে হাঁপ ছাড়িয়া, মোক্ষ, মুক্তি, নির্লিপ্য পায়, তাহারই ব্যবস্থা করিয়াছে, জীবনের সামান্য জাতিকে উদ্ভূত করে নাই।

কিন্তু যোগের উদ্দেশ্য কি? জীব্যধারে কল্যাণপরের ঐক্য প্রকাশ। জগতে ধর্মসংস্থাপনের জটিল যুগে যুগে ভগবান কখন অবতার, কখন ঋশি, কখন বিহুজিহ্নে মানবদেহে আত্মপ্রকাশ করেন, জগতে শান্তি ও সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়—এই যোগ ব্যাপকভাবে জাতির জীবনে প্রভাব বিস্তার না করায়, ভারতের সত্য প্রাণবন্ত হইয়া উঠিতেছে না। ধর্মপ্রদান ভারত ধর্মের গৌরব রক্ষা করিতে পারে নাই, তাই এই দুরবস্থা, ধর্মের নিগূঢ় অর্থ অবধারণে আমরা আজ অসমর্থ হইয়াছি, ধর্মের নামে অধ্যর্থের অহুয়রণ প্রস্তুত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, প্রচলিত ধর্ম আমাদের চরিত্রে বল বিধান করে না, জ্ঞান ভক্তি নিষ্কাম কর্মে জীবন উদ্ভূত করে না, শক্তি সাহস বিশ্বাসের দ্বার মুক্ত করিয়া দেয় না, বরং ধর্মের আরম্ভে আমরা কণ্ঠবিমুখ হই, জ্বর পরবিদ্যে হইয়া উঠি, উন্নতির পরিপন্থী অলসতার আশ্রয়ে স্বার্থপর হই, ধর্মের নামে অধ্যর্থের পুষ্টি, জাতিকে উৎসন্ন দিবার উপক্রম করিয়াছে।

যে ধর্ম সাধনে ভারতবাসী—দায়শীল, দানশীল, জিতেন্দ্রিয়, মহাবল, বীর্যবান, পরাক্রমশালী ছিলেন, মাহুয় হইয়াও দেবতার সঙ্গ, মর্ত্যে স্বর্গের আনন্দ উপভোগ করিতেন, চূড়ান্ত সাধু ও সত্যবাদী

হইতেন, সেই ধর্ম যদি আমরা আচরণ করিতে পারিতাম, আমাদের দিন দিন হৃদ্যার মাত্রা বৃদ্ধি হইবে কেন? আমরা যদি ধর্মের পথে অগ্রসর হইব—তবে আমরা কাম্যমোহিত কেন? হৃদুর্ধ কেন, লুপ্ত, জুহু, নিষ্ঠুর কেন? নীচ জাতির আচার ব্যবহারে নীচাশয়—ধর্মের ছদ্মবেশে নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিয়া মরি কেন? ধর্ম আমাদের পক্ষে কুঠারাঘাত করিয়া মরি কেন? ধর্ম আমাদের ইহাই সত্য।

তবে কি উপায় নাই? আছে—সনাতন ধর্মের নামে আমরা অধ্যর্থের পূজা করিয়া বর্ষ হইতেছি, কলির প্রভাব বেঙ্কায় মাথা ঘরিয়া যুগকে বনন করিয়া লইতেছি, ভয়ে চিত্ত অবনম, পরিত্রাণের আশায় শক্তির মধ্যপনম হই—দৃষ্টি অন্ধ, বুদ্ধি বিকৃত—বিবেক ছাড়িয়াছে, গরল অমৃত, অমৃত গরল, দারুণ সংশয়ে হতভম্ব হইয়া গরল সেবন করিয়াই মরিতেছি, উজ্জ্বলের উপায়—শাস্ত্রের সত্যক নির্দেশ—হুসাধ্যা বোধে, সম্ভব ভাবিয়া তির্য্যক পথে পা বাড়াইতেছি—লগ্নভট্ট নীতিহার্য হইয়া এ জাতির মাথায় ঢুকিয়াছে, শাস্ত্রাণ্ড কুশাস্ত্রাণ্ডপূর্ণ, বুদ্ধির পীঠে পড়িয়া আমরা বিভ্রান্ত, ধর্ম চাই, কিন্তু ধর্মার্থ পথ না ধরিলে, যুগ যুগান্তরের প্রাণ্য বর্ষাভার তীব্র আঘাতে জীবন বিঘনয় করিবে, প্রতিক্রিয়ার ঘূর্ণিপাকে প্রকাতাঙ্কুরে ধর্মবিবেচী হইয়াই, অধ্যর্থের ব্যাঘ্—মাধ্যয় পরিয়া কলির অহুতর হইতে হইবে।

উপায় কি? উপায় আত্মদর্শন, যুগ যুগের বদন্য প্রস্তুতি আধারে স্বল্পদে অধ্যবে যে বাসা বীথিয়াছে, সে বাসা সংস্কারমুক্ত করিতে হইলে, সগুণ স্বতঃবাটীয়া দ্বিধাশক্তির হস্তে সর্গতোভাবে তুলিয়া দেওয়া চাই। এই আত্মদর্শনপন্থার নীতি আছে, বুদ্ধি আছে—যেদণ্ডভাবে আত্মদর্শন করিলে, আমি ও আমার মাথার অতীত এক তৃতীয়া শক্তি

আধারের পূর্ণভক্তি সম্পাদন করিবে, সেই কথা বলিবার জটিল এতদধীন গৌরচন্দ্রিকা।

প্রথমে সাধকের স্বরূপ রাখা উচিত—সাধনাটা তাহার নয়, ভগবানের, মুক্তি ব্যক্তিগত জীবনের জন্ম নয়, অন্তঃতঃ এ যুগে, ভগবানেরই। কথাটা ইংলিশ হইবে না, ভগবান তো নিঃশব্দ, তাহার আবার মুক্তি কি? হাঁ, ইহাই রহস্য, তিনি নিঃশব্দ, কিন্তু বক্তব্যে যখন লীলা করেন, সে অভিনয় এমন সত্য ও অক্ষুণ্ণ, যে নিত্য মুক্ত অবস্থাটা কোন কারণেই প্রকাশ পায় না, কার সাধ্য এ যুগে মুক্তির সাধনা করে! তিনিই যে বেঙ্কায় জ্ঞানের দ্বার বন্ধ করিয়া, আঁধারে হাতড়াইয়া, হুহু হুহু, হুহুয়াতি অধ্যাত্তির নাগরদালায় লোভ ধান, ইহার মধ্যে ব্যাধার কথা কিছু নাই, আর ব্যাধা বোধে বা ইহা হইতে মুক্তির পথ প্রয়াস করিয়াও সিদ্ধ হয় না, তবে ভগবান যখন স্বয়ং তাঁর পরিপূর্ণ অথবা আংশিক ঐক্য্য নরদেহে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন, তখন মাহুয়ের চেষ্টায় বাধ্য সে বিহুতি কল্প হইবার নয়। জীব্য যোগলিপ্সা যখন জাগে তখনই ভগবানের ইচ্ছা প্রকটিত হয়, জ্ঞানী সেই বাহার মধ্যে এই জ্ঞান জাগে; মূর্খ অজ্ঞান সেই—ভগবান যার মধ্যে প্রচ্ছন্ন, যেখানে নারায়ণের আগমন-ইচ্ছা স্পষ্ট। লুকনই নির্ভর করে, সর্গনিবৃত্তা ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর। মাহুয়ের প্রাণান, মনের কামনা, বানরের মত অহুকরণপ্রস্তুতি প্রবল, মনের কামনা, বানরের মত অহুকরণপ্রস্তুতি প্রবল, তাই মাহুয় বাধ্য বোধে তাহা করিতে ছুটে, কিন্তু কয়ে বসিয়া ঠাকুর বাধ্য করেন তাহাই হয়, এক তিল এদিক ওদিক করে কার সাধ্য?

এখন ঠাকুরের ইচ্ছা কি? ইহা বুঝিবার জন্ম বাহিরের দিকে দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন নাই, নিজের অন্তরে ইহার অন্বেষণ করিতে হইবে। অন্তর্ভাষার ইচ্ছা—অন্তরে যদি না থাকে, তবে পরের তপ্ত বালি তোমায় তাহারই কতদিন দাঁড় করাইয়া রাখিবে!

যদি পতিত হও, হুংব করিও না, অপরাধ তোমার নয়—যদি বশবী হও, ঈশ্বরের বাণী প্রচার করার চিহ্নিত সম্মান হও—সম্মান করিও না, নিজের ক্ষমতা পরখ করিয়া দেখিও, হুংবলতায় ভীকৃত্যায় জীবন কেমন আঁধার, তাহা লক্ষ্য করিও। গীর কর্ম তিনি করেন, তাই অসাধ্য সাধন হয়, তাহা না হইলে ভূমি কি! বাতাসের ভর সহিতে পার না, ঈশ্বরের বায়ুয় অটল থাক কেমন করিয়া? প্রভুর ইচ্ছার বলে। এই বিশ্বাস সনাতন সভ্যতাভের মুগ্ধধর্ম। সনাতন ধর্ম লাভ করিতে হইলে মুগ্ধধর্মের অঙ্গসমগ্র করিতে হয়, মুগ্ধধর্ম যেখানে না ছুটে, সেখানে আত্মদানী করা

ধর্মতত্ত্বের ভূমি শুধুমাত্র ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ ইচ্ছার ভূমি উন্মুক্ত নও। পূর্ণাঙ্গ ধর্ম সাধনের অঙ্গগুলির সমগ্র অঙ্গুষ্ঠান চাই, সে অঙ্গুষ্ঠানের মূল ঈশ্বরের পরম ইচ্ছাই বর্তমান থাকিবে, তাহা না হইলে, ধর্মের নামে অর্থকেই প্রদর্শন দেওয়া হইবে। কেমন করিয়া বৃষ্টিব-কি ধর্ম, কি অর্থ? শাস্ত্র গুহম নিদেপ দিয়াছে, সে নিদেপের অঙ্গসমগ্র কর, অস্ত্রধারীনি দিয়া ইচ্ছার সম্মান পাইবে—আজ কেবল উপক্রমণিকা করিয়া বাবিলিয়াম, বারাস্তরে গুরুমুখী সাধনার রহস্ত কথা ব্যক্ত করিব।

বৈষ্ণব-তীর্থ

ভারতের সর্বত্র মুখ মুগ্ধত্বের অঙ্গ কর্তৃত্ব যথেষ্ট সকল বিখ্যাত তীর্থ বিজ্ঞান আছে—সেগুলির কথা ছাড়িয়া, আমি চারিশত বৎসরের বাংলার বৃক্কে নব জাতি গঠনের অঙ্গ উপাদান লইয়া যে সব তীর্থ-মাঠাচ্ছা প্রকটিত হইয়াছে, তাহার কথাই আলোচনা করিব। বাঙ্গালী বাংলার সহিত যদি পরিচিত হইতে চায়, তাহা হইলে বাঙ্গালীর তীর্থনিদেপে মাথা লুটাইয়া তীর্থ-সেবা অঙ্গ মাতিতে হইবে, নিরাশ্রয় বিস্কৃত অস্ত্রকরণ লাভের এমন সহজ বিধি আর নাই।

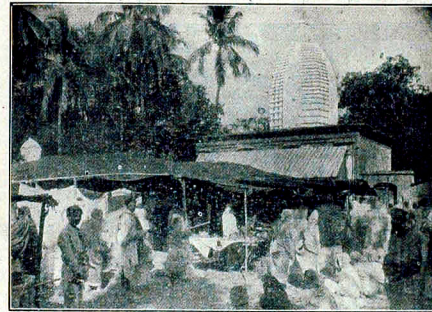
তোমরা একবার বাংলার মানচিত্রের দিকে লক্ষ্য কর, পশ্চিমে বীরভূম, বাঁকুড়া হইতে পূর্বে চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা—আর পার্শ্বাশ্রিত শিকিম জুটানের পাদভূমি কুচবিহার রঙ্গপুর হইতে খুলনা চব্বিশপরগণা—নবনরীয়েশনা মায়ের ভ্রাম অঙ্গল ছলিরা ছলিয়া কি

অপূর্ণ মহিমার সৌভাগ্য সমগ্র ভারতে সঞ্চারিত করিতে উভত, তাহা একবার অঙ্গত্ব কর। মাথের কি রাষ্ট্রগুরু বলিয়াছিলেন,—বাংলা আজ যাহা চিন্তা করে সমগ্র ভারত তাহা কাল অঙ্গসমগ্র করে, বাংলার দিবার এত সম্পদ এই পাচশত বৎসরে সঞ্চিত হইয়াছে, পরবর্তী পচিশাহাজার বৎসর ধরিয়া দুইহাতে দান করিলেও তাহা ফুরাইবে না। চার পাচশত বৎসরের মধ্যে বাংলার মানচিত্রে অসাধ্য পুণ্যময় চরিত্রের স্মৃতি হইয়াছে, এইগুলির স্মৃতি সংগ্রহে মুছিবার নয়, মুছে নাই, সত্যের মহিমা চিরমুখ জাগ্রত থাকে, আমাদের চিত্ত স্বাধিকলুপিত, তীর্থের মধ্যাঙ্গ রক্ষায় তাই উদ্যোগ। অতীতের প্রাতি এই ঐতিহাসিক আমাদের অধ্যাত্ম স্বাধ্য ক্ষয় করে, শুক আনন্ডভায় রক্ত মাংসদেশী পুষ্টি ও পবিত্র হয় না। বিশ্বাসের উত্তাপ,

ভক্তি আদ্যার পরম, প্রেমের আশ্রয় জীবনকে শৌর্য ও বীর্যময় করে, তীর্থ তীর্থে এই সঙ্গুণ সঙ্ঘে বাজী-সমাগম হইত, আজ অধিকাংশ তীর্থক্ষেত্রই হাওয়া কলনাইবার স্থানরূপে গণ্য হইয়াছে, মেলা দেখিতেই ভিড় বাড়ে, অঙ্গবিশালী গতাঃগতিক ধারা রক্ষায় যত্ববান, কিন্তু বিশ্বাসীর সংখ্যা কমিতেছে। তীর্থের গৌরব ভক্তের জগৎধানেই রক্ষিত হয়—বসন্ত নাই, খোয়ার আবর্জনার অতীত মহিমার বর্ণন হইতেছে।

আগেরগিরি পুড়িয়া পুড়িয়া রাশিকৃত ভঙ্গুরপে তোমার ঢাকা দিরাছে—কি অমর সম্পদে ভূমি যে পূর্ণ, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবে। জাতির পরিপূর্ণ সিদ্ধি অতীতের কর্মবোধীমূলে শ্রেণিত, এই লুপ্ত রত্নের অধিকারী, হে আমার সোনার ভাই বাঙ্গালী, কতদিন অটনকোর বিখ্যাত ছুরি হাতে কলহের কলহবে আত্মদাতা হইবে?

বাংলার নব নব তীর্থ একবার ঘুরিয়া আইস,



মন্দির ও মেলা

তীর্থ বলিতে ত্রীক্ষেত্র, বৃন্দাবন, কাশী এত্বেতি প্রসিদ্ধ দেবতার স্থানগুলিই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, জাতির গৌরবমুখের নিদর্শনগুণসমূহের পুণ্যময় স্মৃতি স্থপতিমহনীয় বৃত্তিচিহ্নকে জাগ্রত করে, মনুষ্যস্ব সাধনার এই সকল জীবন্ত উপকরণ উপেক্ষণীয় নহে, ইহা হইতেই আমরা ভবিষ্যতের স্বাভাবিক জীবন গঠনের প্রয়োজনীয় স্বাধ্য সংগ্রহ করি। আত্মবিশ্বত বাঙ্গালী চমৎকৃত হইও না, মাথের চরমতলে ধ্যান-নেত্র শুক চিত্রে অবস্থান কর, জগদে বিদ্যেবর

অবকাশের দিন যাব্দ না করিধা একবার যাও বৈষ্ণবধি, নারকে, হালিসহরে, দক্ষিণেশ্বর নবরীপে—এমন কত তীর্থ বাংলার বৃক্ জুড়িয়া ভবিষ্যৎ স্বজনের উৎকৃষ্ট উপাদান বকে রক্ষা করিতেছে, তাহার অধঃগণ কর, তোমার লগুতা, ক্ষুদ্রতা,

পঙ্কজ ঘূচিবে, ভূমি

বাংলার মাথার মনি হইধা ভারতের যোগ্য পুঞ্জরূপে জগতের কল্যাণ মাথনে সিদ্ধহস্ত হইবে। আজ আমি এখনি একটা, আমার ঘরের পার্শ্বে চারিশত বৎসরের পুণ্যস্মৃতি বহিয়া, যে তীর্থ এখনও প্রাতি বৎসরে সহস্র সহস্র নরনারীর হৃদয়ে প্রেম ভক্তির পরম দিয়া জাতিকে ধজ করে, সেই পবিত্র তীর্থের পরিচয় দিব। সঙ্গুণের ঐ চিত্রের দিকে অবলোকন কর, ঐ মন্দিরে যে বিগাহমুষ্টি উহা কোনও দেব দেবীর স্মৃতি নয়, বাঙ্গালী নর নারায়ণের পুঞ্জার

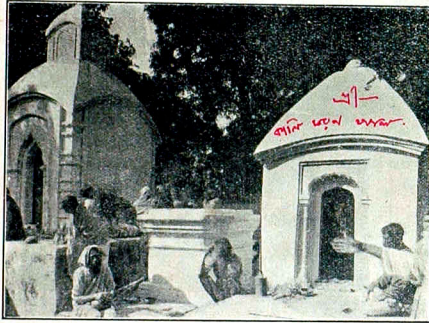
যে আমোদ সাধনশক্তির আবিষ্কার করিয়াছে, তাহার চরম ক্রান্তি একদিন জগতের অহমিকা চূর্ণ করিয়া বিশ্বের মরু-জলযে প্রেমের বার্তা ঘোষণা করিবে, ঈশ্বরপ্রাপ্তির সাধনায় প্রেমের বিজয়বৈজয়ন্তী নবদীপ-চক্ষের ত্রিমূর্তি এই মন্দিরে জীবন্ত স্বর্গ ইতিহাসের নিদর্শনরূপে পূজা পাইতেছে।

ইষ্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের প্রায় পঁচিশ মাইল উত্তরে— কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশন হইতে প্রায় তিন চার মাইল দূরে কুলিয়া নামক গ্রাম। গ্রামবাসিন যমুনা নদীর কুলে অবস্থিত, যমুনা শুকাইয়াছে, কুলিয়া এখন মরুভূমি, অগ্রহাষণ মাসের শেষে প্রতিবৎসর শুক্লা একাদশীতে এখানে মেলা বসে, লক্ষকোকের সমাগম হয়, একাদশীর রাত্রি সহস্র কণ্ঠের হরিনামে ব্যস্ত হইয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে অধঃপতিত জাতির বৃকজরা কলুষ বড় বিকট মূর্তিতে দেখা দেয়, একদিকে আকুল কণ্ঠে হরিধ্বনি, অল্প দিকে নির্ভাষ গল্পীপ্রান্তরে মত্ত, গল্পিকা লইয়া পাণ্ডুলবলের আমোদ প্রমোদ—তীর্থ মহিমা লুপ্ত। জাতির জীবনগতির অজ্ঞাত নির্দেশ লাভের পূর্ণাতীর্থ মহাপাণে কলুষিত, এই সব আকিল তীর্থেভারের কি কোনোই উপায় হইবে না?

যুতিহিক যোগ্যজনের হস্তে রক্ষার ভার না থাকিলে, সহৃদয় পাশকেই প্রার্থনা দেয়, সকল

তীর্থেই এইরূপ দোষদুষ্ট। সমাজের শত্রু চকু গোপন প্রণয়ে বাধা দেয়, তাই পাশমতি নারীপুরুষ, তীর্থ-দর্শনের অছিলায় অবাধে পাণের সুত্রস্রোত বুলিয়া কামোদ্যমে জবজ দূতের অবতারণা করে, জাতির তরুণ জাতীয় উন্নতির বহুবিধ অসুখানের মধ্যে তীর্থ সংস্কারে উদ্বৃত্ত হইলে, আমরা অধিকতর স্থনী হইব। বিশ্বমিশ্রিত খাণ্ড যেমন প্রাণবাহী, তীর্থে অনাচার জাতির জীবনের মূলে কুঠারাঘাত করে।

ষষ্ঠীয় দৃষ্ট—১০দেবানন্দ ও ভক্ত গোপালের



১০দেবানন্দ ও ভক্ত গোপালের সমাধি

সমাধিমন্দির। দেবানন্দ গোপাল তীর্থ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি এই মহামেলার প্রবর্তক, তার গোপাল ভট্টের করুণ কাহিণীই এই তীর্থটির মূলতত্ত্ব। গোপাল নদীয়ার একজন বিখ্যাত নৈমায়িক পণ্ডিত ছিলেন। জট পণ্ডিতের হস্ত হইতে মুক্তি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, ত্রিচৈতন্যও পণ্ডিতমণ্ডলীর হস্তে কম লাঞ্ছনা ভোগ করেন নাই, তিনি ভক্তদিগকে ইহাদের সঙ্গর্গ হইতে দূরে থাকিতে উপদেশ দিতেন,

শুষ্ক জ্ঞানচর্চায় প্রেমের আশ্রয় ভুলিতে হয়—ভট্টাচার্য মহাপ্রমের শুভ প্রতিভা ত্রিচৈতন্যের মহাপ্রেমের মহিমা তলাইয়া বৃষ্টিত না। বিশেষ জাতিবর্ণ নিরীক্ষেণে ত্রিগোপাল আচরণকে কোল দিহেন, সংকীর্ণন রূপে মাতোয়ারা হইতেন, পানাহারে জাতি-ভেদ মানিহেন না, শারবাবদায়ী পণ্ডিতবর্গ ঠাকুরের বিরুদ্ধে যে হইবেন ইহা অবধারিত। গোপাল ভট্ট চরমে উত্তীর্ণ ছিলেন। বাংলার অধিকাংশ নিষ্ঠুর বান রাঙ্গণ পণ্ডিত বাহিরে স্থতির অস্থায়ান সমাজ-কল্যাণে

বৎসরের মধ্যে দাক্ষ কঠ রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন, তিনি ঘটনাচক্রে নবদীপ হইতে কুলিয়ার আসিয়া বস বাঁধেন। ব্যাধির নিদানশ যক্ষণা তাঁর মনে শান্তি ছিল না, তিনি অস্থির হইলেন। শাপরিদ গোপাল ভট্ট ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্তির দৈব ভিন্ন আর অল্প উপায় নাই ইহা স্থির করিয়া, ত্রিধাম বৈদ্যনাথে ধ্যান দেন, স্বপ্ন পূর্ণ স্থিতি জাগিয়া উঠে, তিনি স্বপ্নাদেশে পান, যে ত্রিগোপালের প্রতি অহিতা-চরণের ফলেই তাঁহার এই রোগ, নিমাইয়ের চরণধূলি



দ্বাদশ বকুল

পালন করিলেও, সাধনজগতে তাত্ত্বিক—গোপাল ভট্ট অহিংসাপরায়ণ বৈষ্ণবের সম্মুখে পশুপতি দিয়াছিলেন, হরিনামোচ্চৈ গৌরাঙ্গভক্তের হৃদয়ে ইহা বাথার কষ্টকর বিদ্ধ করিয়াছিল,—পশুপতির উদ্ভেদই ছিল বৈষ্ণবগুরু গৌরচন্দ্রের অপমান করা, ছাগরক্ত ছড়াইয়া অকথা মিথ্যা মানি ঘোষণা করিয়া, প্রেমের ঠাকুর নবদীপচন্দ্রের অকলঙ্ক চরিত্রে কলঙ্কের কালি লেপিয়াছিলেন।

বিষাতার অন্তর্য্য বিধানে গোপাল ভট্ট এক

বিশ্বমের সীমা রহিল না। সমগ্র জনপদ হরিপ্রণে উন্নত—প্রেমের বান ডাকিঘাছে, যমুনার তটে দ্বাদশ বকুলতলে ভক্তজন সঙ্গে ত্রিচৈতন্যের প্রেমমুগ্ধ দেখিধা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। আছাড় বাইয়া ঠাকুরের চরণতলে পতিত হইলেন—প্রেমের দেবতা গলিত, দুর্গদ্ব দত্তময় গোপাল ভট্টের দেহবানি বহু হৃদয়ের পরশে পরিশুদ্ধ করিয়া দিলেন। সে কি মহোৎসব—কুলিয়া প্রেমের বানে ডুবিল, গোপাল ভট্টের অপরাধ ভঞ্জন হইল, হারার কেতন

অপে মাঝিগেই
চোপের শাস্তি
হইবে। ব্যাধির
ক্ষণা হইতে মুক্তি
কামনা প্রবল
হওয়ায় অঙ্গহার
প্রশ্রয় পাইল না,
গোপাল বাঁধী
দিরিলেন।

কুলিয়ায় প্রবেশ
করিয়াই তিনি
মাথা দেবেলেন,
তাঁহাতে আর

উড়িল, ক্রীড়াস্থলের চরণে কত পানী খুণী লুটাইয়া
ধুজ হইল, তার ইচ্ছা নাই। বাঙ্গালী অতীতের এই
কুজ ইতিহাসটুকু বুকের দাঁদ দিগা রক্ষা করিয়াছে,
যদুনার ধর আঁতে গোপালের বসতবাগী নিশ্চেষ্ট,
আছে তার সমাধি-মন্দির, আর আছে সেই ছাদশ
বকুলের পুষ্য বাসী—সিদ্ধ ছায়ায় বসিয়া এখনও হাজার
হাজার অশ্রুপূর্ণ নারী পুংস অশ্রুচক্রে ঠাকুরের নিকট

অপরোধ ভক্তনের প্রার্থনায় হরিষ্মনি করে, উৎসবের
ইহাই বিশেষত্ব।
পরিশেষে ঠাকুরের অমৃতর সহ বিগ্রহমূর্তির
চিত্র দিয়া প্রবন্ধ শেষ করি। ক্রীড়ার ও নিতাইয়ের
আশ্রমায় যুগল-বিগ্রহ বড় সুন্দর, বড় প্রীতিপদ।
ভক্তিভরে অঙ্ক বিখ্যাসী তাঁরো নাম কুলের পাট
বলিয়াই পুজার অর্থাৎ স্বরূপ কুল ও পাট প্রদান করে।
তাঁহাদের মনে এই মূলপত্র অর্থবোধ কত চেষ্টায়
নির্দল করা যায়, বাহা হইয়া আসিগেছে তাহার
মোড় দিয়াইহা নব চেতনায় তীর্থপুজা নব
বিধানে প্রবর্তন করা যে কত শক্ত, তাহা
সহজেই অনুমেয়।

জ্ঞান বিনা ভক্তি দ্বয়ে সাময়িক আনন্দের
প্রবাহ তুলে, কিন্তু হাতী অধ্যাত্মসম্পদে মানুষের
হৃদয় পূর্ণ করে না, দেয় ইহাদের নয়, শিক্ষা,
দীক্ষায় যে অকী ধারাবাহিক চলিয়াছে, তাহার
পতি দিয়াইহা ধরিতে না পারিলে অঙ্গগতির
রোধ হইবে না, আশ্রম ও হৃদয়ের অথবা বায়
হইবে, চরমপদ হইবে না। সুদিন কি আসিবে,
যেদিন দেশের তরুণ প্রাণ ধর্মসম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ
হইয়া, ধর্ম জ্ঞানালোকে জ্ঞাতির মানস ভিত্তির
পূজাহঁতে আত্মদান করিবে? এ যুগ জ্ঞান ও
শক্তির উদ্বোধন করার যুগ, আমরা এই সমাজত
সাপনে জাতিকে ডাক দিই, বাঙ্গালীর ঘরে
ঘরে জ্ঞানবর্তিকাহন্তে সাধকের অভিমান দেশের
প্রাণে শক্তি : অরণ্য মুক্ত করক।



কীর নিতাই

ভাগবত-মাহাত্ম্য

বেদে যার বিশ্বাস নাই, সে অহিন্দু। লোকাতার
ও সামাজিক বিশ্বাস যুগধর্মের অঙ্গরূপে পরিণতিত,
এইগুলির সম্ভার আছে, বর্জনে ও গ্রহণে রূপান্তরিত
হয়, কিন্তু অপৌরুষেয় বেদ নিত্য শাশ্বত, প্রলয়কালে
স্বয়ং ভগবান বেদ রক্ষা করেন।

প্রায়গর্ষোষি জলে

ধৃতবানসি বেদম।

বিহিতবহিঃকটিক্রমবেদম।

কেশবধৃত মীনশারীর

জয় জগদীশ্বরে !

কিন্তু বোধার্থে অতিশয় কঠিন, সত্য অল্প লোকেই
বুঝে, তাই বেদপাঠের অধিকারী হইতে হইলে
বিভাবার্থীকে কঠোর তপস্যা করিতে হয়, কিন্তু বিজ্ঞ
না হইলে বেদের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না। তজ্জ্ঞ সহজে
মানুষ যাহাতে বেদের ধর্ম উপলব্ধি করিতে পারে,
মহামুনি বাসদেব তাহার জন্ম অসাধারণ চেষ্টা
করিয়াছেন। হিন্দুধর্মের মর্ম বোধ করার উপায়
বাসদেবের চরণে শরণাগত হওয়া। বেদ বেদীন
সার্কোভোব সত্য সত্যজ্ঞপ্তে সর্বগগতে পুজিত হইবে,
জগতের আদিগুরু বাসদেব বিশ্ববিজ্ঞানের কেন্দ্র তাঁরো
দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বিশ্ববাসীর নিত্য
পুজার অর্থাৎ গ্রহণ করিবেন।

বেদ বিভাগ করিয়াই বাস দ্ব্যস্ত হন নাই,
উপন্যসি বেদের বিশদ বাখ্যা। জগতে প্রচারোদ্দেশ্যে
তিনি বেদান্ত সৃষ্টি করিলেন, উত্তর ও পূর্ব মীমাংসার
রচনা করিয়া বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয় আরও সরল
করিয়া দিলেন। তাহাতে তাঁহার অন্তর সাধনা পাইল
না; সংসারী জীবের মোহ দূর করার মানসে, তিনি

অষ্টাদশ পর্বে মহাভারত রচনা করিলেন—সমুদ্র পুরাণ
প্রণয়ন করিলেন, বাসদেবের তত্ত্ব কোড দূর হইল
না। লোকমুখি কামনার তিনি উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন,
পরিশেষে পরম ভক্তিরসমিশ্রিত ক্রীমভাগবত গ্রন্থ
ভারতবাসীর হস্তে দিয়া জ্ঞাত যাহাতে ভাগবতপরাগণ
হয়, তাঁর অজান্তে নির্দেশ দিলেন। ভারতের পশ্চাতে
মহাশূন্য বাসদেব ও অসংখ্য ধর্মি মহাপুরুষগণের
এইরূপ কল্যাণ ইচ্ছা এমন একটা প্রবল শক্তির প্রবাহ
সৃষ্টি করিয়াছে যে, এ জ্ঞাতির ধর্মলাভ ইচ্ছামাত্রই
সফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ভারতের ধর্ম সহজ-
সাধ্য, কিন্তু কালচক্রে আমরা এমনই হীনচিত্ত হইয়াছি,
—যাধর্ম করমরুপে বাল্য করিয়াও, ইহার অমৃত ফল
ভক্ষণে আমরা ব্যস্ত, অধঃপতনের ইচ্ছা চূড়ান্ত লক্ষণ।

যে ভাগবত গ্রন্থের শিকড় ভারতের হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ,
যে ভাগবত বুকের রক্ষাব্যবস্থার ভার অপাণবিক্ত
ধর্মি মহাপুরুষগণের উপর হস্ত, বেদ-বেদান্ত বাহার
কাণ্ড, রাম, রুদ্ৰ প্রভৃতি ঈশ্বরের অবতার বাহার
শাখা প্রশাখা, যোগ বাহার পত্র, ভক্তি মুক্তি বাহার
ফল ফল, শাখার শাখায় শব্দ, বৃক্ষ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ
বিহ্বলের জায় স্থলধর হইবে যে হানে ঈশ্বরামুরারের
অঙ্কুর তুলিয়াছে—সেই ভারত যুগে ধর্মের মহিমা
কীর্তন করে, অন্তর সত্যের অমর বোধে পূর্ণ নয়—ইহা
কি নিরাশ্রয় গ্রন্থবগুণ না?

লক্ষ্যভেদে আমরা, সহজ গুরুপণ ছাড়িয়া, বিপরীত
যুগে রাজা করিয়া আত্মপাতী হইতেছি, ঈশ্বরের
উপাসনা করিতে বসিয়া জ্ঞান মনের কমনারাজির পূজা
করিতেছি—খান করি, চিন্তা করি বিষয়ের, গর্ভ হয়
সাধনার। দায়ে পড়িয়াছি বৃষি, কিন্তু সাধন হয় না,

সত্যকে স্বীকার করি। এমন করিয়া আর চলা যায় না। আমাদের যে বিপক্ষে চলার উপায় নাই, জ্ঞাপ্তিতে যে স্রব নাই, মারা যে আমাদের বিপ, এ জ্ঞাপ্তির বিনিময়ে যে ঈশ্বরজনে গড়িয়াছে, ভাগবতময় না হওয়া যে আমাদের ধাত্তে নাই, আমাদের স্বভাবই হইতেছে ভাগবত।

অহং দেখে ন চ চোতাশ্মি
ব্রহ্মবাহং ন শোকভাক্ত।
সক্তির্গানন্দরূপাহং
নিত্যমুখস্বভাবান্॥

এই নিত্যমুখ স্বভাব হারাইরা, অস্বাভাবিক ভাবনাজাত্য, বিজাতীয় গ্রন্থ যথায় আমরা মুহুঃ—আমাদের আজ জীবনকে ধর্মের প্রাপ্তিত করিতে হইবে।

আমাদের ধর্ম “ব্রাহ্মীহিত” — উপায় ব্রহ্ম-বোধ। বেদীন হইতে ধর্মের সত্য মর্ম অবধারণে বঞ্চিত হইয়া, আমরা অধঃপতনের নীচ পথে গড়াইলাম, সেই দিন হইতে আমাদের অধ্যাত্ম ইতিহাসের বিবরণগুলি ধ্বংস করিতে হইবে। জ্ঞাপ্তি পথের নিতি স্বচরিত্র ধর্মের নামে অন্তরে প্রভাব বিস্তার করিতে, ততদিন আমাদের মুক্তি নাই। আজ আমরা ধর্মের নির্গুঢ় রহস্ত উপলব্ধি না করিয়া, বাহ্যিক আচার আচরণের স্রব্যবস্থার আশ্রয়মাগে করিয়াছি, সগর্ভনের মূল কথা—সত্য বস্তুর অদ্বৈত—তাঁহার অভাব যদি হয়, মানবপ্রাণ গর্ভ কাটরা গর্ভ বুঝাইবে, সত্য মিশ্রা নির্লিপ্তে আশ্রয় ধরাইয়া ভ্রমস্থ পূর্ণ নির্ভা করিবে, সত্যের বিরহমুগ্ধ প্রীতিষ্ঠা করিবে না।

হিন্দুশাস্ত্রের উদ্দেশ্য—ব্রহ্ম ও সংসার জ্ঞান পরিষ্কৃত করা, জীব ব্রহ্ম যুক্ত করিয়া ধরায় পরিত্রা প্রীতিষ্ঠা করা, ব্রহ্মজ্ঞি জাগ্রত করিয়া প্রেমতবে জাতিকে ভরাইয়া তোলা। এই মূল বীজের আশ্রয়প্রাপ্তি না

ভর্ত্তী—বেদে, উপনিষদে, সাংখ্যে, পাঠ্যজ্ঞে। মহাভারত, পুরাণ সকল ধর্ম শাস্ত্রই এই একই লক্ষ্যের অঙ্গগমন করিয়াছে, আধুনিক যুগের সহজিয়া ও তন্ত্র এই এক পথেই যাত্রী। ভারতের ধর্ম যে সার্বজনীন, সর্বধর্মসম্বন্ধের সমুদ্র। ভারতের দ্বৈতগা, ভারতের ধর্ম আজ সম্প্রদায়বিশেষে বঞ্চিত, গোমাবন্ধ; ভারত অকর্তার জগৎকে আলিঙ্গন দেয় না, তার জ্ঞাপ্তি যায়, ধর্ম যায়, বর্ণগোত্র প্রভৃতি বও অবর্ত্তে জীবন বিপন্ন,—হায়রে, এত ছোট তোমরা নও, ছোট হইয়া গর্ববোধ মস্তিষ্ক ভিন্ন আর কি বলিবে?

যিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ তিনি
‘সত্যাত্মক উদ্ধৃষ্ট সর্বপ্রাণীহিতেরতঃ’।

অতএব ভারতের এই দিবা চরিত্র লাভের বিধান শাস্ত্রগ্রন্থে যে অনন্ত ভাষায় বর্ণিত থাকিবে, তাহা আর বিচিৎ কি? কিন্তু তাহার সর্বত্র গ্রহণে অসমর্থ হওয়ায় আমরা বেদ, উপনিষদ, গীতা তো ছাড়িয়া দিয়াছি, আকাশলতার মত মধ্যস্থান হইতে লোকচারণত ধর্ম অপৌকমেয় বেদের অঙ্গণে আদিক প্রকার বস্ত্তজ্ঞান করিয়া, লোকগতির অবনতির সঙ্গে ধর্মের অপমান করিতেছি।

এইটা কলিযুগ, আমরা তার অহুতর, আমাদের এক চক্ষে অন্ধ, অন্ধ চক্ষে হিংসার আগুন। ধর্মের রিপাদ ভাঙ্গিয়াছি, অবশিষ্ট পদে আঘাত দিতে হাত উঠাইয়াছি। অবশ্য অজ্ঞান্যায়ীরা ইহা ইচ্ছা নহে, প্রতি পদেই কুঠা—সংসারের বৃষ্টিক ধংশন, তবুও মনকে চোব ঠাঠিয়া, লোকচারণ সনাতন ধর্ম বিলিয়া খোঁচা করিতেছি। দোষ কারও নয়, আমরা স্বধাম সলিলে ডুবিয়া মরিতেছি যে!

ভাগবতশাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য চাণা পড়িয়াছে। ভাগবত শাস্ত্র যে শ্রেষ্ঠ ধর্মবিজ্ঞান, ব্রহ্মমোহাসার অবার অন্ধ তাহা কল্পন রূপে? ভাগবত শাস্ত্র ব্যাখ্যা যে ব্রহ্মপ্রেম জাগ্রিবে তাহার আর উপায়

নাই, উপভাস নাটকাদির ছাড়া, ব্রহ্মবিজ্ঞানের মোমাগাবাদ বড় অনাস্থার সহিত সাধারণ লোকের মনে সাধারণ ভাবই জাগাইয়া দেয়, ভাগবত শাস্ত্রের সাহায্যে উৎকৃষ্ট ব্রহ্মগাধনা লাভের বিনিময়ে, প্রাকৃত প্রেমের আদি রসরূপে রাধাকৃষ্ণের প্রণয় কাহিনীই বিবৃত করে, ইহা যেন সহজ মাছুবের উপভোগ। ত্যাগ বৈরাগ্যের আনন্দ বার বৃক্কে অলে, সে এই অমৃত উৎসে অবগাহন করিয়া শান্তি লাভের সন্ধান পায় না।

যে ভাগবত ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মনোবী ব্যাসদেব একাধারে গৃহী ও গম্যাসীর অন্তরে ব্রহ্মজ্ঞান জাগাইতে প্রণয়ন করিলেন, যাহা আধ্যাত্মিকুলের প্রকাশিত অকুণ্ডলপাণ্ডুর সমুদ্রে যথেষ্ট একটা উজ্জ্বল রত্ন, তপস্বী পরমহংস, ভক্ত, গৃহী সকলের অমৃতধরুণ, তাহা উপকথার মত সমাজে ব্যাখ্যাত হয়, ইহাপেক্ষা আর লজ্জার কথা কি আছে!

“প্রবর্তকের” সূত্র আধারে ধারাবাহিক কোন শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব নয়, আমরা উদীয়মান জ্ঞাপ্তির অন্তরে হিন্দুশাস্ত্রের সত্য ধর্ম অবধারণের সন্ধেৎ এবং ইহাতে যাহাতে কতি জন্মায় তাহারই ব্যাখ্যা করিতে চাই। কেন না, ভারতের সনাতন ধর্ম না জাগিলে, ভারত অস্বাধর্মের সত্য মর্ম উপলব্ধি না করিলে, ধর্মপ্রাণ জ্ঞাপ্তির জীবনে জাগরণের বিদ্যায় দীর্ঘকাল বাধী হইবে না। ধর্মগাধনায় হয় আমরা রক্ষণশীল স্বভাব লাভ করিয়া জগৎ হংতে বস্ত্র হইয়া থাকিতে চাই না, ধর্মের আস্থা হারাইয়া বৈদেশীক চিন্তা ও মাধনায় জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও অস্তিত্বের সত্য কামনা উপলব্ধি করিতে অবিদ্যার পথে বটক নিক্ষেপ করি। ধর্ম যদি ভারতের প্রাণ, তবে অবদারিত ধর্মের প্রভাব প্রাণকে পঙ্কু করিবে না, অরিয়ম করিবে, সপল করিবে, দেবতার প্রীতিষ্ঠা হো প্রাণবেদীর উপর ভর করিয়াই পঙ্কু হইবে।

ভাগবতের প্রথম শ্লোকে আছে—

নৈমিষেহনিমিষকেন্দ্ৰে ধ্বংসঃ শৌনকাদয়ঃ।

সত্ত্বঃ স্বর্গীয় লোকাঃ সংস্রবমাগতঃ॥

এই শ্লোকের অধ্যাত্ম অর্থ জীবনে যে যোগের সন্ধান দেয়, তাহা বুলিলে সমগ্র ভাগবত শাস্ত্রের উদ্দেশ্য কামলকবৎ প্রতীক্ষান হয়।

নৈমিষ নামক অনিমেষকেন্দ্ৰে শৌনকাদি ধর্মগণ স্বর্গলোক কামনা করিয়া সংস্রবব্যাপী বৃজ করিয়াছিলেন।

যায় পুরাণে আছে :—“ব্রহ্মগোবিন্দস্ত মনোময়ত চক্ৰঃ নৈমিঃ শীর্ষাতে কুজী ভবতি বর তল্লেনিবাং নৈমিষস্যেব নৈমিষাং—”

ব্যাসদেবের সপ্তদশ পুরাণের উদ্দেশ্য ইহাতে ধরা যায়। পূর্বেই বলিয়াছি, বেদের গ্রন্থ অর্থ বিশদ করিতেই তিনি বৈদ্যন্ত প্রভৃতি পুরাণাদি রচনা করেন, ভাষিয়া ভাষিয়া বেদের নির্দেশ সর্ব জ্ঞানের অন্তরে প্রবেশ করাইয়া জগৎসৌকে ব্রহ্মানন্দে ভরাইয়া তোলাই ছিল তাঁর সত্য কামনা-জানিনা কত দিনে তার এই পঙ্কু উদ্দেশ্য সফল হইবে।

গীতায় আছে :—

“এবা ব্রাহ্মী হিতি পার্থ নৈনাম প্রাপ্য বিমুক্তি।

হিত্যতঃ সমস্তকালেহপি ব্রহ্মনির্লীণমুচ্ছতি॥”

ব্রহ্মনির্লীণ সেই পায় যে মুক্তাকার ব্রাহ্মীহিত রক্ষা করে, “ব্রাহ্মীহিত”—স্রব ধ্বংসের অতীত নিত্য অবস্থায় যে চেতনা—সমস্তাঙ্গপরি যোগী তার ব্যক্তিগত চেতনা ব্রহ্ম সমুচ্ছ করিয়া নির্লীপিত হয় অর্থাৎ তার বস্ত্র অস্ত্র গুণ হয়, ইহা মুক্তারই নামান্তর নয়, মুক্তানন্দ-রূপাণ্য। নির্লীণ ব্রহ্মচেতনার আশ্রয়নের একটা আশ্রয়, সর্বাধির আনন্দ—ইহা বাসনামুক্ত জীবনের চেতনা, এই পরম অবস্থা আদর্শ, ইহা প্রাপ্তির সাধনাই ভাগবত দিতেছেন। মনোময় চক্ৰ নৈমিষ—মন চারি অংশে গঠিত, মন, চিত্ত, বুদ্ধি, অহংকৃত, এই

চক্ৰ যুগ্মদান—যেখানে ইহা স্থির হয়, সেই নৈমিষ নামক অনিমেষ ক্ষেত্র, যেখানে ঋষিরা সহস্র বৎসর স্বর্ণকামনায় যজ্ঞরত। মন স্থির হয় কোথায়? ইষ্টে। ইষ্ট লাভ হয় কার? যার আছে বিশ্বাস, বিশ্বাসের স্থান রত্নের আশ্রয়। রত্ন না জন্মিলে ঘৃণিত মন স্থির হইবে কেমন করিয়া? মনের ধর্ম চাক্ষুষ, চিত্ত কিশি বিকশিত মৃত প্রভৃতি বৃত্তিময়, বুদ্ধি সংশয়াক্রম, অহংকার মায়া সবই অস্থির, চঞ্চল। কিন্তু রত্ন রসের স্পর্শে মক্ষিকা যেমন মধুময় পুষ্পে স্থির হইয়া বসে, মনও তেমনি স্থির হয়। রত্ন হইতেই শ্রদ্ধার উৎপত্তি, শ্রদ্ধার পরিণতি ভক্তিতে। ভক্তি প্রেমের বীজ। এই প্রেমের উদয়ে মন কৃষ্ঠাধীন হয়; তাই স্থির মনই অনিমেষ ক্ষেত্র, অনাহত স্বরূপ। ঋষিরা এইখানে বসিয়াই স্বর্ণকামনায় সহস্রবর্ষ যজ্ঞ করিতেছেন। কামনাধীন হইলে আত্মাই স্বর্ণ। সহস্রবর্ষ প্রবঞ্চনাময় কালের নির্দেশ দিতেছে।

নিকাম কর্মযোগই যজ্ঞ। গীতার একথা বহু বার উক্ত হইয়াছে। অতএব ভাগবতের প্রথম শ্লোকের নিগূঢ় অধ্যাত্ম অর্থ পাঠককে যোগের পন্থাই দেখায়। সে যোগ সাধনার বিধি রূপকজলে ভাগবতের পাতায় পাতায় ছড়াইয়া, ব্যাসদেব ভারতের প্রাণকে উদ্ভূত করিতেছেন। জাতীয় শিক্ষার পুণ্য বৌদীপীঠে বসিয়া কবে ব্রহ্মজ্ঞানীর কণ্ঠে সূতা ধুকু স্বাক্ষর দিবে? কবে ভারতের কোটি কোটি নরনারী ভারতধর্মের সত্য ধর্ম বৃন্দা উরাস্ত কণ্ঠে সর্বজাতিকে ডাকিবে? একই ধর্মের ছরতলে মহামেলা বসাইবে? সে স্রবোগ ভারতেরই আছে। জীব ধর্মহীন চিরদিন রহিবে না, রহিতে পারে না। অন্তরের শিপাসা বিষয়তৃষ্ণা নহে, ভগবানের পরশকামনা। সে বাহ্য পূরণ করার কলহক ভারতবর্ষ। স্বপ্নের শ্রদ্ধা ঢালিয়া বৃন্দক সজীবিত কর—ধরার পাণের ভার বিমোচিত হইবে।



কাহিনী

ইতিনানগরের উপকণ্ঠে কলনাদিনী যমুনা—কাল জলের তরঙ্গ ফুলিয়া প্রবাহিত। তীরে বনাঞ্জি—গভীর জুগ্মব। অরব্যাপণ কটক গুহের আক্রমণ হইতে অতিকণ্ঠে আত্মরক্ষা করিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া বিলির্গ আকারে ঘাটে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়াছে। বন-কুহ্মের গন্ধে, মধুগণের গুঞ্জনে, বিহঙ্গের কলতানে স্থানটি আমোদিত, সুব্রিত, বড় চমৎকার, বড় মনোরম!

ছল ছল ছলাৎ—নিরন্তর সোহাগের আবদার, মাসীর বুক চেউয়ের আঘাত, অভিভানে ফুলিয়া ফুলিয়া বেন বলিতে চায়, তুমি সর, সর, আমি ছকুল ভাসাইয়া ছুট ছুট, আমায় বাঁধন দিওনা, আমায় মুক্তি দাও। মৃত্তিকার হিয়া কঠিন, কথায় কর্পণত নাহি, চিরদিন অবরোধধাসিনী রমণীর স্নায় তরলিনী তার বৃকর মশোই বন্দিনী—আঘাতে উদাসীন, বিপদের প্লাবনে

উভয় বাহু প্রসারিত করিয়া আরও নিবিড়ভাবে জড়াইয়া ধরে, মিলনের রসাতল্যে বহু হয়।

উভয়ের মধ্যে প্রেমের কোন্দল নিত্যকাল, কেহ কাহাকে ছাড়ে না, এই মিলনের রসাতল্যে বহুক্ষণ স্থগনের উৎস, দেববাহিত, অমরালোকের স্নায় দৌলব্যাময়ী।

ঘাটে আর কেহ নাই, সন্ধ্যার আকাশে একটা একটা করিয়া নক্ষত্র ফুটিতেছে—জ্বর তরলীর উপর এক রমণী উপবেশন করিয়া, পদযুগল জলগর্ভে সঞ্চালিত করিতেছে। মাথায় নিবিড় কুন্তলদাম এলায়িত, উন্নত পর্দাধর, ঘোঁসের লাংবা সর্বাঙ্গে উজ্জ্বলিত - টোট-দ্রবানিতে তুলি দিয়া কে যেন টাটকা গোলাপি রং মাখাইয়া দিয়াছে; সন্ধ্যাকোলে ধরণীর বক্ষে একটা উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতই যুবতী শোভা পাইতেছিল। যুবতীর চকু মৃত, আমোদিত জলতরঙ্গের সহিত বেলা

করিতেছিল, সহসা তাহার কর্ণে পৌছিল—“আমায় পার করে দাও”—চক্ষু মেঘিয়া দেখিল এক তাপস-মূর্তি। সমস্ত্রনে উঠিয়া নৌকার মুখ ধরিয়া তীরের সহিত সমুদ্র করিয়া দিল, বিনাবাক্যে আগন্তক নৌকার উপর উঠিয়া বসিলেন—যুবতী নৌকা ছাড়িয়া দিল, হাল ধরিয়া তরঙ্গি বাহিতে লাগিল।

সতাই তপস্বী—পিঙ্গল জটাতার মস্তক বেঁধেন করিয়া পৃষ্ঠদেশে ঝাঁপিয়া পড়িয়াছে—বৃক্ষবন কট-তটে চূড়বৎ, সর্বাংশ চন্দনচর্চিত, হস্তে কমণ্ডলু, অঙ্গ দীপ্তস্বর্গের ছায়া প্রভাবিশিষ্ট। যুবতীর চক্ষু সে রূপে ঝলসিয়া গেল, ভক্তিতে জ্বলয় নৃত্য করিল, বদনমণ্ডল উৎফুল্ল হইল—যেন সে দেবতা দর্শনে দ্বন্দ্ব হইয়াছে।

সেদিন ক্রম্বা প্রতিপদ। সন্ধ্যার অন্ধকাল পরেই, পূর্ণগগনে চন্দ্রোদয় হইল, জ্যোৎস্নার সিঁদুরে ধোয়া যমুনার কৃষ্ণ প্রকৃতি সাতনের পরাইয়া দিল—তপস্বী নির্বাক, অনিনিম্ন নয়নে পূর্ণাঙ্গ চন্দ্র দর্শন করিতে লাগিলেন। যুবতীর চক্ষু ছিল এই উন্নতবক দিব্য পুরুষমূর্তির দিকে, প্রকৃতির শোভা সে নিভা বেষে, এমন অপূর্ণ ত্রীতেজস্বীমাণ্ডিত দেবতা কোন দিন তার দৃষ্টিতে পড়ে নাই। সে ভক্তিবিহীন বিনয়-চূড়িতে তপস্বীর দিকে চাহিয়া রহিল।

যুবতী আশ্চর্য—নদীবক্যে বাসুদেব চর হিঙ্গ পশুর আবাস দেখে, নৌকা এখানেই একটা চরের নিকটবর্তী হইল, তাপস যুব কিরাইলেন—বিশম জ্যোৎস্নায় তিনি দেখিলেন, ক্রম্বাভরণকূট—স্বির অকিঞ্চানলক—নিম্নদেশে যুবতীর সুখানি হৃদয়ায় ভরা—পূর্ণমের স্নেহ কথা সুরিল না, সর্পস্রাবীর বিদ্যৎ বর্ষণ হইতে লাগিল, কি স্বন্দর, কি অপাখিব ত্রুটি, মাংসপেশী পলকে নৃত্য করিয়া দিল।

একবার চূড়ি কিরাইলেন—নৌকা তালে তালে ছলিয়া, নদীবক্যে বিস্তৃত চরে আসিয়া ঠেকিবার উপক্রম করিয়াছে; আবার চারিলেন রমণী মূর্তির দিকে,

আবার বিদ্রোহের স্পর্শে সর্বাংশ যেন চূর্ণ হইয়া যায়, প্রাণ প্রমত্ত, সরাঙ্গী দেখিলেন—জনশূন্য স্থান, উর্ধ্বে বিশাল নীলিম, নিম্নে বীচীমালা বক্যে যমুনার নৃত্যভঙ্গী, আর সমুখে কে ঐ ইন্দীবর তুল্য প্রহ্লদ বদন—কি ঐ মধুস্বয় চূড়ি, আর সর্বাংশে এ কি অভিনব পরশের অমুকুটি!

তাপস চক্ষু মুদিলেন—প্রাণ স্থির হইল না, প্রবল দৈত্যশক্তি যেন সব চূরমার করিয়া দিল, যুবতী যে পলকহীন! নৌকা চরে আসিয়া ঠেকিল, তপস্বী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া যুবতীর রূপলাবণ্য অকাতরে পান করিতে লাগিলেন।

বিবেকের কথাতার ব্যর্থ হইল—চির জীবনের অভ্যাস—নাশয়, যোগশক্তি কেমন করিয়া যে অন্তহিত হইল—কোন বাহুদয়ে ইন্দিয়জয়ী বীর যে আজ কামবিন্ধল হইয়া যুগপ্তলিকার ছায়া উঠিয়া যুবতীর কণ্ঠ বেঁধেন করিলেন, চূর্ণনের পর চূর্ণন দিয়া অথরে রক্ত প্রলেপ মাখাইয়া দিলেন—তাহা তিনি বুঝিলেন না।

প্রকৃতির হৃদয় শক্তি হ্রোগে পাইয়া অষ্ট বজ একজ করিল। সাধনার পূর্ণাঙ্গেরে বহু প্রকৃতি-পরায়ণ ক্ষুরি পূর্ণা নিম্নাঙ্গে বীর বাঁধিয়া যে আক-হাওয়ার স্রুতি হয়, সেখানে বসন্ত সেনা পরাজয় মানিয়া গিরে, জয়-সদনের বাণও ব্যর্থ হয়, কিন্তু শোণিতের উচ্চতা থাকিতে, প্রকৃতির নিরালা কুঞ্জে নারী পূর্ণমের মিলনে প্রকৃত ক্ষুরি অদমনীয় প্রোজি-দমিত হয় না, বিশেষতঃ দীর্ঘকালের রক্ত প্রোজি শোণিতরূপে সুকির জয়ভাষা বাজাইয়া দিল, অবশ-জিত্তে তাপস যুবতীর গলা ধরিয়া চরে অবহরণ করিলেন—মধুপুঞ্জে সারাদিক ভরিয়া উঠিল, মল্লিকার চাপা হাসি বিকশিত হইল—পিক ব্যস্তার দিল—লজ্জায় সন্ধ্যা-বঁধু কুয়াসা-রঙের চাদর ঢাকা দিয়া আড়াল করিয়া ঈড়াইলেন। এই পূর্ণম ক্ষুরি পরাশর—

রমণী মন্তগন্ধা, পরে সত্যবতী নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছিলেন।

সে যুগে মানবের আকস্মিক পদযান, ভারতের সন্ধ্যাে গোপন করার হীনতা ছিল না, তখন ভারতের স্বাধীন মনোবৃত্তি স্বভাবের জয় পরাজয়ে অসুস্থ থাকিত, তাই এই অজ্ঞাত ধীবরকন্টার গর্ভে ক্ষুরি ঠরসে

যে সন্তান জন্মগ্রহণ করিলেন—তিনি ভারতের শাস্র-বেত্তা—যা, সন্দেহ, ভারতের ব্রাহ্মণ আজও শাস্রাধ্যয়নের পূর্ণাঙ্গ উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করে:—

বাস্যং বশিষ্ঠনগরঃ শক্তেঃ পৌরম্যকক্ষয়ং
পরশরাশ্রমঃ বন্দে স্তবতাতঃ তপোনিধিम्॥

গ্রামের চিত্র

(১)

চিত্রখানি গ্রামের, পটিন বৎসর পূর্ণে চিত্রখানিতে তুলি লেপিয়াছি, আমার পূর্ণে শত শত ব্যক্তি চিত্র-খানি রসাইয়া তুলিয়াছেন—এই রঙ্গীন চিত্র সমস্ত্রয়ে প্রকাশ করিতেছি।

গ্রামের কথা আদি-কথা, ভারতের আদি ও অন্ত তাহার গ্রাম, ভারতমাতা গ্রামে গ্রামে অঙ্গল বিছাইয়া তাঁর মনের কথা ব্যক্ত করিতেছেন। অনেক বনেন, মাঘের কথা অমরা গ্রামেই শুনিতে পাই।

গ্রামের সত্য ভারতের সত্য এক-কথা কবির কথা, সত্যের পাখরে ইহা ক্ষুটিয়া উঠিয়াছে; গ্রামেই ভারতবর্ষ বর্মান, গ্রাম একই হুরে সকলকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে—হিন্দু মুসলমান, শূর ভদ্র শত শত তারে যে স্বভারই তুলুক, ভাঙতে একই হুর লহরী তুলিতেছে।

এইরূপ একটী হুরের লহরী আমার গ্রামখানিতে চিরকালই স্ফূর্তা তুলিত—পটিন বৎসর পূর্ণে গ্রামের প্রত্যেক ব্যক্তি এই গীতমুখা পান করিয়া অমর হইয়াছে।

আজ সেই হুরের কথা প্রকাশ করিতে ভয় হয়—এখন জাতে জাতে কি ভীষণ প্রতিনিধিতা, হিন্দু-মুসলমান ত পরস্পরের শত্রুক্ষেপেই কাঁচা করিতেছে।

গ্রামের অঙ্গল তলে সিঁদুর হাওয়ায় সকলে পাশে পাশে বাস করিতেছেন, কিন্তু মনের আকাশ বনঘটাই ছাইয়া গিয়াছে।

যাক, বর্ষমানের কথা কাক নাই, মুসলমানের প্রণয় এখন তুলিব না, হাড়ি-মুচি-বাগী হইতে গোপ-তেলী, ব্রাহ্মণ কাছর সকলে মিলিয়া আমার যেরূপে এই গ্রামখানিতে বাস করিয়াছি, তাহার কথাই কথিয়া যাই।

(২)

হুরের বিষয় গ্রামখানি ভয়ানক বা গণ্ডগ্রাম নাহে, পটিন বৎসর পূর্ণে প্রত্যেক গণ্ডগ্রামেই অনেক তরঙ্গ উদ্ভিত হইত; সে যুগে গৃহবিচ্ছেদ, জাতের বিরোধ, কলুষ, অহংকার ছিল বড় বড় গ্রামের নিত্য সহচর, আমাদের গ্রামে তাহা আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু গ্রাম গ্রামেই—বোধহয় ইহা শিকড় গাড়িলে না।

গ্রামখানির কেন্দ্রস্থল “ব্রাহ্মণ বাড়ী”—গ্রামে আর তিনঘর ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু পনের আনা লোক এই ব্রাহ্মণের স্বয়ম্ভাব, শুনিতে পাই যাজক ব্রাহ্মণের চিত্র সর্বাংশ হয়, কিন্তু এমন উদার জন্মের ব্যবস্থা আমি অজ ব্রাহ্মণ-বাড়ীতে দেখি নাই।

অথেরনাথ চক্রবর্তী গ্রামের অধিকাংশ জন্ম-সদ

শ্রমের পুরোহিত—গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালীমাতা অখোরনাথ চকবর্তীরই সেবা ও পূজা গ্রহণ করিতেন; প্রতিমাখানি প্রায় পাঁচ হাত উচ্চ, দেখিলে ভীতির সন্ধার হয়, চতুর্দশবর্তী গ্রামের প্রত্যেক লোকই এই দেবীকে ভক্তি ও ভীতির চক্রে দেখিও, প্রত্যেক উৎসব নব্বইর অষ্টভাগ দেবীর উদ্দেশে অর্পিত হইত; কত প্রবাহই না দেবীকে ঘিরিয়া প্রচলিত ছিল, গ্রামের যাহিরে দেবীর বেদী স্থাপিত হওয়ায় শিশুবলি নব-বলির কথাও উথিত হইত! এইরূপ ভীমা নৃপমণ্ডলিনী মহাদেবীর সেবক ও পূজক অখোরনাথ গ্রামবাসীর বিশেষ আদার পাত্র ছিলেন, সকলেই তাঁহার বাটতে প্রসাদ গ্রহণে লালারিত হইত। কালীমাতার পূজারী হিসাবে প্রত্যেক গ্রামবাসীই তাঁহার বধমান, এখানে ইতর নাই ভয় নাই, এখানে জল-চল নাই জল-অচল নাই, সকলেই কালীমাতার পূজা দিয়া মাসের মধ্যে একদিন না একদিন ব্রাহ্মণ বাড়ীতে প্রসাদ গ্রহণ করিতেন—ইহা গ্রামবাগীর—এতই নিম্ন হইয়া উঠিয়াছিল, যে, সময় নাই অসময় নাই, ব্রাহ্মণ বাড়ীতে আসিয়া পড়িলে অনেকেই এক মুঠা প্রসাদ পায়রা যাইতেন। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী ইহাতে কোন বিরক্তি নাই, ব্রাহ্মণী এত কত হাঁড়ি ভাতই যে প্রত্যহ রাঁধিতেন তাহা আবার ঠিক করিতে পারি নাই, বোধহয় সন্ধ্যার কাছাকাছি ধানিকটা সময় কেবল চুলা নির্মাপিত থকিত।

এই অমরজ ও ব্রাহ্মণ বাড়ী গ্রামের কেন্দ্রস্থল, কালী-দেবী গ্রামের প্রত্যেক জাতের হিন্দুকে এই ব্রাহ্মণবাড়ীতে এক করিয়া তুলিয়াছিলেন, গ্রামখানিতে অমর হাড়ি ও মুচি ভিন্ন এমন জাত থাকে নাই বাহারা অন্তঃকরণে সত্যই অস্পৃহরূপে স্থান পাইত, হাড়ি ও মুচিও ব্রাহ্মণ বাড়ীতে ঘন ঘন পাত পাতিয়া বসিয়া যাইত, তাহাদের আগে এমন কি গিল্ল অনেক খাইতেন, সকলেই ব্রাহ্মণের বৈঠকখানায় আহারের

শেষে তামাক বাইবার সময় বিশ্রান্তাশ্রমে শ্রম দূর করিতেন। আর সন্ধ্যার সময় বৈঠকখানায় যে বৈঠকটা বসিত তাহাতে গ্রামের অন্তরের ছবিতী বেশ ফুটরা উঠিত, সকল জাত মিলিয়া হিন্দুরা যে এক-জাতিত্বকে রূপদ্রবী ও ফুটাইয়া তুলিতেছে তাহা আবার এই বৈঠকে পূর্ণরূপে দেখিতে পাইতাম।

(৩)

গ্রামে যে “কালী ঠাঠুর”টা ছিলেন তিনি খুবই জাগ্রত, তাঁহার প্রত্যহ পূজা হইত, তিনি গ্রামের দেওতা—প্রত্যেক গ্রামবাসী সাফল্যভাবে তাঁহার পূজা দিয়া আসিত, সকল জাতই স্ব স্ব পূজাপকরণ লইয়া দেবীর উঠানে আঙঠি হইয়া ফুটাইয়া থাকিত, তখন কে কোন জাত যেন খেয়ালই থাকিত না। অখোর-নাথ বধন পূজা শেষ করিতেন, সকলে দেবীকে ও তাঁহাকে গাঢ় ভক্তির প্রশান করিত, তিনি সামান্যতম শুদ্ধভাবে তাহাদের দিকে তাকাইয়া, পরে পূজার নেপা কাটাইয়া দিয়া শ্রমের হাতে সকলকে সম্বোধন করিতেন, একরূপ সকলকেই প্রশান পাইবার জন্য নিম্নরূপ করিতেন। তাঁহার চক্রে সকলেই স্থান, সকলে আবার পরস্পর ভেদজ্ঞান ত্যাগ করিয়া তাঁহার কথা শুনিতেন, যখন তাঁহার বাড়ীতে পাত পাতিত, সম্ভারের খোলস অবত থাকিয়া যাইত, জাতে জাতে একটু তফাতে বসিয়া ব্রাহ্মণের দেয় অন্ন গ্রহণ করিত, কিন্তু প্রসাদ গ্রহণে ভক্তির ভাবীত যেন বিভিন্ন মূর্ত্তি লইয়া বিভিন্ন হস্তে ভোজন করিয়া যাইত।

এই একত্বা যেমন ভোজনে ছিল, রহস্তাশ্রমে দ্বিতীয় ভাবে তাহা ফুটরা উঠিত—সকল জাতের যুবক ও প্রৌঢ় মিলিয়া বৈঠকখানা ঘুরত করিত। বসিবার মধ্যেও জাতিভেদের চিহ্ন বর্জনমান ছিল, কিন্তু অখোর-নাথের কোঠা পুত্র প্রত্যেক জলচল এমনকি পেঁপে-কলু যোগী প্রভৃতি জল-অচল যুবকদিগের সহিত বৈঠকখানার

উপরের দাওয়ায় একই বিছানার উপর বসিয়া গল্প ও গান বাজনা করিতেন, তাঁহার মধ্যে পিতার ভায়া ব্রাহ্মণের নীচা অপেক্ষা গ্রামবাসীর প্রতী প্রীতি এবং দেবীভক্তিই বিশেষ প্রবল ছিল। বাহারা তাঁহার সহিত একাসনে বসিতেন, তাঁহারা কয়েক দাবীতে তাঁহার সহিত স্থান আসন অধিকার করিতেন, কিন্তু অন্তরে তাঁহাকে জাত হিসাবে ও স্বভাব হিসাবে উচ্চ আসনই দিয়া আসিতেন।

যেদিন লোক বেশী হইত নীচের দাওয়ায় অনেক বসিয়া যাইতেন, তাহারই এক পাশে বাগ্নী-বাদক, গায়ক ও শ্রোতা বসিয়া থাকিত, যেদিন লোক কম থাকিত বাগ্নীয়াও উপরের দাওয়ায় ভিন্নাসনে স্থান পাইত—জাতিভেদটা ছাড়ার মত সুবিধা বেড়াইত, কিন্তু কাণ্ড ও প্রাণ বিভিন্ন জাতের মধ্যে একত্বেরই রস পান করিত।

বৈঠকখানায় প্রত্যহই অখোর নাথ আসিতেন, তিনি বৈকালবেশায় একবার গ্রাম ভ্রমণে বহির্গত হইতেন, অনেক বাড়ী গুরিয়া ভাল মন্দ সংবাদ লইয়া সাধনা ও সংপরাশর্ম দিয়া তিনি একটু রাত্রিতেই বাড়ীতে ফিরিতেন। গৃহে প্রবেশ করিবার পূর্বে বৈঠক খানায় আসিয়া একটু একটু আশিয়াছে দেখিয়া যাইতেন, মিষ্ট কথায় সকলকে ভূষ্ট করিয়া কোন কোন দিন না বসিয়াই অন্তরে প্রবেশ করিতেন, কোনদিনবা কোন একটা কথা শুনিয়া একটু বসিতেন, সেই সময় তাঁহার জ্ঞান একটু স্থান খালি করিয়া দেওয়া হইত, তিনি একই আসনে একটু বেশী স্থান লইয়া বসিতেন ও তামাক সেবন করিতেন।

(৪)

গ্রামের বাসন দূর করিবার জন্ত যখন বাৎসরিক রক্ষাকালীর পূজা হইত, তখন অধিকদূরই তাঁহাকে এখানে কাটাইতে হইত। গ্রামের মধ্যস্থলে বারওয়ীর শিবতলা ও কালীতলা, এখানে অমর প্রত্যেক জাতের

বয়স বৃদ্ধিই এইসময়ে উপস্থিত হইতেন, তাঁহাদের যাত্রা গান চাঁদা সংগ্রহ ও বিভিন্ন প্রকার ব্যবহার কথা এইখানেই হইত, গ্রামের প্রত্যেক জাতই এই পুণ্য ও উৎসবে যোগদান করিত, কিন্তু ইহাদের সহিত আলাপ করিয়া একটু বেশী রাত্রিতে তিনি তাঁহার বৈঠকখানার মণ্ডলীর সহিত কথা বার্ষী করিতেন, প্রত্যেক যুটিনীটার আলোচনা হইত, সমস্ত গ্রামবাসী এইরূপে এককাটা হইয়া আনন্দে মাতিয়া যাইত।

বাৎসরিক রক্ষাকালী পূজার যুগ শেখাবার বিষয়—গ্রামান্তরে প্রতিমা নির্মিত হইত, প্রতিমা আসিত রাত্রিকালে, ইতর ভয় সকলে অশানের নিবর্তকামর বাঁধিয়া উপস্থিত থাকিতেন, প্রতিমাতে অশানে নানা-বিধা তপস্বিত থাকিতেন, এইভাবেই—এক সময় অশানের চূড়ী নির্মাপিত করিতে গ্রামবাসী অশানেই রক্ষাকালীর পূজা করিতেন, চূড়ীতাহারিণী এখন হুখে চুখে সকল সময়েই গ্রামবাসীর পূজা পান, তাই অশানের কাগীকে গ্রামের অন্তরে লইতে তাহাদের এত উল্লাস! মড়কের সময় ভীতি-আড়ষ্ট গ্রামবাসী যে ভাবে মায়ের পূজা করে, এখন তাহার সে ভাব নাই, এখন খলুসারিণী মাকেবী গ্রামের বাস্তু-ঈশ্বর্যে প্রহরা দিতে আগমন করিতেছেন।

আনন্দ দেখে কে! ঢাকের তালে লাকাইয়া লাকাইয়া একপাশ যুবক আনন্দে হাত ধরাধরি করিয়া মা-মা করিয়া চাৎকার করিতেছে, মা আসিয়া বধন বারওয়ীর তলায় উপস্থিত হইলেন, ছেলে ও যুবাদের আনন্দ-উল্লাস উঠিল, জীলোকেরা ভক্তির গলবন্দ হইয়া বিস্ময় নেড়ে মায়েরদিকে তাকাইয়া আছেন,

প্রৌঢ় ও বুড়েরা অক্ষুণ্ণরূপে ঘন-ঘন মা-মা বলিতেছেন। পুত্রীর রাজে মায়ের বধন পূজা হয় তখন সকলেই সম্মুখভাবে প্রতিমার দিকে চাহিয়া থাকেন, সমগ্র গ্রাম ভাঙ্গিয়া বারওয়ীর তলায় উপস্থিত, গ্রামবাসী বিভিন্ন

জাত তখন একটা প্রাণীর ভাষা ধ্যানবির হইয়া গভীর স্বপনে মাকু-ভক্তির সন্ধান করিতে থাকে।

(৫)

আমি আমার গ্রাম্যতার কথা এত অধিক বলিতেছি— তাহার কারণ আমার গ্রামে বসিয়া সকল জাতের হিন্দু পানাহার ও বিবাহ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আলাহিলা। থাকিয়াও, যেন একটা প্রাণীর ভাষা দেব ঘিঙের উদ্দেশ্যে-ইঙ্গিতে পরিচালিত হইয়া পরম শ্রমে বাস করিতাম, আমাদের মনোভাব এমনই এককের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল, যে, তথায় না ছিল মান্তি না ছিল দ্বন্দ্ব, ব্রহ্মহত্য জমি লইয়া ও জীর একগাছা পৈঁছা লইয়া গ্রামে বিবাহ বা গৃহবিচ্ছেদ একেবারেই স্থান পাইত না। গৃহদেবতা কম লোকেরই আবেশে ছিলেন, কিন্তু গ্রাম্য দেবতার। এত জাগ্রত ছিলেন, যে, তাঁহারা তাঁহাদের পুত্রক ও ভক্তদের মধ্যে এতটুকু মান্তি আনিতে একেবারেই বাধা দিতেন—তাঁদের প্রীতি ভক্তির স্রোতে মনের মগা কোথায় তলাইয়া যায়।

মর্ত্যের দেবতা ব্রাহ্মণ ও এ-গ্রামে গৃহকলহ বাহিতে সেন নাহি। তাঁহার কন্ধ্যাপটু সন্দের গৃহে সকল ছিন্ন পুঞ্জাইয়া দিত, এমন মিষ্ট হাসি ও এমন সরল ব্যবহার, যে, জাতের নিষ্ঠা তাহাতে স্থান পায় না, সকলের শিক্ষায় তোলা মন দ্রব্য তিনি অগ্রেই ফেলিয়া দিতেন, তাহাতে তিনি হাড়ি বাঁড়ী শুড়ি বাঁড়ী কোন বাঁড়ী বিচার করিতেন না। বোধ হয় পুরাকালের ব্রাহ্মণরা এইরূপই ছিলেন, তাই হাজার হাজার বছরের অভিজ্ঞতা অথবা অটোর ফলে হিন্দুর দেশে যে অগণিত জাত ও উপজাতের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার ভিতরও তাঁরা একটা রূপ বা এককের সন্ধান সকল জীবনেই প্রাপন করিতে সক্ষম হইতেন। তাঁদের ব্রাহ্মণ ও বোধ হয় আজকালের শুচিবাহুত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ভাষা ছিলেন না।

(৬)

কিন্তু আমি যে গ্রামের মিলনের কথা কহিতেছি সত্য ভক্তি ও সদয় শ্রদ্ধার ভিতর দিগাই গ্রামবাসী তাহা অর্জন করিয়াছিলেন। দেব ও বিজ বড় সন্নিবৃত্ত হইয়াই তাহাদিগের সহিত বিরাজ করিতেন। ইহাতে অনেক সময় মনে হইত তাহার বোধ হয় জীবনের সকল দিক সরল ভাবে উজ্জ্বলময় করিয়া প্রকাশ করিতে পারে না। গ্রামের যা কিছু উৎসব, ঠাকুর দেবতার পূজা লইয়া—সেই সেই ঠাকুরের পূজা বাহাদের স্বরণে ও মনে সর্বদাই গাঢ় কটকিত হইয়া উঠিত। কিন্তু গ্রামের এমনও অশ্রুতান ছিল বাহাতে গ্রামের লোক বোলা প্রাণে ভাবের নেশার জ্বরে সকল কথাই বাক্য করিত, গান, ছড়া ও শব্দ-অভিনয়ে গ্রামের সে দৃশ্য বড় সরল ও আনন্দময়।

চড়কের সময় এই দৃশ্যটি বড় উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। গ্রামের আশুবানী লোক সম্মাস গ্রহণ করিতেন, যাহারা ব্রতধারা তাহাদের অধিকাংশই পূর্ব হইতেই সম্মাস গ্রহণের সক্ষম গ্রহণ করিতেন না—একদিন সম্মাসী ধরিবার ধুম পড়িয়া যায়, সেইদিন অধিকাংশ যুবকের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সম্মাসীপন নৃতন সম্মাসী সংগ্রহ করিতেন, গ্রাম ও মাঠে ছুটাছুটি দেখিতে মনে হইত, গ্রামে ধর্মভাবমিশ্রিত হ্রদ ও শক্তির বিজ্ঞান খেলিয়া যাইতেছে, ছেলেরা বুড়াদের ছুটাছুটির বহরে তন্ত্বিত হইয়া পড়িত, এইরূপে কাঁচা সম্মাসীদের লইয়া সে বিপুল সম্মাসী-বাহিনী চড়কের সময় গ্রামের শোভা বহন করিতেন, আগুনের উপর ও পাট ভাঙ্গায় তাহাদের শক্তি-সামর্থ্যের পরিচয় সকলেই নৃত হইতেন, তাহাদের প্রাণের নারিকেল স-গ্রহের লজ ও অত্যাঁড় মুকেরা বরষার মধ্যে শোঁঘা বোধের পরিচয় দিতেন। হুড়াহুড়ির সহিত শক্তির ঢেউ ও আমোদের ঢেউ শিবতলায় নৃত্য করিতে থাকিত।

কিন্তু নীলাবতীর বিবাহের দিনেই উজ্জ্বলের তরঙ্গে

গ্রাম ছলিয়া উঠিত, এদিনে যুবকেরা বোলা প্রাণে গ্রামের সকল কথাই রস ঢালিয়া দিতেন। অভিনয়ের সাজ সজ্জা হইত, দক্ষিণ দিকের শ্মশান ক্ষেত্রে, শিব যেন শ্মশান হইতে গ্রামের মধ্যে নীলাবতীর সন্ধান চলিয়াছেন, বরষাকী ভূতপ্রেতগণ ভূত প্রেতেরই সাজ সজ্জা গ্রহণ করিয়া ছাই কলা পাতা ও ছাকড়াই অপরূপ শোভা বিস্তার করিতেন, হুগুনো বা শ্রেণীও ছই একজন থাকিতেন—চাক কোল কাড়া নাকাড়ায় শোভাযাত্রা সরগরম হইয়া উঠিত, শোভাযাত্রার পথে গ্রামের ছেলেমেয়ে প্রৌঢ় যুবক সকলেই রহস্তায়া হাসিমুখে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। নাচ ও গানের বিভিন্ন রকমের 'বহর' ছিল—যখন প্রহসিনী বুলোদের লইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেন এবং তিনি কাহার স্বকীয়াটুরাণী তাহার শ্রম হইত, তখন রহস্তে নৃতন রহস্তের অবতারণা হইত, তালতলের সন্ধান না থাকায় সে সময় বিকট নৃত্যও বেশ মনোহর্য করিত।

এই শোভাযাত্রাটি ছিল গ্রামের রঙ্গ-চিত্র ও নৃক-দ্য-

অভিনয়ের সারি যাত্রা, সারা বৎসরের বিশিষ্ট বিশিষ্ট ঘটনাগুলি বাস্তবরূপে গাণিত্য যুবকগণ তাহাদের মন্তব্য প্রকাশ করিতেন; ইহাতে কেহই বাধ পড়িতেন না, গ্রামের প্রধান গৃহস্থ, সম্পদশালী চাকুরে এবং অতি দরঙ্গের গুপ্ত কথাও বেশ রঙ্গায়া তাহার। সকলের সমক্ষে প্রকাশ করিতেন এবং সংবাদপত্রের সম্পাদকের ভাষা এইরূপে তাহার। গ্রামকে গ্রামসাধারণের মতের অঙ্গুণত করিয়া লইতেন, পাণ ও 'দেম'কের ইহা বন বলিলেও চলে। এ সময় বিদ্রোহী হইবার সময় নয়, নিজের বিরুদ্ধে অতি কটু ও তিক্ত অভিনয়ও নিজকে সমুচিত আনন্দে গ্রহণ করিতে হইত। রহস্তের টিপনি টিপিয়া টিপিয়া ইহাদের অন্তর হইতেও বিন্দু বিন্দু রসের সঞ্চার করিত—তাহাদের অন্তরের এক বিন্দু রস এদিকে সহজ বিন্দুর ধারা লইয়া শোভাযাত্রা নাটাইয়া তুলিত। এই আনন্দ-শ্রমত গ্রামবাসীর চিত্র বড় উজ্জ্বল, বড় মনুষ্য, ভাষায় বোধ হয় তাহা বর্ণিত হইয়া পড়িল।

জীবন-বেদ

(উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৮৯১ খৃষ্টাব্দের কথা। একটা শতাব্দীর যবনিকা-পাতের আয়োজন চলিয়াছে, ধর্ম-গুরু রামমোহন হইতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবে, অবিভাব, উনিশ শতাব্দীর বিশেষ্য। বাংলায় ধর্ম, সমাজ ও শাহিত্য এই কালের মধ্যে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে; রামমোহনের বাংলা গল্প বাহ্যিকক্ষেত্র অর্ধ

শতাব্দীর মধ্যেই জয়ন্তী ফুটাইয়া তুলিল, রামমোহনের ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের প্রেরণা একই শতাব্দীর মধ্যে অটল প্রতিষ্ঠা পাইল—বাহ্যিক ধর্মজীবনে উদার, সমাজসংস্কারে নির্ভীক, সাহিত্যে অস্বীতীয় হইয়া উঠিল। রামমোহনের প্রচেষ্টায় বাংলায় ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন চ্য, অর্ধ শতাব্দী যাইতে না যাইতে বাংলার মনীষায় পাশ্চাত্যের প্রতিভা যত্নপ্রদীপ আলিঙ্গিত দিল, বাঙ্গালীর লেখনী অবিকৃত সত্যজ

ইয়ারাজী সাহিত্যের পুষ্টি বিধান করিল—এইগুলি জাগরণের লক্ষণ। জাতির নবোদিত শক্তি পাছে উচ্ছ্বল উদারগামী হয়, তাই বাংলার বিধাতা-পুরুষ ইহা সম্বন্ধেও সতর্কতার সহিত জ্ঞাত, উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়া প্রকৃত জাগরণের প্রস্তুতি করিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর বর্ণময় সিদ্ধপুরুষগণের পদস্বরে মহিমাযুক্ত হইয়াছে, বিশ শতাব্দীর উন্নতি অসীতের সত্যপুত্র বর্ণবৈধির উপর প্রতিষ্ঠিত—বিশেষ ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে যুরোপ ভ্রমণ করিয়া স্বামীজীর কঠিন যত্নে ভারতের আকাশ মুখরিত করিল, তখন তরুণ জীবনে যে বিদ্রোহ ছুটিয়া গেল—সোনাজোলের কমলপুত্রদের পাড়ে, জ্যেষ্ঠ মাসের মধ্যাহ্ন রৌদ্রকে আচ্ছাদিত করিয়া যে প্রাচীন বটবৃক্ষ ছিল, তাহার তলায় তিন জন বৃদ্ধ এই সব কথা লইয়াই আলোচনা করিতেছিল।

ভারতের ধর্ম সম্বন্ধে স্বামীজীর অভিমত তরুণের প্রাণে নতুন হৃদয়ের স্বাক্ষর তুলিয়াছে, ধর্মের সাধনা পূর্ণের যেরূপ আনন্দাত্মক অবস্থার উপর নির্ভর করিত, অথবা স্বভাববিরুদ্ধ ইচ্ছার আচার অসুষ্ঠানে নিবদ্ধ ছিল—যাহা ইহা থাকিলেও অমূল্যমূল্য কথা সকলের পক্ষে সম্ভব হইত না, এক্ষণে স্বামীজীর কথায় সহজ ও সরল পদ্ধতিতে দেশের নিকট ধরা দিয়াছে। ইহার পূর্ণের ধর্মসাধনা করিতে গিয়া মানুষকে নির্জন স্থানে গিয়া ঘর বাঁধিতে হইত, শরীরকে প্রকৃতির পীড়ন সহিব্যবসায় মত করণ করিতে হইত, সকলের সাহসে এই সব ক্রমবর্তিত না। অজ্ঞ দিকে লোকচারণ ধর্মের অধিকাংশ লোকই বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল—কেশবচন্দ্র প্রকৃতি বাংলার নৈঋতীয় মধ্যপুরুষেরা ধর্মকে জীবনের সহজ নীতির মধ্যেই ধরার সন্ধান দিতেছিলেন। তারপর স্বামীজী যখন বলিলেন—শরীরের মুক্তি হয় না, শরীর অকৃত্রিম-বিশেষের অধীন, মুক্তির মুক্তি নাই, বৃদ্ধির কারণ চিন্তা-

সমূহ, চিন্তাহীন মস্তিষ্ক জড়, মৃত। মুক্তি আত্মার, আত্মনীতে যেমন তোমার শরীরের প্রতিবিম্ব দেখ, তরুণ এই শরীর মন আত্মার প্রতিবিম্ব, প্রতিবিম্ব লইয়া সাধনার কারণ ব্যর্থ হইবে। আত্মাকে জানি, আত্মাকে পাই, বেদের অর্থই হইতেছে জানা, কিন্তু ষাট হইতে বেদের উৎপত্তি, এই বেদের উপর ভারতের প্রতিষ্ঠা। আত্মা ভগবানের মন্দির, ভগবান প্রতি জনের আত্মা, আমরা জনে জনে ভগবানের প্রিয়, আমরা দেবজীবনের অধিকারী। এইসব কথা মুমূর্ষু জাতির জীবনে অমৃত বর্ষণ করিয়াছিল, এই তিন জন তরুণ বরুণ ধরিয়া স্বামীজীর বাণী লইয়া আলোচনা করিল, তিনজনই কলকাতার ছাত্র। সোনাজোলের বর্ধমান জেলার একটি গুপ্তাশ্রম, রেল লাইন হইতে ৮১০ মাইল দূরে হইবে। গ্রামের অবস্থা তেমন ভাল নয়, মালেরিয়ায় সর্বনাশ হইয়াছে; সম্প্রতি বিহতিকা রোগে গ্রামের অর্দ্ধেক লোক মারা গিয়াছে, এখনও একটু স্বাস্থ্য ভাল।

কলিকাতায় গ্রীষ্মের প্রেক্ষাপেক্ষে শীতলা দেবীর অসুস্থতা কিছু প্রবল হয়, এই বৎসরে মৃত্যুসংখ্যা এত বাড়িয়াছে যে, অনেক লোক কলিকাতা ছাড়িয়া গলাইয়াছে। বহু বৎসর পরে, গ্রীষ্মকালে ইংল্যান্ডে এই গ্রামে আসিয়াছে। কলিকাতার আশ্রম কায়াধার থাকিরা গ্রামের লোকদিগের সহিত ভাল করিয়া মিলিয়া থাকা কেমন বাধ বাধ ঠেকে। ইংল্যান্ড তিন জনই এক গ্রামের লোক, তাই তিন জনে এক সঙ্গে জেনেই এক গ্রামের লোক, তাই তিন জনে এক সঙ্গে থাকার সুযোগ ঘটাইয়াছে। প্রতিদিন আহারান্তে আশ্রমকে ঘুরিয়া এইখানে তাহার আশ্রম পরিচয় করে, সন্ধ্যার পর শীতলা দেবীর একটি পাখান দেবী আছে, সেইখানে বসিয়া অসীত, সন্তান ও ভবিষ্যতের চিন্তায় দিনগুলি বেশ সুখেই কাটাঁয়া দেয়।

আজ কথাটা বেশ খোঁজাল হইয়া উঠিল, দুই জনের উৎসাহে প্রকট হইয়া উঠিল। একজন ছিল অন্নভাষী,

তার মুখে তেমন চলিত না, কিন্তু কান পাতিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা অল্প ছুই বজর আলাপ শ্রবণ করার মত স্বৈরাচারী। আজিকার কথায় তার শ্রাণেও স্ফুলিঙ্গ দেখা দিল, সে বলিল—“হরিনাথ! উপায় কি? সমস্তা জটিল, মীমাংসা কিসে হবে?”

হরিনাথ কথায় কথায় কবিতা গিয়াছিল, সে তেজের সহিত বলিল, “পরম্পরকে পরম্পর সাহায্য করতে হবে, ঈশ্বরের চিন্তা, ঈশ্বরের কাজে সতত যুক্ত থাকার চূড়ান্ত পর্যন্ত, আমি যদি ঈশ্বরকে পড়ি, তুমি আমায় চেনেন দিবে, তুমি যদি অক্ষম হও, আমি তোমায় তুলে ধরবে, এইরূপ ভাবেই সাধনা আচরিত হবে—এ যুগে নিজে নিজে কিছু হয়ে উঠবে না।”

বিজ্ঞানস বলিল—বিজ্ঞান ব্যক্তির নাম বিজ্ঞান—“সাধারণ কতদিন টুকবে? নিজ পায়ে ভর চাই, নিজের মনে যদি জোর না থাকে, একদিন তোমার উপদেশ পায়ে দিচ্ছিবে ধোবে—মন বিগড়ালে তোমার কথা শুনেও কে?”

হরিনাথ হস্ত স্তম্ভিত করিয়া মাতীর উপর আঘাত দিয়া বলিল, “আরে জোর চাই—জোর আছে, ধরে নাও না জোর আছে, তারপর এর দেখি একটি মতলব ঠিক করে, তিনজনে সে মতলব হাঁসিল না হওয়া পর্যন্ত ছাড়াছাড়ি হবে না, পরপর পরম্পরকে টেনে রাখবে, কেমন না হয় দেখি!”

বিজ্ঞানস—“ছিড়ে যাবে, মতলব নিয়ে কিছু হবে না, তোমার আমার সাহায্য বলির বাঁধ, কামনার জোত অটুকে রাখবে না।”

প্রথম যুবক বলিল, “তুমি কি বল!”

বিজ্ঞানস—“আমি বলি, আমাদের স্বভাবটাকে আগে বলাতে হবে, অনেক ছাত্র আসবে, আভাব জাগবে, সবচেয়ে ভ্রমের না করে, স্থির থাকার অটল স্বভাব গড়ে তুলতে হবে, তা না হলে আমরা তিনজনেও তিরদিন এক হয়ে থাকতে পারবো না, সুখেই অপরোহণ!”

প্রথম যুবক অপরোহণ। সে বলিল, “এই স্বভাবের পরিবর্তন তো সহজ নয়, বাসনা তা অসম্ভবমাত্রের করে ফেলে—স্বভাব বদলাই কিসে?”

বিজ্ঞানস—“সেই তো আসল কথা—তার সম্বন্ধে কি? সে সম্বন্ধে কে দিবে?”

হরিনাথ আর চুপ করিয়া থাকিল না—বলিল, “তোমার ধান ভানতে শিবে, গীত গাইছে—স্বভাব যাবে ম’লে, মরুচ্চগে স্বভাব—এস না আমার একটা কাজ ঠিক করি, তিনজনে সেটা সিদ্ধ করে ফুলি—কুঁদের মুখে ঠকা থাকবে না, ব’লে ব’লে মাথা ঘাবালে হাড়ে বুন ধরবে। দেশে কত কাজ, এখনও একমাল ছুটি আছে। ছেলে বেলায় দাদা মশারের মুখে তুলেছি—এই কমল পুরুষের তিন বাঁধ জল থাকতে, গ্রীষ্মকালেও আরশীর মত মুখ দেখা যেতো, এখন দেখ এর যা অবস্থা! মাথার এক কোমর জল নেই, ঝাঁকুড়ায় ভর্তি, গ্রামের প্রাণ এই জলটুকুতে, এম পুরুষটাকে পরিষ্কার করে ফেলি। গ্রামে কলার প্রাচুর্য্য হয়, জল যাতে সবাই ফুটিয়ে খায় তার ব্যবস্থা করি। কৃষকেরা নিরক্ষর, রাতে তাদের নিয়ে অক্ষর পরিচয় করতে দিই। অনেক কাজ, বিশ্ব, অনেক কাজ, হুক করে দাও, আশা-টা আশা সব ঠিকেরে বেরিয়ে পড়বে।”

হরিনাথের কথায় একটা তেজ ছিল, বিজ্ঞানসের চিন্তা গভীর, সে সব কাজের পিছনে শক্তির অনন্ত প্রবাহ আছে কি না দেখার চেষ্টা করিত। শ্রম দিতে তার বাধা ছিল না, কিন্তু সে শ্রমের পরিণাম যে কিছুই নয়, একমাল হয় ত পুরুষের জলটুকু আনবিল রাখা যাবে, তারপর মানুষের স্বভাব পরিবর্তন না হলে হ্যাঁ! কাজ হওয়া যে হুকটুকু। আরও পুরুষের যে অবস্থা তাই পাড়াবে। বহুই সে ভাবিত, তেজ! সে নিরুপায় হইয়া পড়িত। অপরোহণ এই ছই বজর অমূল্যমূল্যেই হ্রস্ব পাইত, তাহার না ছিল উদ্যমের তেজ, না ছিল গভীর চিন্তাশক্তি, কিন্তু স্ববর্ণাধারি বহু

নয়ন ছিল, ছই বন্ধ যে পথে চলে, সে নিঃশব্দে সেই পথেই পা বাড়াইতে ইচ্ছন্তঃ করিত না। উন্মাদের দীপ্তি না থাকিলেও কর্ণে তার শ্রুতি ছিল না, চিত্তের গভীরতা না থাকিলেও কর্ণকুশলতার অভাব ছিল না—হরিনাথের কথা শুনিয়া বলিল, “বিষ! হরিনাথ একটা কাণের মত কাণ বলেছে, এস লেগে যাই, গ্রামে তবুও ত একটা সাড়া পড়ে যাবে, কি বল?”

বিষদাস—“আমার আগতি কি! তবে একপ্রাণ সাধাথের চেয়ে আমি মানুষের অন্তরচেনাকে উন্মুক্ত করার কাজে আত্মনিয়োগ ভালবাসি, তার পথ পাচ্ছি না, হরিনাথের কাজে আমার আগতি নেই।”

অপরেশের মুখানি প্রসন্ন হইল—“তিন বন্ধুরে আজই রাতে ঘির করিবে, কাল কি করা হইবে, তারপর গ্রামবাসীদের অকৃত্যর সমুদয়ে জীবনের প্রাণীরা আলিয়া তাহাদের উজ্জল ভবিষ্যৎ চিত্রিত করিবে। কলকাতার পড়া মুখ্য করিয়া জীবন যেন আড়ষ্ট হইয়াছে, জীবনের এই নৃতন চাকল্যে স্নায়ুগুলি উৎকল হইল—বেলা পড়িলে তিন বন্ধু বৃকসল হইতে উঠিয়া নিজ নিজ বাটা প্রভাণগমন করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

হরিনাথ কাঁধে কোদাল লইয়া ঘরসা হইতে না হইতেই কলপপুরের পাড়ে আসিয়া উপস্থিত হইল, অপরেশ পাড়ার গিলে রোগা গোটা কয়েক ছেলে ধরিয়া আনিয়াছে, বিষদাস মেয়ে আসিয়া পৌছিল। তোড়জোড় করিতে করিতেই ঘরোয়ায় হইল, পল্লী-নারীগণ বড়া কীকে কীকে কীকে বাটে আসিয়া দেখা দিল। অনেকে চিল কিলি-হুরে তান ধরিয়াছে। কাকের কর্কশ কণ্ঠে কানে তাল্য ধরে, বনজুহুরের

গঞ্জে বাতাস ভরা; কোকিলের স্বাক্ষরের সঙ্গে চাপা গাছের ডোয়া বসিয়া দোয়েল শিশু দ্বিত্তেছে; রক্তে, রেখায়, মাছের কঠরবে, পাখীর ডাকে প্রকৃতির আশ্রয় জন্মকাইয়া উঠিল। হরিনাথ লক্ষ দিয়া জলে পড়িল, ঝাঁকড়া ধরিয়া টানাটানি ছুঁড়িয়া দিল, জলের তলে কোদাল চলে না, অপরেশ যোগ দিল, বিষদাস হাঁটু জলে ঝাঁকড়া টানাটানির চোটে উপা-ছেঁড়া ঝাঁকড়াগুলি হাতাহাতি করিয়া জেগায় ছুঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল—আর পল্লীবালকেরা একটা নৃতন আয়োদি পাইয়া জলে ঝাঁপাই স্বোরা আরম্ভ করিয়া দিল, পুরুরের পাক বুলাইয়া উঠিল। একজন বয়ীমদী নারী বড়া করিয়া জল নিতে আসিয়াছিল, সে বলিল, “মাছ ধরে কারা?” যোমটা টানিয়া অক্ষুটবরে কৃষকধনু উত্তর দিল, “বাবু! ঝাঁকড়া তুলছে—গুগু হব বুঝি।”

প্রাণীরা বলিল, “ওমা তাইতো—নাই কাজ তো থৈ ভাঙ্গ! তারপর উত্তর কণ্ঠে হাঁকিল, “বলি, হাংগা, সকাল সোয়ায় একি আলা, মানুষ কন কি জম সববে না!” বিকৃত হুরে প্রতিপল্লি উঠিল—হরিনাথ একপ্রস্থ বজ্রতা ছুঁড়িয়া দিল।

“না গো না, তোমাদের ভাল করছি, গ্রামে একশ ঘর লোক, এই জলটুকু পুঁজি, এত আগাছা ঝাঁকতে জলের বিস্তৃতা থাকে না, ঝাঁকড়া তুলে লাইম অক ফস্করেট ঢেলে দিলে সে জলে অহম বিস্ত্র হবো না, তার উপর যদি ফুটয়ে বাও, ওলাউঠায় মানুষ সববে না।”

আর কোথায় আছে, কর্কশ কণ্ঠে পাড়া ফাটাইয়া রমণী বলিয়া উঠিল—“ওলাউঠার জল ভাল কর্তে এসেছে, পুরুরের মাছ ধরে যাবে, জলে ফুট ফট শব্দ হ’লে মাছের শ্রোণ কি থাকে! একে জল নেই, একরাশ টাকার মাছ ছাড়া হয়েছে—ওঠ—মত সব অলপের ম’রতে এবেছে!”

হরিনাথের মূখ রাঙা হইয়া উঠিল। বিষদাস তীরে উঠিয়া ঝাঁকড়াইল। অপরেশ রমণীর মূখভঙ্গী দেখিয়া অবাঞ্ছ হইয়া রহিল, এক মুহূর্তে এত যে উৎসাহ সব জল হইল—কিন্তু হরিনাথ বলিল, “কাজে বাধা আছে, হুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা নয়,—বিজ্ঞ, একেবারে উঠে ঝাঁকলে যে, নাও কাজ করা।” জল তোলপাড় করিয়া কার আরম্ভ হইল, সে রমণী বোভংগ হুরে কত কি যে বলিল তার ঠিক নাই, হরিনাথ সে কথাই কান দিল না।

যে দ্বীলোকটা চাঁৎকার করিতেছিল, সে রামতারণ চাউঘোর বিধবা ভাড়া। রামতারণ চাউঘোর পুরুরের উপর হিযো আছে, অজ্ঞ সরকারী কলিকাতায় থাকেন, গ্রামের সম্পত্তি, রক্ষণাবেক্ষণের ভার ইহার উপর স্তত আছে। ভাড়ার মূখে পুরুরে রাধাভানির কথা পাইয়া, রামতারন দ্রুত বাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, যোটা ছুঁড়ি, গলায় উপবীতের গুচ্ছ হাতে দোণার কবজ, পায়ে খড়ম, দূর হইতে বলিলেন, “কেহে তোমরা!” হরিনাথ মাথা তুলিয়া বলিল, “রামতারণ বাবু, আহুদ, গ্রামের প্রাণ এই গলটুকু, কদিন য’রেই দেখছি, সকল রকম রোগের বাজা এই পুরুরে জড় হচ্ছে, মনে করেছি, ঝাঁকড়াগুলি উপড়ে কিছু হুল চলে দেব, আর আমাদের লোকেরা জলটুকু বাতে গরম ক’রে বাও, তার ব্যবস্থা বাড়ী বাড়ী দিয়ে আসবো।”

রামতারণ—“খুব দরদ তো! কলেজে পড়ে বড় বাগল হয়েছ দেখছি—পুরুরে নাম্বার আগে কার হুকুম নিয়েছিলে?”

একপ্রাণ অপ্রত্যাশিত উত্তর শুনিয়া হরিনাথের মূখে কথা সরিল না, দ্বিগুণ অপরেশের মূখের দিকে তাকাইল। এই কলবয়ে গ্রামের অজ্ঞাত লোকেরাও উপস্থিত হইল, যে সব রক্ত বালকেরা অপরেশের সঙ্গে

আসিয়াছিল, তাহারা আত্মদয়ের দেখিয়া চম্পট দিল। হরিনাথ দৃঢ়তরে বলিল, “রামতারণ বাবু—কোন অজ্ঞায় কাজ করি নি, গ্রামের লোকদের এ কাজ করা উচিত, বৎসরে বৎসরে বিধৃতিকায় তা হ’লে আর ম’রতে হয় না, আদেশ না নিয়ে অজ্ঞায় করেছি, এখন আদেশ নিচ্ছি—কাজে বাধা দেবেন না।”

রামতারণ—“বড় ভেপো দেখছি—ওঠ—ব’লছি”—এই বলিয়া রক্তচুপা পাকাইয়া, স্তেজ তজ্জনী সন্তেত করিয়া রামতারণ বাবু হরিনাথের নিকটবর্তী হইল।

অপরেশের মূখ বিবর্ণ, সে একবার হরিনাথের মূখের দিকে তাকাইল—আজনিয়া বলিল, “হরি, উঠে এস—এ জাতির হৃদয় যোচনের উপায় নেই।”

রামতারণ—“কে হে? ভবানী দত্তের বাটা বুঝি—হুপাত ইংরাভী পড়ে বড় clever হয়েছি—আমলো—গুরুজনের প্রতি সমিহ নেই।”

হরিনাথ কীৰ কীদ মূখে জল হইতে উঠিয়া আসিল। বিষদাস দেখিল—বাটের উপর ঝাঁকড়া একটা বালিকা বড় কাতর সরাহুত্বিত দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া আছে—চক্ষু তাহার দিকে পড়িতেই সে চক্ষু কিরাইয়া নহল। দ্বিগুণ আবার চাহিল—বালিকার অশ্লক দৃষ্টি তাহারই দিকে, বিষদাসের চক্ষু পড়িতেই সে চক্ষু পুনরায় কিরাইয়া লইল। তিন বন্ধুরে স্নেহাবদনে রণে ভঙ্গ দিয়া প্রস্থান করিল। সে বিধবা বয়ীসার কণ্ঠে এক হুরে তখনও মানাই বাজিতেছে। আর একবার কিরিয়া চাহিল—কি আশ্চর্য, সে বালিকা বাগল হয়েছ দেখছি—পুরুরে নাম্বার আগে কার হুকুম নিয়েছিলে?”

একপ্রাণ অপ্রত্যাশিত উত্তর শুনিয়া হরিনাথের মূখে কথা সরিল না, দ্বিগুণ অপরেশের মূখের দিকে তাকাইল। এই কলবয়ে গ্রামের অজ্ঞাত লোকেরাও উপস্থিত হইল, যে সব রক্ত বালকেরা অপরেশের সঙ্গে

সকলে ধরে ঘিরিল।

—কর্ণদেবীর যুদ্ধ—

[ক্রীমতী প্রমুদময়ী দেবী]

১
 “দিল্লী বিজয়ী স্নেহ ভূপতি
 বাহিনী সাজায়ে আসে।”
 নিবেদেছে দূত, মিথার রাজ্যে
 কর্ণদেবীর পাশে !
 “দর্শন চাহে সামন্তগণে
 মন্ত্রণা তরে ভূপগন সনে
 অপেক্ষা করে, কিবা অহুযতি
 আজ্ঞা কর তা’ দাসে,”
 “মন্ত্রণাগারে আহ্বান সবে”
 কহিলা মধুর ভাবে।

২
 “শান্তি সমরে সময় সিংহ
 সিংহ সমান বীর,
 তা’ বলে কি মোরা অধীন হইব
 স্নেহ সে ভূপতির ?
 অপ্রাপ্ত বয়ঃ নন্দন স্তীর
 আপনি নিয়েছ কার্জ্যের ভার
 বিদিত করিহু সকল বাক্য
 কি আজ্ঞা জননীর ?”
 “সাজাও বাহিনী” কহিলা মহিষী
 উন্নত করি শির।

৩
 “হুয়ারে এসেছে অরি
 আজিও রবে কি সুনীরব সবে
 আজ্ঞা অপেক্ষা করি ?

বীর-প্রথ এই রাজপুতানার
 নন্দন বত বীর অবতার
 সংগ্রামে আমি যাইব আপনি
 অথরে আশুগরি—
 স্নেহ রাজ্যারে যুদ্ধ দানিব,
 সাজ সবে করা করি !
 স্নেহ শাসন শ’বে কোন জন,
 কে হেন রে নীচাশয়,
 ক্ষত্রকুমারী যুত্বারে চিনে
 তাহারে করে না ভয়।
 বাজাও দামাঘা রণ রণ হবে
 যুদ্ধ হইবে, বলে দাও সবে,
 জাতী : কেতন লহ দূত করে
 সংগ্রাম কর জয়—
 যুত্বারে জানি চির প্রতিবাদী
 অসৌ মহিমায ।”

৪
 রাজপুতানার ক্ষত্রিয় সব
 হেরে বিশ্ব ভরে !
 মিথার মহিষী যুদ্ধে এসেছে
 খড়গ লইয়া করে।
 “জয় মা ভবানী” সবে মিলি কয়
 কর্ণদেবীর পদধূলি লয়।
 বাহিনী সাজায়ে কাতারে চলে
 অতুল হর্ষ ভরে—
 “জয় গোন্ধ রাণী কর্ণদেবীর”
 কহিলা সমস্তরে !

৬
 যুদ্ধ করিতে যবন রাজা
 হইল অগ্রসর—
 যুদ্ধ নয়নে দেখিল চাহিয়া
 কি শোভা অশ্বগর !
 কুন্তল উড়ে ক্ষুদ্রত গমনে
 অতুলোৎসাহ নরনে বননে
 রণরঙ্গিণী স্নেহ দলিছে
 সৈন্ত পেয়েছে ভর—
 দানবদলনী বুঝিবা আপনি
 সমরে অগ্রসর !

৮
 দেবিতে দেবিতে বিজয়দল্লী
 বিধুর যবন-পরে—
 নমিলা আসিয়া কর্ণদেবীরে
 পুষ্পমালাকা করে।
 ভ্রমত করিয়া যবন বাহিনী
 অথৈ ফিরিছে দানবদলনী
 যবন শোনিতে সিন্ধু খড়গ
 শোভিছে চৌর করে—
 গগন বিদারী ছক, র রব
 বেতেছে দিগন্তরে !

৭
 যুগল জিনিয়া কম ভূজযুগে
 বর্শা কুপাণ ভায় !
 বিধু ভুলিয়া সন্ময় ভরে
 যবন নমিছে তায় !
 আপনি রাজা বিদিত হিয়া
 নিমিষের তরে রহিল চাহিয়া
 আপনি ভুলিয়া নোয়াইল শির !
 শিহরি দেবিল হায় !
 ছত্রভঙ্গ সৈন্ত তাঁহার
 বিঘম বর্শাধায় !

৯
 পরাণ লইয়া সংগ্রাম ছাড়ি
 পলায় দিল্লীপানে
 লাহিত অতি যবন বাহিনী
 ভীতিবিকল প্রাণে।
 কর্ণদেবীর বিজয় কেতন
 উজ্জ্বল গগনে, ক্ষত্রিয়গণ
 মিলিল আসিয়া, সুখরিয়া দিশি
 মঙ্গলময় গানে—
 জগৎ কহিল যুত্বা জিনিতে
 ক্ষত্রবিনা জানে !

হিন্দু মহাসভা

বিগত অধিবেশনে হিন্দুমহাসভার বিশেষত্ব সুপরিস্ফুট হয় নাই; পাঞ্জাবকেশরী লাল লক্ষণ রায় সভার কর্ণধার ছিলেন, তাঁহার উত্তম শোণিত ব্যক্তিগতভাবে সভার বিশেষত্ব প্রকট হইয়াছিল, কিন্তু হিন্দু মহাসভা এখন মজা-খালে দীর্ঘ পঞ্চভাষণের নীতি অনুসরণ করিয়াছেন তাই সে হত-ইতিপঞ্জ তাব অবলম্বন করিয়াছে।

হিন্দু মহাসভায় হিন্দুদের প্রাণে একটা চাকুলার প্রভাব লক্ষিত হইয়াছিল, আদ্যমহাপুংজেন ও বিষ্ণুভারতীয় হিন্দু একত্র হওয়ার হিন্দুদিগের প্রাণে এক সর্বভৌম সভার সাড়া অস্বূহৃত হয়, এই লাভে সভার কার্যে ভাল মন্দের বিচার করিবার আদ্যের অবসর হয় নাই, তাই বাস্তবতার সকল সংবাদপত্রই সভার মুখ্যত্ব করিয়াছেন—কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আদ্য একটা অস্বস্তির ইঙ্গিত পাইয়াছি।

ইহা হইল বাস্তবালৌকিকের অস্বস্তি—কিন্তু আদ্যদিগের ধারণা পাঞ্জাবী ও সভাপতির উত্তম দ্বন্দ্ব ও সভার কার্যে পরিভূত হয় নাই, বক্তৃতা সম্বন্ধাক্যের অন্তরাল দিয়া আদ্য তাহা বেশ বুঝিতে পারি, লালাজীর বক্তৃতাতেও তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

হিন্দু মহাসভা তখনই হইয়াছিল, যখন ভারতবর্ষ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লীলা-নিকেতনে পরিণত হয়। ভারতবর্ষে নেশন গঠিত হয় নাই, কিন্তু ভারতবর্ষ নেশনের পথ প্রদর্শিত হইতেছে—ইংরাজ সংস্পর্শে নেশন-ভাব প্রকটিত হইয়া উঠে। একটা নেশন কতকগুলি টাইপকে অনুযায়ণে শাসন করিতে পারে, একটা নেশন বোধ হয় কতকগুলি সম্প্রদায়কেও শাসন করিতে পারে, কিন্তু একটা ক্ষুদ্র নেশন বোধহয়

ভারতবর্ষের জায় বিশাল ভূমিখণ্ডের অধিবাসী একটা নেশন বা জাতীয় এককে কিছুতেই শাসন করিতে পারেন না, তাই ইংরাজ সংস্পর্শে ভারতে যখন জাতি বা নেশন জাগিয়া উঠে, তখন শাসক সম্প্রদায় ভারতের বৃক চিরিয়া সম্প্রদায়গুলিকে বিশেষভাবে জাগাইয়া তোলেন। এসব ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গুলিরই পূর্ণের হস্ত মার্কান্দা করিতে চয়—সেই জন্ত মুসলমানদিগের প্রতি অধিক মনোযোগের ফলে ভারতীয় হিন্দু বিশেষত্ব হইয়া উঠেন; জাতীয় তত্ত্ব-ভারতবর্ষ যখন শাসকজাতির নিকট একেবারেই অগ্রাহ্যের বস্তু হইয়া উঠে, তখনই হিন্দু মহাসভা হিন্দুকেও সাম্প্রদায়িক ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়া একাধারে মুসলমান ও মুসলমানের পৃথক্যক শাসক-জাতি উভয়েরই অসঙ্গত ব্যবহারে প্রতিষ্ঠাপরামর্শ দেন।

পরে ইউরোপীয় এবং মুসলমানে ও খৃষ্টান ভারত-বাসী ভিন্ন সমগ্র ভারতীয় অধিবাসী নাগরিক হিসাবে একশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার হিন্দু মহাসভা উৎসাহের মধ্যে মূল একত্বী বিশেষ ভাবে অগ্রদক্ষান করিয়া লন, একদিকে সেই একশ্রেণীর উদ্বোধনে ও অল্প দিকে সেই একশ্রেণী ছাড়িয়া বাহ্যার খৃষ্টান ও মুসলমান হইয়াছে তাহাদেরও অনুদক্ষান সভা বিশেষ জাগৃত হইয়া উঠিল—খৃষ্টান ও মুসলমান ভিন্ন সকল ভারতবাসীই যে হিন্দু, সম্প্রদায় প্রদেশ ও জাতি নির্বিশেষে সকলেই যে এক বিশাল হিন্দু সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত, ইহা যেমন সভা বলিয়া প্রতিভাত হইতে থাকিল, তেমনই হিন্দু-দিগের অন্তর্নিহিত গল্প বস্তুর উত্তোলন করিয়া হিন্দু-শক্তির স্থান অধিকার করিল; এই হিন্দু-শক্তি হিন্দু মহাসভার নিয়ামক, এই শক্তি এই দিন মনে

বৈশাখ, ১৩০২]

হিন্দু মহাসভা

৫১

করিয়াছিল তাহার সমস্ত দৈন্ত তাহার সমস্ত ক্ষমতা একদিনে পূর্ব করিবে—তাই সংগঠন ও শুদ্ধীকরণ দুই বাছ উত্তোলন করিয়া সে ভারতবর্ষ অধিকার করিতে অগ্রসর হয়। মুসলমানের সহিত সংঘর্ষে, হিন্দু গোড়ামি বা ব্রাহ্মণের খড়গাভ্রগানে হিন্দু মহাসভা অনেকটা দিক্‌হারী হইয়াছে, তৎপরি প্রত্যেক ভারতীয় নেতৃবৃন্দীয় হিন্দু ইহা বিশেষভাবেই জানেন যে হিন্দু মহাসভার কার্য হইতেছে সম্প্রদায়িকভাবে হিন্দুকে সংগঠিত করিয়া পরে ইহাকে জাতীয়তায় উন্নীত করিয়া তোলা, তজ্জন্ত হিন্দুনেতৃগণ গোড়ামির শক্তি বর্জন করিয়াছেন। কিন্তু নূতন শক্তির সন্ধান পাইতেছেন না—তজ্জন্ত “একত্র হও, শক্তি অর্জন কর, সংগঠন কর” এইরূপ বাক্য নিমগ্ন করিয়া এবং গোড়া সমাজকে একেবারে না চটাইয়া তাহার অসুগুণদিগের সংঘর্ষে, পানাহার বেদোচ্চারণে, শুদ্ধির আন্দোলন সংঘর্ষে ধরি-মাছ-না ছুঁই-পানি রকমের প্রতাপ উল্লাপন করিয়া স্ব স্ব প্রদেশে প্রস্থান করিয়াছেন, একা পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজী হিন্দু মহাসভার সাময়িক উত্তম ভাবুকুর সম্ভাবনার মনোবাগী হইয়াছেন। বোধহয় বাস্তব ও পাঞ্জাব ভিন্ন অল্প প্রদেশ শাস্ত্রপণ্ডিত হইবা থাকিলে ধর্মোন্মত্ত হিন্দুজাতির প্রত্যেক পরিচয় আর কোথাও পাওয়া যাইবে না, হিন্দু পাঞ্জাব যে মরিতে বসিয়াছে ইহা প্রত্যেক পাঞ্জাবী হিন্দুই অবগত—অতীত, শুদ্ধি ও সংগঠনে তাহার নষ্ট শক্তি অর্জন করিবে ইহা তাহারই উদ্ভাবিত হিন্দুজীবন-সভা—এই সভার মর্যাদা ও পূজা হিন্দুমহাসভার কলিকাতা অধিবেশনে বৎ প্রকট হইয়া উঠে নাই। তাই বাংলা পাঠ্যের প্রাণ ইহাতে পরিভূত নহে।

হিন্দু যদি হিন্দু থাকিয়া জাতীয়তায় উদ্বোধন আত্মনিবেশণ করে তাহা হইলে তাহাদের এই আপাতঃ সভার মধ্যে অনেক সের্বিক দ্বারা পরিচালিত হিন্দু যদি ভারতবর্ষে বাস করিয়া সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমান

ও খৃষ্টানের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বী হইতেই তৎপর হয় তাহা হইলেও তাহাদের নিষ্ফল অনেক বিষয়েই তাহার। যথার্থমত হইবে। হিন্দুকে বোধহয় ভগবান কোন গুণীভেই আবদ্ধ করিবেন না। তজ্জন্ত তাহাকে এই সময়ে একেবারে দিশাহারা করিয়াছেন। তাহাদের ব্রাহ্মণগণ বোধগা করিতেছেন, ব্রাহ্মণ ভিন্ন ধর্ম ও সমাজ বিষয়ে অল্প কোন হিন্দুর কথা কহিবার অধিকার নাই—জাতি হিসাবে কাধাকে স্পৃষ্ট করিবে কি অস্পৃষ্ট করিবে, জাতি হিসাবে কাধার অন্ন গ্রহণ করিবে কি না করিবে, জাতি হিসাবে কে কোন রূপ পরিবর্তন করিবে কি না করিবে, তাহা ব্রাহ্মণগণই নির্ধারণ করিবেন। ইহাতে বলিবার কিছু নাই, কিন্তু বাহ্যার পরিবর্তন চায়, তাহাদের কথায় কর্ণপাত করাও যে ব্রাহ্মণদিগের ও ব্রাহ্মণ সভার ধর্ম, তাহা ব্রাহ্মণগণ মনে স্বীকার করেন না। সকল পরিবর্তনে সনাতন আচার-পরামর্শভার মূল কুঠারবাতির আশঙ্কা করিয়া ইহারা সর্বক্ষেত্রে চূপ-চাপ নীতি বা তথাকথিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন; এই সময়ে হিন্দুমহাসভার কার্য ছিল, ব্রাহ্মণদিগকে বা হিন্দু গোড়ামিকে পরিহার্য বৃথাইয়া দেওয়া হিন্দুগণ সাধারণভাবে তাহাদের ভাগ্য তাহারাই নির্ধারণ করিবে। প্রত্যেক হিন্দুই জানে, শত্রুকে মানিয়া কার্য করা করিতে হয়, আবার প্রত্যেক হিন্দুই জানে প্রত্যেক মুসলমানই অনেক আচার ও নিয়ম গ্রহণ করিতে হয়, এইরূপ গ্রহণ ও শাস্ত্রানুযায়ী না হইলেও হিন্দুভাব ও হিন্দু-উদ্বোধনমূলক হইলে তাহাকে কোন ব্রাহ্মণই বাধা দিতে পারেন না। এই ভাব লইয়াই ত শৈব, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, আদ্য সমাজ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে, এইরূপ ভাব লইয়াই প্রাচীন শ্রুতি-পুণ্যকে সকল ধর্মকে বিশিষ্ট সম্মানের আদান দিয়া মানার এক্ষণে নূতন আচার এমন কি নূতন জাতিও গড়িতে পারি। হিন্দু মহাসভা

এইরূপ সংস্কার ও গঠনের ভাব শইখা জাতিয়া উঠেন, এখন কিন্তু হিন্দুদিগের মধ্যে পুরাতনের রক্ষণী শক্তি তাহাকে পশ্চাদ্ হইতে টানিয়া ধরিয়াছে। সে উদ্যোগও মন রক্ষা করিতেছে এবং তাহার প্রাণের চাওয়াও যাক্ত করিতেছে—কিন্তু নূতন প্রাণের সন্ধান ইহাতে মিলে না।

বর্তমান যুগশক্তির আশ্রয় লইয়া নূতন সত্য উদ্ভাসিত না হইলে সকল আন্দোলনেরই পরিণাম এইরূপ হয়—আমরা তজ্জন্ত যুগশক্তির উদ্ভাষনের কথাই বিশেষভাবে করিয়া থাকি—এই যুগশক্তি ভারতে নেশনের প্রতিষ্ঠা চাহিতেছেন, হিন্দু মহা-

সভাও তাহাই চান, কিন্তু যুগের সত্যে একান্ত নির্ভীক হইবার তাহার সামর্থ্য নাই, সুবিধা যুগসত্য অবধারণ করিয়া সভা কার্যে অগ্রসর হয় নাই। যাই হ'ক সংগঠন ও শুদ্ধির আন্দোলনের ফলে সকল হিন্দু যে একসঙ্গে স্থান পাইয়াছে ইহার জন্ত হিন্দু মহাসভা চিরস্বপ্নীয় হইবে, ইহাকে জাতীয় আখ্যায় তৃপ্তি সাধনের উপযুক্ত আধার করিতে হইলে হিন্দু সমাজের বর্তমান অবস্থা বিশেষ ভাবে অবগত হইয়া গোড়ামির আবরণ ছিন্ন করিতে হইবে—যুগের সত্য প্রকট না হইলে গোড়ামি যায় না, গোড়ামির জালে আবদ্ধিত সিংহকেও আবদ্ধ হইতে হয়।

সংকলন

—:—

ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা *

[বক্তা—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়]

সভাপতি মহাশয় ও উপস্থিত ভ্রম্যহোদয়গণ, ভারতীয় সভ্যতা বন্ধ কি বোঝায়? এ সংকল্প কারও কোন দ্বিঃ বন্ধন ধাওয়া নাই। আমাদের মনে একটা গর্ভ আছে যে আমরা অতি প্রাচীন জাতি ও আমাদের সভ্যতা যেরূপ উৎকৃষ্ট সেরূপ পৃথিবীর অন্য কোন জাতির ছিল না। রামায়ণ ও মহাভারতীয় যুগের সভ্যতাকে আমরা আদর্শ বলে মনে করি। তারপর যখন প্রথম পাশ্চাত্যশিক্ষা আসে, তখন বিদেশীয় পণ্ডিতেরাও এইকথা বিশেষ-

ভাবে বলতে আরম্ভ করেন। মহাভারতের দুই পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে হয়েছিল। Sir William Jones প্রবু পণ্ডিতগণের এই মত। ভারতবর্ষই জগতের গুরু। ভারতের সভ্যতাই বিস্তৃত হয়ে মিশর বাবিলনকে সভা করে তোলে। তার পূর্বে প্রাচীন মিশর বা বাবিলনের সঙ্গে ভারতের কোন সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু তাঁর পরবর্তী ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁরা বলেন, আমরা মিশর বা বাবিলনের সঙ্গে ভারতের কথা কল্পিত। রাজহু

যজ্ঞের সভা কে করেছিল? একটা 'মহা' নামে দানব, সে এমন এক কৃত্রিম স্রোতের তৈরী করেছিল, যে ছুর্য্যোদয়ের পর্যন্ত ব্রহ্ম হয়েছিল। এ সব বিবরণ এতদিন কল্পিত বলেই মনে হচ্ছিল। তাঁরা আরও বলতে লাগলেন, ভারতের কোন প্রাচীন ইতিহাস নাই। ভারতের ইতিহাস অলেকজান্ডার হতে আরম্ভ হয়েছে। মহাযুগের ইতিহাস মুসলমানদের থেকে আরম্ভ হয়েছে। আর এ পর্যন্ত পাথরের গড়া শিল্প-নির্মাণ প্রকৃতি বা কিছু পাওয়া গিয়েছে, তা আত্মমায়িক ৩০০ খৃঃ পূঃ আগেকার নহে। এইজন্য বিদেশীয় পণ্ডিতগণ ভোর করে বলতে আরম্ভ করেছিলেন, যে খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর শিল্পনির্মাণে গ্রীসের দূর ছায়াপড় আছে। এমন কি গ্রীসেরা এসে যুদ্ধের মূর্ত্তি পর্যন্ত গড়ে তা। রোমকেরা প্রথম ভারতীয় পণ্য ক্রয় করার জন্ত সূর্য্য মুদ্রা প্রচুর পরিমাণে এ দেশে আনয়ন করে। ডাকফাজ প্রকৃতি ভারতের পশ্চিম তীরবর্তী বন্দর সমূহের আশে পাশে প্রচুর রোমক মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। রোমকশিল্পের ছাপ তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীর ভারতীয় শিল্পের উপর পড়ে গেছে। এখন আমরা এ কথা প্রশ্ন করি মানচিত্রখানা কল্পনা করে দেখুন, ভারতবর্ষ কোথায়? এখিয়ার দক্ষিণদিকে তিনটা লেজ আছে, তিনটা উপদ্বীপ—আরব উপদ্বীপ, ভারতীয় উপদ্বীপ ও মলয় উপদ্বীপ; উভয় পার্শ্বের দুইটা উপদ্বীপবাসীর প্রভাব যে ভারত-বর্ষের উপর পড়েছিল তার কোন ছিঃ এতাবৎ কাল পাওয়া যায় নাই। অর্থাৎ ভারতীয় সভ্যতা ষাটশ শতাব্দীতে বিদেশীয় ছাপ পেয়ে বেড়ে উঠেছিল এমতাবৎ সভ্য। কিন্তু ভারতীয় সভ্যতার মূল, কোথায় এবং তার বৃদ্ধিই বা হলো কি করে? .

১৯০০ খৃঃ পূঃ এখিয়ার মাইনরের এক বিস্তৃত নগরে ৩ খানা শিলালিপি পাওয়া যায়; সেখা দেখে সে তিনখানা কনট্রাক্ট (contract) বা চুক্তিপত্র; সে

দেশের লোকেরা যে সকল দেবতার নাম উচ্চারণ করে শপথ করত, সে দেবতা আমাদের দেবতা—ইন্দ্র, বরুণ, যম্য; বাহিরের সঙ্গে সম্বন্ধ এই শিলালিপি থেকে প্রমাণ হচ্ছে—কিন্তু ভারতবর্ষের সভ্যতা কেমন করে বেড়ে উঠল—তাহা অসমাপ্তি হয়ে গেল।

১৯১৬ খৃঃ পূঃ আদি ভারতীয় য়েষ্টিবিদ্যানে শিকার কর্তে গিয়েছিলেন। তথায় পথ হারিয়ে একটা কুং নদীগর্ভের সন্ধান পাই। এমন সিদ্ধনদ যে খাত দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, তিরকাল সে খাত দিয়ে যে চাপতো না। বর্তমান বাদের দুইদিকে অনেকগুলি পুরাতন খাত আছে। এই সমস্ত সিদ্ধন পুরিতাঙ্ক খাত জরীপ করে ২৩টা ব্লক ও ৪৫টা ছোট ছোট প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাই। সিদ্ধনদশ আমাদের বাংলা দেবার ছায়া পলিমাটির দেশ। এ সব নদীর গতি পরিবর্তিত হ'লে বহু গ্রাম নগর ধ্বংসমুখে পতিত হয়। কৌতুহলীরা কথা সকলেই শুনেছেন—এ যে কত কৌতু নাশ করেছে তার সংখ্যা নাই। বহু মন্দির গ্রাম নগর এর কৃষ্ণপত হয়ে রয়েছে। সেদিনেও এ রাজবলভের মন্দির গাঙ্গ করে নষ্ট করেছে। আমাদের দেশের নদী ও সিদ্ধন সঙ্গে তুলনা এই, যে আমাদের দেশে নদীর গতি পরিবর্তিত হ'লে তাগা বিনে পরিণত হয়, কিন্তু সিদ্ধনসঙ্গে সিদ্ধনদ জন্ত পথে গেলে বাদ মকছুমিতে পরিণত হয়। নদ সঙ্গে গেলেই দেশের লোক তাঁর হেড়ে নূতন বাস্তবের তাকে গিলে বাগ করে। এইরূপ প্রাচীন বন্দরে ঠাট্টা নষ্ট হয়ে যায় সেখানে যে এককালে বন্দর ছিল তা উপর থেকে বেঁচে বোঝবার উপায় নাই। কিন্তু মন্দির ভেঙের নৌকা, নোঙর প্রকৃতি পাওয়া গিয়েছে। যেমন সপ্তর্ষ্যদের কোলে যে সরস্বতী নদী, তার মধ্যে নৌকা প্রবৃত্তির সন্ধান আজও পাওয়া যায়। আমি দেখানো গিয়েছিলাম, সেখানে ইটের

* চন্দ্রনগর "সুতাপোপাল দ্ব্যতি মন্দিরে" রাখাল বাবুর আবিষ্কার সম্বন্ধে প্রথম বক্তৃতা। বক্তৃতাটি চিত্রাঙ্গমুকে প্রকাশ করিতে পারিলাম না, তজ্জন্ত দুঃখিত।

তুপ দেখেই আমার অসুস্থ হই যে এইখানে কোন প্রাচীন নগর ছিল। তারপর ১৯২২ সালে খাত-গুলির জরীপ শেষ করে এই স্থির করি যে খনন সিদ্ধান প্রকৃতিস্থান দিয়ে বইত, তখন নিশ্চয়ই এখানে কোন প্রাচীন জাতি বাস করত। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগ থেকে আরম্ভ করে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত সুয়েন জোন্সেফ নগরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত সিদ্ধনদের গর্ভের ভিত্তি চর বা নীপের উপর প্রাচীন ধ্বংসাবশেষগুলি খনন করে ছিলাম। খননশেষে বোঝা গেল যে, কুশানবংশীয় সম্রাট প্রথম বাহুদেবের রাজ্যের শেষভাগে নদের গর্ভের পরিসরনের জ্ঞান এই নগর অধিবাসিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইছিল।

[এই পর্যন্ত বক্তৃতা করিবার পর আলোকচিত্র প্রদর্শন করা হয়।]

১ম চিত্র। আমাদের অসমুদ্রি যে কত স্থলর তা এই সব দেশে না এলে বোঝা যায় না। আমাদের বাংলা দেশ হুজলা, কলকাতা, শ্রদ্ধাঙ্গালা—আর এই দেশের মকছুমির সিদ্ধ দেশ। কালো কাঠো যে দাগ দেখা যাচ্ছে ওগুলি গাছ। এ গাছগুলি বাদের উপর জন্মেছে। ৪০০০ বৎসর পূর্বে সিদ্ধ মন্দির এই খাদ দিয়ে চলতো। এখনও বর্ষাকালে একটু জল থাকে। সেই জলই এই গাছগুলিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এ গুলিকে Camel thorn বলে—পাতা নেই, কেবল ডাঁটা। অনেকগুলি ছোট ছোট বাতরা গাছও জন্মেছে। গাছগুলি এক হাত ছোট ছোট হাতের বেশী বড় হয় না। মকছুমির মধ্যে এই সিদ্ধ খাতেই প্রাচীনতম সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে।

২য় চিত্র। সেই মকছুমির আর একটা দৃশ্য। দূরে ছোট বন দেখা যাচ্ছে, এখানে সিদ্ধনদের গর্ভ। একটু মাজ জল আছে—তাও আবার ময়লা। কিন্তু এই জলই এখানকার মানুষের একমাত্র অলংঘন।

৩য় চিত্র। এই ছবিতে পাহাড়ের মত যে তিনটা ঢিলি দেখেছেন, এগুলি পাহাড় নয়—১০৮০ ফুট উঁচু ইটের তুপ। প্রাচীন কালের সিদ্ধদেশবাসীরা নদীসর্গর্ভ চর বা নীপের উপর খুব উঁচু পোতা তৈরী করে তাদের মন্দির নির্মাণ করত। কেননা, বর্ষার সময় যখন জল বাড়ে, মন্দির নীচু হলে ডুবে যাবার সম্ভাবনা।

৪র্থ চিত্র। ছোট ছোট এগুলি যা দেখেছেন, এ সমস্ত ইট। এইখানে একটা বেরী বাহির হয়—লম্বায় ৪০০ ফুট, শ্রেত মার্কেল পাথর দিয়ে তৈরী।

৫ম চিত্র। তিনটা বোঁপের মধ্যে গলি পথ ছিল—ট্রিক গর্ভের মত দুইদিকে ইটের তুপ। নিকটস্থ বাবলাগাছ-গুলি বেঁচে আছে—ছোট ছোট গাছ। আমাদের দেশের মত সিদ্ধদেশে গাছ বড় হবার ঘো নেই। গাছগুলি সব নীচের দিকে হয়েছে যেখানে একটু জল আছে। গাছগুলি দেখে প্রতীকমান হয় এইখানে সিদ্ধন প্রবাহিত ছিল।

৬ষ্ঠ চিত্র। ৫ বৎসর ধরে সিদ্ধনদের ভিত ভিতর বাত পরীক্ষা করে এই বাত খুঁড়ে লাগলাম। এদেশের বর্তমান মূল্যমান অধিবাসীরা বাবলা ফল আনতে এখানে আসতো। তারা বলে এটা সম্রাটদের জায়গা—এখানে ছুঁত আছে। এগুলো সব সম্রাটদের চিলি, দিয়া দেওয়া আছে যেন কেউ উপরে না উঠে। আগেকার লোকগুলো পুতুল পুতলা করতো বলে আমাদের অভিশাপে মন্দিরগুলো নষ্ট হয়ে গেছে।

৭ম চিত্র। পূর্বের ছবিটা উত্তর দিক থেকে তোলা—এটা পূর্বদিক থেকে। এখানে একটা গম্বুজ দেখতে পাচ্ছেন। নগর ভাগ করে চলে যাবার পূর্বে এটা বৈষ্ণবস্থাপ ছিল। তুপ বা টেতা হরকমের হয়—ফাণ্ডা ও নোরেট। এই শুশুটি গর্ভভেতা বা ফাণ্ডা এবং ভিতরে ভাল পালিশ করা plaster ছিল। তার উপর ভাল ভাল ছবি আঁকা ছিল। ছবিগুলি

বুড় মথকে। দুই তিনটা চিত্রের চুকরায় খরোজী অক্ষর ধর্মশাস্ত্রের দেখাও ছিল।

৮ম চিত্র। একই ছবি। এইবার বোঁড়া হচ্ছে। প্রায় ২০ ফুট বোঁড়া হয়েছে। ইটের ধাম দেখা যাচ্ছে।

৯ম চিত্র। যে ইটের ধাম বা পোস্তার কথা বলুম, এইখানে তা বড় করে দেখান হয়েছে। খুঁড়ে পোস্তার ভিত্তিতে গিয়ে পৌঁছেছি। নীচে নর্মদার মত। পোস্তা যখন তৈরী হয়েছিল তার পূর্বে এখানে বাজী ছিল। এখানে তট শীলমোহর পেয়েছি, তাতে কুয়ের মুদ্রাও অক্ষর আছে।

এ অক্ষরগুলো কি? এগুলি pictogram বা চিত্রাকর। প্রাচীনকালে লোকে যা দেখত তা বোঝাবার জ্ঞান ছবি আঁকত। ধন, একটা গুস্তর মধ্যে একটা হাঁস রয়েছে, এর মানে পুস্তুরের মধ্যে হাঁস চরত, তার ছবি। একটা পানীর মত কাল দাগ কাকের ছবি বোঝাত। আমরা এখন ট্রিক খা দেখি তারই ছবি না দিয়ে, যা বলি সেই ধ্বনির ছবি ব্যবহার করি। আমাদের প্রাচীন কালের ছবিটা কাকের চিত্রের মতই ছিল। আর একটা উদাহরণ ধন—দুটো চিলি, তার মধ্যে সিঁড়ি, উপরে মন্দির ও নীচে পা। এর মানে লোকে সিঁড়ি বেয়ে উপরে মন্দিরে উঠত। এই রকম দেখাচ্ছে চিত্রাক্ষর বলে। এখানে নর্মদার মধ্যে প্রাচীন শীলমোহর-গুলিতে এই ধরনের চিত্রাক্ষর ছিল। বিদেশীয় পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করে বলেছেন এগুলি আত্মমায়িক জী: পু: ৪০০০ বৎসরের প্রাচীন।

১০ম চিত্র। পূর্বদিকের খাতটা খুঁড়ে নীচের দিকে এখানে বোঁড়া অতি কঠোর। লোকালয় থেকে উঠের সিঁচে ৭৮ দিনের পথ। এখন রেল হয়েছে; কিন্তু তখন ১০০ লোকের বেশী নিয়ে যাওয়া যেত না। এখানে একটা গোলাকার ঘর পাওয়া গেল। তার

দেওয়ালে বুদ্ধের জন্ম, বুদ্ধর প্রাণি, মৃত্যু প্রভৃতি চিত্র পাওয়া গিয়েছে। তুপী কাঁচা ইটের তৈরী। সিদ্ধ দেশে রুটি হয় না বলে লোকে কাঁচা ইটের গাধিন করত, নীচের অংশ হুদার পোড়ান ইট দিয়ে তৈরী—আজ পর্যন্ত নোনা ধরনি। এইখানে ভিত্তি। এর নীচে যে অক্ষরকার দেখেছেন উহা ছায়েহর গাদা। এই ছায়েহর গাদার মধ্যে মার্কেল পাথরের মুদ্রা, আটগোলা লম্বা নানা রকমের পাওয়া গেছে। একটু আটগির পরিধি হুটু—আমার মত একজন অনায়াসে গলে যেতে পারে। এখানে মার্কেল আনতে হলে কাছাকাছি জায়গা হচ্ছে বিকানীর—প্রায় ৪৫০ কোশ দূরে। যে জাতি সাধা পাথর দিয়ে এই সব জিনিষ তৈরী করেছে তাদের একটা স্বতন্ত্র ধর্ম ছিল। সেটা বৃহত্তে গেলে সাই প্রাস বোঁপে যেতে হবে।

১১ম চিত্র। এখানকার ইটগুলি সমস্ত ১২ ইঞ্চি। পাতলীপুত্র, বারাগনী, তক্ষশিলা প্রভৃতি যত নীচের দিকে যাওয়া যত তত ইটের আকৃতি বড়। এখানকার ইট দেখে ভাঙারকার মহাশয় এ গুলিকে আধুনিক বলে মনে করে ছিলেন।

তার মত—আমীরো এখানে শিকার করতে আসতেন—তারাই এই সব কাজ করে গেছেন। কিন্তু তা নয়। ভাঙারকার মহাশয় ইটগুলিকে প্রাচীন তুপের ভগ্নাবশেষ বলে ধরতে পারেন নাই। সর্গজ্ঞ আশি একই ভায়েই ইট দেখল। এ থেকেই বোঝা যায় আমরা পটুগিজ ও ওলন্দারের কাছে ইটের কার্জ শিখিনি। তখনকার লোকে বড় বড় ষিানার কাঁজও জানত।

১২ম চিত্র। তুপের উপর পাঁড়ালে সিদ্ধর খাদ যেমন দেখায় তার চিত্র। ৩৩০ ফুট চওড়া। গাছ জমাবার জায়গা শুনি নীচে।

১৩ম চিত্র। ২০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত মন্দিরে লোকে উঠত কিরণে? চাকোপ ইট দিয়ে খুব উঁচু

বেদী তৈরী করা হতো। তার চারদিক ঘিরে তিনবার প্রদক্ষিণ করে যোজন সিঁড়ি থাকত। এই সিঁড়ি দিয়ে মন্দিরে ওঠা হতো। এখানকার মন্দিরটা প্রাচীন বাবিলনের মন্দিরের মত। প্রাচীন বাবিলনের মন্দিরকে জলপাইয়ের ধ্বংস থেকে রক্ষা করার জন্য বেদী একপাশ উচু করে তৈরী করা হতো। এর উপরে ওঠবার উপায় এই যোজান সিঁড়ি।

১৪শ চিত্র। এইবার আমাদের গুর বিভাগের (stratification) এর কথা কিছু বুঝতে হবে। এই যে হুন্সর Library দেখছেন এরও একদিন ধ্বংস হবে। নতুন লোক এর উপর নতুন বাড়ী তুলবে। তারও ধ্বংস হবে আবার নতুন বাড়ী উঠবে। বাড়ী ধ্বংস হলে লোকে প্রাচীন ভিত্তি একেবারে ভুলে ফেলে না। পুরাণ বনেন নীচেই থেকে যায়। ২০০০ বৎসর পরে বসি কেহ এই হান খোঁড়েন, তিনি পর পর এই সব তত্ত্বের বন্দন দেখতে পাবেন। আমি এখানে তিনটা তত্ত্ব দেখছি। তিনটা শুইই ৪ ফুটের মধ্যে। বৌদ্ধত্বপূর্ণী প্রথম তত্ত্বের। সর্ব নিম্নতরের প্রাচীনতম মুদ্রা পাওয়া গেছে। এই সবত মুদ্রার উপর চিত্রাকর আছে। সম্ভবতঃ এগুলি রাজার বা দেশের নাম। এ পর্যন্ত জীসাদই সর্বপ্রথম মুদ্রা ঢালিয়ে ছিলেন বলে আমাদের জানা ছিল। তাঁর পূর্বে লোকে অল্প বিক্রয় কালে মোনা রাজার গুঁড়া ব্যবহার করতো। বননকালে মুদ্রাত্ব সম্বন্ধে এই মতগুলো মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হলো। রিদেয়ার পণ্ডিতদ্বিগণের কাহারও কাহারও এখনও সন্দেহ আছে এ গুলি মুদ্রা কিনা। খৃঃ পূঃ ৩০০ বৎসর থেকে অতি হুন্সর কাঁচের জিনিষও যে আমাদের দেশে তৈরী হয়ে আসছে তারও নির্দশন পাওয়া গেছে। বননকালে ৩ প্রকার (৩টা) মুদ্রা পাওয়া গেছে—অবজ্ঞ তখনকার ওজন। পরিমাণ বিধি সব দেশেই স্বতন্ত্র। আমাদের দেশের প্রাচীনতম কাঁরাপন মুদ্রার সহিত এর ওজন মেলে না।

এ মুদ্রাগুলির পরিমাণবিধি কোন প্রাচীন দেশের পরিমাণ বিধির সহিতই মেলে না।

১৫শ চিত্র। ২০ ফুট বৌদ্ধী তৈরী হলো কিরূপে? ছোট ছোট ঘরে তৈরী করে মাটি দিয়ে ভরাট করা হতো। এগুলো বাসের জন্য নয়। এর উপর ঘর তোলা হতো।

১৬শ চিত্র। গুর বিভাগের তৃতীয় গুরে সেকলে ভারতের সমাধিপ্রথা দেখতে পাওয়া যায়। এই যে সমাধি দেখছেন এর মধ্যে একটি যুবতীর দেহ আছে। চুল পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছিল। দেহটিকে সমাধিষ্ণু করে শুকানো বালি চাপা দেওয়া হয়েছিল। গত ৪০০০ বৎসরে জলীয় পদার্থ শুকিয়ে গিয়েছে। সমাধি থেকে প্রমাণ হচ্ছে তারা কাঁচা নয়। তারা দাহ করতো না। হিন্দুধর্মে সমাধিবিধি অনেক রকমের আছে। দশনামী সম্প্রদায়ের লোকেরা শব মাটিতে পুঁতে ফেলে। কিন্তু এটা সাধারণ বিধি নয়। বননকালে ৩ প্রকারের সমাধি প্রথা আবিষ্কৃত হয়। যুবতীর সমাধিটা প্রথম প্রকারের। চুলগুলি একটু কটা ছিল। তার গায়ের অলঙ্কার, কণ্ঠে হার (তাতে agate ও Sapphire ছিল)। পায়ে কাঁচের মল, হাতে শাঁখার বালা ছিল। একটা পুরো শাঁখা ৩ ভাগে কেটে পরা। নাক চোব ছাড়া এই যুবতীর সমগ্র দেহটাই পাওয়া গিয়েছিল। ৪ হাজার বৎসরের দেহ খোলা মারই খুঁলা হয়ে গেল। ঘটাগ্রাফার কাছে ছিলেন না—তাকে আমানার পূর্বে ১৫ মিনিটের মধ্যেই সব খুঁলা হয়ে গেল। এই দেখুন বৃদ্ধ আর পা। যে যুগে মানুষ তামার অলঙ্কার ব্যবহার করতো এই সমাধিপ্রথা সেই যুগের। বৃদ্ধ জাতি এ নও পৈতলের নিগড় পরে। অল্প দেশের দৃষ্টান্ত থেকেও জানতে পেরেছি, সোণার পূর্বে তামার অল্প অলঙ্কার ব্যবহার হতো। এই থেকে বোঝা যায়, প্রথম থেকে তৃতীয় গুর

পর্যন্ত সিদ্ধদেশবাসীরা তামার অলঙ্কার ব্যবহার করতো।

১৭শ চিত্র। এই দেওয়াল যে যুগের বালিকার দেহটি সেই যুগের—৬০০০ বৎসরের পুরাতন।

১৮শ চিত্র। সকলের নীচে অলঙ্কারের মতন যে জাফরা দেখছেন—এইখানে একটা হাড়ির মধ্যে ২৫০০ তামার পয়সা পাওয়া গেছে। চিত্রাকর আছে। এই আবিষ্কার থেকে প্রাচীন মুদ্রা সম্বন্ধে মত বদলে গেল।

১৯শ চিত্র। এই যে হাড়ি দেখা যাচ্ছে তাঁর মধ্যে ষিঠীয় প্রকারের সমাধি দেখুন। মরে গেলে দেহটা পচেতে দেওয়া হতো, এখনও এই প্রথা আছে। মানুষ মরে গেলে দেহটা গাছের উপর রাখা হ'ত। আশানারা জানেন, পাণ্ডবেরা অজ্ঞাত-বাসে পূর্বে আপনাদের অল্প সত্ত্ব কাপড়ে জড়িয়ে গাছে ঝুলিয়ে রেখে শব মাছে বলে প্রচার করে দিয়েছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় মহাভারতের মধ্যে গুত বের বরাহস্মিত কর গাছে রাখার প্রথা ছিল। মাংস পচে গেলে একখানি অস্থি নিয়ে যুতের কাঁধের পেটাকে ভাঁড়ের মধ্যে রাখতো। যুতের ব্যবহারের জন্য বান, বস্ত্র, অল্প প্রস্তুতি ছোট ছোট ভাঁড়ে করে সেই অস্থির সঙ্গে রাখা হতো। ভাঁড়ের মধ্যে হস্ত কাঁপালের বস্ত্রও দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। ভুলতে যাওয়া মাত্র অত দিনের কাঁপড় গুঁড়ো হয়ে গেল। অতি প্রাচীন কালেও যে আমাদেব দেশে দেশে কাঁপালের বস্ত্র ছিল, এই আবিষ্কার দেখে তা প্রমাণিত হ'ল। ১৯২২ সালে প্রথম তুপটীর বনন কার্য শেষ হয়।

ষিঠীয় যুগের চিত্রাবলি।

১ম। ২য় চিত্র। ষিঠীয় যুগের বৌদ্ধার ছবি—উত্তর ও পূর্ব দিক থেকে তোলা। খুঁড়ে কি হয়েছে—অবস্থাটা দেখুন।

৩য় চিত্র। এর উপর যে মন্দির ছিল তাহা ভারতের কোথাও ছিল না। পশ্চিমে ছোট ছোট ঘর, তার মধ্যে বেদী। পূর্বের ভাগে আর একটা মন্দির। কীটের সর্পদেবের মন্দিরের মত।

৪র্থ চিত্র। সর্পদেবের মন্দির। এই যুগগুলিতে ছোট ছোট দেবী আছে। এই দেবীর সমুখে নন্দীনা। আমরা ঠাকুর রাখার যেমন পিঁড়ী করি, এ বেদী পে রকমের নয়। ছোট একটা মানুষ কারুক্লেপে বসতে পারে।

৫ম চিত্র। বেদী দেখুন—সমুখে ছোট নন্দীনা। যে জাত ইহা তৈরী করেছিল, সে জাত ধ্বংস হবার পর এই দেওয়াল তোলা হয়েছে। তারপর ৬ ফুট জমি ছেড়ে ষিঠীয় গুরের দেওয়াল আরম্ভ হয়েছে।

৬ষ্ঠ চিত্র। এই সিঁড়ি যখন তৈরী হয়েছিল তখন দেওয়াল ছিল না। পরে সামনে দেওয়াল তোলা হয়েছে।

৭ম চিত্র। সিঁড়ির ধাপের নীচে মার্বেল দিয়ে ঢাকা পয়ঃপ্রাণী।

৮ম চিত্র। গর্ভ দেওয়াল ভেদ করে চলে গেছে।

৯ম চিত্র। এই নন্দীনা কি জন্য ব্যবহার হতো জানি না। কিন্তু এখানকার ইউগুলি ইতিহাসিকের পক্ষে বড় প্রয়োজনীয়। ইটের উপর মীনা করা। কাঁচ মাত্রের মধ্যে থাকলে যেমন বিবর্ণ হয়ে যায় এর রং সেইরূপ বিবর্ণ হয়ে গেছে। এখানকার নন্দীমাটা এই ধরনের ইট দিয়ে তৈরী।

১০ম চিত্র। সর্পদেবীর মন্দির। যে জাত এই মন্দির তৈরী করেছিল, বেলিলান বা মিশরের সহিত তার বানিতা ছিল। এই সম্পর্ক জাতিগত কি উৎকর্ষগত তা জানি না। উৎকর্ষগত সম্পর্ক থেকে জাতিগত সম্পর্ক বোঝা যায় না। আমরা বালাসী জাতি মূলতঃ অব্যবহৃত হনও আর্ঘ্যগণের সহিত আমাদের উৎকর্ষগত সম্পর্ক আছে। যে জাতি এই মন্দির

তৈরী করেছিল, তারাই ভারতের প্রাচীন সভ্যতার অধিকারী। আর্যেরা যখন ভারতে আসেন তখন তাঁরা বর্ষের ছিলেন। এ জাতি তখন আর্যদের অনেক উচুতে অবস্থিত। জীউ বৌদ্ধ দেখতে পাওয়া যায়—একটা সর্প ও তার পাশে ছইটা সশিখি। তিনটা নালীযুক্ত চামচ দিয়ে আহুতি দেওয়া হতো—মস, রক্ত ও দুধ। একসঙ্গে আহুতির ত্রিধারা প্রবাহিত হ'য়ে সপ্তর্ষির নিকট পতিত হতো। নন্দবার মধ্যে ছোট বড় ৫০০ খেত পাথরের টুকরা পাওয়া গেছে। সব আহুতি একত্র হ'য়ে চরণামৃত রুণ্ডে পড়তো। আমরা এক সঙ্গে আহুতি দিই না। যে আহুতিই দিই না কেন স্বতন্ত্রভাবে দিরা থাকি। বৈদিক যুগে এরকমের একত্র আহুতি দিবার প্রথা ছিল না। এক সঙ্গে ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতিকে আহুতি দেওয়া হতো, একসাধ বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায় না। সুতরাং এখানকার প্রথার সঙ্গে মিশর বা ব্যাবিলোনের কোন না কোন সঙ্গ ছিল।

১১ চিত্র। পরিহার করে মন্দিরটা এই ঠাঁড়াল। মন্দিরের বেরী টো পদের উপর স্থাপিত। একটা আঁটার উপর আর একটা আঁটা সাজিয়ে তার পা হতো।

১২শ চিত্র। খোঁড়ার শেষের ছবি।

তৃতীয় বীণের চিত্রাবলী।

১ম চিত্র। তৃতীয় বীণ—একটা ছোট চিপি। এইখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাপ দেখতে পাওয়া গেল। আমাদের একটা কুলি সাপের কামড়ে মারা গেল। এই বীণ খনন করে দেখা গেল, এটা হৃদ্যদেবের মন্দির। এর বৈশিষ্ট্য ১১১৫ ফুট উচু। মন্দিরে পাথরের pavement ছিল। বহু বর্ষের ধাপ দেখতে পাওয়া যায়।

২য় চিত্র। খননের পরের অবস্থা। সিঁড়ির উপর মন্দির প্রস্তরের আচ্ছাদন। এখানে একটা আশ্চর্য্য জিনিষ পাওয়া গেছে।

এই কথা বলার পর বক্তা সেই আশ্চর্য্য জিনিষটা অথবা জিনিষগুলি দর্শকমণ্ডলীকে প্রদর্শন করেন। সে জিনিষগুলি তৃতীয় প্রকার সমাধি সম্পর্কীয়। পূর্বে ছই বিভিন্ন প্রকারের সমাধির কথা বলা হ'য়েছে। এটা তৃতীয় প্রকারের। শাকে দাহ ক'রে তাঁর ভস্মাবশেষ সংগ্রহ ক'রে, একটা মাটির পাতের মধ্যে পুরে, এই পাতের পাশে একবাঁনি প্রস্তর নির্মিত ক্ষুদ্র অসি রেখে উভয় জিনিষকে একটা মাটির গোলাসে স্থাপন করা হ'ত। এই তিনটা জিনিষই অপূর্ণ—গোলাসটা মাটির হ'লেও যেন সেদিন কুম্বারের পোখান হ'তে বার হয়েচে—তাহার গঠনভঙ্গী ও আলকালিকার কুম্বারের গোলাদের মত। তারপর যে পুটের মধ্যে ভস্ম স্থাপিত ছিল, তাহার মুখ বন্ধ ছিল। পার্শ্বদিক বর্ষণ করলে মধ্যস্থিত ৫০০০ বৎসরের ছাই বাঁধ হ'য়ে পড়ে। শেষে পাথরের অসির কণা বলেন। যে সময়ের সমাধি তখন লোকে তাহার অঙ্গাদি বাহ্যহার করত। কিন্তু ভস্মবশেষের সঙ্গে প্রস্তরের অসি কেন? যে জাতির এই সমাধি, তারা তাদের ইতিহাসের প্রায়ন্তে প্রস্তরের ব্যবহার করত। কালক্রমে খাতুর ব্যবহার লিখলেও সূতের সম্বন্ধে পার্শ্বদিক ব্যাপারে পুরাতন প্রথা অবলম্বন করেছিল মাত্র। এ প্রকার পুরাতন প্রথার অবশেষ প্রায়ই দেখা যায়। সে দিন বিকানীর রাজ্যে অখমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করা হয়েছিল। শায়ের নির্দেশ অনুসারে অখমে কাঠাসি দিয়ে বধ করবার বিধি আছে। এ শায় পুরাতন যুগের ব্যবহারের অবশেষ মাত্র। সুতরাং আজও প্রথমে অশ্বের কণ্ঠে কাঠের অসি স্পর্শ করে, পরে লোহের অসি দিয়ে তা'রে বধ করা হয়।

এই আবিষ্কার থেকে প্রাচীন স্বদেশীয় প্রভুতি জাতির সঙ্গে ভারতের যে একটা সঙ্গ ছিল তা প্রমাণিত হ'লো। এই সব প্রাচীন জাতির পূজা প্রথা প্রায় একই রকমের ছিল।

এই আবিষ্কার থেকে প্রাচীন স্বদেশীয় প্রভুতি জাতির সঙ্গে ভারতের যে একটা সঙ্গ ছিল তা প্রমাণিত হ'লো। এই সব প্রাচীন জাতির পূজা প্রথা প্রায় একই রকমের ছিল।

সমালোচনা

শিল্প ও ছাত্রসমাজ—শ্রীপ্রিয়নাথ গাঙ্গুলী প্রণীত। মূল্য ১০ আনা মাত্র। তরুণের প্রেরণাই সমাজ, জাতি, রাষ্ট্র জীবনে শক্তি ও নব-জীবন সঞ্চার করে। সকল দেশের রাষ্ট্র বা সমাজ-প্রকৃতি এক নয়। পাশ্চাত্য হইতে স্বতন্ত্র জীবনধারা লইয়া প্রতীচোর, বিশেষ ভারতের জাগরণ। তাই কবিয়ার ছাত্র-সমাজের অবগতিও পথ। ভারতের পক্ষে পরিত্যক্ত। কিন্তু তাহা হইলেও তরুণ প্রাণের উৎসাহ, উজ্জ্বল, আত্মত্যাগ ও আদর্শপ্রাণতা ক্রমের জ্বায় ভারতের যুগ্মমণ্ডলীকে উজ্জ্বল করিবে—বিভিন্ন গণে নির্ধূল দেশপ্রেমের সাধনায় তাহার। তাহাদের শ্রেষ্ঠ যৌবন ও সামর্থ্য অর্পণ করিবে—বৈধানির লোভা এই দিক দিয়া সফল হইবে, মনে করি।

প্রতিভা—শ্রীমতী প্রমুখমণী দেবী প্রণীত। মূল্য ১০ আনা মাত্র। তিনটি ছোট গল্পের সমষ্টি। লেখিকার ভাব ও ভাবা স্বচ্ছ ও সরসপ্রাণী।

গোপেনবা-মাহাত্ম্য—শ্রীগগনধর ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত। মূল্য ১০ আনা। হিন্দু নিকট গোমাতার মাহাত্ম্য প্রচার নূতন কথা নহে। জাতিরকার প্রয়োজনে ইহা ধার্যগত হইলে আরও ভাল হয়।

সদাচার মাহাত্ম্য—শ্রীভালানাথ বিজ্ঞাপ্রমি সঙ্কলিত। মূল্য ১০ আনা। হিন্দু সদাচার জুলিতেছে। যুগ্মধর্মের অমূল্য করিয়া ইহার প্রবর্তনে সার্বকতা আছে। আশা করি, ব্রাহ্মণসভা এই দিক দিয়াই উদার ভিত্তির উপরে সমাজ-তত্ত্বের ব্যবস্থা প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ হইয়া হিন্দু ধর্ম ও সমাজকে যথার্থ রক্ষা করিতে পারিবেন।

অটলভাদ নাভিক্সের গান—শ্রীশ্রীশচন্দ্র শর্মা কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত। মূল্য ১০ আনা। ভক্তিপূর্ণ আধ্যাত্মিক গান। তত্ত্ব ও ভাব্যের প্রাণের সরল উজ্জ্বল অমূল্য করা যায়।



প্রতাবনা

পাঠান মোগলের রাজত্বকালে বাংলা ভারতের অজ্ঞাত প্রদেশ অপেক্ষা কম নির্যাতন ভোগ করিয়াছে, ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে পরাধীনতার বন্ধন যত প্রকট হইয়াছিল, বাংলার নবাবী আমলেও তাহার অল্পপাতে বাঙ্গালী অনেকাংশে স্বাধীন ছিল, তবে এ জাতির ধর্মের ইতিহাস যেমন উজ্জ্বল, ব্যবহারিক জীবনের তেমন উন্নত আদর্শবলক ইতিহাস নাই। বাঙ্গালী মৌর্য ও গুপ্ত রাজত্বকালে সর্ব বিষয়েই উন্নতি সাধন করিয়াছিল, বৌদ্ধযুগ হইতে ধারাবাহিক করণে শত বৎসর বাংলার সমৃদ্ধির কথা শুনা যায়, কিন্তু তার পর এমন একটা অন্ধকার বাংলার আকাশে ঘনীভূত হইয়াছিল, যাহা ভেদ করিয়া বাঙ্গালীকে খৃষ্টিয় বাহির করা যায় না।

স্বাধীনতা যখন যায়, তখন হীনতা আসিয়াই জীবন বিয়োগ বসে, যে ভারতের গৌরববর্ষা একদিন জগত আলো বিতরণ করিত, সেই ভারতের অন্ধনতির কথা

বৈদেশিক পর্যটক যে ভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট যুগা যায়, ভারতের রাজমুঠে যেদিন হইতে বসিয়া পড়িল, সেই দিন হইতে দর্শনে, সাহিত্যে, জ্যোতিষে ভারত অস্বীয় হইলেও, ভীকতা, সর্কারিতা, জ্যোতিষে প্রভৃতি চরিত্রসমূহে ও ধর্মীকৃত্যয় আমরা বিদেশীর চক্ষে বড় হয়েক্ষেণ পরিচূড় হইতাম। মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং বাবর লিখিয়াছেন, “ভারত-বর্ষে প্রতিভা নাই, শিল্পচার ও পরম্পর সমাহুত্বের একান্তই অভাব, কারুকার্যে, স্থাপত্যে নব নব উদ্ভাবনী শক্তিতে ভারত বড় নাই, পাঠাগার নাই, ক্রমশঃের জ্ঞান উত্তান নাই; লোকদের একত্র হইয়া আনন্দ প্রমোদ করিবার কোনই ব্যবস্থা নাই; পুঙ্খ ছাটা, নারীও তৎপক, তবে প্রচুর রপ্ত রোগে প্রকটা ভারত ঐখণ্য-ময়ী।” কপাগুলি আংশিক সত্য হইলেও ভাবিবার বিষয়। আজও আমরা দেখি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভারতের স্রষ্টা ইতিহাস উদ্ধার করিয়া গাতির গৌরব

বুদ্ধি করে, সে যুগেও কৈকী আবুল ফজল, নজিমুদ্দিন প্রভৃতি স্রষ্টা মুসলমানগণ হিন্দুর শাস্ত্র গ্রন্থ, পুরাণ দর্শন প্রভৃতির পুনঃ প্রচার করিয়া হিন্দুর মূল ভূমি জাগ্রত করার প্রয়াস করিতেন। হিন্দুজাতি যুদ্ধবিগ্রহ, বন্দুক বাহকের ব্যবহার জানিত না, মুসলমান জাতিই ইহার প্রথম প্রবর্তন করে, মুসলমান রাজত্বকালেই ভারত বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হয়, শিল্প স্থাপত্য বিজ্ঞায় পারদর্শী হইয়া উঠে, চিত্র বিজ্ঞায় হিন্দু নিরতিশয় অজ্ঞ ছিল, মুসলমান কল্‌ক ইহার অদৃশ্যলন প্রবৃত্তি এ দেশে জাগ্রত হয়, ভাস্কর্য্য, কারুকার্য্য এমন কি ঢাকার মদলিন সবই মুসলমান প্রভাবের ফল, ইহা হিন্দু জাতির পক্ষে কম নিদার কথা নহে, ইতিহাসগ্রন্থে কথ্য আমাদের অস্বীকার করার উপায় নাই।

অজ্ঞ ও যে কাটোয়া গাইহাটের হরধরগণের ভাষ্কর্য্য, ক্রন্দনগরের শিল্প আদর্শস্থানীয়, তাহার মূলও আছে মুসলমানদিগের উৎসাহ—হিন্দু বোধ হয় বৌদ্ধ যুগের পর সর্বাঙ্গিকভাবেই ঐহিক জীবনের হাল ছাড়িয়া গিয়াছিল, পারলৌকিক জীবনের খোঁজাটে, পারের প্রতীকায় শতাব্দীর পর শতাব্দী কাটিয়া গেল, তবুও যখন কর্ণধারের দেবা মিলিল না, তখন আবার তাহাদের ইহ জীবনের অভাবের দিকে দৃষ্টি জাতির পুনর্ব্যবস্থার হতন, এবং এই উন্মোচন মূলেও মুসলমান জাতির ধান অস্বীকার করা যায় না, নাবালক হিন্দু-জাতি এ যুগেও যুগেপুষ্টি সমাজের নিকট জ্ঞা। কল্যাণপ্রিয় হিন্দুজাতি জীবনের সাধনায় বিমুগ্ধ হইয়া একেবারেই পদু হইয়া গিয়াছে।

আমরা ধর্মের অসুত আবাদ হইতে জাতিকে বঞ্চিত হইতে বলি না, কিন্তু নিরন্তর বাসু প্রাণের সহিত জীবনে। প্রয়োজন সাধনে উদাসীন হইতে নিষেধ করি, আমাদের সামান্য পণ্যটিও হইয়া পড়িয়াছে এত সর্কার যে ক্রম দ্রবত্বের তৃষ্ণ কামনায় ব্যবহারিক জগত যেমন পাগল হই, অদ্যায় সাধনায় তরুণ।

আমরা আমাদের বাহিরে যে বিপুল বিখ্যাত পুণ্ডর্য্য গ্রন্থে হাত বাড়াইয়া পাড়াইয়া মাছে তাহা স্বীকার করি না, বিষয় ভোগের যত ধর্মক্ষেত্রেও চাই আশ্ব-প্রসাদ, আশ্বজ্ঞানগণের মায়ে আশ্বহতাই করিতেছি, আশ্বজ্ঞান সন্ধান নাই। যে জাতি নিষ্কের পায়ে পাড়াইবার ভরসা রাখে না, সে ক্ষেত্র চিত্রিনই দাঁতবোর খাতায় নাম লিখিয়া জীবন কাটাইবে, তার আবার স্বাধীনতা-সুখ কেন?

জীবনের ধর্ম অস্বীকার করিয়া ভগবানের উপাসনায় যাট লক সবল স্রষ্টা ব্যক্তিকে উদাসীন করিয়াছে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া বাহারা জীবিকায় সংগ্রহ করে, তাহাদের চেয়ে ইহারা জীবভোগী নহে। দৈন্য দিয়াছেন জীবন, দৈন্য রক্ষা করিতেছেন প্রাণ, দৈন্য মন্তিকৃত্তির অদৃশ্যলন করিয়া করিতেছেন স্রষ্টি, দৈন্য জববে জাগাইয়া তোলেন প্রেম, মাছের এমনি অহমিকা যে ইহা অস্বীকার করিয়া তাহার হির করে,—ভাবি আমি, ভালবাসি আমি, কাজ করি আমি। কিছুদিন পরে আবার তাহা উঠাইতে হয়, এমন বলোই এ জাতি ভিন্ন আর কে হইবে? যাহা আমি, তাহাতেই জাতি রাখিয়া, প্রত্যয় করিয়া যদি উত্তর হই, বিশ্বের কল্যাণে, বিশ্বের কলমে দৈন্যের শক্তিই নামে। সে বিনা যখন কিছু নাই, তখন এত কলমা কিদের জ্ঞ? যেহেতু বিনাশী গজননী সর্গাপাধ ভারত ক্রমশে আসিয়া তখনও লব্ধ্য করিয়াছিলেন—“হিন্দুর গ্রন্থ বড় আড়ম্বর-পূর্ণ, সত্যের চেয়ে শব্দবিজ্ঞাসের ঘটা অধিক,” একথা সর্বাংশে না হইলেও আংশিক ভাবে সত্য, ভগবানে চিত্ত সমর্পণের সহজ বিধি, দার্শনিক কলনায় আমরা এমনই ঘোরাল করিয়া ধরি, যে, ইহার ঘূর্ণিপাকে জীবনের বিকাশ রুদ্ধ হয়। আমরা ধর্মজীবনের সহিত ব্যবহারিক জীবনের অনৈক্য দূর করিবার জন্তই দৈন্য-প্রণয়ন উদ্ভূত হইয়াছি।

এইরূপে দেশের এই অন্ধকার যুগে, পাপের বাস-
স্থানে পুণ্যের নীপমালা জ্বলিয়া তুলিতে হইবে, তাই
নীপাবলীর আয়োজন। বাংলার অতীতযুগে যে সমুদ্র
ধর্মপুঙ্খবর্ণ, সাহিত্যিক, কবী, শিল্পী, সমাজসংস্কারক
যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া, পতিত জাতির যেকোনও
বল বিধান করিয়াছেন, তাহাদের চরিত্র ও কর্ম চিত্রে
আমরা নীপাবলীর তুষ্ণ পূরণ করিব। এই জন্ত
“প্রবর্তকের” গ্রাহক ও পাঠকবর্গের প্রতি আমাদের
নিবেদন যে তাহারা যেন বাংলার লুপ্ত রত্নের উদ্ধার
সাধন করিয়া প্রবর্তকে উপহার প্রেরণ করেন।

বাংলার গ্রামে নগরে পল্লীতে কত লুপ্ত সাধনার বিচিত্র
কাহিনী—সত্যের চুড়ান্ত, সমাজ-রাষ্ট্রের ইতিহাস, কত
কবি, দার্শন্য, রামানন্দ, ত্রীচৈতন্যের আদর্শে অমু-
প্রাণিত শাখক—নবযুগপটনের সংস্কারক, কত শিল্পী,
কত প্রতাপাদিত্য, সীতারামের মত দেশপ্রেমিক, বীর
লোকলোচনের বাহিরে আত্মদান করিয়াছেন, তাহাদের
চিত্রাদি সহ বিবরণ পাঠাইলে আমরা তাহা এই
তুষ্ণ স্থান দিয়া,—“প্রবর্তক” জাতিকে সর্বতোভাবে
বাহ্যতে সমৃদ্ধ করে, তাহার ব্যবহা করিতে পারি, আজ
শুধু এই নিবেদনটুকু করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

আশ্রম সংবাদ।

ঈশ্বরের ইচ্ছায় সঙ্ঘের বিশেষ পরিবর্তন উপস্থিত।
আমাদের চন্দননগরের প্রতিষ্ঠানটির অধিকাংশ কলি-
কাতায় স্থানান্তরিত করিতে হইয়াছে, “প্রবর্তকের”
আশ্রমে সাধনভবনের অঙ্গশালন ব্যতীত কর্মভবনের যে
প্রবাহ তাহা রাজনগরী কলিকাতায় গিয়া পড়িল।
বাল্যালীর বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি
কিছুতে নিষ্ফল স্থান করিয়া লইবে, তাহা ভবিষ্যতের
হাতে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত। আমরা তাঁর হাতের
বল তিন খেয়ন ঢালাইবেন তেমন চলিল। চন্দন-
নগরের শ্রামাঞ্চলে আমাদের সংখ্যাটা বেলা ছিল না,
রাজা ও প্রজার পক্ষে যেন কিছু ঢাকা দেওয়ার মত

বোধ হইত। কিন্তু প্রবর্তকের কাজ স্পষ্ট দিব্যদোকের
মত ফুটিল। কলিকাতায় প্রবর্তকের জীবন স্পষ্টে
অনর্থক সংস্কারের নিষেধ করুক, ঈশ্বরের নিষেধ
আমাদের এই দারুন।

প্রবর্তক—চাহে দিয়া জীবনের সাহিত্য, বাস্তবজীবন
নিকনুয় করা, ও এইরূপ বাট মাঝখের জীবন লইয়া
নব সমাজের প্রবর্তন, যে সমাজের ভিত্তি হইবে
অধ্যাত্ম, স্বাধীন হইবে সাধনা—উপায় অসম্ভাব্য
শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যের বিস্তৃতি। ভগবান আমাদের
সহায়, সিদ্ধি নিঃসংশয়, প্রবর্তকের পথ তবিস্যাতের
অকাটা সন্দেহ। “নাভ্যপথ্যঃ বিজ্ঞেয়মান।”

শুভ বিবাহ

১২ই বৈশাখ প্রবর্তকের একনিষ্ঠ সাধক বন্দোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন পরিগ্রহ
“Standard Bearer” অথবা “নবদজ্জের” সম্পাদক করেন। শ্রীযুত অমিয়প্রভন হিন বঙ্গের ধর্মদা
শ্রীমান অকণ্ঠস্বরে ভক্তের সহিত চট্টবনিবাসী শ্রীযুক্ত মঞ্জী
নাথ দে মহাশয়ের একমাত্র কন্ডা শ্রীযুত অমিয়প্রভনের
শুভ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিবাহ সভায় সংস্থত
কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মুরলীধর
শ্রী দৌলদাস জাতিতে সমৃদ্ধ করুক।

অক্ষয় তৃতীয়ার মেলা

নবজাতির উৎসব। সদেশজাত শিল্প ও কৃষিকাজ
সামগ্রীর অপূর্ণ সমাহার। স্বাবলম্বী হস্তার সাধনা
প্রদর্শনীর মধ্যে মধ্যে গাথা বন্ধুত্ব, গানে,
অভিনয়ে, আলোকচিত্রে, দৃশ্যাবলীতে ইত্যাদি পরিচুত।
সমাজ চিত্রে দেশের নূতন দৃষ্টি জুটবে, ভার-
তের ধর্মগুরুমণ্ডলে, পাঁচ হাজার বৎসরের ভারত
জীবন্তরূপে দর্শকের প্রাণ উৎসাহের সঞ্চার করিবে।

মহাত্মার আগমন

২২শে বৈশাখ মহাত্মা গান্ধী আশ্রম দর্শনে
আগমন করিবেন। তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজন নিঃসংশয়
আশ্রমবাসী দ্বন্দ্বের শ্রদ্ধা ভক্তি দিয়াই করিবে।
বান্ধব বন্ধ বেন্দীতে তাঁহাকে বসাইয়া সঙ্ঘের সহিত
তাঁহার আত্মপরিচয় এই পরিবর্তন যুগের একটা বিশেষ
লক্ষণ। প্রবর্তক ভারতের সাধনার আত্মদান
করিয়াছে—সে সাধনা কৃষি, বন শিল্প, ইত্যাদি
অহিংসা নীতি। সঙ্ঘের নারী পুরুষ দীর্ঘ দিন
ইহাতে রত থাকিয়া ইহার উপযোগী হইয়াছে, মহাত্মার
চরণে অন্তরের অবদান নিঃসংকোচেই দান করিবে।
ভারতের মূর্তি দেবতা মহাত্মার আশীর্বাদে আমাদের
জীবনে নূতন প্রেরণার সঞ্চার করিবে।

ত্রিশীপ্রজ্ঞাপতয়ে নমঃ

পৌসাইরডাধা

নিজবাড়ী

২ই বৈশাখ।

মেহের অমির মা আমার,

পারিবারিক বিশেষ কারণ বশতঃ তোমার শুভ-পরিণয় দিবসে উপস্থিত থাকিতে পারিলাম না বলিয়া বড়ই দুঃখিত। ত্রিশীভগবানের নিকট প্রার্থনা তোমাদের এই পুণ্য উষাধ-বন্ধন সুখের হইয়া জগতেরও মঙ্গলবিশদ্যক হউক। তুমি সীতা সাবিত্রীর মত সতী সাধী হও, আর বনা, পার্বী ও মৈত্রেয়ীর মত জগতে অক্ষয় কীর্তি স্থাপনা কর।

মা, ভারতে সবাই কেবল নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। তোমাদের কণ্ঠের ধারা হউক নিজের মুক্তি, আর মনে দেশের হিত, বর্তমান ভারতে এইটির বড়ই অভাব, দেখেছি না—আমরা কি হয়ে পড়েছি! ভারতকে তুলতে হলে আগে চাই হাজার হাজার জীবন্ত মেয়ে। যাদের “মন হবে যেন দিগন্তব্যাপী উন্মুক্ত আকাশ, জ্বল হবে সাগরের মত প্রশান্ত, তারা জানে হবে অচল অটল হিমালি, আর কণ্ঠ হবে বজা-প্রায় জাহবীর।

মা, পরিণয়ের এই প্রিয় মিলন আনন্দময়িত্তে নিজেকে ভরপুর করে রেখে অশ্রুত কণ্ঠপ্রোতে দেশকে মাতিয়া তোল।

পরিণয়-মিলনটা কেন? জীবনটা কি রকম, আমরা তাহা বুঝি না। প্রকৃতি পুরুষের মিলন পরশে যে আনন্দ-স্বরূপ হয়, সেই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-ধারাই আমাদের জীবনের গতি বা এইটিই আমাদের জীবনের রং! এই অবস্থাটি বুঝবার জন্যই এই পরিণয় মিলন, পক্ষান্তরে এইটিই আধ্যাত্মিক পরিণয়।

মা প্রার্থন, এই আনন্দ উপলব্ধ করিয়া আজ এই “মটরমালা” বানি তোমাদের শুভ পরিণয়ে আমাদের মঙ্গল ইচ্ছাঙ্কক আশীষস্বরূপ পাঠাইলাম, গ্রহণ করিও।

তোমার শুভবাবা, যিনি মাতৃহারা তোমাকে মাতৃ-মেহ দানে তিল তিল করে আপন মানস-প্রতিমা স্বরূপ গড়ে তুলেছেন, তাঁর শ্রীচরণে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপক শত শত ভক্তি প্রণতি জানাইও। ভগবৎ সনৌপে তোমাদের মঙ্গলপ্রার্থী। ইতি—

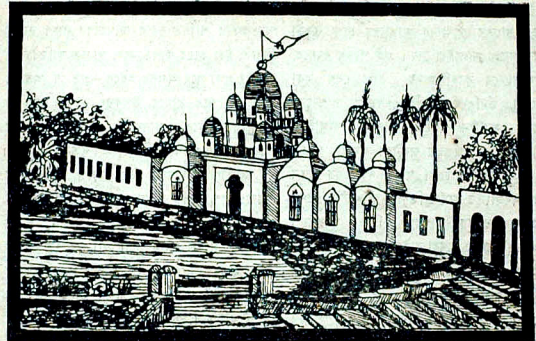
তোমার—“ভোজীমা”

ত্রিশীম সবেজিনী চৌধুরী



১৫নং নয়াচাঁদ দাঁড় স্ট্রীট, মোটাকান্দ প্রেসে ২ইতে—শ্রীকীর্ত্তী চন্দ্র মল্লমদার

বর্জক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



প্রথম বর্ষ }
২য় সংখ্যা }

প্রবর্তক

{ জ্যৈষ্ঠ
{ ১৩৩২

নির্মাণ-কেন্দ্র

—:—:—

উন্নতির অন্তরায় যে সব অসংপ্রতি স্তম্ভ জাতির মধ্যে এত দিন তলাইয়া ছিল, জাগরণের সঙ্গে সেইগুলি বিকট মূর্ত্তিতে উপরে ভাসিয়া উঠিয়াছে। “অসংখ্য কণ্ঠক্ষেত্র সংগঠনের প্রয়াস সর্বত্র কল্যাণ-শ্রী না ফুটাইয়া, কদাকার বিদ্রোহ আকারে দেখা দিতেছে। অনেকের কণ্ঠপ্রেরণা নৈরাশ্রে ক্ষুণ্ণতার আত্মপ্রকাশের পূর্বেই লয় পাইতেছে। জাতীয় জীবন প্রকাশের পথে ইহা ছিন্ন-গণের পরিচয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু তবুও আমরা ইহার মধ্যে শুভ স্ফূর্ত্তার সন্ধান পাই,

কেননা, স্বজনের প্রারম্ভে বাধার মাত্রা যত অধিক হইবে, উদীয়মান স্বজনশক্তির বেগের পরিমাপ ততই স্থপরীকৃত হইবে। সব কিছুক অতিক্রম করার স্পীড়া লইয়া একটা প্রবল শক্তির অভ্যুত্থান আমরা কামনা করি। মাহুষের কামকল্পিত নীচ কণ্ঠপ্রয়াস সামান্য বাধায় আহত হইয়া, কণ্ঠপথে আবদ্ধনার সৃষ্টি করে, জাতির প্রাণে অবদান বাড়ায়—এই সকলকে বিদীর্ণ করিয়া একটা বিশুদ্ধ শক্তির প্রকাশ যাহাতে সম্ভব হয়, তাহার আরোহণে আমরা প্রাণ দিতেও স্তুতি নই।

বাংলায় এই বিস্তৃত কণ্ঠশিল্পের আত্মপ্রকাশের কাল আজ আর হৃদয়গাহ্য নহে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রভাতের সূর্যোদয় আমাদের চক্ষে একটা আশার আলো জ্বলিয়াছে। এই পঁচিশ বৎসরে, সে আশা যে কুহেলিকাময়, তাহা বেশ বৃদ্ধা গিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, পাশ্চাত্য ভারতের সমাজে ধর্মের বিজয়ভঙ্গা বাজাইয়া, স্বামীজী যে দিন ধর্মগুরুর জয়চীকা লগাটে পরিয়া হিমালয় হইতে কুমারিকা পঞ্চাশ পঞ্চতরের নতুন বাখা নবজাতির কর্ণ প্রতিধ্বনি তুলিলেন, তখন হইতেই ভারতের জাগরণ স্ফূর্তি হইয়াছে। ভৌগলিক সংকেত অথবা রাষ্ট্রশাসনের সীমাবোধায়, ভারতবর্ষ সেই দিন হইতেই আর সর্বাধি বিস্তৃত নহে, সিদ্ধজলবিধৌত পদতল হইতে হিমালয়ের অম্বভেন্দ্রী শৃঙ্গচূড়া পঞ্চাশ বিরাট ভারত স্পর্শিত শিরে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। তন্ত্রাতুর ভারতের মোহে দূর হইল যে ময়ে, সেই মগ্ন যে ভারতের প্রাণ, একথা বলাই বাহুল্য। ভারতের তেরোশাখা দীর্ঘশক্তি সবই যে সমানতন ধর্মপ্রেরণার অহুভা, তাহা আর প্রমাণসাপেক্ষ নহে। ধর্মের অটল ভিত্তির উপর ভর করিয়াই ভারতের জাগরণ সম্ভব হইয়াছে, পঞ্চবলেই ভারত বিশ্বগ্রহণ করিলে।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে নবযুগের প্রথম ধর্মি নবাবারতের কর্ণে জাগরণের মন্ত্র দিয়া অস্ত্রধান করিলেন, এই প্রায় পঁচিশ বৎসর মন্ত্রশক্তি প্রভাবেই জাতি আত্ম হইয়াছে, ঐক্য লাভ করিয়াছে, দ্বিবা ভীষনের আশ্বাদ পাইয়াছে, বিস্তৃত রুস্তির বিকাশে ক্রমোন্নতি সাধনে যত্নবান হইয়াছে। এই পঁচিশ বৎসরের ইতিহাস উদ্ভাসের ইতিহাস, পতনের লক্ষ্য ইহার মধ্যে নাই, অতএব স্পষ্ট দিবালোকের সাহায্যে আমরা জাতির উন্নতি প্রত্যক্ষ করিয়া দেশকে নিঃশঙ্করে আশ্রয় ও সাহস দিতে পারি। ভয় নাই, জাতি আগিয়াছে—

মরণের আতঙ্ক আর গ্রিয়মান হইও না।

হিসার ছুরি, পরনিষেধের উগ্র বিংশ, বিশ্বাস-ঘাতকতার শাণিত কুঠার জাগরণের লক্ষণ রূপেই উদাত, ইহা ভয়ের কারণ নহে, জাগ্রত জাতিচৈতন্য নির্ভয়ে লক্ষ্য পথে অগ্রসর হইবে—এত যে অস্ত্রায় সবই তন্ত্রা দূরে রাখার উপকরণ, রূপেই বাবহারে লাগাইতে হইবে, প্রাণঘাতী হলহল ভিক্ষের বাবহার গুণে মৃতসজীবনী হয়, ইহা নতুন কথা নহে। জাতীয় সত্তা অমান উজ্জ্বল মূর্তি লইয়া বিশেষ আত্মপ্রকাশ করিবে, ভারতের মতকে জয়মুহূর্তে গোড়া পাঠিবে, বিংশ শতাব্দীর মধ্যেই ভারত জগতের অজ্ঞাত প্রধান প্রধান জাতিসমূহের সমকক্ষ হইয়া মানবকল্যাণে পুরোভাগে দাঁড়াইবে, সমসামান্য সকল জাতিই ভারতকে যোগ্যতম আসনে উঠাইয়া বসাইবে, ভারতের গৌরববৃদ্ধির পরকরোজ্জলতার অদূর ভবিষ্যৎ সমুজ্জল হইবে—ইহা স্বপ্ন নয়, কাহিনী নয়, ঐ দিন আসিবে—বিষাভার এই অলম্ব্য বিধান মন্ত্রাশক্তির বাধ্য ফল হইবে না।

ভারতের এই মহাযজ্ঞ ভারতের সন্তান আমরা, আমাদের হান কি, দেয় কি, কর্ম কি—ইহা লইয়াই কথা। আমরা কেমন করিয়া রূতরাই হইতে পারি, সন্তান ধর্ম পালন করিতে পারি, আমাদের কণ্ঠে বিস্তৃত শব্দ কেমন করিয়া স্বরার দিবে, আমাদের অকশিত অঙ্গলি আশ্রয়ানের অর্থা লইয়া মাতৃ-চরণে কেমন করিয়া উপস্থিত হইবে, আমরা এই অমিকার কেমন করিয়া অর্জন করিব, ইহাই তো ভাবিবার কথা।

এই দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরে মাতৃসাধনার পূজাবোধী-তলে কত পুরোহিত নতজানু হইয়া কোটী কোটী সন্তানকে আশ্রান করিল, কত মন্ত্র উচ্চারণ করাইয়া—মাতৃ আজ কাতর কণ্ঠে প্রবল কণ্ঠে আশ্রয় আশ্রয় কোথায়? প্রথম মাতৃমূর্তির হতে যে আশীর্বাদ

ধরিল, তাহা আমাদের কতখানি যোগা করিয়া তুলিল—আমরা করিলাম কি, পাইলাম কি, আমরা দেব হইল কি?

একটা বৃহৎ শূন্য ছাড়া অল্প কিছু আর চক্ষে পড়ে না—তাই কণ্ঠে উৎসাহ নাই, প্রতি পদে সাংশয়ের বৃষ্টিক দংশন অচভব করি, উদ্যমের মূর্তি চলনার ছন্দাঘর বলিয়া মনে হয়, সাময়িক উত্তেজনায় হৃদয়ের অবদান কোথাও স্মৃতিখ্যা পড়িলেও, বিচারের কণাঘাত সতর্ক হইতে হয়; চতুর্দিকেই কার্পণ্য, চতুর্দিকেই আত্মস্বার্থ চরিতার্থতার বুদ্ধ-দুষ্টি, কে কহাকে গ্রাস করিবে তাহারই বিস্তৃত দৃষ্টবিস্তৃতি—কর্মক্ষেত্র শাস্ত্রহীন, প্রত্যাহীন, বন্ধ ও সাংঘর্ষের কোলাহলময় উচ্ছ্বল তাত্তব মতো প্রায় অপেক্ষা মনের জগৎই অধিক বীভৎস, স্পষ্ট ও নির্মাণের মন্ত্র যুগের প্রভাবে শুধু ওঠপুটেই উচ্চারিত, সত্তার মন্ত্র বলিয়া এখনও স্বীকৃত হয় নাই।

পঁচিশ বৎসরের ধর্মসন্নীতি মধ্যে, সমাচ্ছে, রাষ্ট্রে, শিক্ষায় অপ্রতিহত প্রভাবে চলিয়া আসিয়াছে, প্রকৃতির মধ্যে ধর্মায়ের প্রভাব শিকড় গাঢ়িয়াছে, যুগধর্মে নির্মাণরত জোর করিয়া কাঁপে চাপিলেও, রক্ত হতে ভাঙ্গায় আমরা সিদ্ধকর্মী, গড়ার মৈনুগা এখনও ধাতে বসে নাই—তাই স্বপ্নের ক্ষেত্রে গড়ার অপেক্ষা ভাঙ্গার মাত্রাই অধিক জুটে, সহায়তার নামে কপট প্রকৃতির আড়ালে মাল্লখ ঘোর প্রতিকূলভাও করি। যেখানে নির্মাণের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, সেখানে এ রঙ্গা যুবাই প্রকট, প্রায়ই স্বপ্নের ক্ষেত্রে, সেখানে এ রঙ্গা যুবাই প্রকট, স্পষ্টর আনন্দে সন্তুষ্ট ঘনি পূর্ণ না হয়, স্বভাবের এইরূপ অম্পাষ বাহা জাতিকে নির্মাণের যুগে এক পদও অগ্রসর হইতে দিলে না।

প্ৰজন্মীতির মত ধর্মসন্নীতিও ঐশ্বর্য-প্রবাহ। কিন্তু চট্টটা পরম্পরবিরাগী শক্তি—তবুও

ইহার মধ্যে সামঞ্জস্য আছে। আপোষের সামঞ্জস্য মহাপ্রাণের উদ্যোহন করে না, যেখানে এই দুই স্বতন্ত্র নীতি মূল চৈতন্য চৈতন্যময়, সেখানে অন্ধ আঘাত স্পষ্টিকে বার্থ করে না, ধর্মশক্তি স্পষ্টিকেই সার্থক করে, বিনাশের বস্ত্র অস্তিত্ব নষ্ট না করিয়া, স্পষ্টির স্থিতিপ্রকৃতিকে পরিবর্তনশীল করে, সচল করে, ধর্মসংস্থানে স্বপ্নের বুদ্ধিগাঢ়তা। সকল নির্মাণকেন্দ্রে এই দুই ভিন্ন প্রকৃতির চৈতন্যময় সত্তা অধিষ্ঠিত থাকে, ইহার অভাবে স্বপ্ন কোথাও সার্থক হয় না।

এই জগৎ ভারতের কর্মক্ষেত্রে, বাক্তিগত ধর্মে বিস্কন্দ দিয়া জাতিধর্মে জীবন উৎসর্গ করার ত্রুত হাধারে, তাহাদের সত্তার মধ্যে দীপ্য লইতে হইবে, অন্তরচৈতন্যের বহিরঙ্গকে উন্মীলিত করিতে না পারিলে, সমবর্ণ, সমজাতি, সমদেশ—তবুও বিরোধের আগুনে প্রবল শক্তি বিনষ্ট হইবে, ভারতের ক্ষয় নিবারণ করি। ভারত ধর্ম, ভারত জাতি পুষ্টি করার একমাত্র উপায় আত্মদর্শন। আত্মদর্শীর অটল চরণই স্বপ্নের পাত্রে দীপ্য ধারণের শক্তি ধরে। একই মূল প্রেরণায় আছে ধর্মসং ও নির্মাণ, স্পষ্টি ও বিস্তৃতি। অযোগ্যতা হেতু কোথাও নির্মাণ করিয়া বসি—উষ্মকেন্দ্রে, তৃণহীন মরুভূমি, কোথাও কণ্টক-গুচ্ছ আগাছার ক্ষেত্রভূমি, অস্বাস্থ্যকর ভীষণ অরণ্য। শক্তি অবিমিশ্র নয়, সামঞ্জস্যের অভাবে স্পষ্টি কোথাও অসম্পূর্ণশ্রবণের মত অটল দৃঢ়ভিত্তি-বিশিষ্ট হইতেছে না।

ভারতের সর্বত্র না হউক, বাংলায় কিন্তু স্পষ্টির আনন্দে সন্তুষ্ট ঘনি পূর্ণ না হয়, স্বভাবের এইরূপ অম্পাষ বাহা জাতিকে নির্মাণের যুগে এক পদও অগ্রসর হইতে দিলে না।

বাংলায় স্বামীজীর অধ্যাত্মমূলক ধর্মতত্ত্বাচরণীগণে একটা প্রবাহ দেশব্যাপী সৃষ্টি লইয়া আশ্চর্যপ্রকাশের উদ্যোগ করে, সে প্রয়াসের ফলে, তরুণ জীবনে সেবারত্তির প্রাচীন বহিরা যাহা, স্বদেশ, স্বজাতি, স্বধর্মের প্রতি আত্মল অমুরাগ তমসাচ্ছন্ন দেশের বায়ুমণ্ডলে নবস্বাস্থ্য সঞ্চার করে। এই উপযুক্ত ক্ষেত্র ও সুযোগের আশ্রুকল্যেই, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় স্বদেশপ্রেমিতর ভীষণ যুগ্মবর্ন্ত সঞ্চিত হয়। অসিত্ত্ব জাতিজীবনের ইহা মনন যুগ, সে অবস্থানে উগ্র বিষ উৎপন্ন হয়, ১৯১০ খৃষ্টাব্দের পরই বাংলার বিপ্লববহ্নি প্রলয়মুখি ধরিয়া সারা ভারত ছড়াইয়া পড়ে, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের পর হইতেই জাতি আত্মস্ব ইহঁদের সাধনা করে, উগ্র রাজসিক বৃত্তির প্রশমন করিয়া বিধাতা কঠোর চরিত্রের ব্যবস্থা করেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বিপ্লব জীবনপ্রোত উচ্চলিয়া উঠে, ভিন্নভিন্ন প্রকৃতি ও আচার আশ্রয় করিয়া অবশিষ্ট তমঃ ও রক্ত শক্তি সর্ব কালেই পুটিকে শিখিল ও মন্থর করার উদ্যোগ করিয়াছে, কিন্তু উন্নতির পরিপন্থী কোন প্রভাবই জাতিকে ক্ষুণ্ণ করে নাই। আজ ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে বিপ্লবজ্বার অবতার মহাস্বাস্থ্য প্রাশ্ণার চরণধূলি সর্বদেয় মাথিয়া এই যে শুষ্ক বাদি বাবহারের প্রতিশ্রুতি গ্রহণে বাঙ্গালী অগ্রসর, ইহা অন্তর্যশোধানের বহিঃপরিচয়। জাতির সত্তা এই পচিশ বৎসরে, কতখানি যোগ্য মুক্ত হইয়াছে, তাহা অস্ত দৃষ্টিসম্পন্ন কোন মনীষী-কেই অদিক করিয়া বুঝাইতে হইবে না। ঝাঁপারা বাংলার এই দীর্ঘ জাগরণ যুগের ইতিহাস আমোদান করিয়া হতাশ হন, তাহারদিগকে আমরা দৃষ্টিহীন বলিব, বাঙ্গালীর অতীত সাধনা নিফল হয় নাই, বাঙ্গালীর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চিত্র মহাআর চিত্রে প্রতিকলিত হওয়ায় তিনি উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন—ইহা আজিকার দল নহে, বিগত পচিশ বৎসরের সিদ্ধি

মহাআর কক্ষ-মুখে উদাত হইয়াছে, ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের পর বাংলায় আবার আর এক প্রাশ্ণ পাণ্ডী আরম্ভ হইল।

এইবার বাংলায় নিছক নির্মাণের যুগ আরম্ভ হইল। ইহার অব্যাহত গতি আর রুদ্ধ হইবে না। আশা ও নৈরাশ্যের কুহেলিকা মাছয়ের মনে কখনও রোজ ও ছায়ায় চিহ্ন চুটাইয়া তুলিবে, দেশের যত্না কিন্তু অমোঘ লক্ষ্যে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইবে। এখনও ঝাঁপাদের মস্তিষ্ক পাশ্চাত্যের আমদানী কল্পা মত ও যুক্তি দিয়া ভরিয়া আছে, তাহারা হয়তো এই পরিবর্তনের ভবিষ্যৎ পথক্ষে নিরাশ হইবেন, দেশবিরুদ্ধ আদর্শ ও কল্পনায় জাতির সত্তাকে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা করিবেন—কিন্তু জাতির সত্তা স্বরূপ লাভ করিয়াছে, অটল পদে সর্ব প্রকারের বিরুদ্ধ শক্তিকে অতিক্রম করিয়া স্বল্প গঠন নীতিতেই জাতিকে ও ধর্মকে পুষ্ট করিবে। ভারতে ব্যক্তিগত ধর্ম লোপ পাইয়াছে, ভারতের বর্ণাশ্রম ভাঙ্গিয়াছে, সমাজের ভিত্তি পর্যন্ত উপাড়িয়া পড়িয়াছে—জাতির সত্তা যখন আচ্ছন্ন হয়, তখন জাতিকে আশ্রয় করিয়া যে ব্যাক্ত, বর্ণ বা সমাজ, তাহার অস্তিত্ব রক্ষা অসম্ভব হয়। ভারতের সত্তা জাতিধর্ম উপাদানী হইয়াছিল বলিয়াই তাহার আজ এই দুর্দশা, আবার জাতি-গঠনের প্রেরণা অনচ্ছিন্নভাবে অচলান করিয়া চলিলে আমাদের ভাগবত সমাজ, গুণধর্মোদ্ভিত বর্ণ ও দিবা জীবনের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিব। ভাগবতের যুগে সত্তা ধর্মের আবর্ন্ত হইতে একটা শক্তিকে কেন্দ্রীকৃত করার প্রেরণা লইয়াই দক্ষিণপথের সাধনা বেলুড় স্থানান্তরিত হইয়াছিল, এই বেলুড়ের স্রষ্টা বাংলায় নানা আকারে যুগধর্মের উপযোগী হইয়া হয়তো আরও অনেক ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে—যে বিভাগ-গৃহ হইতে শক্তিকলির জাতীয় জীবনে

সঞ্চারিত হইয়া দেশের অভিনব পরিবর্তন সাধিত করিবে, ভারতে সনাতন ধর্মের প্রতিষ্ঠা হইবে, ধর্ম-রাজ্য গঠনের অল্প উপাদান যোগাইয়া দিবে—বাং-

লায় এই নির্মাণ-কেন্দ্র স্থাপনেরই যুগ উপস্থিত—মুক্ত-চিত্ত সিদ্ধ সন্তান, তোমরা কি এই নব অতিথির সমাদর করিবে না!

নৃতনের আবাহন

—:—

ভারতবর্ষ নৃতনকে পূর্ণরূপে আবাহন করিতে পারে না—সে সনাতনদর্শী, রক্ষণশীলতায় তাহার ধাতু আচ্ছন্ন; যখন নৃতনের জাগরণ হয়, পুরাতনের শূন্যস্থানধারণ করে 'সনাতনবর্ষ' গল্পের নিকপ্ত করায়। ভারতীয় সনাতন যদি সত্যই সনাতন হয়, তাহা হইলে ইহাতে কোনরূপ ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, কিন্তু যুগ যুগ ব্যাপিয়া ভারতের বিশিষ্ট জীবনধারা নিছকে সনাতন বলিবার অধিকার লাভ করে নাই, একটা যুগ, ঠিক বর্ষমানের পূর্বের যুগই, সনাতনের সলল মহিমা হরণ করিয়া নৃতনের বিরুদ্ধে অস্থায়িত্ব হয়। সে যখন ঘোষণা করে, আমিই সনাতন, আমারই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কাব্য করিবে, তখন মনে হয় ভারতে যুগ-বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে; একটা যুগই—সংসোদ্রব পূর্ব-বর্তী যুগই যদি সনাতনের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে, তাহা হইলে ভারতে শুষ্ক সনাতনের উপর নব যুগের আবির্ভাব হয় না। ভারতের ইতিহাসে যুগপরিবর্তনের ক্রমগণিত এত অপ্রকট ও দুইটী যুগের মধ্যবর্তী কালে ভারতের সনাতন সৃষ্টি এত অস্পষ্ট, যে আমরাদিগকে বলিতে হয়, ভারতের সমগ্র যুগ-ইতিহাস অন্ধজন কর্তৃক অন্ধজনের পরিচালনার দ্বারা প্রতিকৃত হয়। নবযুগপথের পূর্বে

ভারতের বাহ্যিক অবস্থা যেকোনই হউক, উহার শাস্ত দ্বারা যদি জীবন-তরঙ্গে হিরোলিত হইয়া না উঠে, তাহা হইলে নৃতনের পত্তনে ভারতের মূল-শক্তির যুগলীলা সম্পাদিত হয় না—সমাজ্যম্ ভাব ও নেশায় কোনরূপে ভারতের বর্তমান কর্তব্য সাধন করিয়া আমরা নবযুগের প্রবর্তক হইয়া আত্মপ্রাণা অর্জন করি। ভারতবর্ষ এইরূপে বহুযুগ কাটাইয়াছে, আজ নবযুগের সন্ধিক্ষণে সে সত্যই নৃতনের আবাহন করিতে পারে কি না, তাহাই দেখিতে হইবে। অন্তঃ নৃতনের আবির্ভাবের পূর্বে ভারত-বর্ষ যদি তার সনাতন জীবন ধারায় সঞ্জীবিত হয়, তাহা হইলে বলিব, নৃতনের আবির্ভাব অদূরবর্তী।

এই আজ আমাদের সমুখে যে যুগ অপসারিত হইতেছে, উহা-যে সনাতন নহে, সনাতনপন্থা আধাযয় উঠাকে অভিহিত করা যে একান্ত আশ্চর্য কার্য, ইহা আমরা যত অধিক ক্ষয়ক্ষম করিব, আমরা নৃতনের পথকে ততই সরল করিয়া তুলিব। অধিকন্তু আজ যে-নৃতন আমাদেরই জীবন মথিয়া উদ্ভূত হইতেছে তাহাকে শাস্ত জীবন ধারায় মতই নিমজ্জিত করিব, ততই তাহার যুগলপটী প্রকট হইয়া উঠিবে; নৃতন যদি পুরাতনের প্রতিজ্ঞা হয়

তাহা হইলে সে-নূতন স্বপ্নদ্বারা—বাস্তব জীবন-বাহনর অভাবে সে নূতন নবগুণের দৃঢ়ভিত্তি গড়িবে না। পুরাতনের পীড়নে নূতনকে পুরাতনের প্রতি-ধ্বনীরূপেই অস্থায়িত হইতে হয়, ইহাই যেন প্রকৃতির নীতি, ভারতের বহিজীবনপ্রকৃতিও তাহাকে এইরূপে চালাইয়া চলিতেছে, কিন্তু নূতন আসে সকলকে নুতন করিয়া তুলিতে—আমাদের মঞ্চ-কাষে যে নিতুই-নব মহাভারত অঙ্কুরিয়া আছে, তাহার প্রতি-প্রতীকরূপে বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত, ইহাই তাহার সনাতনত্ব—সে কোন যুগের পত্তন করে না যখন মানবের অন্তরকোষে রসের সিঞ্জন “নূতনের” আবির্ভাব না হয়! তখন এই নূতন ও সনাতনের প্রভেদ—তরঙ্গ ও সিলনের প্রভেদের দ্বারা অসাম্যর অখণ্ড প্রকৃত।

সনাতনের সহিত অঙ্গাঙ্গী সঞ্চয়ক হইয়া নব-তরঙ্গহিলোলে মানবের অন্তরকণ্ঠে যে নূতন ধারা নামিয়া আসে তাহাকে অবশ্যে পরিচালিত করাই নূতনের আবাহন, এ কার্যে ভারতের বহিজীবন প্রতিগুণে বন্ধনময়ী সঙ্গী করিয়াছে; বৈদিক আশ্রমের আশ্রয় সাধনায় মানবে যে মহামানবের জন্ম হয় তাহা বোধহয় ভারতকুমি ভুলিয়া যায়! সাধারণ দৃষ্টি-প্রবাহে তাহা আশ্রয় রাজ্যে অঙ্গুর ছিল, কিন্তু বহিঃরাজ্যে তাহাকে কি বর্ণে, কি আশ্রমে, কি রাষ্ট্রে, কি বাণিজ্যে কিছুতেই বেশ ফুটাইয়া তুলে নাই। ভারত-সভ্যতার অস্থলীনধারা ইহার ক্ষীণ সত্তা মানিয়া লইয়াছে, কিন্তু ইহাকে মানিয়া লইয়াই নিজের মধ্যে এমন এক সনাতনের রেখা আঁকিয়া গিয়াছে যে সে কিছুতেই তাহার ধারায় নব ধারার উদ্ভব সম্ভাবন দেখে না! কোন নব-ধারায় সে

আশ্রয় করিতে সক্ষম হয় নাই, একান্ত অন্ধ, কামা, অনাধা জীবনধারাগুলিকে সে আশ্রয় দিয়াছে সত্য, কিন্তু নিম্ন ধারায় নব নব উৎসপ্রবাহে সে পরিপূর্ণ হয় নাই। এইরূপে সে অচল আয়তনে পরিণত হইয়াছে। তাহার এই পাহাড়-প্রমাণ পরিণতি অর্থাৎ বর্তমান “সনাতনের” মূলে কঠোরপাথর করিতে সত্য সনাতন নূতন প্রবাহে নামিয়া আসিতেছে—এই অবতরণে অবগাহন করিবার শক্তি যাহাদের জন্মিয়াছে তাহারা ই নূতনের আবাহন করিবে। কিন্তু এখানেও সাবধানতা চাই।

যাহা আসিতেছে, ধ্বংসের দ্বারা তাহা মথকে অবধারণ করিব, নবীন তরঙ্গে বাহা ফিরালিয়া উঠিতেছে তাহা নবজীবনের হিলোলে দিয়াই চুমিয়া লইব—কিন্তু নবজীবন কি? মানবের নিতুই-নব অবস্থা কল্পনাতে অর্জন করিতে পারি, হাসি-কালা-ভরা মুগ্ধস্বপ্নময় অন্তরকণ্ঠে নিতুই-নব আনন্দ-হিলোলে আরোপ করায় মানবের তৃপ্তি আছে, কিন্তু তাহা পাইতে হইলে সমগ্র মানবসাম্রাজ্যকে বিধাতা যে বীজ-সমুদ্রের বন্ধনে বধিয়া লিখাচ্ছেন তাহার সন্ধান করিতে হইবে। বিধাতার একটা সঙ্কেত মানবজাতি এক হইয়া আছে—মানবাত্মায় আনন্দের হিলোলে তুলিয়া যে মহাধারা সঞ্চিত হয়, তাহার প্রকৃতি বৈজ্ঞানিক, তাহাতে মানবে মানবে দ্বন্দ্ব নাই, পার্থক্য নাই, সকল মানবই তথায় মহাপ্রেমে আবদ্ধ, ভাগবত প্রেমের পরিপূরণে তাহারা প্রতি জন এক একটা হিলোলে তুলিয়া মহাপ্রেমেই নিমগ্ন হইতেছে—এই যে নির্যম্য মহাপ্রীতির অবস্থা, এই অবস্থাতিকে ভিতরে ও বাহিরে মুগ্ধপ্রতিভা করিয়া তবে মানুষ যুগের-মানুষ হয়, তবেই মানুষ নবগুণের প্রতিষ্ঠায় আশ্রয়যোগ্য করে, তৎপূর্বে একটা প্রতীক আসে—তাহাই আবাহনের গুণ।

কিন্তু এ-নূতন নূতন জীবনপ্রকাশ-নয়, এগুণে যাহারা মানবকল্যাণে উদ্বুদ্ধ তাহারা ইহার পূর্ণাভায় অবগত হন; ভারতবর্ষ যেন দেশ নহে, ভারতবর্ষ মানবকল্যাণসাধনার প্রতিশব্দ মাত্র, এই ভারতও অস্তর দিয়া কল্যাণ-যুগের আভাস অবগত হয়, কল্যাণ-রূপের অন্ধুর বহন করিয়া সাধন-ভারত আজ পর্য্যন্ত জাগিয়া আছে—কিন্তু প্রবাহের দ্বারা সে ভারত চলিয়াছে, কিন্তু যথায় ভারতবর্ষ দেশ, যথায় ভারতবর্ষ আধা-অনাধা, হিন্দু-মুসলমান, শাসক-শাসিত, যেখানে সে চলিয়াছে একটা অতৃপ্ত বাসনা লইয়া, অতৃপ্তির তারে রেখা টানিয়া, সে ভারতের বহিঃরাজ্যে একটা ক্রমের পরে আর একটা ক্রম গড়িতে চাহিতেছে, পূর্ণ ক্রম পর ক্রমের বাধ্যস্বরূপ হইয়া তাহাকে বিস্কৃত করিয়া তুলিতেছে, তথাপি তাহাকে চলিতে হইতেছে।

ভারতের এই বাহিরের চলনভঙ্গী একেবারে পুরাইয়া দিতে হইবে। বাহিরে ভারতবর্ষ চলে ভেদ রাগিয়া, বাহিরে তাহাকে সামঞ্জস্য করিতে হয়, বোধহয় সামঞ্জস্য ও সে তাগ করিয়াছে—বর্ষসঙ্করের ভয়ে সে কোনরূপ জাতিগত সামঞ্জস্য মূখ ফিরাইয়াছে। তাহার অন্তর সাধনায় ভারতের গুণগান, এমন কি ভেদে আশ্রয় সাধনার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাভিগে যে অর্পণ করিবে, কিন্তু সে বাহির দিয়া চলিতেছে নিজ নিজ বিভক্ত জীবনের ক্ষীণ রেখা লইয়া! মানুষ বোধহয় মরিতে চাহিলেও ভিতরের অন্তরাঙ্গী তাহাকে মরিতে দেয় না, তাই অলংকার ব্যবস্থাগুলি জীবনের একান্ত পরিপন্থী হইলে কলার জজ সে কোনরূপে নূতন ব্যবস্থা করিয়া লইতেছে—ইহাই আবার এক একটা যুগ হইয়া পাড়ায়, ইহাই আবার নূতনের আসন অলংকৃত করে!

কিন্তু এ-নূতন নূতন জীবনপ্রকাশ-নয়, এগুণে মানবপ্রেমের প্রেমাঙ্কুরের নবগুণ নয়! ইহাই হইতেছে কথা—আমরা এই কথাই বলিতে চাহিতেছি। আমাদের সকল কথাই ভারতের ত্রিশকোটি নরনারী লইয়া আরম্ভ হইয়াছে, ত্রিভুজাকৃতি ভারত-দেশের কথা—স্বরণ করিয়াই আমরা প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি। আমরা বলি, এই ভারতে মহামিলনের যে রাস-রহস্ত ভারত-সাধনায় উন্মীত হইয়াছে, তাহারই মূর্খন দরিয়া বহির্ভারত কেন গড়িয়া উঠবে না! আনন্দ ও মিলনই হইবে ভারতের বহিঃসাধনা, এখানে সামঞ্জস্য আদিত পারে, কিন্তু ভেদের এখানে স্থান নাই। আর ভারতবর্ষে মিলনের মজ্জা যে বড় প্রবল ভাবেই প্রজ্জ্বলিত হইবে। আধা-অনাধা, হিন্দু-মুসলমান, শাসক-শাসিত এমন প্রবল ভেদ আর কোথায় বর্তমান—ভেদই যদি ভারতের সনাতন অবস্থা হইত, আশ্রয়ভাব যদি ভারতের অন্তরের কথা হইত, তাহা হইলে কেবল শুভেচ্ছা লইয়াই আমরা কারো অগ্রসর হইতাম! কিন্তু প্রেম, আনন্দ ও মিলনই ভারতের সম্পত্তি, তাহার অন্তরের কথা, মানব বলিতে, মানবাত্মা বলিতে ভারতবর্ষ ইহাই বুকে, অন্তরবে সেই ভারতের বাহিরে আমরা এই ভারতীয় ধারার প্রবাহই প্রবাহিত করিব। ভারতের সাধন-কাষে অগতঃ যে আনন্দময় মানব লুকাইয়া আছে, তাহাকেই জাগাইতে—যে কাঙ্গা তাহাকে আমরা নূতনের আবাহন বলিব। আর একগুণ জাগ্রত মানব যদি শ্রীরামরূক্ষ প্রকৃতির দ্বারা যুগের কর্ণে তাহার বাণী-স্বাধা বর্ণন করেন, তাহা হইলে যুগে যুগে মানব-প্রেমের পথেই অগ্রসর হইবে।

ভারতের বর্ণে-বর্ণে আধা-অনাধা হিন্দু-মুসলমানে গামক-শাসিতে এক প্রেমময় মহামিলন ও মহা-

মিশ্রণের দ্ব্যোতনায় উদ্ভাসিত হইয়া আমরা এই নৃতনের আবাহন তখন নৃতনকে বরণ করিয়া নৃতন কথা কহিতেছি—ভারের গুহনেই প্রবন্ধ লইবে। নিতুই-নব অবস্থার পূর্ণাভায়ে ভারতপ্রাণ উদ্ভূত ও সজীবিত হউক—এই সজীবনীময়ে নব ভারত গড়িয়া উঠিবে। ভারত-জাতি গঠনের অঙ্কুরোদগম এইরূপেই হইতে উঠে, ভারত আজ মহামিশ্রণের ক্ষেত্র হইবে। পারে।

ধর্মগুরুমণ্ডল

—১০—

প্রবন্ধক আশ্রম—অক্ষয় তৃতীয়ার জাতীয় উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। অত্রস্থ ইহার বিশদ বিবরণ বাহির হইল।

উৎসবের বিশেষত্ব—“ভারতের ধর্মগুরুমণ্ডল।”
রায় বৃতীক্ষনাথ চৌধুরী মেলার উদ্বোধন সভার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, আশ্রম ও তদনুসার কর্মসূচ্যানের অন্তর্মর্মে—তার গভীর চিন্তাশীল মস্তিষ্কে বড় আশার বিদ্যুৎ ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন, তিনি আশ্রমের আশা ও আদর্শের কথা লইয়া ক্ষয়গ্রাস্ত হইয়া সত্যকেই মুক্ত করিয়াছিলেন, তারপর মনোবী বিশদচক্র, ধর্মগুরুমণ্ডলের বিশেষত্ব অধ্যয়ন করিয়া ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দেন, তাহাতে আমরা ধন্ত হইয়াছি—পরিশেষে জগৎরথের ভারতের মুকুটধীন সম্রাট মহাশ্বা আশ্রমের বৈশিষ্ট্য ও বাবদ্য দর্শনে যে বাণী উচ্চারণ করেন, তাহাতেই আমরা সার্থক হইয়াছি—ইহা ভাগবত আশীর্ষচক্রের মতই আমাদের অন্তর ও বাহির উৎসাহে ও নবপ্রেরণায় উদ্ভূত করিয়াছে।

ধর্মগুরুমণ্ডলের পরিচয়, ভারতের স্বরূপ পরি-

চয়—যে পরিচয়ে ভারতবর্ষে আশ্রম, যে পরিচয়ে সত্যভারত মুক্ত জাগ্রত মূর্তিতে হৃদয় অধিকার করে, সে পরিচয় প্রত্যেক ভারতমস্তানের চক্ষে ভাষার রূপে আগাইয়া রাখার দরকার, ভারতের ধর্মগুরুমণ্ডল তাই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার তৎপক্ষেত্বরূপে, সয়দিন প্রদর্শনী বহু নরনারীর চক্ষে তীর্থস্থানরূপে পূজিত হইয়াছিল।

গৃহমণ্ডলের মধ্যস্থলে আশ্রমবালকগণের সমতা-মাথান স্তুমুখ মন্দির। তাহাদের হাতে গড়া উচ্চ-চতুর্বিম্বিত এই দেবমন্দির—দর্শকের চিত্তে সুপথং তত্ত্বি ও হর্বের স্ফূর্তি করিয়াছে। মন্দিরশীর্ষে রক্ত-পতাকা নিরন্তর ছলিয়া ছলিয়া যাত্রীদের সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়াছে। আশ্রমগণের মালা, কদলীতরুবোজিত হৃদয়জিত মন্দিরে, বিচিত্র সিংহাসনে মাতৃমূর্তি অদ্বিতীয়, পদতলে পূর্ণঘট—সশীঘ্র নারিকেল ও আম্রাণা সহকারে কল্যাণহুতক দৃশ্য, ধূপ ধূনা চন্দনকাঠের গুড়া ধূনাটির আগুন পুড়িয়া পুড়িয়া সৌগন্ধে স্থানটি নিরন্তর আমোদিত করিয়াছিল—মহামূর্তির অহরূপ জামাশী—ভারতলক্ষী

চতুর্হস্তে শিখা-দীপা-অন্ন-বস্তু লইয়া অবতীর্ণ, এই আমাদের মা, এই তেত্রিশকোটি নরনারীর জননী-মূর্তি—হাতে শাখা, রক্তাক্তের মালা, পরিধানে পৈরিকবসন, এলায়িতকুন্তলা, পদতলে বিকশিত কমলদল শোভা পাইতেছে—নবদীক্ষিত সন্তানদের, নির্দোষময়ে উদ্ভূত সাদকদের অভীষ্ট ইষ্টমূর্তি,—মাযের অপকল্প শোভায় আশ্বহারা না হইয়াছে এমন একজনও দেখি নাই।

মাতৃমন্দির প্রদক্ষিণ করিতে গিয়াই চক্ষে পড়ে আনন্দময়ের স্থলি বহিমচন্দ্রের স্বপ্নচিত্র “মা যা হইয়াছেন” —নরকঙ্কালমালাপারিতীক্ষী, কুখিরপানোমাত্রা, খেটক-পূর্ণ-করে শবাসনে তাথিয়া তাথিয়া নৃত-পরায়ণা, রূপাঙ্গী মাতৃমূর্তি, ছিন্ন-পাণিপরিহাতি— কক্ষকেশভার এলাইয়া কি বিকট দৃশ্য—পদতলে নর-কপাল বিক্ষিপ্ত, পুত্র-পুণ্ড্রহীন গ্রাণ্যে বৃক্ষমূলে মাযের এই লীভৎস দৃশ্য দর্শকের চক্ষু চিরিয়া অশ্রু বাহির করিয়াছিল।

তারপর—ভারতের ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র। পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে—পাক্জন্তুশব্দ মূৎকারে ধর্ম-রাশা স্থাপনের শিখময় যিনি প্রচার করিয়াছিলেন, সেই জগৎগুরু শ্রীকৃষ্ণ, মানবপ্রতিনিধি পার্শ্বের সারথি রূপে অসংখ্য রথরথীপরিবেষ্টিত হইয়া, বণকোলাহলের মধ্যেই সনাতন ধর্ম প্রচার করিতেছেন।

সে দ্বন্দ্বের নিগূঢ় মর্ম্ম আজ পর্যন্ত মনোবীমণ্ডলী



ভারতমাতা

কত ভাবেই না ব্যাখ্যা করিয়াছেন, মাযের স্বভাব ও প্রকৃতি অস্বাভাবী গীতার মধ্যার্থী নানা ভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে, ধর্ম—সর্বদ্বন্দ্বের আশ্রয়, জাতি, বর্ণ, সমাজ, ব্যক্তি যে ধর্মমূলে সার্থক হইয়া, গীতার ধর্ম সেই বিরাট, মহানুসনাতন ধর্ম, গীতা সকল দেশ, সকল জাতি, সকল ধর্মীর পূজ্য, জাতিবর্ষের সংস্কারশূন্য প্রতি মানবের সাধনতত্ত্ব ইহার মধ্যে নিহিত, কোন-রূপ সাম্প্রদায়িকতা ও কোন বিশিষ্ট দেশের ও কালের মধ্যেই ইহা আবদ্ধ নহে, সর্ব দেশ ও সর্ব কালের লোকদিগের অর্থাৎ জীবনোন্নতির নিদেশ গীতাই দিয়াছে, চরিত্রনি হার মহিমা অক্ষয় থাকিবে, মানবজাতি দ্ব্যতী জন, সত্য ও প্রেম উদার দৃষ্টি



‘মা বা হইয়াছেন।’

লাভ করিবে, গীতার ধর্ম ততই সার্বভৌমরূপে ধর্মনির্দেশে সকলের হৃদয় অধিকার করিবে। গীতা কোন ধর্মবিশেষের রীতিনীতির নির্দেশ দেয় নাই, মানবচরিত্রের ঐক্যমূলক শোধনের ব্যবস্থা দিয়াছে—ভারতের ধর্মসমষ্টিকারী এই মহাবাণী প্রচারের তীর্থক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র হইতেই পর পর ধর্ম-সাধনার জলস্র ইতিহাস প্রদর্শিত হইয়াছে।

কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মীয় পাথকে জ্ঞানভক্তি-কণ্ঠের শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গ শেষ করিয়া, অবশেষে গুহ্যতম যে সাধনার মহোত্তর দিলেন, মাত্র সেই মহাবাণী সাধন করিতে পারিলেই জীব দজ হয়, সেই অমলা সিদ্ধান্ত—

‘মননা ভব মল্লকো মদ্যাকী মাং মমস্তুক।

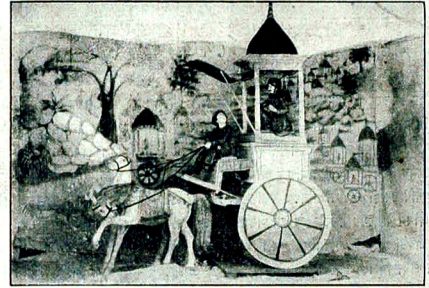
মামেবৈজ্ঞানি সত্যং তে প্রতিজ্ঞানো প্রিযোহসি মে।’

সর্বদখ্যান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং হ্যং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।

ভবিষ্যৎ ভারতের মুক্তসাধনার আলোষা এই মহোত্তরম্পষ্ট হইয়া উঠিল, এই বাণীর স্বভাবই নানাভাব, দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈতজ্ঞানের মনো পরিপূর্ণ হইয়া, বাংলার দক্ষিণেখরে বঙ্গতর হইয়া উঠিল, এই মায়া ভজনের অধিনির্দেশ পালন করিয়াই অজ্ঞানের মোহ দূর হইল, দক্ষিণেখরে স্বামীস্বির কণ্ঠে সিংহনাদ ঘণ্টিয়া উঠিল, এই বাণীর প্রতি-ধ্বনিই চণ্ডীদাসের কণ্ঠে মধুর গুরে স্বাক্ষর তুলিয়াছিল।

উহা আত্মসমর্পণের নিদেশ। মায়াসের অহমিকাই আড়াল করিয়া সত্যের বিজ্ঞানবীণা প্রকাশে বাগ দেয়, সাধনার পামাণ ঘণ্টা সে অহমিকা দূর হইলে



কুরুক্ষেত্র।

স্বরূপ দর্শন হয়। এই অহং শুধু ভাবসাধনায় নিশেষ হয় না, সর্বাংকরণে তন্ময় হইতে হয়, ‘তুচ্ছ তুচ্ছ’ করিয়া ‘অমাকে’ ফরাইয়া কেলিতে হয়—নিজেকে মুছিয়া কেলিতে পারিলেই “মামেবৈজ্ঞানি” অর্থাৎ এই পরম পুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ঈশ্বরপ্রাপ্তির সিদ্ধ মহই শ্রীকৃষ্ণের পাকগুণে বাহিয়াছিল, কল্যাণের সন্ধিক্ষণে এই সর্ব-ধর্ম-বর্জন-কারী—“মামেকং শরণং ব্রজ”—আত্মসমর্পণ বোণা প্রচারিত হইয়াছিল। ভারতের ধর্মসাধনার নূতন ইতিহাস এই স্থান হইতেই আরম্ভ

হইয়াছে, বেদ, উপনিষদ, পুর্ণাণ—ভারতের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে শক্তি, প্রেম ও জ্ঞান তত্ত্বের আলোচনা আছে, বিশ্লেষণ আছে, কিন্তু বঙ্গ ভাষার পদ্ম তেমন স্পষ্ট করিয়া বলা নাই, বিশ্বগুরু শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ জ্ঞতির কর্ণ সাধনার অমোঘ মন্ত্র প্রদান করিয়াছেন, এই পাঁচ হাজার বৎসর ভারতের তপস্বীরা যেই শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞতির কর্ণদার, তিনিই পরমার্থ পথে জাতিকে পরিচালিত করিতেছেন, ধর্মগুরুমণ্ডলের প্রথম চিত্র তাই কুরুক্ষেত্র।

কর্মণঃ

কর্মক্ষেত্র

—*—

অশ্বপতনের চরমে বৃষ্টি আছ ও আমরা পৌঁছিতে পারি নাই, যাত্রা শেষ না হইলে পড়ারের গতি পরিবর্তিত হয় না, পতনের বেগ সামলাইয়া পুনঃপ্রত্যাবর্তনের দৈর্ঘ্য রক্ষা সামান্য জীবনের পরিচয় নয়, অসাধারণ প্রতি ও শক্তি সঞ্চয় করা চাই, এ গুণ সহজ জীবন যাপনের ক্ষেত্রে অর্জন অসম্ভব, তাই বাংলায় একটা অব্যাহত সাধনার স্থান নির্মাণে আমরা এতটা প্রবৃত্তপরি।

যোগ চেতনাকে জাগ্রত রাখে—চেতনাময়ী জীবন বিবেচী ও হিসাবসায়ন হয়, সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব প্রচারে ও পালনে সমর্থ হয় না, অহংকারের পুষ্টি বিধানে নিজেকে যতটা প্রসারিত করিতে পারে, ততটা ছলনাময় উদারো জাতিকে প্রবঞ্চনা করে, জাতীয়তার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হয়, —পতনের যুগে নির্মাণের বাধ তাই দুঃসাধ্য।

বিজ্ঞ জনেরা অশ্বপতন যুগে সৃষ্টির ক্ষেত্র হইতে দূরে অবস্থান করেন, কালের বিরোধ জানিয়া জীবনের প্রয়াসে অপসারিত না হইয়া জীবন-স্রোতকে ধর করে, দান করিয়া দেয়, তবে আত্ম আবার নির্মাণের বাণী দেশের পক্ষাঘাতে বাতাসে মুখরিত কেন? কালপ্রবাহের কি মোড় ফিরাইছে?

নির্মাণের ময় আমরা প্রথম উচ্চারণ করিয়াছি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে। আজ ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ, দীর্ঘ একাদশ বর্ষ অব্যাহতভাবে একই স্রবের সাধনে তখনও আছি। বাধা এই এগার বছরের মধ্যে কোন দিনই প্রসঙ্গ স্মৃতিতে আমাদের আশাস দেয় নাই, নির্মাণের পথ যত বিস্তৃত করার আয়োজন করি; বিরুদ্ধ শক্তি

নিঃসঙ্গ হস্তে ততই অন্তরায়ের আবর্জনা নিক্ষেপ করে—কাল্পনিক বাস্তব জীবনে নিরন্তর সাগ্রাম করিয়াছে, ভবিষ্যতেও করিবে। নির্মাণ যে আদর্শ, অঙ্গের নিকট ইহা কল্পনা, আমাদের নিকট সত্য সত্তময়, তাই প্রাণের কবিতা দিয়া নয়, অস্ত্র প্রাণের দ্বারা চালিয়া এই পথে যাত্রা করিয়াছি।

এই নির্মাণের মূল কথা ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের “প্রবর্তকের” অস্থানপথে যাত্রা লেগা হইয়াছিল, তাই এখানে পুনরুদ্ধৃত করি :—

“প্রবর্তক গঠনের সহায়তা করিবে। সে কি? চরিত্র। এই চরিত্র অভাবেই আমরা নীচ হইয়া পড়িয়াছি..... বাঙ্গালী দেবচরিত্র লাভ করিবে। এই চরিত্র সাধনার সামগ্রী, তাই হিন্দুর সর্ব স্বর্গ, ধর্মসাধনার উপর প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুর চরিত্র পূর্ণাঙ্গ। বাঙ্গালীকে এই দেবজন্ম পরিপূর্ণ চরিত্র লাভ করিতে হইবে। বাঙ্গালীর যাত্রা আছে, তাহার উপর দাপ্তরাজী করিয়া কিংবা তাহাকে একটু মাজিয়া ঘষিয়া ঠাণ্ড করাইলে চলিবে না। একে-বারে পুরাতন বিনিময় তুলিয়া ফেলিতে হইবে, সম্পূর্ণ নূতন ভাবে নূতন বিনিময়ের উপর তাহার এই সম্মান চরিত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহা হইলেই বাংলার বিচ্ছিন্ন মহাশক্তি কেন্দ্রগত হইয়া, সমগ্র জগতের মঙ্গল সাধন করিবে।”

প্রচার করাই আমাদের ধর্ম ছিল না, সঙ্গে সঙ্গে ইহা পালন করিতে আমাদের আশাস জীবনকে গড়িয়া তুলে—স্বল্পনের পক্ষে, আত্মগঠনের প্রেরণাই প্রবল হইয়া উঠে, নূতন ভিত্তির উপর জীবন প্রতিষ্ঠার আয়োজনে পুরাতনের বিনিময় সত্য

সত্যই উপভূমি হইয়া উঠিতে হয়। সমাধি ও সংসার জীবন ইহাতে মধ্যস্থিত আঘাত পাইয়াছে, কিন্তু উপায়হীন আমরা, কোন্ তৃতীয় শক্তির হস্তে আত্ম-দান করিয়া আমরা স্বপ্নপুতলিকার মতই চলিয়াছি, চেতনার গুরে সকল ক্ষেত্রের অধিকৃত হীরে বাথায় বাজিলেও, নূতনের প্রেরণা আমাদের উদ্ভাদন করিয়াছে, জাতির বিচ্ছিন্ন শক্তির কেন্দ্রভালে গঠনের মৌলিক প্রেরণা এক মুঠা নরনারীকে যদি সর্বভাষা না করে, তাহা হইলে সত্যের পরিচয় পাইব কি প্রকারে? আজ আমরা সম্পূর্ণ প্রোতাহুরিত, গৃহহীন, সমাজপরিভ্রম—প্রচলিত জাতিধর্মের কমাচার, রক্ষণশীল শক্তির বিরুদ্ধতা, পরাধীন দেশের পথানিই যে প্রভাবের আচ্ছন্ন, তাহা আমাদের এক প্রকার নিরাশ্রয় করিয়াছে। এ দুর্গম পথের যাত্রী “প্রবর্তকের” সাদক, ময়সিক করিতে ঐ উদ্ভের আকাশ যদি চক্ষুতপ করিতে হয়, আর স্রোতধিনী তীরে সারি সারি বৃক্ষমূলে যদি ঘর ঝুঁকিত হয়, তাহার স্রজ প্রস্রুত হও, ক্ষমদের আগুন জ্বালাইতে যে দ্রব সম্যাদৃষ্টি, গঠনের তপস্বী উত্থাপণে যে অগ্নি আশাস-ও-স্বপ্নসাধা তাহা যদি মনে করিয়া থাক, তবে বড় ভুল করিয়াছে, এ পথ হইতে তোমায় ফিরিতে হইবে।

ভারতের এই নির্মাণনীতি—আজ তো আর অস্পষ্ট নয়, কল্পনার বস্তু নয়, “প্রবর্তকের” কৃতিস্রবাহে এগার বৎসর পূর্বে যে অতিথি উল্লম্বমুখি নাই উপস্থিত হইয়াছিলেন—সেই মুষ্টির জীবন্ত দেবতাই তো পাণ্ডাভাজনাম্পন্ন, শক্তিময় ও প্রতিভাশালী নেতৃগুণের সমুদয় অঙ্গ অশ্ব বর্ধন করিয়া, একবিশ দিন নিরশনে, অস্ত্রপ্রেরণাকে জাগ্রত করিয়া, চীরপথ কটিকটে জড়াইয়া, এই অস্বাধ্য নীতির প্রচার তোমার অন্তরে যোগ্য করিতে উপস্থিত—তুমি আজও কি ইহা স্বপ্ন কল্পনার বস্তু বলিয়া নীরবে ত্যাগের প্রত্যাগাচ্ছ করিবে?

“প্রবর্তকের” সাদকদের নিকট ইহা নবদীক্ষা নয়, এই সাধনাই তো তাহাদের জীবনবোধ—তবে স্বল্পনের পক্ষাঘাতে যে দেবচরিত্র গঠনের নির্দেশ বজ্রকণ্ঠে ভগবান দ্রব্য কল্পিত করিয়া ধর্ম তুলিয়াছিলেন, সে বাণী পূরণের প্রয়াসেই এই নির্মাণতত্ত্ব স্বতঃপ্রকাশিত হইবে। নির্মাণের রূপ যেন জীবনকে ঢাকা না দেয়, “প্রবর্তকের” সাধকেরা যেন সৌন্দর্যে সজকলিত রাখে, তাহাদের যেন স্বরণ থাকে—জীবনের মূল প্রেরণা ধরিয়া চলিলেই বাহিরের অভিব্যক্তি হৃদয় ও ছন্দময় হইবে, বাহিরের দিকে জীবনের সব চালিয়া স্রুতগতি লাভের টানে আগাইয়া পড়িলে, আমাদেরও একদিন কর্মক্ষেত্রে পরাজয় স্বীকার করিয়া ঘরে ফিরিতে হইবে—আজ পর্যন্ত “প্রবর্তকের” সাধক কোন ক্ষেত্র হইতেই পূর্ণপ্রদর্শন করে নাই, নির্মাণের ক্ষেত্রে তাহাদের অগ্রগতি পিছু হটিয়া যেন কোন দিন না ফিরে।

বাধাও নীতি আমরা যেন সমুদ্রে রাখিয়াই চলি, বাধার প্রতি উপেক্ষা কোন মতে কর্তব্য নয়। সাগ্রাম যদিও রাষ্ট্রক্ষেত্রে নয়, তবুও একটা প্রবল পুরাতন শক্তি আমাদের বিরুদ্ধে প্রসঙ্গবজ্রগতে উদাত, একথা যেন স্বরণ থাকে—ইহা ছাড়া আমরা যে নীতির উপর প্রতিষ্ঠান গঠনের আয়োজন করিয়াছি তাহাও নিরাপদ নীতি নহে, যদিও এই পতনের যুগে কোন নীতিই বিতর্ক নহে, সর্বের মধ্যেই ক্ষমবীজ লুপ্ত হইয়া আছে, তত্রাত্ত জ্ঞানিয়া শুনিয়াই আমরা উগ্র হলাহল কণ্ঠে ধরিয়া, কর্মক্ষেত্রে আগাইয়া পড়িয়াছি। সে বিষ—আমাদের ক্ষম।

ক্ষম—সৃষ্টির মূল ক্ষম কর, ক্ষমে বাধ্য ও সৌন্দর্য নষ্ট হয়, এই মহাশব্দের বোঝা সাধারণ বহিয়া আমরা মহান সৃষ্টির অস্থান করিয়াছি—পাণ্ডাভোজ এ নীতি রূতকাণ্ড হওয়ার পক্ষে যে একান্তই বিষম জনক এবং আত্মপ্রাণানিকর—ইহা অবদারিত, কিন্তু আমা-

দের দেশে কর্তব্যের সমান হইলেও, এ তার যে কেহে চাপ দেয়, কর্মী সে কেহে বাস করে না—ইহাই সাংলোর একমাত্র আশা—ইহাই যৌগিকজীবন। প্রাণ বাহিরের চাপে শতধারে বিকীর্ণ হয়, যোগের লক্ষণ এই পরীকার আঙুনেই প্রকাশ পাইবে, স্বামী-জির মত, আমাদের কণ্ঠেও এই বাণী সর্বদা উচ্চারিত হয়, ভারতের কার্য অর্থদমনায় কোন দিন বিপর্য হইবে না। অর্থ আদানের জগতের চক্রে ধ্যেয় করিতে পারে, অর্থের গুরুতাপে আমরা নিরাশ্রয় হইতে পারি, দারিদ্র্যের কথাবাতে বিপর্য হইতে পারি, কিন্তু চরিত্র তো অবস্থার অধস্তন নয়, যে চরিত্র “প্রবর্তকের” তীর্থে গঠনের ব্যবস্থা, সে চরিত্র, স্বরূপের চরিত্র—তদা যে কোনও কারণে ক্ষয় হয় না, নিন্দায় প্রশংসায়, সাঙ্কল্যে অভাবে, সকল কালে, সকল অবস্থায় তার পরিচ্ছন্ন মুক্তি মান হইবে না। আজ যে নিন্দ্যাবের বেনী গড়িয়া উঠিয়াছে, কাল বিরুদ্ধ হওয়ায় তাহা ভাঙিতে পারে, চরিত্রবল তো টুটিবে না, সেই অমোঘ অটল চরিত্রের উপর ভর করিয়া, আরও নিম্ন শত সহস্র কর্মবৈদী গড়িয়া উঠিবে। “প্রবর্তকের” সাধক যেন এই পরমাভ্যন্তানে প্রবৃত্ত হইয়া, উজ্জমণী চেতনার স্তরে জীবনকে উড়াইয়া, নিন্দ্যাবের কুরুক্ষেত্রে সতত পশ্চাদগম্য হতে উত্তর যেন। নিন্দ্যাবের বীজ জন্মে দারুণ করিয়া কোথাও যেন আঘাত পাইয়া পরনিন্দ্য পদের অনিষ্ট সাধনের বাক্য, কর্ম, চিন্তা পথ্য প্রশ্রয় না পায়, অহিস নীতির পরম সাধনা—“প্রবর্তক” সাধকের যে সিদ্ধ সম্পদ—আমাদের এই বংশের মহা সন্ধিসুগুণ, নিন্দ্যাবের স্বমিগলী গঠনের উদ্যোগপূর্ণ দাক্ষণ্য দুরবস্থাও যেন চরিত্রবলকে বিন্দুমাত্র অবনত না করে।

জাতীয়তার ক্ষেত্রে জীবনের সর্বাঙ্গ পুষ্টি বিধানের ব্যবস্থা করিতে গিয়া সকল দিকেই আমাদের হস্ত প্রসারিত হইয়াছে। “প্রবর্তক” সাধক

জাতি বিচার ছাড়িয়াছে, সমাজিক সৃষ্টির নামে বিশৃঙ্খলা আনয়নের ভয় নহে, পরন্তু গুণকণ্ঠে চতুর্-বর্ষ প্রতিষ্ঠার মহান উদ্দেশ্য ইহার মধ্যে নিহিত আছে। নারীজীবন সর্বাঙ্গীন মুক্তি লাভ করিয়া, জাতির কর্মক্ষেত্রে যাহাতে যথার্থ সাহায্যকারীণী মহাশক্তিরূপে দাঁড়াইতে পারে, সে আয়োজনও আমরা অব্যাহত। কৃষি, শিল্প, বস্ত্রবন্দন, শিকায়, সাধনায় আত্মদানের সমারোহ—ইহার মধ্যে বিরুদ্ধতা-স্বজনের কুটিল নীতি সহজেই অনিষ্ট সাধনের প্রয়াস করিবে, আমরা যেন কোথাও বিচলিত না হই, সর্বাঙ্গস্থ দ্বির ও তৃত্ব মস্তিষ্কে বরণ করিয়া, আমাদের মৌলিক ভ্রাতৃত্বাবের একাবদীতে জীবন-সমষ্টির অধিকতর অভিব্যক্তি প্রকাশে কোথাও যেন সঙ্কচিত না হই। অন্যাহারে যেন মেরুপরে নিকং-সাধের অক্ষকার সঞ্চারিত না হয়, নিন্দ্যাব অপ্রশংসায় প্রাণ যেন অবসাদে ভাঙিয়া না পড়ে, সাময়িক দুর্বোধ্য ও নৈরাস্ত্রের যোবাবরণে মনের বল অটু থাকে, সৃষ্টির প্রাণবর্ধ যেন হ্রাস না হয়।

ইহার রূঢ়ী কোথাও ঘনি হয়, সেও ত কল্যাণের হেতু, কেননা যুক্ত জীবনের ক্ষেত্র না হইলে, পরীকার অগ্নি-উত্তাপে তাহা বেত ন হইবেই, স্বজনের হৃৎচাপ্র মেয়ী বহুই বাচ্ পড়ে, ভবিষ্যতের অক্ষত সৃষ্টির পক্ষে ততই সুবিধা। আজ যেন রাস্তিতে হইবে, আমরা এই দীর্ঘ একাদশ বর্ষ নিজেদের স্বজন করার যোগ্য করিয়া তুলিতেই সাধনা করিয়াছি, নিন্দ্যাবের প্রথম প্রস্তর এখনও পাতিত করা হয় নাই, বহুদিন পর্য্যন্ত সমষ্টি শক্তি নিরাময় না হইবে, বহুদিন পর্য্যন্ত কামনার কথা মাত্র আমাদের আধারে বর্ধমান থাকিবে, বহুদিন অহমিকার ছায়া পর্য্যন্ত অবিদ্যায় না বাইবে, ততদিন আমরা দ্বিবা নিন্দ্যাবে অস্বিকারী হইব না, বাহারা “প্রবর্তক” সাধনা গ্রহণ করিয়া এই দীর্ঘ একাদশ বর্ষ স্তম্ভে জুগে, নিদ্যাভনে, যশ

অপবন, নিন্দ্যাব প্রশংসা মাধ্যম বহন করিয়া, অস্বাস-চরণে এক সঙ্গে চলিয়াছে, যুগান্তের আর অত্যন্তকাল অটল পদভরে সকল অনর্থ বহিয়া তাহার যে স্থির থাকিবে, সে বিষয়ে আমরা নিঃসংশয়।

কাজের সূচনায়ুগে নব প্রেরণায় আমরা উদ্বুদ্ধ—

দাম তোমাদের সম্মুখে।

নির্মাণ-যজ্ঞ

দুর্দায়ক ও প্রকাশ-বিভাগ

—:—

অসহযোগ আন্দোলনে জাতীয়শক্তি গ্রহণ মানসে, ১৯২০ গ্রীষ্মকে দলে দলে স্থল কলেজ পরিত্যাগ করিয়া ছাত্রেরা বাহির হইয়া গেল। তাহাদের মধ্যে অনেকেরই বাহিরে ভেদন শিকার সুব্যবস্থা না পাইয়া, কিছুদিন পরে আবার বিদ্যালয়ে পুনঃপ্রত্যাবর্তন করে। বেকার হইয়া ঘুরিয়া বেড়ান অপেক্ষা ইহা শ্রেয়ঃকর। শিকার প্রয়োজন শেষ হয় নাই, কোনদিন হইবে না, জাতীয়শিকার অচুচানওলি এই অবস্থায় শৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত করাও দুঃসাধ্য—কাজেই শিকার বর্ধমান ব্যবস্থাকে আমরা সীকার করিয়া চলিতেই হইবে।

তবে দেশের কাজে আত্মদান করার মত বয়স ও তৎপারযোগী শক্তি যাহাদের হইয়াছে; এবং সে চরিত্রবলও বাহিরে লাভ করিয়াছে, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। এইরূপ একদল ছাত্র আমাদের আশ্রমে সে-দিন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, ইহা দেশের চাপ্তয়া বলিয়াই, আমাদের সাধাতীত হইলেও, আমরা

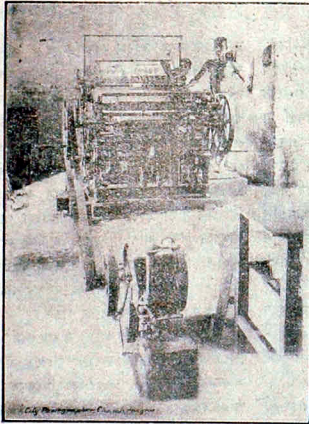
তাহাদিগকে বরণ করিয়া লইয়াছিলাম। আমাদের আশ্রমে সাধারণ শিকার অপেক্ষা সাধনার মর্ম্মকথা লইয়াই অধিক আলোচনা হয়, এতদ্ব্যতীত তাত্ত্বশাস্ত্র তখন বস্ত্রবন্দন শিকার সুযোগ ছিল—প্রকৃতিভেদে কেহ কেহ তাঁতের কাজ শিকায় প্রবৃত্ত হয়, কেহ কেহ বা সম্ভের অধ্যাত্মসাধনার জীবন চালিয়া দেয়। ছাত্রগণ প্রথম মনে করিয়াছিল, তাহাদের বাড়ী হইতে খোরাকীর টাকা পাইবে, আমরাও এইরূপ আশা পাইয়াছিলাম, কিন্তু কার্যতঃ তাহা ডাড়াইল না, ছাত্রদের সকল ভারই ধীরে ধীরে আমাদের বহন করিতে হইল, এই অবস্থায় আমাদের কার্যক্ষেত্রে বিস্তৃত আকার ধারণ করিল।

তাত্ত্বশাস্ত্র, কাঠের কাজে, সংবাদ পত্র, ক্রু-ক্ষেত্রে এবং চাপাখানায় ছাত্রেরা যাহাতে জীবিকা স্বতন্ত্র। এইরূপ একদল ছাত্র আমাদের আশ্রমে সে-দিন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, ইহা দেশের চাপ্তয়া বলিয়াই, আমাদের সাধাতীত হইলেও, আমরা

ছাত্রদের যোগ্যতার পরিচয়।

দেশে শিক্ষাদিগ্গার ক্ষেত্রগুলি আজ এমন ভাবে গড়িয়া তোলার প্রয়োজন হইয়াছে, যেখানে চরিত্রবান যুবকেরা ভরপোষাঘর্ষের সুযোগ পায় এবং স্বচ্ছন্দচিত্তে সাধনায় আত্মস্থ হইতে পারে, আমাদের আশ্রমের ইহাই বিশেষত্ব।

নানা অপ্রত্যাশিত ঘটনায় আমরা বিপর্য হইলেও, জাতির নেতৃবৃন্দের প্রতি আমাদের এই নিবেদন— যে সকল তরুণ দেশের কাজে আত্মদান করিতে পারে, তাহাদের জীবনসাধনায় সাহায্য করার মত নীতিসম্বন্ধে শিক্ষাদান করার বহু আশ্রম আজ গঠন করার দিকে যেন তাঁরা দৃষ্টি দেন। কেননা আমরা দেখিয়াছি—পাশ্চাত্য প্রথায শিক্ষালাভ

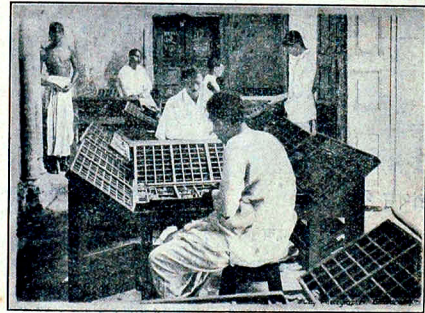


করিলেও, অন্ততঃ যাহাদের চরিত্রে তপস্বী আছে, উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে ও সংকল্প সাধনের সত্ত্ব আছে, তাহানিগকে প্রাচীন ভারতের উপযোগী গুরুগৃহে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা যদি না হয়, কর্মক্ষেত্রে অসঙ্গত বিষয়ে এই সকল তরুণ উপযোগী হইলেও—বাধ্য ও প্রলোভনের হস্ত হইতেইহার সকলেই যে নিষ্কৃতি পাইবে, এ আশা আমাদের অভিজ্ঞতায় চূরশ্য। বলিয়াই মনে হয়। কষ্ট্র ও যশাকাজ্ঞায় উদ্বেগুসিক্তির মূল কঠোরাবাস্য না করার মত সংঘ ও সত্যতা—বিনা অন্তঃসাধনায় অঙ্কিত হয় না। যদিও এই অন্তঃসাধনার ক্ষেত্র নির্মাণ করিব বলিলেই যে হইবে তাহা নহে, তবে ইহা যে জাতীয়জীবনগঠনের পক্ষে অনিবার্য্য ব্যবস্থা, একথা অস্বীকার করিয়া চলিলে আমরা বার বার কর্মক্ষেত্রে বাধা হইয়া, সমদিক অবদানভারে ভাসিয়া পড়িব।

“প্রবর্তক-আশ্রমের” আজ একটা বড় কর্মপ্রতিষ্ঠান — বাধ্য হইয়া কলিকাতায় প্রেরণ করিতে হইয়াছে। আমরা প্রায় শতজন সাধকের জীবন-যাত্রার উপযোগী কর্মক্ষেত্রে স্থাপি করিয়াছিলাম, আমাদের উদ্দেশ্য— একমুষ্টি অন্ন যোগ্যপাঙ্কিত অর্থে সংগ্রহ করিয়া, প্রত্যেক সাধক পরমাত্র সাধনায় আত্মনিয়োগ করিবে, এই আদর্শসিক্তির মানসেই, আমরা নানাবিধ কর্মপ্রতিষ্ঠান গড়ি, আমাদের প্রেসে অন্যান্য ২৪জন ছাত্রসংকুলানের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

“প্রবর্তকের” উপর রাজশক্তির কুদৃষ্টি পড়ায়, ‘প্রবর্তকের’ সঙ্গে প্রেসের অধিকাংশভাগই কলিকাতায় স্থান-

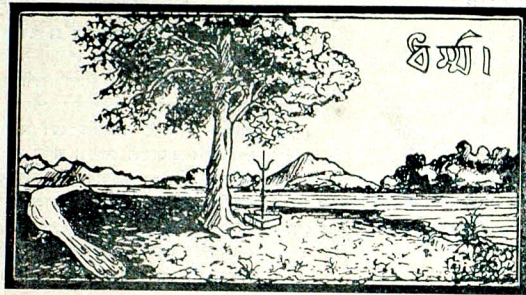
স্থাপিত করা হইয়াছে। এই প্রেসে—অসহযোগী ছাত্রেরা এই দীর্ঘ চার বৎসর সর্বতোভাবে ইহার পরিচালনভার গ্রহণ করিয়াছিল, কম্পোজিটারী হইতে প্রেস চালনা কার্য্য পর্য্যন্ত স্বচাুরুপে সম্পন্ন করার শিক্ষা ইহারায় আশ্রয় করিয়াছিল, এই প্রেস হইতেই সাপ্তাহিক ‘নবমঙ্গল’, ‘ইংরাজী নবমঙ্গল’, ‘মাসিক প্রবর্তক’ বাহির হইত, এই সংবাদ পত্র পরিচালনের জন্ত আমরা সাধারণ শ্রমিক রাখি নাই, ছাত্রদের হাতেই সকল কাজ নির্ভর করা হইয়াছিল। নিজে প্রেসের কাজে ছাত্রদের আত্মনিয়োগের চিত্র দেখা হইল।



শিক্ষা সমাপনান্তে অনেকেই স্বাধীনভাবে কার্য্য করিয়া জীবিকানির্মাণ করিতেছে, তাঁতশালা হইতে অন্যান্য ৩০জন ছাত্র স্বাধীন উপজীবিকা অর্জনে সক্ষম

হইয়াছে। কৃত্তবদীয়ায় আমাদের যে শুদ্ধ বাদি প্রস্তুতের ক্ষেত্র নির্মাণ করা হইয়াছে—তাহাতে এখানকার তাঁতশালার কাজে বিশেষ পারদর্শী ছাত্রই যোগদান করিয়াছে। কলিকাতার প্রেসও এই ছাত্রগণের দায়িত্বেই পরিচালিত হয়। স্বাবলম্বী হওয়ার সাধনায় ছাত্রগণ যোগ্যতা অর্জন করিতে পারিয়াছে বলিয়া আমরা কৃত্তান্ত ও ভগবানকে ধন্যবাদ দিই। বাংলায় চরিত্রগঠনের বহু কেন্দ্র স্থাপিত হউক—ইহাই আমাদের প্রার্থনা। সকল কেন্দ্রেই যেন সাহসকে স্বাবলম্বী হওয়ার সাধনায় উদ্বুদ্ধ করে, চরিত্রের ইহা বিশেষ গুণ—যে-মাহুষ পরপ্রত্যাশী

সে নৃপসংক—জগতের হাতে কানাকড়ির অপেক্ষা হয়ে যুগ্ম—ইহার জগতের ভারই বৃদ্ধি করে, ভগবান আমাদের স্বাবলম্বী করুন।



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (শ্রীম)*

পঞ্চম ভাগ

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মমহোৎসব

১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দ।

—:—

প্রথম পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে কীর্তনানন্দে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে উত্তরপূর্ণিমা বারাগায়ে গোপীগোষ্ঠ ও স্তবল মিলান কীর্তন শুনিতেছেন। নরেন্দ্রসহ কীর্তন করিতেছেন। আজ রবিবার ২২এ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৫ খৃঃ ১২ই ফাল্গুন ১২৯১, ফাল্গুন শুক্লাষ্টমী। ভক্তেরা তাঁহার জন্ম মহোৎসব করিতেছেন। গত সোমবার ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয় তাঁহার জন্মতিথি গিয়াছে। নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম, ভবনাথ, স্বতন্ত্র, গিরীন্দ্র, বিনোদ, হাজরা, রামলাল, রাম, নৃত্যগোপাল, মণিমল্লিক, গিরি,

দি'তির মহেন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি অনেক ভক্তের সমাগম হইয়াছে। কীর্তন প্রাতঃকাল ৫ইতেই হইতেছে, এখন বেলা ৮টা হইবে। মাঠার আসিয়া শ্রবণ করিলেন। ঠাকুর ইঙ্গিত করিয়া কাছে বসিতে বলিলেন।

কীর্তন শুনিতে শুনিতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের গোচারণে আসিতে দেবী হইতেছে। কোন রাখাল বলিতেছে, মা খশোদা আনিতে দিতেছেন না। বলাই রোক করিয়া বলিতেছে, আমি শিপা বাজিয়ে কানাইকে আনিব; বলায়ের অপাধ পেম।

কীর্তনোয় আবার গাহিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ

[ছাট ১৩৩২]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (শ্রীম)

৮৬

বংশীধ্বনি করিতেছেন। গোপীরা, রাখালেরা, বংশীরব শুনিতেছে, তাহাদের নানা ভাব উদয় হইতেছে।

ঠাকুর বসিয়া ভক্তসঙ্গে কীর্তন শুনিতেছেন। হঠাৎ নরেন্দ্রের দিকে তাঁর দৃষ্টিপাত হইল। নরেন্দ্র কাছেই বসিয়া ছিলেন, ঠাকুর দাঁড়াইয়া সমাদৃশ্ব। নরেন্দ্রের জাহ এক পা দিয়া স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

ঠাকুর লজ্জতিস্থ হইয়া আবার বসিলেন। নরেন্দ্র সভা হইতে উঠিয়া গেলেন। কীর্তন চলিতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বাবুরামকে আশ্রিত বসিলেন — ঘরে কীর আছে, নরেন্দ্রকে দিগে যা।



শ্রীরামকৃষ্ণ

ঠাকুর কি নরেন্দ্রের ভিতর সাক্ষাৎ নারায়ণ দর্শন করিতেছিলেন?

কীর্তনান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘরে আসিয়াছেন ও নরেন্দ্রকে আদর করিয়া নিঠাই খাওয়াইতেছেন। গিরিশের বিবাস, যে ঈশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

গিরিশ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। আপনার সব কার্য শ্রীকৃষ্ণের মত। শ্রীকৃষ্ণ যেমন খশোদার কাছে চং করতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ; শ্রীকৃষ্ণ যে অবতার, নরলীলার

একটি হয়। এদিকে গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ করিতেছিলেন, আর নন্দের কাছে বেখাচ্ছেন, পীড়ে বয়ে নিয়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে।

গিরীশ। বুঝছি; আপনাকে বুঝছি।

জন্মোৎসবে নববস্ত্র পরিধান, ভক্তগণ কর্তৃক সেবা ও সমাদ্রি।

ঠাকুর ছোট ষাটটিতে বসিয়া আছেন। বেলা ১১টা হইবে। রাম প্রভৃতি ভক্তেরা ঠাকুরকে নব বস্ত্র পরাইবেন। ঠাকুর বলিতেছেন—‘না’ ‘না’।

একজন ইংরাজী পড়া লোককে দেখাইয়া বলিতেছেন, উনি কি বলবেন! ভক্তেরা অনেক জিজ্ঞাস্য করিতে ঠাকুর বলিলেন,—‘তোমরা বলছ, পরি।’

ভক্তেরা ঐ ঘরেতেই ঠাকুরের অমাদি আহাষের আয়োজন করিতেছেন। ঠাকুর নরেন্দ্রকে একটু গান গাইতে বলিতেছেন। নরেন্দ্র গান গাইতেছেন।

গান।

নিবিড় আঁধারে মী তোর, চমকে অরুণরাশি।

তাই যোগী ধ্যান ধরে, হ’য়ে গিরিগুহাবাসী।

অনন্ত আঁধার কোলে, মহানির্ঝর হিল্লোলে

জিহ্বাস্তি পরিমল অবিরল যায় ভাসি।

মহাকাল রূপ ধরি, আঁধার বসন পরি

সমাধি মন্দিরে মা গো কে ভূমি গো একা বসি;

অভয় পৃথকমলে প্রেমের বিজয়ী অলে—

চিরম মুগ্ধমণ্ডলে শোভে অটু অটু হাসি।

নরেন্দ্র বাই গাইলেন, ‘সমাধিমন্দিরে মা গো কে ভূমি গো একা বসি!’ অমনি ঠাকুর বাহুশূন্য,

সমাধিস্থ। অনেকক্ষণ পরে সমাধিস্থের পর

ভক্তেরা ঠাকুরকে আঁধারের জগৎ আননে বসাইলেন।

এখনও ভাবের আবেশ রহিয়াছে। ভাত খাইতে-

ছেন, কিন্তু দুই হাতে! ভবনাথকে বলিতেছেন,

‘তুই দে খাইয়ে!’ ভাবের আবেশ রহিয়াছে, তাই

নিজে খাইতে পারিতেছেন না। ভবনাথ তাঁহাকে

খাওয়াইয়া দিতেছেন।

ঠাকুর সামান্য আহাষ করিলেন। আহাষান্তে

রাখ বলিতেছেন, ‘নৃত্যগোপাল পাতে বাবে।’

শ্রীরামকৃষ্ণ। পাতে? পাতে কেন?

রাম। তা আর আপনি বলছেন! আপনার

পাতে বাবে না?

নৃত্যগোপালকে ভাবাবিষ্ট দেখিয়া ঠাকুর তাহাকে

হু এক গ্রাস খাওয়াইয়া দিলেন।

কোন্সপরের ভক্তগণ নৌকা করিয়া এইবার



স্বামী বিবেকানন্দ

আসিয়াছেন। তাঁহারা কীর্জন করিতে করিতে

ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিলেন। কীর্জনাতে তাঁহারা

জলযোগ করিতে বাহিরে গেলেন। নরেন্দ্র

কীর্জনীয়া ঠাকুরের ঘরে বসিয়া আছেন। ঠাকুর

নরেন্দ্র সম্ভ্রতিক্ত বলিতেছেন—‘এদের যেন ভোঙ্গা-

ঠেলা গান। এমন গান হবে যে সকলে নাচবে।’

এই সব গান গাইতে হয়।

গান।

নদে টলমল টলমল করে,

গৌরপ্রসন্নের হিল্লোলে রে!

(নরেন্দ্রের প্রতি) ‘ওর সঙ্গে এইটা বলতে

হয়।

গান।

যাদের হরি বলতে নাম করে

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (শ্রীম)

৮৫

তার, তার ছুভাই এসেছে রে।

যাযা নার খেয়ে প্রেম যাচে

তার, তার ছুভাই এসেছে রে।

যাযা আপনি কেঁদে জগৎ কাঁদায়

তার তার ছুভাই এসেছে রে।

যাযা আপনি মেতে জগৎ মাতায়

তার, তার ছুভাই এসেছে রে।

যাযা আঁচুঙালে কোল দেয়

তার, তার ছুভাই এসেছে রে।

‘আর এটাও গাইতে হয়।

গান।

গৌর নিতাই ভোমরা ছুভাই

পরম দয়াল হে প্রভু।

আমি তাই শুনে এসেছি হে নাথ,

ভোমরা নাকি অঁচুঙালে দাও কোল

কোল দিয়ে বল হরিবোল!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জ্যোৎসবে ভক্তসম্ভাষণে।

এইবার ভক্তেরা প্রসাদ পাইতেছেন। চিড়ে মিষ্টাদি অনেক প্রকার প্রসাদ তাঁহারা পাইয়া তৃপ্তি লাভ করিলেন। ঠাকুর মায়ীকে বলিতেছেন, ‘হৃদয়ের বল নাই? হৃদয়কে বল, বাউলদের ধোতে বলতে।’

শ্রীকৃষ্ণ বিপিন সরকার আসিয়াছেন। ভক্তেরা বলিলেন, ‘এঁর নাম বিপিন সরকার।’ ঠাকুর উদ্বিগ্ন বসিলেন ও বিনীতভাবে বলিলেন, ‘এঁকে আসন দাও। আর পান দাও।’ তাঁহাকে বলিতেছেন, ‘আপনার সঙ্গে কথা কইতে পেলাম না; অনেক জিজ্ঞাস্য

গিরীশকে দেখিয়া ঠাকুর বাবুরামকে বলিলেন,

‘এঁকে একখানা আসন দাও।’ নৃত্যগোপাল মাটিতে বসিয়াছিলেন দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন, ‘ওকেও একখানা আসন দাও।’

সিঁতির মতো কবিরাজ আসিয়াছেন। ঠাকুর সহজে রাখালকে ইঙ্গিত করিতেছেন, ‘হাতটা দেখিয়ে নে।’

শ্রীকৃষ্ণ রামলালকে বলিতেছেন, গিরীশ বোধের সঙ্গে ভাব কর, তা হলে গিরেটার দেখতে পারি।

(হাত)

নরেন্দ্র হাজরা মহাশয়ের সঙ্গে বাহিরের বারান্দায় অনেকক্ষণ গল্প করিতেছিলেন। নরেন্দ্রের পিতৃ-বিয়োগের পর বাড়ীতে বড়ই কষ্ট হইয়াছে। এইবার নরেন্দ্র ঘরের ভিতর আসিয়া বসিলেন।

নরেন্দ্রের প্রতি ঠাকুরের নানা উপদেশ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)। তুই কি হাজরার কাছে বসেছিলি? তুই বিনেশিনী, সে বিরহিনী! হাজরাও দেড়ফাটার টাকার দরকার। (হাত)

‘হাজরা বলে, ‘নরেন্দ্রের যোগআনা সব গুল হয়েছিল, একটু, লালচে রক্তগুণ আছে! আমার বিত্তজবাব সতের আনা। (সকলের হাত)।’

‘আমি যখন বলি, ‘ভূমি কেবল বিচার কর, তাই শুক; সে বলে, আমি সৌর হুয়া পান করি, তাই শুক।’

‘আমি যখন শুদ্ধ ভক্তির কথা বলি, যখন বলি শুদ্ধ ভক্ত টাকা কড়ি ঐখুঁয়া কিছু চায় না; তখন সে বলে, ‘তাঁর রূপাবাণ এগে নদীতে উপুড়ে বাবে; আবার বলে ডোবাও জলে পূর্ণ হবে। শুদ্ধ ভক্তিও হয়, আবার খড়খড়িও হয়। টাকা কড়িও হয়।’

ঠাকুরের ঘরের মেজাজে নরেন্দ্রাদি অনেক ভক্ত বসিয়া আছেন; গিরীশও আসিয়া বসিলেন।

গ্রামরক্ষক (গিরীশের প্রতি)। আমি নরেন্দ্রকে
আবার বরুণ জ্ঞান করি; আর আমি ওর অমৃত্যু।
গিরীশ। আপনি কারই বা অমৃত্যু নন!

নরেন্দ্রের অগণ্ডের ঘর।

গ্রামরক্ষক (সহজে)। ওর মন্দের ভাব
(পুরুষাব) আর আমার মেমিভাব (প্রকৃতিভাব)।
নরেন্দ্রের উচু ঘর, অগণ্ডের ঘর।

গিরীশ বাহিরে তামাক খাতিয়ে গেলেন।
নরেন্দ্র (গ্রামরক্ষকের প্রতি)। গিরীশ ঘোষের
সঙ্গে অলাপ হল, খুব বড় লোক। (মণিরেয়
প্রতি) আপনার কথা ছিল।

গ্রামরক্ষক। কি কথা?

নরেন্দ্র। আপনি লেখাপড়া জ্ঞানেন না, আমরা
সব পণ্ডিত, এই সব কথা ছিল। (হাস্ত)

গ্রামরক্ষক ও নরেন্দ্র। পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্র

মনিমল্লিক (ঠাকুরের প্রতি)। আপনি না
পড়ে পণ্ডিত।

গ্রামরক্ষক (নরেন্দ্রের প্রতি)। সত্য বলছি,
আমি বোস্তা আদি শাস্ত্র পড়ি নাই বলে একটু ছুখ
হয় না। আমি যদি, বোস্তার সার, বরুণ সত্য জ্ঞান
মিথ্য। আবার গীতার সার কি? গীতা দশবার
বলে যা হয়; ত্যাগী ত্যাগী!

“শাস্ত্রের সার গুরুত্ব কেমনে নিতে হয়। তারপর
সাধন ভজন। একজন চিঠি লিখেছিল।
চিঠিখানি পড়া হয় নাই, হারিয়ে গেল। তখন
সকলে মিলে খুঁজতে লাগল। বহন চিঠিখানা
পাওয়া গেল, পড়ে দেখলে, পাঁচের সন্দেশ পাঠাবে
আর একখানা কাপড় পাঠাবে। তখন চিঠিটা
কেলে দিলে, আর পাঁচের সন্দেশ, আর একখানা
কাপড়ের যোগাড় করতে লাগল। তেমন শাস্ত্রের

সার কেমনে নিয়ে আর বই পড়বার কি দরকার?
এখন সাধন ভজন।

এইবার গিরীশ ঘরে আসিয়াছেন।

গ্রামরক্ষক (গিরীশের প্রতি)। হ্যাঁ গো, আমার
কথা সব তোমরা কি কহিলে? আমি বাই দাঁই
থাকি।

গিরীশ। আপনার কথা আর কি বলবে।
আপনি কি সাধু?

গ্রামরক্ষক। সাধু টাট্ট নয়। আমার সত্যই
তো সাধু বোধ নাই।

গিরীশ। ফটুকিমিতেও আপনাকে পাল্লম না।
গ্রামরক্ষক। আমি লালপেড়ে কাপড় পরে
জয়গোলাপ সেনের বাগানে গিচ্ছলাম। কেশব সেন
সেখানে ছিল। কেশব লালপেড়ে কাপড় দেখে
বললে, আজ বড় যেরং, লালপাড়ের বাহার! আমি
বললাম, কেশবের মন ভুলতে হবে, তাই বাহার দিয়ে
এসেছি।

এইবার আবার নরেন্দ্রের গান হইবে। গ্রাম-
রক্ষক মণিরেয়কে তানপুরাটি পাড়িরা দিতে বলিলেন।
নরেন্দ্র তানপুরাটি অনেকক্ষণ ধরিয়া বাঁধিতেছেন।
ঠাকুর ও সকলে অপেক্ষা হইয়াছেন।

বিনোদ বলিতেছেন, বাঁধা আছে হবে; গান আর
একদিন হবে। (সকলের হাস্ত)

গ্রামরক্ষক হাসিতেছেন আর বণিতেছেন,
“এমনি ইচ্ছে হচ্ছে যে তানপুরাটি ভেঙ্গে ফেলি।
কি টং টং—আবার ‘তানা নানা নেরে হু’ হবে।
তানাখ। যাত্রার গোড়ার অবনি বিরক্ত হয়।
নরেন্দ্র (বাঁধিতে বাঁধিতে)। সে না বুলেই
হয়।

গ্রামরক্ষক (সহজে)। ঐ! আমাদের সব
উড়িয়ে দিলে!

নরেন্দ্রের গান ও শ্রীগ্রামরক্ষকের ভাবাবেশ।

অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ। স্থির জল ও তরঙ্গ।

নরেন্দ্র গান গাইতেছেন। ঠাকুর ছোট খাটটিতে
বসিয়া শুনিতেছেন। নৃত্যগোপাল প্রভৃতি ভক্তরা
মেজিতে বসিয়া শুনিতেছেন।

গান।

অন্তরে জাগিছ এমা অন্তরহামিনী,
কোলে করে আছ মোরে দিবস যামিনী।
অধম মৃতের প্রতি, কেন এত স্নেহ প্রীতি,
প্রেমে আছ একবারে যেন পাগলিনী!
ওমা, এবার ভেবেছিলাম, না আমার আমি মার,
চলিবে মরণের সদা সনে তব বানী।
করে মাতৃহত্যা পান, হব বীর বলগান,
আনন্দে বলিবে মর ভক্ত প্রসবিনী।

২। গান। গাওরে আনন্দময়ী নাম।

ওরে আমার একতরঙ্গী প্রাণের আরাম।
৩। নিবিড় আঁধারে মাতোর চমকে অরুণরাশি।
তাই বোণী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিজাহারী।

ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া নীচে মাটিয়া আসিয়াছেন
ও নরেন্দ্রের কাছে বসিয়াছেন। ভাবাবিষ্ট হইয়া
কথা কহিতেছেন।

গ্রামরক্ষক। গান গাইব? খুঁ! (নৃত্য-
গোপালের প্রতি) ভূই কি বলি? উদ্ভীপনের জন্য
শুনতে হয়; তারপর কি হলো আর কি গেল।

“আঙুন জেলে দিলে; সে ত বেশ! তারপর
চুপ। বেশ তো, আমিও তো চুপ করে আছি,
ভূইও চুপ করে থাক।

“জানদরসে ময় হওয়া নিয়ে কথা।

গান গাইব? আচ্ছা, গাইলেও হয়। জল স্থির
থাকলেও জল, আর লেলেও লুণ্ডেও জল।

নরেন্দ্রকে শিক্ষা—

“জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও।”

নরেন্দ্র কাছে বসিয়া আছেন। তাঁর বাড়ীতে
কষ্ট, সেই কষ্ট যিনি সর্বদা চিন্তিত হইয়া থাকেন।
তাঁহার সাধারণ ভ্রান্ত সমাজে বাতায়ত ছিল। এখনও
সর্বদা জ্ঞান বিচার করেন, দেখাশ্রাদ্ধি গ্রন্থ পড়িবার
খুব ইচ্ছা। একসে বয়স ৩০ বৎসর হইবে। ঠাকুর
নরেন্দ্রকে একদৃষ্ট দেখিতেছেন।

শ্রীগ্রামরক্ষক (সহজে, নরেন্দ্রের প্রতি)। ভূই ত
“ত্বা” (আকাশবৎ); তবে বদি টেকোসা (tax
অর্থাৎ বাড়ীর ভাবনা) না থাকত! (সকলের হাস্ত)
“কৃষ্ণাকেশের বস্তুতো, ‘আমি থ’। একদিন
তার বাড়ীতে গিয়ে দেখি, সে চিন্তিতহয়ে বসে আছে;
বোনী কথা কহে না। আমি জিজ্ঞাসা কর্ণনুম, ‘কি
হয়েছে গো, এমন করে বসে রয়েছ কেন?’ সে বলে
‘টেকোসাওহালা এসেছিল; সে বলে গেছে, টাকা
যদি না দাও তাহলে ঘটা বাটা সব নিঃশব্দ করে নিয়ে
যাব; তাই আমার ভাবনা হয়েছে।’ আমি হাসিতে
হাসিতে বলিলাম,—‘সে কি গো, তুমি ত ‘ত্বা’
আকাশবৎ। যাক্ শালারা ঘটা বাটা নিয়ে যাক্,
তোমার কি?’

“তাই তোকে বলছি, ভূই ত’থ’—এত ভাবছি
কেন? কি জানিনা, এমনি আছে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে
বলছেন, অষ্টদিনের একটা থাকলে কিছু শক্তি হতে
পারে, কিন্তু আমার পাবে না। শিলাঘরের দ্বারা বেশ
ভাল, টাকা এই সব হতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরকে লাভ
হয় না।

“আর একটা কথা। জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও।
অনেকে বলে অমুক বড় জানী; বস্তু: তা নয়।
বিশিষ্ট এত বড় জানী, পুস্তকশোকে অস্থির হয়েছিল;
তখন লক্ষ্যব বসেন, “হাম, এ কি আশ্চর্য্য। ইনিও
এত শোকার্ত।” রাম বলেন,—“ভাই, যার জ্ঞান

আছে, তার অজ্ঞানও আছে; যার আলো বোধ আছে, তার অন্ধকার বোধও আছে; যার ভাল বোধ আছে, তার মন্দ বোধও আছে; যার স্বপ্ন বোধ আছে, তার দুঃখ বোধও আছে। ভাই, তুমি চুইএর পায়ে বাও, স্বপ্ন দুঃখের পায়ে বাও, জ্ঞান অজ্ঞানের পায়ে বাও।" তাই তোকে বলছি, জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে। স্বরেন্দ্রের প্রতি উপদেশ। গৃহস্থ ও দানধর্ম।

মনোযোগ ও কর্মযোগ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার ছোট পাটীতে আসিয়া বসিয়াছেন। ভক্তগণ এখনও মেহেতে বসিয়া আছেন। স্বরেন্দ্রও বসিয়া আছেন। ঠাকুর তাঁহার দিকে সহস্র দৃষ্টিপাত করিতেছেন ও কথাগুলো তাঁহাকে নানা উপদেশ দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (স্বরেন্দ্রের প্রতি)। মাঝে মাঝে এসো। জ্যাটা বুলতে, খটী রোগ মাজতে হয়; তা না হলে কলঙ্ক পড়বে। সাধুগণ সর্পদাঁই দরকার।

"সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ; তোমাদের পক্ষে তা নয়। তোমরা মাঝে মাঝে নির্জনে যাবে আর তাঁকে ব্যালুপ হয়ে ডাকবে। তোমরা মনে ত্যাগ করবে।"

"বীর-ভক্ত না হলে দু দিক রাখতে পারে না। জনক রাজা সাধন ভক্তনের পর সিদ্ধ হয়ে সংসারে ছিল। সে দুখানা ভরাখাল বুঝতো; জ্ঞান আর কর্ম। এই বলিয়া ঠাকুর গান গাহিতেছেন।

গান।

এই সংসার দয়ার কুঠী।

আমি বাই দাই আর মজা লুটী ॥

জনক রাজা মহাতেকা, তার কিসে ছিল ক্রটি,
সে যে এদিক ওদিক চুকিক রেখে খেয়েছিল

দুধের বাটী।

"তোমাদের পক্ষে, চৈতন্যদেব যা বলেছিলেন,
জীবে দয়া, ভক্তসেবা আর নাম সংকীর্ণন।

"তোমার বলছি কেন? তোমার হৌস-এর
(house, সদাগরের বাড়ী) কাছ; আর অনেক
কাছ কর্তব্য হয়; তাই বলছি।

"তুমি আফিসে মিথ্যা কথা কও, তবে তোমার
কিনিস খাই কেন? তোমার যে দান ধ্যান আছে;
তোমার যা আর তার চেয়ে বেশী দান কর; বার হাত
কাঁড়ের তের হাত বিচি।

"কৃপণের জিনিস খাই না। তাদের ধন এই
কয় বকমে উড়ে যায়ঃ—১ম, মাশলা হোকদ্দমার;
২য়, চোর ডাকাতে; ৩য়, ডাক্তার খরচে; ৪র্থ,
আবার বলছেলো সেই সব টাকা উড়িয়ে দেয়;
এই সব।

"তুমি যে দান ধ্যান কর, খুব ভাল। যাদের
টাকা আছে তাদের দান করা উচিত। কৃপণের
ধন উড়ে যায়; দাতার ধন রক্ষা হয়, সংকাজে যায়।
ও দেশে চাষারা ধান কেটে ক্ষেতে জল আনে।
কখনও কখনও জলের এত তোড় হয় যে ক্ষেতের
আল ভেঙ্গে যায়, আর জল বেরিয়ে যায় ও ফসল
নষ্ট হয়। তাই চাষারা আগের মাঝে মাঝে ছোঁচা
করে রাখে; তাকে যোগ বলে। জল যোগ দিয়ে
একটু একটু বেরিয়ে যায়, তখন জলের তোড়ে আল
ভাঙ্গে না। আর ক্ষেতের উপর পলি পড়ে। সেই
পলিতে ক্ষেত উর্বরা হয়; আর খুব ফসল হয়। যে
দান ধ্যান করে, সে অনেক ফল লাভ করে; চতুর্ভুগ
ফল।

ভক্তেরা সকলে ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে এই দান-
ধর্ম কথা একমনে শুনিতেছেন।

স্বরেন্দ্র। আমার ধ্যান ভাল হয় না। মাঝে
মাঝে মা মা বলি; আর শোবার সময় মা মা বলতে
বলতে ঘুমিয়ে পড়ি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা হলেই হল। স্বরণ মনন ত
আছে?

"মনোযোগ ও কর্মযোগ। পূজা, তীর্থ জীবসেবা
ইত্যাদি শুক উপদেশে কর্ম করার নাম কর্মযোগ।
জনকাদি যা কর্ম করতেন তার নামও কর্মযোগ।
যোগীরা যে স্বরণ মনন করেন তার নাম
মনোযোগ।

"আবার ডাবি কালীঘরে গিয়ে, মা মনও ত
তুমি। তাই শুক মন, শুদ্ধ বুদ্ধি, শুদ্ধ আত্মা একই
জিনিস।

সদ্যা আগতপ্রায়, ভক্তেরা অনেকই ঠাকুরকে
প্রণাম করিয়া বাটী প্রত্যাগমন করিতেছেন।

ঠাকুর পশ্চিমের বাবাগার গিয়াছেন; ভবনায়
ও মাঠের সঙ্গে আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভবনায়ের প্রতি)। তুই এত
সেহিত-দেহিতে আসিস কেন?

ভবনায় (সহান্তে)। আচ্ছ, পনের দিন অন্তর
দেখা করি; সে দিন আপনি নিজে রাখার দেখা
দিলেন, তাই আর আসি নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে কিরে? শুধু দর্শনে কি হয়?
স্পর্শন লাগা এ সব ও চাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

জ্যোৎসব রাত্রি গীতীরা প্রভুতি-

ভক্তসঙ্গে প্রেমামন্দে।

সদ্যা হইল। ক্রমে ঠাকুরদের আরতির শব্দ
সব শুনা যাইতেছে। আশ কাশনের শুক্লস্রোম;

৩৭ দিন পরে পূর্ণিমায় বেশ মহোৎসব হইবে।

সদ্যা হইল; ঠাকুর বাড়ীর মন্দির-শীর্ষ, প্রাঙ্গণ,
উত্তানচূর্ণি, বৃক্ষ-শীর্ষ—চন্দ্রালোকে মনোহর রূপ ধারণ
বহিয়াছে। গঙ্গা এমনে উত্তরবাহিনী, জ্যোৎসবময়ী,
মন্দিরের গা দিয়া যেন আনন্দে উত্তরমুখ হইয়া
প্রবাহিত হইতেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে
বরের ছোট পাটীতে বসিয়া নিশেপে জগন্নাথের
চিহ্না করিতেছেন।

উৎসবান্তে এখনও দু একটা ভক্ত রহিয়াছেন।
নরেন্দ্র আগেই চলিয়া গিয়াছেন।

আরতি হইয়া গেল। ঠাকুর আবিষ্ট হইয়া
দক্ষিণ পূর্ণের লম্বা বারাণ্ডা পদচারণ করিতেছেন।
মাঠেরও সেইখানে দণ্ডায়মান আছেন ও ঠাকুরকে
দর্শন করিতেছেন। ঠাকুর হঠাৎ মাঠারকে সযোজন
করিয়া বলিতেছেন, 'আহা, নরেন্দ্রের কি গান!'।

[তন্মুখে মহাকালীর ধ্যান। গভীর মানে।]

মাঠার। আচ্ছা, 'নিবড় আঁধারে' ঐ গানটা?
শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ; ও গানের খুব গভীর মানে।
আমার মনটা এখনও যেন টেনে রেখেছে।

মাঠার। আচ্ছা, হাঁ।
শ্রীরামকৃষ্ণ। আঁধারে ধ্যান, এইটা তরঙ্গের মত।
তখন হৃদয়ের আঁধার কোথায়?

শ্রীমুখ গীতীরা যোগ আসিয়া দাঁড়াইলেন; ঠাকুর
গান গাহিতেছেন।

গান।

মা কি আমার কাণো যে!
কালরূপ দিগম্বরী ধনু্যর করে আলো রে।
ঠাকুর মাতিয়াগা হইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া
গীতীর গায় হাত দিয়া গান গাহিতেছেন।

গান

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাকী কেবা চায়—
কালী কালী বলে আমার অঙ্গণ যদি দূরায়?

হিসাবা যে বলে কালী পূজা সন্ধ্যা সে কি চায় ?
সন্ধ্যা তার সন্ধ্যানে ফেরে কতু সন্ধ্যা নাহি পায় ।

দয়া ব্রত ধান আদি আর কিছু না মনে লয় ।

মদনেরই বাসবজ্ঞ ঐক্যময়ী বসন্তপায় ॥

গান ।

এবার আমি ভাল ভেবেছি
ভাল ভাবীর কাছে ভাব শিখোছি
যে দেশের রজনী মাই না সেই দেশের

এক শোক গেয়েছি ।

আমি কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা সন্ধ্যার বদ্য। করেছি।
হৃদয়ে মিশিয়ে ভাল সেই ভালের এক গীত শিখোছি,
তারি ম তারি ম বাজছে সে ভাল নিম্নের ওস্তাদ
করেছি ।

যুম কেড়েছে আর কি ঘুনাই, যোগে যোগে জেগে
আছি,
যোগ নিজা তোরে দিয়ে না ঘুমেরে ঘুম পাড়াচ্ছে।
প্রশ্নার বলে ভুক্তি মুক্তি উঠয়ে মাপার হেবেছি,
আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্থ ধর্মার্থ সব ছেড়েছি ।

গিরীশকে দেখিতে দেখিতে যেন ঠাকুরের
ভাবেলাস আরও বাড়িতেছে । তিনি দাঁড়াইয়া
দাঁড়াইয়া আবার গাইতেছেন ।

গান ।

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি
আমি আর কি ঘরের ভয় রেগেছি ।
কালী নাম মহামন্ত্র আশ্বিনীর শিখায় বেধেছি
আমি ঘের বেচে ভবের হাটে ঐতৃর্ণ্যনাম কিনে
এনেছি ।

কালীনাম কল্প তরু দ্বন্দ্বেরে রোপণ করেছি,
এবার শমন এলে দ্বন্দ্বের গুলে বেথাব তাই বসে আছি ।
ঠাকুর ভাবে মত্ত হইয়া আবার গাইতেছেন—

‘আমি দেহ বেচে ভবের হাটে ঐতৃর্ণ্যনাম কিনে
এনেছি’

(গিরীশার ভক্তের প্রতি) ‘ভাবতে ভরল তবু হরল
পেপান’ ।

‘সে জান মানো বাহু, জান । তবজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান
এ সব চাই ।

‘ভক্তিই সার। সকাম ভক্তিও আছে; আবার
নিকাম ভক্তি, শুদ্ধ ভক্তি, অহেতুকী ভক্তি এও
আছে । কেশব সেন ওরা অহেতুকী ভক্তি জানত
না; কোন কামনা নাই, কেবল ঈশ্বরের পাশপায়ে
ভক্তি ।

(ঐরামকৃষ্ণ কি অবতারণা! পরমহংস-
অবস্থা)।

‘আবার আছে, উর্জিতা ভক্তি । ভক্তি যেন
উপলে পড়ছে । ‘ভাবে হাসে কাঁদে নাচে পায়’ ।
যেমন চৈতন্যদেবের । রাম বল্লভ লক্ষ্মণকে, তাই
বেথানে দেখবে উজ্জিতা ভক্তি, সেইখানে জানবে
আমি স্বয়ং বর্তমান ।

ঠাকুর কি ইঙ্গিত করিতেছেন, নিজের অবস্থা ?
ঠাকুর কি চৈতন্যদেবের জায় অবতার ? জীবকে
ভক্তি শিখাইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন ।

গিরীশ । আপনার রূপা হলেই সব হয় । আমি
কি ছিলাম কি হয়েছি !

ঐরামকৃষ্ণ । ওগো, তোমার সংস্কার ছিল তাই
হচ্ছে । সময় না হলে হয় না । যখন রোগ ভাল
হয়ে এল, তখন কবিরাজ বলে, এই পাত্তী মরিচ
দিয়ে বেটে খেও । তারপর রোগ ভাল হল । তা
মরিচ দিয়ে ঔষধ খেয়ে ভাল হল, না আপনি ভাল
হল, কে বলবে ?

‘লক্ষণ লবকৃষ্ণকে বল্লভ, তোরা ছেলে মানুষ,
তোরা রামকৃষ্ণকে জানিস না । তাঁর পাব্যপার্শে
অহল্যা পাবণী মানবী হয়ে গেল । লবকৃষ্ণ বলে,
ঠাকুর সব জানি, সব জানেছি; পাবণী যে মানব
হল সে সুনিবাক্য ছিল; গৌতমমুনি বলেছিলেন, যে
জ্যোতিষগোপাল ঐ আশ্রমের কাছ দিয়ে যাবেন ;

তাঁর পাব্যপার্শে তুমি আবার মানবী হবে । তা এখন
রামের গুণে না মনিবাক্যে, কে বলবে বল ।

‘সবই ঈশ্বর ইচ্ছায় হচ্ছে । এখানে যদি তোমার
চৈতন্য হয়, আমাকে জানবে হেতুমাঝ । টাণামা
সকলেরই মাঝ । ঈশ্বর ইচ্ছায় সব হচ্ছে ।

গিরীশ (সহাস্তে) । ঈশ্বরের ইচ্ছায় তো ?
আমি ও ত তাই বলছি (সকলের হাত) ।

ঐরামকৃষ্ণ (গিরীশের প্রতি) । সরল হলে
শায় ঈশ্বর লাভ হয় । কয় জনের জ্ঞান হয় না ;
১ম,—যার ঝাঙ্গা মন, সংল নয়; ২য়,—যার ভক্তি
বাই; ৩য়,—যার সংস্কার ।

ঠাকুর নিত্যাগোপনের ভাবাবস্থার প্রকাশ্যকরিতেন ।

এখনও তিন চার জন ভক্ত ঐ দক্ষিণ পূর্ব লগ্না
বাগ্যায় ঠাকুরের কাছে দাঁড়াইয়া আছেন ও সমস্ত
কনিতোছেন । পরমহংসের অবস্থা ঠাকুর বর্ণনা
করিতেছেন ।

বাল্যেই সত্য আর সব অনিত্য । ইশ্বরেরই
শক্তি আছে ছাৎক জল থেকে তক্তা করা । দুধে
কলে দাঁদ মিশিয়ে থাকে, তাদের জিহ্বাতে এক
রকম টুকরন আছে সেই রসের খাড়া ছব আলোনা
জল আলাদা হয় যায় । পরমহংসের মুখেও সেই
টুকর হস আছে, প্রেমভক্তি । প্রেমভক্তি থাকলেই
ঈশ্বরের অহত্বিত হয়, ঈশ্বর দর্শন হয়, নিত্য অনিত্য
বিবেক হয় ।

সাধন-তত্ত্ব

গুরু ও দীক্ষা

— — —

সন্ন্যাস পন্থা, লক্ষ্য নাহে—লক্ষ্য ভগবান। ভগবৎ-
তত্ত্ব—ঐহিক অর্থেই, সাকার নিরাকার প্রকৃতি নানা
কথায়, নানাভাবে ব্যক্ত হইয়াছে; মূলতঃ বস্তু এক
বৈ ছই নয়, সাকারও যে ভগবান, নিরাকারও সেই
ভগবান। ‘অচ্ছ’নের মনও ভাষা বৈষম্যে বিচলিত
হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরতত্ত্বের অশৌকসময় ভাব যখন
ব্যক্ত করিতেছিলেন, অথচ তাঁহাতেই আত্মসমর্পণের
নিদেশ দিতেছিলেন—‘তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথায়
সামগ্রস্বা গুণিয়া পাইতেছিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ তখন
আত্মবিকৃতিক কথ্য উল্লেখ করিলেন, অচ্ছ’নের চিত্ত
নিঃসংশয় হইল। তিনি বলিলেন, “মোহোহং বিপতো
নমঃ”—একমে ঐশ্বরিকরূপ দর্শনে আমার যদি সমর্থ মনে
কর, তবে আমার অবশ্য আত্মরূপ দর্শন করাও।

“নরসে যদি তচ্ছব্যাং ময়া হ্রৈমিতি প্রভো।

যোগেশ্বর ততো মে হা দর্শনাস্থানমবয়াম ॥”

শ্রীকৃষ্ণ তখন আত্মসেই বিশ্বরূপ সন্দর্শন করাইবার
জন্ত অচ্ছ’নকে দ্বিবা চক্ষু দিলেন, “নতু নাং শকাসে
হ্রৈমুনেনৈব স্বচক্ষুঃ ॥”—এই স্বকীয় প্রাকৃত
চক্ষুদ্বারা সে রূপ দেখা যায় না।

অচ্ছ’ন এই দ্বিবা চক্ষু কেন পাইলেন? শ্রীভগ-
বানের এত অতুগ্রহ কেন হইল?

দধ বলিতে আমার ঈশ্বরপ্রার্থিষ্ট পুত্র, কিন্তু
সাধন অভাবে পাই না, চেষ্টা করিয়াও সফলকাম
হই না, এই প্রাকৃত দৃষ্টি দিয়া যেমন সে রূপ দেখা
যায় না, তজ্জন প্রাকৃত মন দিয়াও সাধনা হয় না।
এই সামান্য মন যায় কি? এ মনের মন্বন হইলেই
তো, দ্বিবা মনের আবির্ভাব হয়। শরীর বুদ্ধসাধনা

তপস্শায় অবসর করিলে যদি মনের বাধন উঠে,
তাহার প্রমুখ্য হঠযোগ, রাজযোগ, প্রকৃতি শাস্ত্র
উপদেশে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা করজন পালন
করিতে পারে, করজনের সাধো কল্যাণ? এই সকল
যোগপথ চুসাদ্যা হইলেও, এইগুলির সাহায্যে দ্বিবা
শরীর মন লাভের যে সম্ভাবনা আছে, তাহা অস্বীকার
করা যায় না। কিন্তু চাই যে আত্ম এমন পথ, এমন
সাধনা—যাহার সাহায্যে সম্ভব জীবন পতির মধ্যেই
এই চুলভ জীবন লাভ হয়, সেই পথের সম্ভানই
গীতার যোগ, শ্রীকৃষ্ণ অচ্ছ’নের নিকট বাহা প্রকাশ
করিয়াছিলেন, এক কথায় ইহাকেই বলা যায়
আত্মসমর্পণ।

আত্মসমর্পণ করিতে হইবে—শ্রীকৃষ্ণে। কৃষ্ণ-
নিরূপণ করিতেই তো জীবন শেষ হয়, আত্মসমর্পণ
করা ঘটয়া উঠে না! ভগবান সাকার কি নিরাকার,
গুণময় কি গুণাতীত, ব্রহ্ম কি কালী, ইহা লইয়াই
জগতাল সমস্তা স্থলি। অধুনা প্রচারিত ঈশ্বরব শাস্ত্রে
ভাগবত নিরূপণের সূত্র কণ্ঠস্থ করিতেই যে বেগ
পাইতে হয়, তাহাতেই চক্ষু ধির—ব্রহ্ম, আত্মা, ভগ-
বান এই সকলের বিচার সহজ নয়। যে বিশ্বাস
শাস্ত্রে নিবদ্ধ করিব, সে বিশ্বাসের মূল কি? বিশ্বাসের
দৃঢ় ভিত্তির উপরই তো শঙ্কর উৎপত্তি, শঙ্করবানই
তো ঈশ্বর লাভ করে, ইহা তো তোমার আমার
কথা নয়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই বাণী উচ্চারণ
করিয়াছেন:—

যো যো বাং বাং তহঃ ভক্তঃ শঙ্করাভিভূমিচ্ছতি।

তত্ত্ব তত্ত্বাচলঃ শঙ্করঃ তামেব বিদ্যামায়াং ॥

বে যে ভক্ত, যে যে আশ্রয় শ্রদ্ধা সহকারে অর্চনা
করুক, আমি সেই সেই ভক্তের শ্রদ্ধাকেই অচলা
করি। অতএব শ্রদ্ধা ছিল বলিয়াই তো অচ্ছ’ন
শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বতেই বিশ্বরূপ দর্শন করিলেন, এই শ্রদ্ধাই
আত্মসমর্পণের শক্তি প্রধান করে। আত্মসমর্পণ
বড় কঠিন, মন্থের কথা নয়, বুদ্ধি হইতে পর পর মন
প্রাণ তত্ত্ব পন্থা, তন্মাত্রা, তত্ত্বজ্ঞান, তন্মাত্রা করিয়া
তুলিতে হয়, তবে তো “তোমাং সততযুক্তানাং”
ভগবানে আসক্তচিত্ত সাধক এমন তত্ত্বজ্ঞান লাভ
করে, যাহার দ্বারা তাহার ঈশ্বর লাভ হয়।

ঈশ্বর নিরূপণ লইয়া—শারদাকার সাধকে বড়
উদ্ধৃত্য করে। ঈশ্বর সর্গভূতাহার্যহিত, তুমি আত্ম-
সমর্পণ যোগ গ্রহণে সমর্থ কি না—ইহাই বিচার্য।
আত্মসমর্পণ—আপনকে ক্ষুদ্রাইয়া ফেলা, আত্ম-
মত্তির অপর উঠাইয়া নিজেকে নিশেষ করা।
ইহা বুদ্ধিগ্রাহ্য হয়, ক্ষুদ্রগ্রাহ্য হওয়াও অসম্ভব নয়, রাম-
প্রসাদ বলিয়াছিলেন, “আমার মন বুকেছে, প্রাণ বুকে
না, ধরবে শশী হয়ে বামন!” প্রাণ রাজী নয়,
জীবের প্রাণের ধর্ম বড় ধর্ম, সর্গ ধর্ম ঈশ্বরের বিসর্জন
দিয়া, আমি যে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সর্লপাপমুক্তির
আশায় তোমার দৃঢ় চাহিয়া কাড়াল হইব, সে বিশ্বাস,
সে শ্রদ্ধা আমার প্রবল প্রাণশক্তি করিতে প্রস্তুত নাহে;
আত্মসমর্পণ যোগের মার এখানেই।

তুমি তো বলিলে—মঙ্গলা হও, মঙ্গল হও,
মন্মাজী হও, অন্যাকেই নবগ্রহণ কর, এমন করিলে
আমার মত প্রিয় আর তোমার কে? তুমি তো
বলিলে, এরূপ হইলে আমি তোমাকেই পাইব।
এ কথা তো মুক্তিবন্ধ নর, সতত তোমাতে রুচি,
রতি রাখিলে, তোমাময় হওয়া বিজ্ঞানসম্মত,
তজোপোকা যে কাচ পোকার দিকে চাহিয়া
চাহিয়া উদাকার প্রাপ্ত হয়। ইহা করিতে হইলে
সর্গ ধর্ম তো আপনা হইতেই ছাড়িবে, বাহিরের ধর্ম

তন্মাত্রা হইতে গিয়াই লোপ পাইবে, তারপর আত্ম-
ধর্ম—আত্মসমর্পণে উহা থাকে কি প্রকারে? তুমি বলি-
তেছ—“অহং স্বাং সর্লপাপেভ্যঃ মোক্ষমিচ্ছামি” মা
ওতঃ—ইহা বড় কথা নয়, আমার ধর্ম, অধর্ম থাকিলে
তো আমার মুক্তি দিবে? ইহা মোক্ষ বৈ আর কি!

কিন্তু আত্মার মোক্ষ হইল কি? সত্তার নিকার
—ভগবানের বিচিত্র বিকারের অস্ত হইল কি?
না। আত্মসমর্পণের উদ্দেশ্য তাহা নহে; আত্ম-
সমর্পণ দেহীকে পাপমুক্ত করে, পাপ অধর্মিকা।
আত্মসমর্পণ যে পরিমাণে সাদিত হয়, সেই পরিমাণে
গুণিক ও শক্তির প্রভাব শরীরে সঞ্চারিত হয়,
দেহভাবের উদ্ভুদ্ধতা আসে—জীবন দ্বিবা করার
ইহা ব্যতীত দ্বিতীয় উপায় আর নাই। অচ্ছ’ন
শ্রদ্ধা সহকারে, “মাহত্যাং তত্বাপ্রতিভাং”—শ্রীকৃষ্ণ-
মুত্তির চরণে আত্মদান করিয়াই, দ্বিবা জীবন পাই-
লেন, দ্বিবা চক্ষু লাভ করিলেন। গীতার এই
অপূর্ণ যোগগ্রহণ, এই অভিনব যোগতত্ত্ব, আত্ম
সর্গভূত, সর্গজননমো স্বরূপময় হয় নাই, তাই অন্তরে
শ্রীভগবানের লীলা, তাঁর অমৃতপরণে মনের পুলক,
বুদ্ধিতে তাঁর বাণী, চিত্তায় প্রেরণা—কল্পনা বলিয়া
মাহুয়া বড় ক্ষুদ্র হইতেছে, ধর্ম জীবদেহে স্থান
পাইতেছে না। আত্মসমর্পণে অহংএর বিসর্জন
হয়। এই আত্মসমর্পণ—মনের অংঘের চূর্ণ করার
জন্ত, মানবের চরণেই করিতে হইবে, অংঘারের
ছলনাকে প্রশ্রয় দিলে চলিবে না, আত্মসমর্পণ
সুহৃৎসাধনা হইলেও যদি অগ্নি-আকাঙ্ক্ষা জাগে,
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপরূপে, গুরুরূপে পথ দেখান,
ঈশ্বরপথের যাত্রী—এই পরম সখা, পরম বন্ধুকে,
ক্ষুদ্রদের বিশ্বাস চাণিয়া যদি বিশ্বাস না করি, তাহা
হইলে যোগ কড়ই যে কুলায়। তাই গুরুমুত্তির
এত মহিমা। গুরুকে মাহুয় জ্ঞান করায় শাস্ত্রে
নিষেধ আছে। যেমন পিতা মাতা ভ্রাতা মাহুয়,

তেমনই যিনি ঈশ্বর লাভে জীবকে পথ দেখান সেই গুরু মাহুয়। এই মানববৃত্তি, হৃদয়, প্রাণ চালিয়া নিরাময় হইতে হইবে যে ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিয়া—সে ভগবান মাহুয়। কোথাও তিনি গুরু, কোথাও ভক্ত, কোথাও অবতার, কোথাও শক্তি। ভাগবতে তাঁর ষড়বিধ মূর্তির কথা আছে। চণ্ডীদাসও কহিয়াছেন—

চণ্ডীদাস কহে, তন হে মাহুয় ভাই!

সবার উপর মাহুয় সত্য
তাহার উপর নাই।

পাইয়া যে যোয়ায় সে বড় অভাগা—শ্রদ্ধা দিয়া আমি কাহারেও ধন্ত করি না, সৌভাগ্য আমার—শ্রদ্ধা চানার আশ্রয় পাইয়াছি, সকল শ্রেণীর সাধকের দলেই সেই এক বাণী :—

ইটে অধিষ্ঠাতা তার স্বরূপ লক্ষ্য হয়।
সেই ইটে বাহার হয় পাচ অহরূপ।
সেই জন লোক-ধর্মাদি সব করে ত্যাগ।
ইহাও—সেই “সর্বপ্রধান” পরিচায়কের কথা।

পাকাতা শিক্ষাভিমায়ী ইহাতে শিহরিয়া উঠিবেন—মাহুয়ে ভগবানের আরোপ যে বড় স্পর্শকার কথা। যে দেশে সত্য পতিকে দেবতার আসনে বসাইয়া দৃষ্ট হইয়াছে, মহোদর মহোদরকে, ভূতা প্রভৃকে ঈশ্বরের আসন দিয়া, পৃথিবীর সদ্গুরু মধুয় করিয়াছে, সে দেশে এক কথা নূতন নয়,—সর্ব শাস্ত্রে, তত্ত্বে, ভাগবতে ইহার তুরি তুরি প্রমাণবাক্য সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য নয়।

ব্রাহ্ম-সমাজের আত্মদয় যুগে—ব্রহ্মোপাসনা নূতন ভঙ্গী ও মূর্তিতে প্রচারিত হওয়ায়, প্রথম প্রথম, শিক্ষিত জনগণের মধ্যে কালধর্মে বিকৃত গুরুবাদে অনাগ্রা আসিয়াছিল, প্রতুপাদ বিজয়-কৃষ্ণও ইহার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

তার পর তিনি অন্তরপিপাসায় কাতব হইয়া যখন গুরুমূর্তির রূপায় পরম সাহস পাঠিলেন, তাঁর কণ্ঠে আবার নূতন সত্য প্রচারিত হইল, একজন সেই সময়ে তাঁহারকে বলিয়াছিলেন—“আপনিই না একদিন, গুরু, শাস্ত্র এই সব কিছু নয় বলিয়াছিলেন!” গোষ্ঠাস্বামী মহাশয় উত্তর দিয়াছিলেন—“হাঁ। কিন্তু এখন আর আমি সে মাহুয় নই, তখন মাহা বলিয়াছি, তাহার জ্ঞান আমার কণে বলিয়া দাও।”

দিক্বেশের এই তত্ত্বের চরম প্রকাশ সাধিত হইয়াছে। ঠাকুরের প্রতি মমতা জন্মিলে, নরেন্দ্র মাঝে মাঝে দিক্বেশেরে আদিয়া ঠাকুরকে দেখিয়া যাইতেন, এই মমতার পুঞ্জিত, অশিক্ষিত ব্রাহ্মণের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, কিন্তু সে শ্রদ্ধার পূর্ণতা না আসায়, তিনি বড় আতুল হইয়াছিলেন। যে প্রত্যয় স্থির হইলে, জন্ম উপচিত হইয়া—শ্রদ্ধার সমুদ্র উল্লিখা—জীবন মধুয় হইবে, তীক্ষ্ণবৃত্তি নরেন্দ্র মাহুয়ে সে প্রত্যয় স্থাপনের বৃত্তি খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। এই অবস্থায় ঠাকুর রূপা করিলেন। সহসা তিনি একদিন নরেন্দ্রকে লইয়া পঞ্চবটী-মূলে গিয়া ঠাড়াইলেন, একদৃষ্টে তাঁহার প্রতি তাকাইয়া রহিলেন, তারপর ছুজনে এক হইলেন—রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ হইলেন, বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ হইলেন, নরেন্দ্র বুদ্ধিল, বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ কেবল নামে পুণ্ডক, এক বস্তুরই বিভিন্ন মূর্তি—তখন সাকার, নিরাকার সূচিল, তার কণ্ঠে সত্য বাণী নিনাদিত হইল—“Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity within.” ঠাকুরের মধ্যে ঈশ্বর দর্শন করিয়া—তিনি সিদ্ধ হইলেন।

গুরু চিৎশক্তি—গুরুতে মাহুয় জ্ঞান বতর্দিন, ততদিন ব্রহ্মদর্শন হয় না। বিরাট জীবনের সর্বত্তরে বিস্তৃত হইলে সর্গাঙ্গীনা শ্রদ্ধার উদয় হয়, তদ্ব্যতী

আপনা আপনি হইয়া থাকে, এই ভাববিভোর অবস্থায় অহংকার গলিয়া পড়ে, ঠাকুর বলিতেন—“তোরা যেমন ভাব তেমন লাভ মূল সে প্রত্যয়”—লাভ প্রেম, ভাব ঘন হইলেই প্রেমের উদয়, প্রেমে জাগে শক্তি, শক্তির জাগরণে ঈশ্বর সাক্ষ্য হয়।

এক্ষণে দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও শাস্ত্র-বিত্ত কয়েকটা লক্ষণের কথা উল্লেখ করিয়া বর্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। ঈশ্বর লাভের পথে গুরুর সাহায্য বিনা দীক্ষায় সম্পন্ন হয় না—শাস্ত্রে তিন প্রকার দীক্ষার কথা উল্লিখিত আছে, প্রত্যেক অন্তর্দর্শী সাধক ইহা স্বয়ং উপলব্ধি করিতে পারে।

প্রথম সান্ত্বনী দীক্ষা। এমন এক মাহুয়ের আশ্রয় পাইলাম, যিহার দর্শনে, স্পর্শে ও বাণী শ্রবণে অন্তর উদ্ভুক্ত হইল, আর সে উদ্ভুক্ততা জীবনে ছাড়া গেল না, জীবনের সব বৃত্তি সংস্কৃত হইয়া ঈশ্বরমুখী হইয়া পড়িল। কত কথ্যা অভাস, জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার উদয় হওয়া মাত্র লয় পাইয়া যায়, চেষ্টা করিয়াও অযোমূখী থাকায় পা সরে না, কে যেন জোর করিয়া, শব্দে শব্দে উপরে দিকে টানিয়া তুলে। দীক্ষা দান বা গ্রহণের কোন সঙ্গল্পই ছিল না, কিন্তু বস্তুতঃ এইরূপ ঘটয়া গেল, এই সান্ত্বনী দীক্ষা বড় অল্পজনের ভাগ্যে ঘটে।

শান্তী দীক্ষা—আচার্য শিষ্যের পূর্ণস্বীকৃতি গ্রহণ

করিয়া, অধ্যাত্ম শক্তি সাকারে তাহার ভিতর দিয়া জ্ঞানের প্রদীপ জালিয়া দেন, এক্ষণে ময় বা কোন আচার অহুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না, গুরুসম্মুখী ইহার একমাত্র প্রকরণ। আচার্যের হৃদয়ে কল্পনার উল্লেখ হইলেই, শিষ্য দীর্ঘে দীর্ঘে অধ্যাত্মশক্তি-সম্পন্ন হইয়া উঠে।

পরিণামে মাষ্ট্রী দীক্ষা। মন্বয় সাহায্যে, নানা-বিধ আচার অহুষ্ঠানের মধ্যে, শিষ্যের মনে ঈশ্বর-হরণ জাগ্রত করার প্রয়াস এই দীক্ষার সর্বপ্রধান লক্ষণ। ইহাই বর্তমান সময়ে সুপ্রচলিত। উপরোক্ত সান্ত্বনী ও শান্তী দীক্ষা অসাধারণ বলিয়া সহজ জীবনে উহার মর্মবোধ হয় না, কেননা উহা দের সাধন নীতি, শাস্ত্রাচার ও লোকাচার হইতে অনেক বিষয়ে ভিন্ন, কিন্তু সিদ্ধ বলিয়া যাহারা প্রসিদ্ধ, তাহাদের মধ্যে অনেকেই এই দুই দীক্ষার দ্বারাই কৃতকার্য হইয়াছেন।

আত্মসমর্পণ যোগে গুরু ও দীক্ষা সৎক্ষে এইরূপ মোটাটোটা জ্ঞানই যথেষ্ট, কেননা গুরুমূর্তি অস্তিত্ব সাধনার মত সাধকজীবনে তেমন প্রকট নহে, হৃদয় ও দণ্ডার মতই, সহজ ভাবেই, সাধককে ঈশ্বরভিত্তিতে পরিচালিত করেন।

বর্তমান যুগে এই আত্মসমর্পণ যোগই যে যুগধর্ম—এই বিষয়ের আলোচনা বারাত্তরে করিব।

বেদ পরিচয়

[লেখক—শ্রীনন্দিনীকান্ত গুপ্ত]

—:—:—

বেদের পরিচয় বেদের নামেই। বেদ অর্থ জ্ঞান, বিদ্য দাতৃ হইতে, বৈজ্ঞান হিন্দু, ভারতের, আধ্যাত্মিক শিক্ষা দীক্ষার বা সভ্যতার প্রতিষ্ঠা ও প্রাণ, তাহাই বিশেষভাবে বেদ নামে পরিচিত। এই জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন একদল সাধক বা ঋষি এবং ও কোথায় তাহা যদিও নিঃসংশয়ে নিরূপণ করা দুঃসম্ভব—এবং সাধক ও ঋষি পরম্পরই এই জ্ঞানকে বাঁচাইয়া বাড়াইয়া সাজাইয়া রাখিয়াছেন। বেদের আর এক নাম স্মৃতি। কারণ বলা হয় এই যে বেদমন্ত্র গুরু-শিষ্য পরম্পর কানে কানে চলিয়া আসিয়াছে; পূর্ক পূর্ক সাধকদের মুখ হইতে শুনিয়া শ্রবণে শ্রবণে ধারণ করা, রক্ষা করা হইয়াছে। কিন্তু বলা হইতেছে গৌণ বা লৌকিক বাণী। বেদ যে স্মৃতি, তাহার অঙ্গল কাণ্ড এই যে সাধক ঋষিরা তাঁহাদের বেদ বা জ্ঞান মন্ত্ররূপে দিবাকরণে শ্রবণ করিয়াছিলেন। সত্যের বাস্তব বিগ্রহ যে দিবা বাণী সাধক ঋষিরা তাহা ধামে দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন, তাই তাঁহাদের নাম মন্ত্রজ্ঞা এবং তাঁহাদের বক্তৃতা জ্ঞানের নাম স্মৃতি। বেদকে বলা হয় যে অগৌণের, অনাদি, অনন্ত, তাহার কারণ এইখানে। দিবাজ্ঞান কোন মাত্রার বাস্তবিকবিশেষের সৃষ্টি নহে। দিবাজ্ঞান হইতেছে সৃষ্টির অন্তর্যম সত্য সমূহ—তাঁহা চিরকালই আছে ও থাকিবে। ঋষিরা কেবল তাহার সুপাণ্ডব বা প্রকাশের যত্ন।

বেদের যে আধুনিক রূপ আমরা দেখিতে পাই, তাহা গোঁড়ার ছিল না। যেন বলিয়া একথানা

গোটা গ্রন্থ একটি বিশেষ স্থানে বা বিশেষ যুগে রচিত হয় নাই। বেদের মন্ত্ররাষ্ট্র নানা ঋষি নানা যুগে এবং হযত নানা স্থানে দেখিয়া প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন। এই রকমে দেশ-কাল-পাত্র ভেদে বেদরাষ্ট্র প্রথম প্রথম ছিল ইত্যন্ত: বিক্ষিপ্ত, অপূর্ণাঙ্গিত। পরে দেওকটিকে বেদাঙ্গসমূহ সংগ্রহ করিয়া, একত্র করিয়া, সাজাইয়া গুছাইয়া তোলা হইয়াছে। তখন পুরাতন মন্ত্র সব কতক পাওয়া গিয়াছে, বাক্য পাওয়া যায় নাই—বেদীয় ভাগই পাওয়া যায় নাই, নষ্ট হইয়া গিয়াছে—আর কতক বা নূতন নূতন রচিত হইয়া পুরাতনের সাথে মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই সংগ্রহের চেষ্টা যে একবারেই হইয়াছে তাহা নহে। প্রথমত: আমরা যে খলিমান বেদ গোঁড়ার ছিল নানা ঋষি নানা মন্ত্র, তাহার অর্থ এমন নয় যে প্রত্যেক সাধক ঋষি আপন আপন উপলব্ধি একান্ত ব্যক্তিগত ভাবেই যত্নে রাখিয়া গিয়াছেন, কাহারও কথার সহিত কাহারও সম্বন্ধ বা মিল নাই। তাহা নয়। প্রাচীন ঋষিদিগের সাধনার একটা বিশেষত্বই এই যে তাহা একান্ত ব্যক্তিগত জিনিষ ছিল না। তাঁহাদের সাধনা চলিত একটা দল বা সম্মত ব্যক্তিরা, বৈদিক ঋষির যুগে সর্বশেষ তাই শুনি বহুবচন—আমরা, তোমরা সগণরূপে ইত্যাদি এই রকমে সম্মত সম্মত এক একটা সাধনার ক্রম দেখা দিয়াছে—সম্মত ছিল কোথাও গুরু শিষ্যের পরম্পরা, কোথাও বা তাহা ছিল একটা

জ্যোতিষ, ১৩০২]

বেদ-পরিচয়

২৭

বংশ বা কুলের দ্বারা। এই যে নানা পারম্পর্য্যে, নানা ধারায় নানা সাধক মন্ত্র সব সৃষ্টি করিয়াছেন বা রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন, তাহা লইয়াই ক্রমে বেদের অসংখ্য অনুরক্ত শাখা প্রতিশাখা উপশাখা সব গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্তমানে যে বেদ পাই তাহা এইরূপ কয়েকটি শাখা ও উপশাখার কয়েকটি অংশমাত্র। বেশীর ভাগ বেদই লোপ পাইয়াছে। সুতরাং বেদের মৌলিক সংগ্রহ বা শ্রেণীবিভাগ আপনা হইতেই এই রকমে দুঃসম্ভব রূপে বা গুরু-শিষ্য-পারম্পর্য্যে ঘটয়া আসিয়াছে।

কিন্তু তারপর প্রধান সংগ্রহে কাঁচা ও শৌণ্ডিক ভাগ হয় যখন সমস্ত গ্রাণ্ড বেদদ্রব্যাদীকে তিনভাগে ভাগ করিয়া সাজান হইয়াছিল। সেই ভিত্তিই বেদের আর এক নাম হইয়াছিল 'ত্রয়ী'। ঋক, সাম, ও যজু এই তিন পদার্থে তিন ধরনের মন্ত্রমণ্ডল সংগ্রহিত করা হয়। ঋকে পদ্য, সামে গীতিপদ্য, (অর্থাৎ যে পদ্য গৌণ) আর যজুতে গদ্যভাগ সন্নিবিষ্ট। বেদের সর্বশেষ সংগ্রহ বা সংস্করণ হইল যখন ঋক সাম যজু এই ত্রয়ীর সহিত অথর্বস নামের আর এক পদ্য: যজু করিয়া দেওয়া হইল। যে সব মন্ত্র পূর্বসংগৃহীত ত্রয়ীর মধ্যে স্থান পায় নাই, তাহা ছিল ইত্যন্ত: বিক্ষিপ্ত বা পরে রচিত হইয়াছিল, সেই সকল হইয়াই অথর্ববেদ। এই রকম বেদের চারিভাগ বা চতুর্বেদ গড়িয়া উঠিল।

পূরণ বক্তৃত্তেছেন যে, বেদ মন্ত্রের বাঁহারা এই সংগ্রহের কাঁচা করিয়াছেন তাঁহাদের সাধারণ নাম বেদব্যাস। ২৮ জন বেদব্যাস যুগে যুগে এই রকম সংস্করণের পর সংস্করণ তৈয়ার করিয়া বেদের আধুনিক রূপ দিয়াছেন। সর্বশেষ বেদব্যাস, বাঁহার হাতে বেদ চতুর্বেদ হইল, তিনি মহাভারতকার কৃষ্ণ-দৈপ্যারন বেদব্যাস। আর ভবিষ্যতেও নাকি বেদের সাধারণ নূতন বিভাগ বা সংস্করণ হইবে এবং যে ব্যাস-

দব সে কাঁচা করিবেন তাঁহার নাম জৌনবিদ্যাস। সমগ্র বেদের এই যে তিন বা চারি ভাগ করা হইয়াছে তাহা কি কেবল ব্যাযের গড়ন প্রকৃতি দেখিয়া? বলা যায় না কি তাহা ছাড়া সাধনার এক একটা বিশেষ ভঙ্গী, গোষ্ঠীগত ক্রিয়াকলাপের ধরন মোটামুটি এই চারিটি ধারায় বাজ হইয়াছে? প্রাচীনতম বেদমন্ত্রে 'ঋক', 'সাম' (তৎসংগে জ্ঞান, উৎকৃ, গীত, অত্র প্রকৃতি উল্লেখ করা হইতে পারে) কথা দুইটির ছিল যে তাত্ত্বিক অর্থ, অন্তরে এক একটা বিশেষ আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সংস্কাররূপে যে তাহারা বিন্যস্ত হইত, তাহা নিঃসন্দেহেই এক রকম বলা যায়। তারপর উপনিষৎ ও যখন বলিতেছেন 'তুনি, "অয়ং বেদে", বায়োজিৎস্বয়, সামানি আদিত্যং—তখন কি এই ধরনের কথাটা কিছু বুঝায় না যে, বাঁহারা অতির সাধক তাঁহাদের ছিল ঋকমন্ত্র, বাঁহারা বাঁহারা সাধক তাঁহাদের ছিল যজুঃমন্ত্র আর বাঁহারা আদিত্যের সাধনা করিতেন তাঁহাদের ছিল সাম মন্ত্র? এই এক একটা সাধন পথের বিশেষত্ব, অধি বাহু আদিত্য এই সব রূপক বা মতৌকের অর্থ কি, তাহা আর আমরা এখানে আলোচনা করিব না। বেদের বিভাগ সাধনপথের বিভাগের দ্বারা নিম্নলিখিত হইয়াছে কি না, সেই সমস্যাটা তুলিয়াই আমরা নিম্নত হইব।

সে বাহা হউক, বেদ বেদন চারিভাগে বিভক্ত, তেমনি প্রত্যেক বেদও আবার কয়েকটি অংশে বা পর্কে বিভক্ত। প্রথমে, প্রত্যেক বেদের আছে মোটামুটি দুইটি প্রধান অংশ, এক 'সংহিতা' আর এক 'ব্রাহ্মণ'। সংহিতা হইতেছে মন্ত্রমণ্ডল, মূলবেদ। ব্রাহ্মণ এই মূল মন্ত্রেরই ভাষা, ব্যাখ্যা, বা নূতন সংস্করণ। ব্রাহ্মণে আবার তিনটি ভাগ পাই—আঙ্গন ব্রাহ্মণ, ঋণ্যগণ ও উপনিষৎ। বৈদিক সাধনার যে সব সাধনার অন্তর্ভুক্ত উপলব্ধি, দেবতাদিগকে পূজা করিবার, প্রকাশের কথার ভিত্তি যে সব মন্ত্র, তাহা লইয়া

সংহিতা। আর সে সতলের মধ্যে যে অষ্টদশ ক্রিয়াকলাপ বাগ্যজ্ঞানের উল্লেখ আছে, তাহাদের বাহ্য বিবরণ, প্রকৃতিবিদ্যা এবং বেদের পরিচয়, ধর্ম, মনঃসাধনা প্রভৃতি দিচ্ছে ব্রাহ্মণ। উপনিষদ হইতেছে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা, বাস্তবিক অষ্টদশ ক্রিয়াকলাপের পরিচয় করিয়া শুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের কথা। সংহিতা অধ্যায় বিচার রূপের দিকে জ্ঞানের দৃষ্টিতে, আর উপনিষদ দ্বারা অধ্যায় বিচার স্বরূপের দিকে। আরণ্যক হইতেছে ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের সংমিশ্রণ। তবে দাঁড়াইল এই যে, বেদের প্রথমভাগ সংহিতা, সংহিতার পরে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের শেষভাগে আরণ্যক ও আরণ্যকের শেষভাগে, বেদের পরিশিষ্ট উপনিষদ বা বেদান্ত। কোথাও অবশ্য দেখি আরণ্যক হইতেছে ব্রাহ্মণের নামান্তর (যেমন “ইতরক্বেদ আশ্বক”—এইখানেই আছে ঋগ্বেদ সংহি ১৫ পরিচয় আশ্বক)।

প্রত্যেক বেদের এই যে চারি পর্যায়, সাধারণতঃ বলা হয়। থাকে তাহা নির্ণীত হইয়াছে। আশ্রম বিভাগ অনুসারে। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে যখন স্বাধীন জীবনের দশ, তখন মনঃসাধনের উপরই গৌরব দেওয়া হইত বেশী, কারণ উহার সকল জ্ঞানের মূল প্রতিষ্ঠা, উহারই মধ্যে রহিয়াছে জীবনের আদর্শের বিনিময়, মূলতন্ত্র। তারপর গৃহস্থাস্রমে প্রবেশ করিয়া যে সব বৈদিক আচার অষ্টদশ ক্রিয়াকলাপ করিতে হইত, তাহা হইয়া ব্রাহ্মণ। তারপর বানপ্রস্থ যখন বাহ্য কর্ম্মাষ্টদশ সকল সম্পাদিত হইয়া আসিত, তাহাদের মানসিক প্রতিক্রিয়া মনঃসাধনা চলিত, সেই অরণ্যবাসের সময় আরণ্যকের স্থিতি ও চর্চা। সর্বশেষে চতুর্থ বা বৃদ্ধি আশ্রমে যখন কর্ম্মাষ্টদশ পরিচালিত করিয়া, মানসিক রূপকারিগণকে ছাড়িয়া—মৈত্রী তর্কণ মিত্রতাপনীয়—যান ধারণা সমাপিত দ্বারা চরম সত্য,

শুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইত, তখনই উপনিষদের উদ্ভব ও আশ্রমোদ্য।

কিন্তু তা ছাড়া, সময়ের সাথে সাথে বৈদিক সাধনার যে ক্রম পরিবর্তন ঘটয়াছে, তাহারই মোটামুটি কয়েকটি ধাপ নির্দেশ করিতেছে এই পঞ্চায়াশি ভাগ, একথাও বলা হইতে পারে। আরণ্যক অর্থ কোথাও ব্রাহ্মণ, কোথাও উপনিষদ তাই বৈদিক সাধনাকে যুগ হিসাবে তিনটি স্তরে আমরা দেখিতে পারি, (১) সংহিতা (২) ব্রাহ্মণ (৩) উপনিষদ। সংহিতার সাধনা হইতেছে দেবত্ব লাভ। দেবত্ব হইতেছে, বিশ্বাত্মিক যে অনন্ত অণুও সত্তা জ্ঞান আনন্দ তাহার বিশ্বব্যাপী (cosmic) এক একটি প্রকাশধারা। আবারের প্রতি স্তরের, অপর স্তরভাষ্যে প্রাকৃত রূপ শুদ্ধ শুদ্ধ করিয়া তাহাদের মধ্যে বিশ্বদেবতার স্বরূপের লীলা ফুটাইয়া তোলাই হইতেছে দেবত্ব লাভ। এই সাধনার যে সব ক্রিয়া, তাহারিগণকে বারংবার দিয়া দৃঢ় অষ্টদশে বান্ধিয়া তোলাই হইতেছে ব্রাহ্মণের সাধনা। আর উপনিষদের সাধনা হইতেছে দেবত্বের প্রকাশ তাহার মধ্যে ভূমি বায়ু, আবারের মূল দেবত্ব। তাহার মধ্যে ভূমি বায়ু, আবারের মূল দেবত্ব। শক্তির অবতরণ ততপানি নয়, কিন্তু আবারের বায়ু মূল কেন্দ্র, বাহ্যকে বলা হইয়াছে “মণ্ডলীভাষ্যে” পুরুষঃ সবা জনানাং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ—সেই মণ্ডল-পুরুষকে আবারের উপরে যে মহান পুরুষ তাহার সহিত মিলিয়া দেওয়া; বিশ্বের মধ্যে দেবতার প্রকাশের পূর্ণতা যে চাই বিশ্বাত্মিক দেবত্বের চরম সত্য ও একশ্রু উপলব্ধি করা।

কিন্তু যুগভেদে একের পর আর একটি এই তিনটি সাধনার উদ্ভব হইয়াছে—মোটামুটি একথা সত্য হইলেও, আসলে ঐ তিনটি ধারাকে এককম কাটাছাঁটা ভাবে দেখা যোঁক হয় ঠিক নয়। অনেক

উপনিষদ অনেক ব্রাহ্মণের অপেক্ষা পুরাতন এবং সংহিতার কোন কোন অংশ কোন কোন ব্রাহ্মণের বা উপনিষদের অপেক্ষা অধীনত। ব্যাপারটিকে তাই আমরা এই ভাবে দেখিতে চাই, যে প্রথমে ছিল সংহিতা অর্থাৎ সংহিতার প্রাচীনতম ময়গত, তার পর সংহিতা ছাড়া ধর্মায় পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে, (১) ব্রাহ্মণ ও (২) উপনিষদ। ব্রাহ্মণ সংহিতার যে বাহন ক্রিয়াকলাপ তাহারই উপর বোর দিয়াছে, আর উপনিষদ ভিতরের একবারে গোড়াকার যে মূল তত্ত্ব-জ্ঞান তাহা লইয়াই ব্যাপ্ত হইয়াছে। অবশ্য উত্তর-কালে সংহিতার বাহ্য দিকটাই লোকের চোখে পড়িয়াছে, ব্রাহ্মণের বৈদ্যের বাহ্যিক ভাব লইয়াছেন এই জন্য; কিন্তু উপনিষদ বৈদ্যের যে মূল আধ্যাত্মিক উপলব্ধি তাহারই বাহ্য অঙ্গুলি রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। এই জন্যই উপনিষদকে বলা হয় বেদের “জ্ঞানবাক্য” আর সংহিতা ও ব্রাহ্মণের নাম দেওয়া হয় “কর্ম্মবাক্য”।

সকল বেদের মধ্যে ঋগ্বেদ এবং যজুর্বেদের মধ্যে ঋগ্বেদ সংহিতাই সর্বপ্রাচীন (তবে ইউরোপীয় গণিতেরা যেমন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন হয় দশম মণ্ডলটি কিছু পরবর্তী কালের)। শুধু তাই নয়, আজ্ঞা সংহিতার মধ্যে ঋগ্বেদের বহু শ্লোক, শ্লোকের পর শ্লোক বহু বহু বাৎসরিক পরিবর্তন করিয়া ভূমি বায়ু হইয়াছে দেখা যায়। এবিষয়ে সামবেদই ঋগ্বেদের কাছে বিশেষ ধর্মী। সামবেদ নতুন করিয়া সাধারণ ঋগ্বেদেরই সংস্করণ, এরকম বর্ণিলেও খুব সত্যাক্তি হয় না। এই জন্য মতান্তরে প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে যে কুপেদ অপেক্ষা সামবেদই প্রাচীনতম—সামবেদ সংহিতাই প্রাচীনতম মূল সংহিতা।

ঋগ্বেদ সংহিতাকেও ভাগে ভাগে ভাগ করিয়া সাজান হইয়াছে—আধুনিক গ্রন্থসমূহে যে রকম পত্র, পরিচ্ছেদ ইত্যাদি থাকে, সেই রকম এই যে মূল্যে ইহার আচ্ছাদিত হইতে পছন্দ, সমগ্র সংহিতাকে দশটি খণ্ডে বিভক্ত করা হইয়াছে, প্রত্যেক খণ্ডকে বলা হয় মণ্ডল। তারপর প্রত্যেক মণ্ডল ভেঙে গুচ্ছে

সজ্জিত শ্লোকমালায় বিভক্ত। এক একটি শ্লোক-গুচ্ছে হইতেছে এক একটি “যজুঃ”। প্রত্যেক শ্লোকের বা মন্ত্রের নাম “মন্ত্রক”। ঋগ্বেদের মণ্ডল বিভাগ হইয়াছে মোটামুটি এক এক ধর্মী ধর্মী, যেমন দ্বিতীয় মণ্ডল হইতেছে গৃহদান ও তদবংশীয় ঋগ্বেদের, তৃতীয় মণ্ডলের ধর্মী বিশ্বামিত্র, চতুর্থ মণ্ডলের বামবেদ, পঞ্চম মণ্ডলের অজি, ষষ্ঠ মণ্ডলের ভদ্রাঙ্গ, সপ্তম মণ্ডলের বশিষ্ঠ, অষ্টম মণ্ডলের প্রগাথা। সমগ্র নবম মণ্ডল হইতেছে শুধু সোমদেবতার উদ্দেশ্যে। প্রথম ও দশম মণ্ডলে নানা ধর্মী দেখিতে পাই। এক একটি যজুঃ এক একটি বিশেষ দেবতা বা সেই দেবতার সহিত সম্মিলিত একাধিক দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত মন্ত্রাবলী। ঋগ্বেদ বিভাগের এই রকম পদ্ধতি ছাড়া আর একটি পদ্ধতি আছে। সমগ্র সংহিতাকে আটভাগে ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেক খণ্ডের নাম এক একটি অষ্টক। প্রত্যেক অষ্টক আবার অধ্যায়, অধ্যায়, বর্ণে বিভক্ত। কিন্তু কি লক্ষণ অনুসারে এই বিভাগ করা হইয়াছিল, তাহা নির্ভর্য্য কথা কঠিন।

সে বাণী হইক, বেদের বাহিরের পরিচয় দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমাদের লক্ষ্য বেদের অন্তরের পরিচয় দেওয়া। এতকাল বেদ গ্রন্থতাত্ত্বিকেরই গবেষণার বিষয় হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু বেদের আছে একটা ভৌগোলিক সত্তা, যে দেখে যে কালে হইক না কেন, নাহকে একটা হস্তর লিখিত উদ্ভিগা পাঁড়াবিহার লক্ষ্য ও সাধনা যে বেদ দিতেছে, তাহাই বেদের আসল পরিচয়। জ্ঞানের আর আশ্রিত্রি নিম্নানন্দের কলগণত মাহুয় চিরকাল যে স্বপ্ন দেখিয়া আসিয়াছে, সকল বি বায়ুর মধ্য দিয়া যে মহান আদর্শের চিহ্নন সে ছুটিয়া চলিয়াছে—“বাহা নিয়া আমি অমৃত পাইব না তাহা দিয়া আমি কি করিব?”—মাহুয়ে অগ্রগাম্যার এই যে অমৃতত্ব পিপাসা, তাহার পূর্ণ ভূমি যেখানে ও বাণী দিয়া, সেই রূপের রূপে আধার—রায়ে অবান—সেই মহান অর্জন—বাহা অর্জন—হইতেছে বেদ। বেদমন্ত্র বাহার অন্তরে এই দিব্যত্বা জাগিয়া উঠে, তাহারই বেদপাঠ সাধক।



বঙ্গসাহিত্যে সমাজতত্ত্বীয় অনুসন্ধান।

লেখক—ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, এম.এ., এম.টি.এস. [

—১০১—

মানবসমাজ বর্তকণ্ডল নিয়মাহুসারে চলে। বিশৃঙ্খল ও কার্যকারণবহীন ইহা। কখনও সমাজ থাকিতে পারে না। যে প্রকার প্রত্যেক ঘটনার একটি কারণ ও কাৰ্য্য থাকে, তদ্রূপ সমাজের প্রত্যেক কার্যের ও প্রত্যেক অঙ্কনের কারণ আছে এবং সমাজ নিশ্চিষ্ট নিয়মাহুসারে উৎপত্তিলাভ করে, বৃদ্ধি ও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। সমাজের এই নিয়মগুলির পথ্যবেক্ষণ ও কারণ নির্ধারণ করাকে সমাজবিজ্ঞান বলে। কোন কোন পুরাতন পণ্ডিতের মত এই যে, মানবসমাজের গতি একটি বিজ্ঞানাহুযায়ী ধারায় চলে না; কিন্তু লেস্টার ওয়ার্ড (Lester, Ward) ও তাহার শিষ্যেরা ইহা নির্ধারণিত করিয়াছেন যে, মানবসমাজের বৃদ্ধি ও ক্ষয় নিয়মবশীল হইয়া চলে, এবং সমাজতত্ত্ব একটি বিজ্ঞান বিশেষ। এক্ষণে এই মতট প্রচলিত হইয়াছে।

সমাজবিজ্ঞান অর্থে শুদ্ধ সমাজের অধ্যয়নগুলির কাৰ্য্যপদ্ধতি নিরূপণ করার পথ্যবসিত নহে; নৃতত্ত্ব (anthropology), জাতিতত্ত্ব (ethnology) জাতীয় মনস্তত্ত্ব (Social psychology) অথবা race psychology, ইতিহাস প্রভৃতিও এই বিজ্ঞানের অন্তর্গত হয়। কারণ যে সব অধ্যয়ন মানবের সামাজিক জীবনে প্রয়োজন, তাহারই সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্গত। পঞ্চাশত্রে, আবার ইহাও বলা যায়, যাহা মানবের জীবনে প্রয়োজন তাহা নৃতত্ত্বের অধ্যয়নের বস্তু। এইজন্ম সমাজবিজ্ঞানকে নৃতত্ত্বের অন্তর্গত বলা যাইতে পারে, এবং নৃতত্ত্বকেও সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্গত বলা যাইতে পারে।

একটি জাতির সমাজ-বৈজ্ঞানিক তথ্য নিরূপণ করিতে হইলে তাহার রীতিনীতি, চালচলন, আচার ব্যবহার, চিন্তা, শিক্ষা-চর্চা, ধর্ম, সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদির বিশ্লেষণ করিয়া নির্ধারণিত করিতে হয়।

জৈষ্ঠ ১৩৩২]

বঙ্গসাহিত্যে সমাজতত্ত্বীয় অনুসন্ধান

১০১

তাহার সমাজের মধ্যে সে সব আচার ব্যবহার, চিন্তা-পদ্ধতি ও শ্রেণীসংগ্রাম ক্রমাগত চলিতেছে, তাহা কোন নিয়মাহুযায়ী ধারায় চলিতেছে, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে সেই জাতির মধ্যে বসবাস করিতে হয়। কিন্তু এ স্থলে আমি বাংলাভাষীর সমাজ-বিজ্ঞানের যৎকিঞ্চিৎ তত্ত্ব বাংলা সাহিত্যের মধ্যে যাহা প্রতিভাসিত হইয়াছে, তাহারই অধ্যয়নের চেষ্টা করিব।

বঙ্গভাষীর সমাজতত্ত্বের আলোচনা করিবার পূর্বে তাহার জাতি (race) নির্ণয়ের প্রয়োজন। কারণ বঙ্গভাষী কোন মানব জাতির শাখা, অথবা কোন কোন জাতির রক্ত তাহার মননীতে প্রবাহিত হইতেছে, বাঙ্গালী উত্তরাধিকার ক্ষত্রে সেই সব জাতির কি কি প্রকারের অধ্যয়ন ও মনস্তত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা নির্ধারণিত না হইলে বর্তমান “বাঙ্গালীর” সমাজ বোধগম্য হইবে না। এইজন্ম সর্লপক্ষে যে বাংলা নৃতত্ত্বের আলোচনা প্রয়োজন।

“বাঙ্গালী” কোন জাতি, এ প্রশ্ন একটি হাস্যপ্রদ বাক্য! ভারতের অস্মাজ প্রদেশের কোন কোন লোকের কাছ হইতে এই প্রশ্ন শ্রবণ করা গিয়াছে যে—“বাঙ্গালী কোন জাতি”? ইহার প্রত্যুত্তর সাক্ষেপে দেখা যায়, যে তাহারা কোন “জাতি”! এই হাস্যপ্রদ বাক্যের নিরাকরণ করিতে হইলে প্রথমে স্থির করিতে হয়—“বাঙ্গালী” কে? প্রথমতঃ ভারতবর্ষে চলিত ভাষায় “বাঙ্গালী” অর্থে বঙ্গভাষী হিন্দু অর্থাৎ যেহ, বহু, দাস, বন্দোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি নামধারী বাঙ্গালিদের সমষ্টি; বাঙ্গালার রাজপুত্র ও অস্মাজ বর্ণের লোকেরা বহু শতাব্দী ধরিয়া বঙ্গ বসবাস করিলেও, তাহার অনেক স্থলে নিজেদের বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দেন না। তদুপরি বাংলার মুসলমানেরা, ঐংরা সাংখ্য শতকরা ৪৩ জন লোক এবং তাহারা দোহ, বহু,

বাড়ুয়ে, চাটুয়ে দলের চেয়েও বঙ্গের প্রাচীন অধিবাসী, তাহার নিজেদের “বাঙ্গালী” বলেন না। “বাঙ্গালী” নামের এই চলিত অর্থ হইতেছে, সামাজিক অর্থ, অর্থাৎ বঙ্গালসেনের সমাজ পদ্ধতির বহির্ভূত বাঙ্গালী বাঙ্গালী নন। কিন্তু নৃতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্ব (ethnology) হিসাবে আমাদের পথ্যবেক্ষণের প্রয়োজন—“বাঙ্গালী” বলিলে কাহারের বুঝায়; এবং ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়াও দেখা প্রয়োজন, যে নৃতত্ত্ব হিসাবের “বাঙ্গালী” ভাষাতত্ত্বের গভীর অস্তিত্ব হয় কি না!

নৃতত্ত্ব হিসাবে বাঙ্গালীর জাতি (race) নিরূপণ করিতে হইলে শারীরিক নৃতত্ত্বের (physical anthropology) শরণ করা প্রয়োজন। এক্ষণে প্রধান হোতা Herbert H. Risley. আমি শারীরিক নৃতত্ত্বের অধ্যয়নের জন্ম তাহার “Tribes and Castes of Bengal” নামক পুস্তকে যে সব বাঙ্গালী জাতি সমূহের শারীরিক মাপ (physical measurements) দিয়াছেন, সেই উপকরণ (data) গ্রহণ করিয়া নৃতত্ত্বের নূতন পদ্ধতি অহুসারে biometric analysis করিয়া যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। বাকী থাকে রাঘবাহুহর গুপ্তের যৎসামান্য মাপবেশ, যাহার উল্লেখও এই স্থলে করিতেছি ও অধ্যাপক রমাপ্রসাদ চন্দ্রের মাপবেশ (measurements), আর I. B. Davis-এর বাঙ্গালী skull-এর মাপ।

নৃতত্ত্ব একটি অদ্বিসংবহীন ব্যাপার; এ বিজ্ঞানও অতি নূতন, এক্ষণেও স্বীয় পদোপরি দণ্ডায়মান হয় নাই। শারীরিক নৃতত্ত্ব আজকাল জীবতত্ত্বের (Biology) পঞ্চাং গমন করে, এবং নূতন চং অহুসারে জীবতত্ত্ব সংজ্ঞাস্ত অধ্যয়ন (biometry) ইহাতে ব্যবহৃত হইতেছে। এই-

টুইই হইতেছে ইহার মধ্যে আত্মকাল বিজ্ঞান, আর বাকী পুরাতন মতামতগুলি হইতেছে কতকগুলি “আমছে” hypotheses—যথা, জাখান স্বদেশ-প্রেমিক নূ-বৈজ্ঞানিকেরাও (PanGermanists) স্থির করিয়াছেন যে, উত্তর ইউরোপের blond যোকেরা অর্থাৎ নীল চক্ষু, কটা চুল, লম্বা মাথা ও লম্বা নাক বিশিষ্ট মনুষ্যেরা, যাহাদের Germans বা Teutons বলে তাঁহারা খাটি “আখা”। কিন্তু করাসী, কৃষ্ণ ও ইতালীয় বৈজ্ঞানিকেরা তারম্বের তাহার প্রতিবাদ করেন, আর তাঁহারা আখা জাতির অল্প ব্যবস্থা করিয়াছেন। জাখান ভাষাতত্ত্ববিদেরাও স্বজাতির নূ-বৈজ্ঞানিকদের এ মত সমর্থন করেন। কলে হয় যে, এ ব্যাপার লইয়া ইউরোপে একটা আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক দ্বন্দ্ব উদ্ভিত হয়, যাহাকে Aryan controversy বলে। এই অস্বস্তি আখাজাতির স্বরূপ নির্ণয়ের বিবাদের ইতিহাস এক মহাভারতের ব্যাপার, সে সংখ্যক কবি নির্দোষিত হইবে তাহা নিরূপণ করা অসম্ভব, হয় ত জগতে এ বিবাদ কখনও মিটিবে না! তবে এইটুকু জানি, যে জাতির (nation) কামান, বসক ও রণপোতের বহর বেশী, সেই জাতিই নিজেই আখাদের শাবীর প্রতিষ্ঠা করিতে পারে! বেচার্য মোক্ষমল্লার এই “আখাজাতি”কে আবিষ্কার করিয়া শেষে কি মুশ্লেই পড়িয়াছিলেন! তাহার প্রথম অধ্যায়, তিনি বাঙ্গালী কুবক ও ইংরেজ Tommy Atkinsকে এক রক্ত-সম্পর্কীয় বলিয়া ছিলেন, দ্বিতীয়তঃ ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতিদের (nation) এক রক্তের লোক (one race) বলিয়া ছিলেন; তিনি মুড়ি মিছিরির একদর করিয়াছিলেন, ইহাও কি imperialistদের সহ হয়! বেচার্য শেষে নিরুপায় হইয়া স্বীকার করিয়া নিম্নত পান, যে তিনি “আখাজাতি” নৃতত্ত্ব অর্থে ব্যবহার করেন

নাই, ভাষাতত্ত্ব অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই প্রকার বহুতর “খোলাই” পুরাতন নৃতত্ত্বের অস্বীকৃত হইয়াছিল এবং তাহার ফলও অতি বিষময় হইয়াছে; যথা, জাতিগত ঐশ্বর্য, দ্বন্দ্ব, অবিচার ইত্যাদির উদ্ভব হইয়াছে। ভারতবর্ষও এই বিষয়ের ফলভাগ করিতেছে। পরলোকগত রিসলি এই বিষয়ক ভারতের সমাজশরীরে প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। ইহার ফলেই উপরোক্ত “বাঙ্গালী কোন জাতি”রূপ উদ্ভট প্রশ্নের উত্থাপন হয়। ইহার ফলেই পাঞ্জাবী বাঙ্গালীকে Mongolo-dravidian বলিয়া গৃহ্য করে, ইহার ফলেই ভারতে একটা Dravidian problem উদ্ভূত হয় ও কোন কোন আবিষ্কারীরা উত্তরভারত “আখা” হইয়া ভারত বর্ষে আর্ঘ্যসন্ধান আছে অশ্বণ করিলে দ্বন্দ্বই শেল বিদ্ধ হয়।

যাহাই হউক, বাঙ্গালী কোন জাতি এ প্রশ্নের অবতারণা করিবার পূর্বে কতকগুলি কথা বলিবার প্রয়োজন আছে। যাহারা ভারতের জাতি নির্ণয় করিবেন, তাঁহারা বেন রিসলির Aryo-dravidian, Mongolo-dravidian ইত্যাদি জাতিজ্ঞাপক শব্দ চুলিয়া নান। এই প্রকার অর্থবিহীন নাম ব্যবহার করার বিরুদ্ধে Crookes পূর্বেই প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কথা এই যে, সব দোশটা রিসলির নহে, তৎকালে নূ-বিজ্ঞানের বিদ্যাও বেশী ছিল না, তাহার উপর রিসলি নিজের hypothesis (মত) দিয়া তাহাকে আরও কিছুতরিকাকার করিয়াছেন। এবিষয়ে তাঁহার গল্প যে, ইউরোপের প্রধান প্রধান নূ-বৈজ্ঞানিকেরা তাঁহার সহিত একমত হইয়াছেন। কিন্তু ব্যাপারটা এই যে Kollmann, Tapinard ও Emil Schmidt তাঁহার সহিত এইমাত্র একমত হইয়াছিলেন যে, ভারতীয়দের মধ্যে তিনটি বিভিন্ন জাতির রক্ত বর্তমান আছে (the racial elements), কিন্তু তাঁহারা এই কিছুতর নামের সমর্থন করেন নাই। এই সব নামেতে রিসলি ইহাই বিশ্বাসাচ্ছিনেন, যে ভারতের স্থানে স্থানে, যথা বাংলায়, ত্রাণ্ডি ও মঙ্গোলীয় জাতিদ্বয়ের রক্ত বর্তমান আছে। কিন্তু এক্ষণে নূ-বিজ্ঞানে এই প্রশ্ন উঠিতেছে যে, “হাটিক” বলিলে কাহাদের বুঝায় ও তাহাদের শারীরিক স্বরূপ কি, “আখ্যের গোলমান” অগ্রেই বিবৃত করিচ্ছি; নঙ্গোলীয় অর্থে কাহাকে বুঝায় ইত্যাদি।

এক্ষণে শারীরিক নূ-বিজ্ঞানে জীবতত্ত্বীয় নিয়মাবলী (biological principles) ব্যবহৃত হইতেছে। বিভিন্ন জাতির সমীচরণে কি দশকরের মারফের উৎপন্ন হইতেছে, তাহা Mendelian principle অনুযায়ী কি ফল হইতেছে, hybridism নিয়মানুযায়ী কি প্রকারের মিশ্রণ হইতেছে, এই সব পর্যবেক্ষণের ফলে জীবতত্ত্ব আত্মকাল race বলিয়া শব্দ ব্যবহৃত হয় না, কারণ এ কথাটার একটা সঠিক ব্যাখ্যা হয় না। নূ-বিজ্ঞানেও সেই কারণে এই শব্দ লোপ পাইয়াছে। এক্ষণে race-এর বদলে bio-type, যাহা উদ্ভারদিকারিত্বকে অপর্যবর্তনশীল, ও যাহা হইতেছে একটা জাতির শারীরিক স্বরূপ (permanent physical character), phenotype, প্রত্যেক মনুষ্যের ব্যক্তিগত আকৃতি (man as he looks) প্রকৃতি শব্দের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। এই বিধি অনুসারে স্থিরীকৃত হইয়াছে, যে কোন একটি বিশিষ্ট মনুষ্য-সমষ্টিতে নানা প্রকারের biotype বর্তমান আছে। কারণ biometric অংশাংশ দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, এই বিশিষ্ট সমষ্টি যদি বিন্দু (homogeneous) হয়, তাহা হইলে তাহার indices-এর curve অঙ্কিত হইলে binomial theorem অনুসারে একটি polygonal curve

অঙ্কিত হইবে। কিন্তু এই প্রকারের curve জীবজগতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সেই জন্য বলিতে হইবে, যে জগতে বিন্দু জাতি (homogeneous racial type) নাই। এই পদ্ধতি অনুসারে দেশা যাহা যে জগতে অল্প biotype আছে; এবং “আখা” বা “মঙ্গোলীয়” জাতিগতক শব্দ ব্যবহৃত হইলে কোন অর্থ হয় না, কারণ আখাজাতিদের মধ্যে বহু প্রকারের biotype আখাজাতিগতক করিতেছে, মঙ্গোলীয় ও ত্রাণ্ডিদের মধ্যেও তদ্রূপ। সেইজন্য race-এর উৎপত্তির অস্বরণ করিতে বাইলে অকূল পাথার দেখিতে হয়। ইহা হইল শারীরিক নূ-বিজ্ঞানের কথা; কিন্তু জাতি-বৈজ্ঞানিকেরা (ethnologists) একথা মানেন না। তাঁহারা বলেন, নূ-বৈজ্ঞানিকেরা গোষ্ঠাকৃত লোকের শরীর মাণিয়া গোষ্ঠাকৃতক জাতি (racial type) আবিষ্কার করেন! শারীরিক বিভিন্নতা range of variation দ্বারা ইং সংগঠিত হয়।

একটা বিশিষ্ট সমষ্টিতে যে নানা প্রকারের বিভিন্নতা থাকে, তাহা তাঁহারা range of variation-এর স্বত্বগত বলিয়াই নিশ্চিন্ত করিতে চান। কিন্তু তাঁহাদের এই যুক্তি biologyর নিয়মানুসারে বৈজ্ঞানিক নহে।

যাহাই হউক, নূ-বিজ্ঞানের এই গৌরচক্রিকা করিয়া আমাদের বাঙ্গালীর জাতীয় স্বরূপ নির্দ্ধারিত করিতে হইবে। আমার data রিসলির নিকট হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। রিসলির data, absolute নহে, বাংলার গোটা কতক জাতির (caste) মাপ তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাহারও মধ্যে যে জাতির মধ্যে বেশী মাণিয়াছেন তাহার subjectরা একশতের বেশী যায় নাই। তার পরে এই subjectদের যথাবিহিত বিভাগ করা হয় নাই, যথা, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের দলে তিনি বাংলার

নানা প্রকারের ব্রাক্ষণকে মিশ্রিত করিয়াছেন। এমনকি বাঙ্গালী ব্রাক্ষণের তালিকায় তিনি “পাণ্ডে” নামক এক ব্রাক্ষণকে গননা করিয়াছেন। এই সর্বের জন্ত তাঁহার পদ্ধতি পূর্ব বৈজ্ঞানিক বলা যায় না। তৎপরে বাঙ্গালী প্রদেশের নানা প্রকারের জাতিকে (বাঙ্গালী ব্রাক্ষণ হইতে পাছাড়া পর্যন্ত) মাপ করিয়া, তাহাদের *indices* একত্র করিয়া একটা average করিয়া, তিনি তাঁহার কল্পিত “Mongolo-dravidians” জাতিমূলক “বাঙ্গালী”কে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই average indices দ্বারা একটা কল্পিত জাতি (hypothetic race) সৃষ্টি করা শুরাতন ন-বিজ্ঞানের বিশেষ দোষ ছিল এবং এক্ষণে তাহা অগ্রাহ্য হয়। এক্ষণে একটি সমষ্টিগত বিশ্লেষণ করিয়া তাহার বিভিন্নতা (different racial elements) নির্ধারণ করিতে হয়। তৎপরে একটি সমষ্টির বিশ্লেষণের ফলের সহিত আর একটি সমষ্টির বিশ্লেষণের ফলের তুলনা করিয়া সেই স্থানের সাধারণ common biotype নির্ধারণ করিতে হয়। তবে অল্প কতিপা আমি দেখিয়াছি, যে প্রত্যেক সমষ্টির যেটি average index number বাহির হইয়াছে, সেই চিরসংগলিত biotypeটি সেই সমষ্টির মধ্যে বিশেষ ভাবে বিরাজমান। এই পদ্ধতি অনুসারে আমি রিসলির মাপ লইয়া বাংলায় কতকগুলি জাতির (caste) biometric বিশ্লেষণ করিয়াছি, তাহা এতলে সম্বাস্তব না বর্ণনা করিয়া

মোটামুটি ভাবে বলা যাইতে পারে যে, বাঙ্গালী ব্রাক্ষণের মধ্যে লম্বা মাথা ও নাক বিশিষ্ট ব্যক্তি (Dolichoid—leptorrhine) শতকরা ২২.০০ ; কাহ্নের ভিতর এই এই চিরুদ্বারী শতকরা ৩০ ; গোয়ালার ভিতর ১২.০৫ ; সংগোপের ভিতর ২৩ ; কৈবর্তের ভিতর ১১, চণ্ডালের ভিতর ১৫। গোল মাথা—লম্বা নাক (brachycephal leptorrhine) বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্রাক্ষণের মধ্যে শতকরা ১৩ ; কাহ্নের মধ্যে ১৭ ; গোয়ালার মধ্যে ৫ ; সংগোপের মধ্যে ৪১.৬ ; কৈবর্তের মধ্যে ২ ; চণ্ডালের মধ্যে ১২। লম্বা মাথা—মাঝারি রকমের নাক (dolichoid-mesorrhine) ব্যক্তি ব্রাক্ষণে শতকরা ৪০ ; কাহ্নে ৩৮ ; গোয়ালায় ৫৮.৫৩ ; সংগোপে ৫০ ; কৈবর্তে ৫৪ ; চণ্ডালে ৫১। আর লম্বা মাথা—খেবড়া নাক (dolichoid-chamaerhine) বিশিষ্ট ব্যক্তি কৈবর্তে শতকরা ১১ ; চণ্ডালে ৯ ; আর ব্রাক্ষণে ২ ; কাহ্নে ১ ; গোয়ালায় ৭ ; সংগোপে ৪। গোল মাথা—মাঝারি রকমের নাক (brachycephal mesorrhine) ব্যক্তি ব্রাক্ষণে শতকরা ১৫ ; কাহ্নে ১৪ ; গোয়ালাতে ৭ ; সংগোপে ১৪ ; কৈবর্তে ১৪ ; চণ্ডালে ১০। গোল মাথা—খেবড়া নাক (brachycephal chamaerhine) বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্রাক্ষণে শতকরা ১ ; কাহ্নে ০ ; গোয়ালাতে ২ ; সংগোপে ০ ; কৈবর্তে ৪ ; আর চণ্ডালে ৩।

ক্রমশঃ।

গ্রামের ছবি

—:—

১

জ্ঞানের বাতি জলে, আবার জ্ঞানের বাতি নিভিয়া যায়—যে স্থান যত পুরাতন, তাহার ইতিহাস তত এইরূপ পরিচ্ছদে পূর্ণ। একটি পুরাতন গ্রামে যাহা, তাহার ইতিহাসেও এইরূপ ক'ত পরিচ্ছদ! হঠাৎ-বিপ্লব ও প্রাকৃতিক বিপ্লবে মানবসমাজ অসুস্থ পড়ায় বহু না, ইহা বাহিরের কারণবাল—কিন্তু অন্তরের কারণজালে জটাইয়াও মানুষ পড়ত মত ঘুমায়া পড়ে। ইহার নব্বির অজ্ঞান দিবার প্রয়োজন নাই, একান্ত নিঃস্বচ্ছভাবে নিদর্শনরূপে আমি আমার গ্রামটিকেই আপনাদের সমক্ষে তুলিয়া ধরিতেছি।

আমি কতিপয় মূৰ্খ ও অন্ধবিশিষ্ট ভ্রমসংগম গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ইংলান্ড নিঃস্র, আমার জন্ম স্থানটির ছোট্টটি করিতেছে। মস্তর বংশের পূর্বে এই গ্রামেই বড় বড় মৌলবী ও বড় বড় পণ্ডিত গ্রামে অঙ্কন করিয়া, নিত্য বসবাস করিতেন, ইংল্যান্ডের উত্তম প্রাচীন ভ্রমসংগম পারস্ত ও সিন্ধুভূমি ভাষায় বাৎপত্তি লাভ করিতেন, কাম সাহিত্য ও শাস্ত্রচর্চার মুরতি হইয়া উঠিত।

স্বাস্থ্যে সকলেই পূর্ণাঙ্গ ছিলেন, কতিপয়কান হইতে উজ্জল গ্রাম বর্ণের দীর্ঘাকৃতি ভ্রমসংগম বিদ্যা ও বিনয়ের প্রতিমূর্তি ব্রাক্ষণ ও মুগ্ধমানস গ্রামে হারকসদৃশ প্রভা বিস্তার করিতেন; তাহাদের বিদ্যাকান্তি, ছটপুট গঠন, জ্ঞানোজ্জ্বল অন্তঃকরণ ওমানুষের বৃত্তিপট হইয়া কখনও নধর ভাববর্জিত

হয় নাই, গ্রামের নাগেরাও মহন্তব্য ও ব্রাহ্মণের জন্ম-জন্মও তাহাদের গৃহের লক্ষণী বর্জন করিত; তাহাদের শক্তিকেন্দ্র—জ্ঞানাহীণ, ঐশ্বর্য—উন্নত মন এবং সরল, নিবিড় ও নিষ্ঠাপূর্ণ হৃদয়ে তাহারা সর্বদাই ভরপুর থাকিতেন।

হঠাৎ ইংলান্ড শিকার-প্রাচুর্য্য হইল, দশমাইল বিশদাইল দূরে উচ্চ ও মহাইংলান্ড বিদ্যায় প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল, আমার গ্রামবাসী তাহা চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। বিদ্যার্জন মনোরঞ্জির অঙ্গুলীলনহেতু—অন্ন ও বস্ত্রের সংস্থান ও বৈষয়িক উন্নতিকল্পে অধীত বিদ্যা যে বিশেষভাবে আবশ্যক হইতে পারে, তাহা আমার প্রাচীন গ্রামবাসিগণ কল্পনাবলেই বুঝিতে সক্ষম হইতেন,—তীক্ষ্ণজ্ঞান ঐশ্বর্য্যপ্রভা তাহারা উপভোগ করিতে পারিতেন না, রক্তভাব তাহাদের কঠিন অংকরণে বাধার সঞ্চার করিত! ইংলান্ড পড়িয়া কে হাকিম হইল, তাহাদের নিকট সংবাদ আদিত, ইংলান্ড পড়িয়া কে মাসিক সহস্র মুদ্রা উপার্জন করিতেছে তাহা গল্প ও উপজালাকারে গ্রামবাসী ও গ্রামবাসিনীর কর্ণধারিত করিত, কিন্তু ইহা ছিল বৃদ্ধ গ্রামবাসিগণের শ্রুতিবৃকর ও শ্রবণ-যোগ্য গল্প ইতিহাস; তাহারা কেহই অপত্যাদিগকে ইংলান্ড বিদ্যাধ্যয়নে নিযুক্ত করেন নাই, সর্বদাকাল আশ্রয়ের বিষয় এই, অপত্যগণ বস্ত্রাশ্রয় পারস্ত ও সংস্কৃত বিদ্যাগ্রহণেও মনোযোগী হইতেন না, পাঠশালায় পাঠ শেষ করিয়া তাহারা গ্রামের শিরোভূষণ হইবার স্পর্ধা অর্জন করিতেন।

কিন্তু এ মাল বেণী দিন দেশের

বাঞ্ছারে বিকাইল না!—দেখ আমার গ্রামের মোহীও পণ্ডিত-বংশধরদিগের বুদ্ধি বদ্ধ করিয়া দিলেন, জমিদার উপযুক্ত পাঠ্য না পাইয়া বা পাঠ্য দেগিতে হইয়া তাহা প্রত্যাৰ্পণ না করিয়া নারোজ মহন্তগণ ও ব্রাহ্মসন্তর পণ্ডিত বাহ্যেয়াশু করিয়া দিলেন। গ্রামে উকীল ও মাস্তাবের কয় হয় নাই, উকীল ও মোকদর বাড়ী ছুটুটি অমর রজোভাণ্ড ও গ্রামের অস্থলীগনে স্থান পায় নাই, অগত্যা জমিদারের নিকট কান্নাকাটি ও বৃত্তিভাতা-দেহ বংশধরদিগের নিকট বাতায়ত করিয়া গ্রামবাসী নিজদ্রিগের কর্তব্য শেষ করিলেন। পাঠশালায় পড়ুয়াদিগের দ্বারা ইহা ভিন্ন অধিক আশা করা যায় না!—পঞ্চাশ বাট বৎসরের মধ্যে গ্রামে যে অব্যাহার আনয়ন করিয়াছে, তাহা দখিলে গ্রামের পূর্ণাবস্থা বলনা করিতেও ভয় হয়, মনে হয় বুঝি অসত্য বিবরণের উল্লেখ করিতেছি। বাইহ'ক, এখনও আমরা স্মৃতিতে গ্রামের পূর্ণাবস্থা বিশেষভাবে সাঙাইয়া রাখিয়াছি, আমাদের নিকট ইহা বিখ্যা নয়! ইহার কলে আমরা আজ ভিত্তারী, অসত্যের সকল বিশেষণই আমরা বহন করিতেছি, কিন্তু দেখিতেছি ইহার কলে আমাদের গ্রামে অপূর্ণ হিন্দু-মুসলমানসম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। পরস্পরের প্রতি এমন দহদ্রী অহংকরণ বৃদ্ধি আর কোথাও দেখিতে পাইব না।

২

আমাদের গ্রামের হিন্দু-মুসলমান এক বিশেষ বস্তু—গ্রামে বাসিয়া হিন্দু ও মুসলমানে যে নিবিড় সম্বন্ধ অস্থল করিয়াছে, ভারতের পূণ্য-স্থানে সে সম্বন্ধ-স্বা আশিও বর্তমান, এই প্রেমস্বরূপ পাগল হইয়াই মহাত্মা গান্ধী হিন্দু-ও-মুসলমান মিলনের কথা কহিত্বেছেন; ইহা না বৃত্তিগা সবাধিপণ্ডের পক্ষে পক্ষে নারীনির্ভাতন ও ধর্মাস্তর গ্রহণের সংবাদ পাঠ

করিয়া হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধ যদি অস্থল করিতে যাই, নিয়ত বৃত্তিক দংশনই হিন্দু-স্থবর জিয়া উঠিবে। এ জালা সময় সময় বন্ধ পাতিয়া বহন করিতে হয়, কিন্তু গ্রামের মর্ম্মকোষ হিন্দু ও মুসলমানের প্রীতি-কল্প জালা জুড়িয়া আমাদের এক অমর সম্বন্ধের কথাই বাজ করিয়া তুলে।

আমরা এক পাঠশালায় বেশাপাড়া করিয়া থাকি; গ্রামের প্রত্যেক মুসলমানই ভদ্র গৃহস্থ, প্রত্যেকেই শিশুদিগকে বিভাজন করিতে বাধ্য করিয়া থাকেন—মুসলমানের ছেলে ও হিন্দুর ছেলে এমসঙ্গে দিয়া এখন যে বিভাজ্যাস করিয়া থাকে, তাহার উপর নব্য মুসলমানেরা কটাক্ষপাত করিত্বেছেন; পূর্ববঙ্গের মুসলমান হিন্দু বংশ নিশেধ করিবার শক্তি-পুঞ্জায় প্রমত্ত হইয়া, যে নব্য মুসলমান ভাব সম্বন্ধে সময় সময় উদ্ভুদ্ধ হইয়া উঠেন, বাংলার মাটিতে তাহার উত্তাপ অচিরে নষ্ট হইয়া যায়—পশ্চিমবঙ্গে তাহার উত্তাপ কতিয় পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে জন্ম এক গ্রামে আমরা হিন্দুও মুসলমানের ছেলে সমবয়সেই নামস্তা পড়িয়া থাকি, গুব উচ্চকণ্ঠেই আমরা শতকিছা ও গণাকিছা পাঠ করি, গুব উৎসাহভরেই আমরা শুভকীর অক শিখা করি, ইহাতে হিন্দু-মুসলমানে প্রতিযোগিতা নাই, আছে সোভানে ও স্বভাভে—সোভান ভাল পড়ুয়াকি স্বভাভ ভাল পড়ুয়া ইহা লইয়া মালাপরি পণ্ডিত হইয়া যায়, পাঠশালায় সকল ছেলে চারিদিকে দাঁড়াইয়া এইরূপ মন-বুদ্ধ দেখিয়া থাকে।

সোভান মিক্রা পিতৃবা-আনৌত মুসলমানী বিস্তৃত চিনুয়াই স্বভাভের দিকে তাকিয়া আছে, স্বভাভ তখনও কৌচাঃ-বীধা মুন্ডির পুট্টিল শেষ করিতে পারে নাই, সোভানের মনে এক-একবার উদয় হইতেছে মুন্ডির পুট্টিলটা ছুইয়া দি। স্বভাভের

আর পাওয়া হইবে না, কুম্ভোজর স্বভাভকে তখন শিখিয়া মাটিতে মিশাইয়া দিব স্বভাভ বৃষ্টিতে পাইয়া বলিতেছে, 'দেনা ছুয়ে, মুন্ডি না হয় খাওয়া হবে না, কালা দু' বাটা গ্রুপ দেয়েছি।' ইহার অনতি-বিলম্বেই লড়াই আরম্ভ হইয়া যাইল, দক্ষিণ পাড়ার সোভান একবার কিল, তৎপরে উত্তরপাড়ার সোভান—তুই পাড়াতেই হিন্দু ও মুসলমান বাস করে, দক্ষিণপাড়ার জয়ে দক্ষিণপাড়ার হিন্দু মুসলমান ধর্ম্ম-জ্ঞানি করিয়া উঠিল, আবার উত্তরপাড়ার জয়ে উত্তরপাড়ার হিন্দু মুসলমান গগন কাঁপাইয়া দিল। ৩৫-পরে সকলে বই মেনে ও পাড়াভি বগলে গৃহমুখে যাত্রা করিল। ভৌবনের এসব দিন কখন ভুলার যায় কি?

৩

আমাদের এই ছেলেবেলার সম্বন্ধই হিন্দু-মুসলমান প্রীতির উৎসমূল নহে—আমরা মরিয়া আছি আমাদের গিণ্ডুম্বন্ধের সম্বন্ধ-স্মৃতি বহন করিয়া! আদ্যস্বামী মগল গ্রামের শ্রেষ্ঠ মাতঙ্গর, সে জানে হরিমন্ড চৌধুরীর পিতামহ তাগার বাপজীকে পারন্ত ভাষা শিক্ষা দিত; গ্রামে আরবীর চর্চ্চা বেশী থাকে নাই, মুসলমান ধর্ম্মবিশ্বাস মুসলমান-স্থবর তেমন দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করে নাই, পারন্ত ভাষায় সাহিত্যচর্চ্চা হিন্দু-মুসলমান আনন্দে অস্থলীল করিত, কখন হিন্দু মৌলবীর আসন অলঙ্কৃত করিত, কখনও মুসলমান মৌলবীরূপে হিন্দুকে পাণ্ডা ভাষা শিক্ষা দিত—ইহাতে গ্রামের বৈবাহিক উন্নতিও হইয়াছে, আদ্য-লভে অমেকে বড় বড় কাঁধা গ্রহণ করিয়া গ্রামের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। আমার বংশের ঐশ্বর্য্য যে কাহার সাহায্য লাভ হইয়াছে, আমার বংশের পাণ্ডিত্যের গুণকল্পে যে কে আমাদের অন্তরে বিরাজ করিতেছে, তাহা প্রত্যেক হিন্দু ও প্রত্যেক

মুসলমান এখনও স্বরণ করিতে পারে, তাই কেহ কাহারও ভক্ষা ও ভক্ষক, খাদ্য ও খাদকরূপে প্রতীবাহন হয় না—একাত্তর আত্মীয় ও প্রতিবেশীরূপে তাহারাজ পৃথক নির্ভয়ে বসগাস করিতেছে। হিন্দুর রমণা যে মুসলমানের ভোগ্যা, মুসলমানের অন্তঃকরণ যে হিন্দুর একাত্তর অপুত্র, আমাদের গ্রামের বৈবাহিক কেহই চিত্তা করিতে সক্ষম হন না—হিন্দু স্ত্রী-লোকের মধ্যমা রক্ষায় মুসলমানের স্থবর যেমন নাচিয়া উঠে, হিন্দুর স্থবর বোধহয় তেমন বীরভাবে নাচিয়া উঠে না। বীর মুসলমানের অন্তঃস্থায় বিশ্বাসী ধর্ম্মপ্রচারের আগ্রহ ও একাগ্রতা যেমন তাহাকে হিন্দুর প্রাণঘাতী অন্তঃকল্পে পরিণত করে, তেমনই কেবল বধি সে বীরের মহিমায়ই আশ্বাস্য হইয়া থাকিতে পারে, তাহার ভীতাজ্ঞান মুসলমান-মহিমায় হিন্দুও কোন দ্বিভিই হয় না, তাহার স্ত্রী ঐশ্বর্য্য সকলই মুসলমানের কাজ স্ববয়ে মধ্যাদার আসনই পাঁয়া থাকে। কিন্তু মুসলমান-স্থবর যদি বাংলা ভাষাতক মুসলমান করিবার স্বপ্নে আশ্বাদন করে, তাহা হইলে জানি কত যজ্ঞযজ্ঞই না হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্থিত হইতে পারে, জানি হিন্দুই স্ত্রী ও ভদ্রীকে ছলে বলে মুসলমানী করিবার চেষ্টায় অনেক শিক্তও নির্গুণ হইয়া থাকিতে পারেন। পাঞ্জাব ও উত্তর ভারতে মুসলমান করিবার কৌশল আমরা গুব বিস্তৃত-ভাবেই হিন্দু-মহাসভায় স্বরণ করিয়াছি।

৪

কিন্তু আমাদের গ্রামে—মুসলমানেরা এখনও পারের পুঞ্জাই করিয়া থাকেন; তাহার স্ববজ যে সে পারের পুঞ্জা করেন না, তাহার সেই পারের পুঞ্জা করেন যে-পার পশ্চিম বঙ্গের ধর্ম্মপ্রচারক

আঠার জন পীরের অত্যন্তক্রমে আমাদের গ্রামের হিন্দু রাজাকে যুদ্ধে নিহত করিয়া, গ্রামটী মুসলমানের অধিকারভুক্ত করিয়া লন। দে-গর্গ প্রত্যেক মুসলমানের দ্বারা বেশ উজ্জলরূপেই স্থান পাইয়া আছে। এককালে রাজার যে তাঁর পুত্রগী ছিল, যাহার তীরে রাজ দেবতা উক্ত দেউল-অগস্ত্যের হিন্দু-মহিষার মণ্ডিত থাকিতেন, সেই তাঁরেই সেই দেউল কত করিয়াই এখন শ্রেষ্ঠ পীরের আস্তানা গ্রামে বিরাজ করিতেছে; সেই শ্রেষ্ঠ পীর—বাহাকে সাধারণ ভাবে আঠার পীর বলা হয়—এখন হিন্দু ও মুসলমানের মিলি গ্রহণ করিয়া থাকেন; এখন তিনি গ্রামা দেবতা—মুসলমানের মহিমা-দৌধ এবং হিন্দু পূজ্য। এই পীরের প্রতি তাকাহিয়া মুসলমানের উজ্জল স্তম্ভবর্ণ সত্যই সময় সময় আরও উজ্জল হইয়া উঠে, ইহাতে আমাদের কত্রির দ্বন্দ্ব মন্তর ফাল্গুনীরেই পূর্ণ হয়, সে-দ্বন্দ্বের মানবধর্ম রক্ষাই আশ্বাসন করিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে, পাক্ক আর না পাক্ক সে মানবধর্ম রক্ষা একান্ত সচেষ্ট হয়।

৫

আমাদের মানবধর্ম গ্রামের গভীর মধ্যেই বাব্ধ—মুসলমান আমি গ্রামান্তরে পৌছিয়া হিন্দুর নিকট গ্রামের হিন্দুর মত আর প্রাণ-চালা অভ্যর্থনা পুঁজিয়া পাই না, তাই তথায় আমার শ্রেষ্ঠ আত্মীয় মুসলমান। আমার সবার্বে রক্ষায় কেহ আর বাধ বিস্তারিয়া অগ্রসর হয়না, যদি হয় সে মুসলমান। গ্রামের বাহিরের হিন্দুকে আত্মীয় বলিবার শিক্ষা ও সাধনা আমার নাই, তাহারও প্রশস্ত দ্বারা অহিন্দুকে বন্ধে স্থান দিতে অক্ষম—গ্রামের বাহির হইয়া ওঁ যে আমি সন্দেহ দোলায় দুলিতেছি, এখানে আমার একমাত্র চেলা মুসলমান ভাই।

কিন্তু এই মুসলমান চায় হিন্দুর মনে বাধা দিয়াও

গোবর্ধে মুসলমান ধর্মের বিজয়ধ্বজা গ্রামে গ্রামে প্রোথিত করিতে,—আমি কিন্তু তাহাদের সহিত গো-নাথ তক্ষণ বরি, গ্রামে হিন্দু দ্রুতিবাসীর মুখ দেখিয়া আমি সে কথা প্রকাশ করিতেও অক্ষম হই; আমাদের বিবিধানোয়া বিশেষে বা সহরে কখন গমন করেন না, তাহাদিগকেও আমি একথা বলিতে ভয় পাই। আর বেশী ভয় আমার সেইখানে, যখন আমি দেখি, সহরে বা বিদেশের যে কোন স্থানে পদার্পণ করিয়া মুসলমান জাতদের অন্তঃকরণ অহুসরণ করিলে হিন্দু বিশ্বাস সযত্নে অত্যা অলোচনায় আমাকে প্রবৃত্ত হইতে হয়।

এদিকে আমার গ্রামে—স্তুপু আমার গ্রামে নয়, বর্ডমান বিভাগের অধিগাংগ গ্রামেই মুসলমান বিশ্বাস দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন না, আমারই বিশ্বাস ভদ্রীর যদি বিবাহ কথা শ্রবণ করি, আমার অন্তঃকরণ কাঁপিয়া উঠে। মুসলমান জাতদের কথায় বুদ্ধিতেছি—ইহা খাটি মুসলমানী ভাব নয় হিন্দুর দেশে হিন্দুর সাধে মিলিয়া মিশিয়া মুসলমান ধর্মের নিগূঢ় মর্ম অঙ্গত না হইয়া, আমরা হিন্দুর প্রেম ও জাতিত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া হিন্দু সংস্কারের মুসলমান হইয়া উঠিয়াছি। আমার মুসলমান-আত্মা ইহা ছিড়িয়া কেবলিতে চায়, কিন্তু গ্রামের প্রতিবাসীর অন্তঃকরণের নিকট আমার এভাবে সব কোথায় মিশিয়া যায়! আমার অন্তঃকরণের জ্বলোকলিঙ্গের নিকট আমি কোন কথা কহি না।

গ্রামের বাহিরে আমার অন্তঃকরণে যে বিকট ছবির উদয় হয়, আমার গ্রামের তিন ও চার পুরুদের ছবি যদি তথায় তেমন উজ্জল হইয়া না থাকিত, আমি বোধহয় গ্রামে বসিয়াই অনেক বিভ্রাট বাধাইতে পারিতাম। তনিতেছি ইহার মোমাংসা আছে,—হিন্দুস্থানে বসিয়া সময় হিন্দুস্থান মুসলমান

করিবার বিশেষ আকাঙ্ক্ষা বর্ডমান পূর্বক আমার সহরভাবে নিজ নিজ ধর্ম এমনকি স্বার্থ রক্ষা করিয়া, আমরাই গ্রামবাসীর চায় প্রেমোত্তীর্ণক অন্তঃকরণে ভারতবর্ষে বংশপরম্পরাক্রমে বস-পাণ করিবার সংকল্প গ্রহণ করিলে ইহার মোমাংসা আছে। মুসলমানের উপর আমার ক্রপা থাকিলে মুসলমানই ভারত প্রবল হইবে—কে প্রবল কে দুর্বল, ইহা বইয়া মারামারি ও সংগঠনের আবশ্যক নাই।

আমি আমার গ্রামে বসিয়া ইহার সত্য উদ্ধার করিতে চাই—গ্রামের বাহিরে, প্রবাসে ও সহরে, আমি

যে হিন্দুবিধে ও হিন্দু-গ্রামের হিঙ্গোল স্বরমধ্যে অহুত্ব করিয়াছি, ইহা যদি আমার বাণী হয়, আমি যখন মুসলমান হইরাছি, তখন তাহা আমাকে তনিতেই হইবে। কিন্তু হে আমার অন্তঃসীম, হে হিন্দু ও মুসলমানে—সমগ্র মানবসমাজের একমাত্র নিয়ন্তা, আমাকে বলিয়া দাও, ইহা সত্য কি মিথ্যা! ইহা সত্য হইলে আত্মই আমাকে দরুবেশ হইতে হয়—আমার গ্রামের স্মৃতি মুছিতে আমার একমাত্র কাটরা যাইবে, পরন্তু মুসলমান গৃহে জন্ম গ্রহণ করিলে আজ্ঞা বা করান আমি তাহাই করিব।

শিবাজী ও বাজী

[লেখিকা—শ্রীমতী প্রদুম্মময়ী দেবী]

—১০—

(স্থান—বনপাথ)

বাজী যত্ন ও শিবাজী অশ্বপূর্তে।

বাজী। কার সনে যুদ্ধস্থল জাঙ্গিন পামর,
আমি নহি ক্ষুদ্র তুচ্ছ অসভ্য তদ্রূপ।
শিবাজী। কে তুমি কহ না বীর!

—আমি “প্রভু বাজী।”

তোমার পরিচয় বলু?
শিবাজী। অধম শিবাজী।

মহারাক্ষতুলনরত্ন, চিনিছ তোমায়,
লহ অসি, তার সনে লহ হে আমার।

বাজী। তুমি হে শিবাজী? দহ, পূর্ণত নিরাসী,
ফিরিতেছে যে বাড়ল যখন বিনাশি?

শিবাজী। সত্য বীর, আমি সেই অধম বর্ষর,
দহ্যপতি সত্য আমি, নহি হে তদ্রূপ!

সাক্ষিকে সার্থক যম কাননে ভ্রমণ
সন্ধ্যায় প্রভাসে, ধন আয়ুধ ধারণ—
বাজীপ্রভু মহাবলী তুমিমাছি তাঁরে
বীরের প্রধান আমি বর্ম উপহারে।
একি মৃষ্টি! হায় হায় আমার কল্পনা
প্রতিদিন অতাপারে করেছে ছলনা,
আমি বুদ্ধিতেছি, একি মানি, অবদান,
দোষাতেছে করিয়াছি কত অপরাধ।
তুমি কি গো বীরবর, ভেবেছ আমার
বর্ষর বীরভোজ্যাত্তি বিবৃতিতে কাহ্ন?
সে কল্পনা স্বপ্নজাল দীর্ঘ লজ
আমারে দেখিয়া? কিন্তু ওগো মহারাজ,

আমি তোমা ভাবিয়াছি যত মহত্তর,
আমি তোমা দেখিয়াছি যেমন স্বন্দর,
বাস্তব আলোকে আজ দেখিতেছি চাহি,
সেই তুমি, কল্পনার বিন্দু থলি নাহি।
তেমনি প্রসার বক্ষ, ললাট উন্নত,
স্বগতিত মুগ্ধভূজ মহাদণ্ড মত,
তেমনি শারলা ভাসে অধরে, নয়নে,
স্বাদীনতাসেবী গল্প মহান্ বদনে।
সকলি তেমনি!

বাজী। বীর, কি কহিব আর
হেন ভ্রম এ জীবনে হয়নি আমার!
আমি তোমা ভাবিয়াছি, দম্পত্য, ক্রুরচেতা,
আজি দেখি, তুমি হবে ভারতবিজ্ঞতা,
ভাবিয়াছি ক্রোধী, লোভী, বাতুল, তপস্বী—
একি দেখি, তুমি দৈব দীপ্তিতে ভাস্বর! বাজী।
প্রথম উদীয়মান স্বন্দর যুগল
স্বদেশসেবক, দৃষ্টি গম্ভীর করুণ—
অন্তরের অন্তঃস্থলে কি আছে তা' আজ
তোমার চরণে নিবেদিত দস্তাবেজ,
আজি আর দ্বন্দ্ব নাই, দৈন্দ্র লজ্জা ভায়ে

শিবাজী।

অবসন্ন মনঃপ্রাণ—হেসোনা আমারে,
তোমার ছুয়ার হতে করোনা বিদায়
দীনজনে।

এস বন্ধু, শিবা তাই চায়।

না ডাকিছে ধনী দীন সবল ছন্দলে,
তার চির মেহময় অঞ্চলের তলে,
বীর তুমি, অসি তব ঘুচাক তরাস
ভেঙ্গে দিক্ মহাবলে জননীর পাশ!
বিন্দু বিন্দু জলে সিদ্ধ বনানীর ছায়
বীরবর, বরে' নিক্ জননী তোমার,
ভাল করে একে দিক্ ক্ষত্রজয় ঢাকা,
রূপে দিক্ প্রলয়ের মহা অগ্নিশিখা,
শিখাইয়া দিক্ মহা বিষাঘের তান,
আরো দিক্ ভীতিহীন সহানুর প্রাণ!
হে শিবাজী, শিব তুমি প্রকৃত শব্দর,
তাই তুমি ভালবাস যত অহম্বর,
ভয়ঙ্করে জন্ম তব ভয়ঙ্কর প্রিয়,
তোমার গুহ তেজ মোর বুকে দিয়ে,
তোমার সে মহাবল মহা চেতনায়,
চেতন করিয়া স্থান দিও তব পায়।

জীবন-বেদ

(উপস্থাপন)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রূপ, রূপ রূপ। আকাশে বড় ঘন ঘটা। শে'।
শে'। হাওয়া বহিতেছে। আবারের প্রথম দিনে
প্রারটের প্রথম জলধারায় গ্রাম অভিযুক্ত। বিজ্ঞদাসের
বাড়ীর এক নিভৃত কক্ষে সন্ধ্যার পর তিন বন্ধুতে
কথা কহিতেছিল।

ঐশ্বর্যবাকশ শেষ হইয়া আসিল—কাজের গেয়ে
কথাই অধিক হইল। এত বড় গ্রামখানিতে এই তিন
কনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের আর দ্বিতীয় সাহায্যকারী
ছুটল না। দুই একজন তরুণ বন্ধু লাভ হইতে
পারিত, কিন্তু দুই চারিদিন ইহাদের সহিত মিশিতে
না মিশিতে অভিভাবকদের কড়কানিতে তাহারা
বিমূখ হইল। অপারেশনের জয় নৈরাশ্রে ছাইয়া গেল,
বিজ্ঞদাসের গোড়া হইতেই কর্ণে আস্থা ছিল না,
অভিজ্ঞতার তার প্রত্যয় বহু দূর হইল। হরিনাথের
উৎসাহে প্রতি পদে বাধা পাইয়া বিগুণ বাড়িয়া গেল,
কিন্তু কাৰ্য্যত: কিছুই কহিতে পারে নাই, কোচে ও
রোয়ে সে সব কথার গর্জিয়া উঠিতেছিল।

অপারেশন বলিল—‘জ্ঞাতির অধ্যাপন সহজে
আসে না, আগে ভিতরে মরে, পরে পতনের লক্ষণ
প্রকাশ পায়, আমরা মহাজ্ঞাতি—জীবনের আশা স্বপ্ন!’
হরিনাথ বক্রগীর্বাণ উজ্জল কটাক্ষপাত করিল।
দ্বিধা বলিল—‘জ্ঞাত ঠিক মনে নি, তাহলে এত
আবর্তে অস্তিত্ব রক্ষা অসম্ভব হতো, ঘুমুচ্ছে, অগাধার
উপার আগেই কাজ নয়, নিজেরদে গড়ে তোলা—
গোড়াথেকে সে আরোজন না হলে, আমরা কোন
কাজে সার্থক হব না।’

হরিনাথ অন্তরঙ্গ ভাবে একবার বইয়ের পাতা
উন্টাইতে লাগিল। অপারেশন বলিল—‘সে
আরোজনের বাবস্থা কি?’

বিজ্ঞদাস—‘দেই তো সমস্যা। স্বানীজি বলেন
—এই জ্ঞাতির পশ্চাতে একটা অধ্যাষ সংহতিশক্তি
আছে, যা এত বিপর্য্যয়েও আবারের নিম্ন হতে
দেখ নি, সহজ চেতনার গুরে সে অক্লান্তি বর্ধ
জাগিয়ে তোলা যায়, তা হলেই জ্ঞাতটা অধে—কিন্তু
সে কাজ বড় শক্ত, ভাব পাওয়া যায়, সাধনার
কৌশল কেউ দেয় না।’

অপারেশন বিজ্ঞদাসের কথায় উদ্বুদ্ধ হইয়া বলিল—
‘দ্বিধা, তুমি এ বিষয়ে যেরূপ গভীরভাবে চিন্তা কর,
সাধনার কৌশল তুমিই বার করবে। কিন্তু তার
পূর্বে কি বসেই থাকতে হবে?’
দ্বিধা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, অপারেশনের দৃষ্টি
হরিনাথের নিকে পড়িল—হরিনাথ কিম্বদন্তে হস্তে,
পুস্তকের পাতা উন্টাইয়া উত্তীর্ণা দাঁড়াইল, অপারেশন
বলিল—‘নাও কোথায়। মুখধারে বৃষ্টি।’

হরিনাথ—‘তোমরা ক্রমে যে রকম তথ্যজানী
হয়ে উঠেছে, আমরা দেখছি সরতে হবে—এই তবের
গোলক ধাঁধায় জ্ঞাতটার হাড়ে দূর্বা গজিয়েছে, তার
উপর আবার এই বিঘ্নকোড়া, আর বৃষ্টি টেকে না।’
এই বলিয়া সে ঘরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত
পর্য্যন্ত একবার পায়েচালা করিয়া লইল, বিজ্ঞদাসের
চিন্তাশ্রোতে বাধা পড়িল, সে বলিল—‘হরিনাথ!
যে উত্তেজনা নিয়ে আমরা কিছু করবো তাহা, সে
বাণির তাত, বাহিরের জগো হাওয়ার ঠাটা হয়ে

যাবে, এমন উজ্জ্বল সৃষ্টি করতে পার, যার হ্রাস বৃদ্ধি নেই।”

হরিনাথ এতটুকু বিয়া বলিল—“এত হেঁয়ালি কেন? সোজা কথা বলিনি তাত আছে কাজ কর, নয় ঠাট্টা হয় বসে পড়, তোমাদের মত তৎকথা নিয়ে মাথা ঘামাতে হরিনাথ রাজী নেই।”

অপরেশ—“কি বসবে! এহিতো মাসখানেক ধরে গ্রামে কিছু করার চেষ্টা করা গেল—কিছু হলো কি! বরং আমরা একটা নতুন ধরণের জীব বলে গ্রামের লোকেরা আমাদের এড়িয়ে চলে, কোন গেলো নিশ্চয়ত এলে—অভিভাবকরা বাহক কর, এই অবস্থার করবে কি?”

হরিনাথ উত্তেজিত হইয়া কহিল—“এই কর্ণা! রাজার বাধা তেলেই যাবে, কেউ না যোগ দেয়, নিজের প্রাণ যতখানি ততখানি ঢেলে যাবে। আর এতে যে কিছু হয় নি, তা বলা না, হরি-কম্বরের বিধবা বোন মাং গেল, আমরা কীধ দেওয়া শেষ, মড়া বেগু-লে ছেলেদের মধ্যে অনেক ভয় কমে গেছে, তারা এগিয়ে আসতে চায়, বাধা দিচ্ছে গ্রামের প্রাচীন বাহা—কিন্তু আঁজিকার কাজ, তরুণ প্রাণে যে তেরা কেটে দিয়ে যাচ্ছে, একদিন তার ফল হবেই হরিনাথের এক কথা তোমরা শ্রবণে রেখো।”

অপরেশ আর কোন কথা কহিল না, সে বেগিল—
দ্বিজ চক্ষু মুখিয়া নিম্পল। সে একবার হরিনাথের দিকে চাহিল।—হরিনাথ জ্ঞানাল গুলিরা বাহিরের অন্ধকার আকাশে চাহিয়া আছে,—একটা বিস্তারিত আলোয় সে বেগিল, তার ওচ্রে যেন বিদ্রাঘ অগ্নিতেছে। কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত মুখখানি বড় প্রশস্ত, গাভীরোঁ ও শৌর্য্যে বড় সুন্দর দেখাইকেছে। অপরেশের ইচ্ছা হইল সেও চক্ষু বৃদ্ধে, একবার চক্ষু মুদিত করিয়া আবার চাহিল, হরিনাথ তখনও দাঁড়াইয়া আছে, এইরূপ দুই চারিবার চক্ষু মুদিত ও উদ্ভিলিত করিয়া

নয়নপল্লব মুদ্রিয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে, তাহারাই ছইজনে পদস্পর্শের দিকে চাহিয়া বড় শান্তি ও আনন্দের দৃষ্টি বিনিময় করিল, কি একপ্রকার অপার্থিব আনন্দে উভয়ের হৃদয় ভরিয়া উঠিল, কিন্তু হরিনাথ কোথা। এই বৃষ্টিতে সে চলিয়া গিয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

একখানি মাসির প্রাচীর ঘেরা মেটে ঘর। উঠানে ধানের মগাই, এক পাশে ছোট একচাক্ষা ছই ভাগে বিড়জ, এক বগে একটা গর বাঁধা রহিয়াছে, অপর বগে রায়াবার—পত্রী বৃহৎস্থের কচি।

ঘরের মধ্যে মাসির উপর সামান্য শয্যা রোগ-কাতর এক কিশোরী, বৃদ্ধা জননী উৎকণ্ঠিতা, হরিনাথ সেই শয্যা পার্শ্ব উপবিষ্ট।

সপারো মা ও মেয়ে ছাড়া অজ্ঞা অভিভাবক আর কেহ নাই। গৃহস্থানী গহবৎসর একমাত্র কন্যা বীণাপাণিকে রাখিয়া পত্নীকে শেখকসাগরে ভাসাইয়া পরগণা গমন করিয়াছেন, সেই-সব প্রতিশাপের সহায়কৃতি ও অভিভাবককে সতর্কতার সহিত কড়াগহ বিধবা ভিটার পড়িয়া আছে। বাগান ঘেনো জন্মি বাহা কিছু সামান্য সম্পত্তি, তাহারই উপসর্গে তাহারের দিন কাটে। স্বামী বর্ধমানের যে আয় ছিল, প্রতিবাহী-বর্ধের সালিশীতে জ্ঞাতীদের সহিত ভাগ বাটাওয়ার কারিয়া বিষয়ের আর কিছু কমিয়াছে, তবুও একটা কঠোর গাছের আর্দ্রক ফল, পাঁচ আড় কাশ, তিনটা গোপালে খোপা আমগাছ, পাঁচটা তেঁতুল গাছ, এইরূপ সলকর ও আগাছা দিলিয়া বাগানের কিয়দংশ ও পাঁচ সাত বিঘা ঘেনো জমি ভাগে চাষ করিয়া কয়েক মন বাৎসরিক ধান, ও দুই একশত টাকা কৃষকদের জিনিষ পত্র বন্ধক রাখিয়া, খব বিবিধা কর্ত্ত দিয়া, আসল বাটাইয়া ধনের টাকায় এই সুদ-অদস্যয় পরিবারের দিন সুখল ভাবেই কাটিয়া যায়।

অনুভূ কন্যা—গ্রামের মাতঙ্গর রামতারণ মহাশয়ের উপর পাত্র দেখার ভার দিয়া, বিধবা নিশ্চিন্ত ছিল, রামতারণ নিজের একটি বহরগাটে ভাগিনার সহিত সখ্য স্থির করিয়া গৃহবাহী নিকট একবার কথা পাড়িয়াছিল, কিন্তু বীণাপাণির মা তাহাতে রাজী হয় নাই। রামতারণের দৃষ্টি ছিল বিধবার বিষয়সম্পত্তিটার উপর, পত্নীগ্রামের মেয়েদের মধ্যে বিষয় হকার মতর্কতা অসিদ্ধাচারে দেখা যায়, বীণাপাণির মা অগত্যা তা-তারণের উপর অনেক বিষয় নির্ভর করিলেও, তাহার এদিকে বিশেষ দৃষ্টি ছিল।

কর্ত্তার কাল হইয়াছে, এক বৎসরের উপর। এই এক বৎসর কি উৎপীড়ায় যে কন্যা সহ জননীর দিন কাটিয়াছে, তাহা বলিবার নয়, গ্রামের কৃষক মোড়ল-দের বাড়ীঘরে গিরির প্রতি শ্রদ্ধা না থাকিলে, জ্ঞাত শত্রুতার ইহাকে এতদিন সর্বস্বান্ত হইতে হইত। গ্রামের পাঁচজন মোড়ল ধরিতাই, স্বামীর মৃত্যুর পর বীণাপাণির মা বিষয় বিভাগ করিয়া লইয়াছে, রাম-তারণের অস্থগত সদয় বাড়ীঘো গৃহস্থানীর সোধের, ভাগের সম—যখন বলিয়া বলিল, বিধবার এত কৌক মাথাঘ নেওয়ার দরকার নাই, বড় তাহারই ক্রী জননী-ভুগ, হুতরায় বিষয় সম্পত্তি যোগ রাখাই শ্রেয়; আর বাহাই হইবে তাহার তরুণ হইবে না, চুল চিরিয়া বড় বৌকে বুকাইয়া বিবে—রামতারণের তাহাতে অসম্মতি ছিল না, কিন্তু পাঁচমণ্ডল ঘাড় নাড়া দিয়া বলিল—“না তা হয় না, বাড়ীঘো মশায়ের অনেক খেয়েছি, বিপদে তিনি মাথা দিয়েছেন, তাঁর বিধবা পত্নী যদি ফাঁকেই পড়ে, তার দায় কে নেবে! আপনাদের জন সে তো দেখেবেই, বিষয় কড়ায় গণ্ডায় ভাগ হোক!” পাঁচ মণ্ডল, বাড়ীঘো গিরিত, মনোভাব জানিয়াই এই জেবু ধরিয়া বলিল।

গ্রামের ভদ্রলোকজন অপেক্ষা—কৃষক মোড়ল-দের প্রভাবও যেন বেশী, ধন্যের পরিচয়েও তাহার।

কর্ম নয়। ভদ্রতার আধরণে কুলিগতা ঢাকা থাকে, কিন্তু এই সকল সরল শ্রমজীবী কৃষকরা অজ্ঞতা-দোষে কখন কখন নিজের পায়ে কুড়ুল মারিলেও—সত্য রক্ষার সর্ব্বশ পণ করিতে স্কৃতিত হয় না, জেদের পায়ে অনেকে সর্বস্বান্তও হইয়াছে। ভাগের সময় হিসাবে একখাড় বাঁশ, শতর বাড়ীঘোর অংশ পড়িবে কি বীণাপাণির মায়ের অংশে পড়িবে, এইরূপ উর্ভাকৃতি উপস্থিত হইলে, পাঁচ মোড়ল—বিধবার দিক টানিয়াই কথা কহিয়াছিল।

রামতারণ ইচ্ছায় অনিচ্ছায় রাজী হইয়াছিল, সদর বাড়ীঘোও কোন কথা কহে নাই, কিন্তু ভাগের পত্র, ভিতরে ভিতরে বেশ মনোমান্তি জমিয়া উঠিয়াছিল, উপরে কোন ভাব প্রকাশ না হইলেও, বিষয়ের সম্বন্ধ বিধবাকে বেশ বেগ পাইতে হইত, অথচ কোন সঙ্কট উপস্থিত হইলে, ইহাদের অভিভাবক স্বীকার করিয়াই, শত্রুতার মাত্রা বাহাতে লাঘব হয়, বুদ্ধিমতী তাহারই চেষ্টা করিত।

সেদিন অপরেশ—বীণাপাণি দুই চারিবার ভেদের পর বড় অস্থির হইয়া পড়ল, আকাশে মেঘ ঘনাইয়াছে, বৃষ্টিও আরম্ভ হইয়াছে, পরিবার তেলে জল মিশাইয়া কিয়ৎক্ষণ পেটে মালিশ করিয়াও অস্থিরতার উপশম হইল না—যদি আরম্ভ হইল, সঙ্গে সঙ্গে বীণাপাণির চক্ষু কোটার দ্রবিত হইল। মায়ের প্রাণ—উর্ভবাসে সদর বাড়ীঘোর নিকট কন্ডার অস্থির কথা ছাণাইল। রামতারণ ঘর হইতে বাঁদ্যার বাহির হইল না। হোগ যে সাংখ্যাতিক—এ রোগে কেহ যে নিকটে বাইবে না, ইহা একপ্রকার সিদ্ধান্ত হইয়া গেল। মেয়ে ক্রমেই অস্থির হইয়া পড়িল, সর্পকে যেন অগ্নিবর্ণের আলা আরম্ভ হইয়া পড়িল, সর্পকে ধরিল, বিধবামায়ের অস্থিতা তখন যে কিরূপ ভায়া সহকেই অস্থির। জ্ঞাতদের মিনতি করিয়া কানাইল, মোড়লদের কাহাকেও খবর দিতে, সন্দেহে রাজিকাল,

চিকিৎসার ব্যবস্থা না হইলে বে.ঘারে মাতা বাইরে, সস্ত্র সমর হইলে হয়তো বা সাহায্য মিলিত, কিন্তু গ্রামে কোন বাড়ীতে কমেবা রোগ হইলে, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার জন্য ভয়ে শুড়, শুড় করে, একপ্রকার অর্ধমৃত অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার উপর যাত্রী অন্ধকার, বৃষ্টি হইতেছে—সকলেই গুঁই গুঁই করিয়া কাটাইয়া দিল। বাণবিক পক্ষীস্বর ভ্রায়, বোণাবণির ম একবার ঘর, একবার সদর দ্বারের ছুটছুটি করিতে আরম্ভ করিল। মেয়েকে একা রাখি-
য়াই বা যার কেমন করিয়া! এমন সময় হরিনাথ বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে বাড়ী ফিরিতেছিল, বিধবা আকুল হইয়া কাদিয়া বসিল—“বাবা! এ দায়ে রক্ষা কর, আমি একা বিধবা—মেয়ের ওলাইটা হয়েছে—কেউ যে দেখে বাবে নেই বাবা!” হরিনাথের শরীরে বিছাৎ ছুটিয়া গেল, দূরে দূরে দোরহা ঘরের ভিতর হইতে প্রতীপের আলো দেখা যাইতেছে, পিছল পল্লী-পথ জনহীন—বিধবার মধ্যাহ্নিক প্রার্থনা শেষের মত তার দ্বন্দ্ব বিদ্ধ করিল—বিনাবাক্যে বিধবার সহিত বাড়ীতে প্রবেশ করিল, পীড়িতার সস্ত্র অবস্থা বৃষ্টিতে আর বাকী রহিল না। একবার ভানিল, দ্বিদ্ধাসকে বধ দিই, কিন্তু অভিমান বাধা দিল, মনে হইল, তা’র দান করুক,—লগাটি কুণ্ডিত করিয়া কহিল,

“আপনি আধবন্টা মেয়ের কাছে থাকুন, আমি ডাক্তার নিয়ে আসছি; ভয় নেই।” বীণাধারিণি মা আশী-
র্বাদ করিয়া বসিল, “বাবা—ভগবান তোমার ভাল করুন—একলা এতক্ষণ কেটেছে, আধবন্টা খুব কাটবে।” হরিনাথ—গ্রামের চম্ভ ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া ফিরাই, রোগীর অবস্থা দেখিয়া ডাক্তার হতাশ হইল, বধারীতি ব্যবস্থা করিয়া প্রস্থান করিল। হরিনাথ সারারাত্রি এই কালব্যাহির সঙ্গে সংগ্রাম করিল। ভোরের সময় অবস্থা সামান্যিক হইল, হস্তপদ হিমাল হইয়া গেল, গরম বাদার দুটুটি করিয়া পোক দিতে দিতে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। দরজার বাহিরে নাকে কাপড় দিয়া রামতারণ হাঁকিল—
“বো, মেয়ে কেমন আছে?” সদর বাজুঘা দুই হইতে উকি মারিয়া কহিল—“ঘরে কে রয়েছে না!”
বীণাধারিণি মাতা কোন উত্তর দিলে না হির করিল, কিন্তু পাছে উঠাদের রাগ আরও প্রবল হয়—সেই ভয়ে, দাওয়ায় দাঁড়াইয়া বসিল, “এখন আর থাক-
পাকি কি, ভগবান রাখেন তবেই!” সদর বাজুঘার কথা শুনিয়া রামতারণও জিজ্ঞাসা করিল, “ঘরে কে রয়েছে বো?” হরিনাথ—ওপাড়ার মুখোদেবকে—
“এই বলিয়া দে যার প্রবেশ করিল। রামতারণও সদর পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিয়া প্রস্থান করিল।

(জন্মশ্রী)



মত ও পথ

অসংযম।

রাজনীতিকক্ষে পাশ্চাত্য যুবজাতিচিহ্ন অসংযম বদীয় যুবকটির কলুষিত করিতেছে—এ-অপবাদ বাংলার দীরপথী নেতৃস্থানীয় প্রত্যেক পুরুষ ও নারী বহবার ঘোষণা করিয়াছেন। স্বরাষ্ট্রী অভ্যুদয়ের সময় হইতে বদীয় তরুণ বিশেষভাবে এই কলহ বহন করিতেছেন, পরাজী ভিন্ন অজ্ঞান নেতাই জনসভার বিশেষ সম্মানিত হন নাই, ইহা বহু ক্ষেত্রে প্রমাণিত হইয়াছে—আজ কাল স্বরাষ্ট্রী আন্দোলনেও ভাটা পড়িয়াছে, পূর্বশ্রেণীর অসংযমের মাত্রাও কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু, দেখিতেছি, নেতৃত্বদ্বয়ের প্রাণে যুবকদিগের ব্যবহার বেশ একটা বদন্যর সঞ্চার করিয়াছে। দে-দিন বৃদ্ধ স্বরেন্দ্র বেদনার সঞ্চার করিয়াছে। দে-দিন বৃদ্ধ স্বরেন্দ্র বেদনার সঞ্চার করিয়াছে। দে-দিন বৃদ্ধ স্বরেন্দ্র বেদনার সঞ্চার করিয়াছে। দে-দিন বৃদ্ধ স্বরেন্দ্র বেদনার সঞ্চার করিয়াছে।

রুদ্রের অতর্কিতদনার অভিব্যক্তি।

দে-দিনও ময়মনসিংহে মহাঘোর নিকট জনৈক যুবক বলিয়াছেন, “গলায় কাঁসী পরিতেও পরাশ্রয় নই, কিন্তু রোজ আধ ঘণ্টা চরকা কাটা আমরা অসম্ভব বলিয়া মনে করি।” মহাঘোরা অবস্থা এই উক্তিগত অসংযমের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

কিন্তু বদীয় যুবক এতদপ অসংযত হইল কেন? আমরা দেখি, দে-সকল যুবক রাজনীতিকক্ষে বা অজ্ঞ কোনজন সমাজহিতৈষ্যতার ক্ষেত্রে আশ্ব-
নিয়োগ করেন, তাহাদের প্রাণে দেশের স্বা-
লতা আছে—নিয়ম-অনুগত হইবার চিন্তাও তাহারা করিয়া থাকেন, তবে তাহারা দেশসেবী অধিনায়ক-
দিগের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিবেন কেন? কথা হইতেছে এই, আত্মচিন্তা পরিবর্জন করিয়া দেশ-চিন্তার অহমস্র করিলে প্রথমে প্রাণে এক প্রভূত চাকল্যের সঞ্চার হয়, এ-চাকল্য প্রথম অবস্থায় কোন বাধাই মানিতে পারে না, যে দেশবীরের বা যে শ্রেণীর দেশ-
চিন্তার সম্পর্শে যুবকদিগের জীবন নতুন প্রবাহে

প্রবাহিত হয়, তাহার প্রতি কিন্তু তাঁহারা প্রগাঢ় আশ্চর্য্য প্রকাশ করেন—ততদিন না এই আশ্চর্য্যকি শ্রদ্ধারূপে যুবকদিগের অস্ত্যকরণে বিশ্বস্ত দেশ-প্রেমের সঞ্চার করে, ততদিন ক্ষুদ্র ও বৃহৎ আকারে স্বতঃশ্রেণীর দেশ-চিন্তার প্রতি যুবকদিগের অসংখ্যের মাত্রা আমরা দেখিতে পাইব, ইহা অনিবার্য্য ঘটনা। কিন্তু যেখানে ইহা একেবারে সাধারণ শিল্পাচারের মাত্রা উল্লেখন করিয়া চলে, সেখানে পরিতাপ আপনাই আসিয়া থাকে। এ পরিতাপ কিন্তু যুবকদিগের সমশ্রেণীর দেশ-চিন্তা-নাযকদিগেরই ধূম্যে আসিবার কথা—আমরাও, বোধহয়, কোন কোন ক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্র নেতৃত্ববৃন্দের মধ্যে পরিতাপের ভাষা শব্দ করিয়াছি। কিন্তু ইহাতে ভিন্ন শ্রেণীর চিন্তাবীরদিগের মনোমুগ্ধতা প্রশমিত হয় না, বরং স্তম্ভেরস্তম্ভাবের মনোমুগ্ধতা অতি স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশিত হইয়া আমাদের এই কথাই সমর্থিত করিতেছে—দেখিতেছি তিনি যুবকদিগের বাহ্য-হারকে small matters বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

আমরা বলি, আমাদের দেশে রাজনীতি ব্যতিরিক্ত—এমন কি দলাপলি পর্যায়ভুক্ত রাজনীতি ব্যতিরিক্ত শুদ্ধ ও সার্বজনীন দেশপ্রেমের অহুশীলনের একান্ত অভাব হইয়াছে, আমরা দেশ-সেবার পুণ্য ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত মনোমোহকর উচ্ছৃঙ্খলতার মতো আদিক পরিমাণে লক্ষ্য করিতেছি—যদি কোন দেশে শুদ্ধ ও সার্বজনীন দেশ-প্রেমের প্রকৃত অহুশীলন সম্ভব হয়, তাহা এই আমাদের ভারতবর্ষেই সম্ভব হইবে। দেশ-সংজ্ঞায় যে বৃহৎ অংকুর ও ধ্বনয় বিরাট স্বাতন্ত্র্যের সম্পাদক জগৎ ছড়িয়া আজ পর্যন্ত রাষ্ট্রত্ব করিতেছে, এই ভারতবর্ষে আমরা তাহা একেবারেই জুড়াইয়া দিয়া বিশ্বপ্রেমময় অমর দেশ-ও-জাতি-

বীজের উদ্ধার করিতে পারি—আমরা দেশকেও ভগবানের বিদ্যুততলে মিলাইয়া দিয়া, তাঁহারই কলাপ-বিন্দুরূপে স্বাদেশিকতার পুণ্য-পীষ্ম গ্রহণ করিয়া, জগতে কলাপময় নিঃশব্দ জাতি-পঠনের মহাভয় অরস্ত্র করিতে পারি। ইহার জ্ঞাত অংশ সাধক-জীবনের আবশ্যক—পুণ্যোদ্দেশ্যে উপজিত জীবন-চাক্ষুস্য সাহস, সত্য ও বিশ্বস্ত করিয়া তবে যে জীবন-গতি প্রকাশিত হয়, তাহাই হইল বিশ্বস্ত জাতীয় চরিত্রবিকাশ—এই চরিত্রের অতুল্যদের জ্ঞাত বন্ধীয় যুবক কৃতসঙ্কল্প হইলে, দেশ-সেবার পথে ও তাঁহাদিগকে উচ্ছৃঙ্খলতার কলঙ্ক বহন করিতে হইবে না। এই আনবিল দেশপ্রেমাত্মস্থলনের পুণ্য-দ্বারা এখনও কলঙ্কর মত আঘাতোপান করিয়া চলিতেছে, তাই দেশ-কর্মের প্রত্যেক ধারায়, অবিদ্যায়, কলহ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিচ্ছেদের পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিতেছে।

বিচ্ছেদ

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র খোসা এতদিনে প্রকাশভাবেরই অভয় আশ্রমে সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন; বহুদিন হইতেই কংগ্রেসের কার্য্যে সম্মিলিত হইয়া থাকায়, অভয় আশ্রমের জীবন-কোষে তিনি সাক্ষাৎভাবে অমর বাত্বেরে রসসঞ্চারে বঞ্চিত হইয়াছিলেন—মনে করিয়াছিলেন, দূরে থাকিয়াও তিনি আশ্রম-দিগের স্বপ্নজগতে সখদের পীষ্মদ্বারা বর্ধন করিতে-ছেন, কিন্তু তাঁহার পত্র পাঠ করিয়া বুঝিলাম, বহুদিন হইতেই এই স্বার্থভাগী যুবকমণ্ডলীর অভয় বর্ধের ভিতরেও বিচ্ছেদের অঙ্গ-লেখা স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল; নাই হ'ক, আশাকরি, অভয় আশ্রমের কর্মক্ষেত্রে বিধা-বিভক্ত হইলেও আজ উভয় বাহা ভিন্ন নাম গ্রহণ করিয়াও, অভয় আশ্রমের মূল ভাব

কেই পুষ্ট করিয়া চলিবেন।

আমরা বহুক্ষেত্রে দেখিয়াছি, মতাস্তরের ফলে এমন মনাস্তরের সৃষ্টি হয়, স্থানান্তরে থাকিয়াও বিভক্ত কম্বিকুল পরস্পরের নিন্দাবাদ ও প্রতিকূলতাচরণেই জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট করিয়া থাকেন! বিশ্বস্ত মতের পার্থক্য আমাদের দেশে প্রায়ই বিচ্ছেদের সৃষ্টি হয় না, মন-কষাকষি পড়িলে অথবা ব্যক্তিগত প্রভাবের সংঘর্ষেই কম্বিকুল একান্ত উত্তেজনার সময়েই পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন, তাই কিছুদিন দূরীয়া উভয় পক্ষের মধ্যে সন্দেহ, প্রানি ও সংসার প্রচার হইতে থাকে। আমরা জানি, অমর আশ্রমের কম্বিকুল বিশ্বস্ত বর্ধদেশপ্রেমের স্পর্শে নিজদিগের মধ্যে যে সখ্য ও ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে পূর্বোক্ত মানিকর পরিমাণ উত্তেজনার মধ্যে আসিলে না, কিন্তু বর্ধদেশ-সাধনায় জাতীয় কর্মসাধনার সহিত পরস্পরের মধ্যে আচ্ছন্ন সম্বন্ধ নির্ঘের আধ্যাত্মিক সাধনা যদি আমরা গ্রহণ করিতে না পারি, কর্মসাধনার উপযুক্ত স্বাস্থ্যকর ভেদের ভিতরেও আশ্রমের মধ্যে এমন রক্ত মোক্ষণও হইতে পারে, যে ভারতে জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা বোধহয় মূল্যেই বিনষ্ট হইতে পারে।

হিন্দুসমাজ-না-অধ্যাত্মিত ভারতবর্ষে জাতীয় জীবন এলাপ প্রাণাচ্ছন্ন করিতে সমর্থ হয় নাই—মাশ্রদায়িক স্বার্থ, মর্যাদা ও প্রভাব রক্ষা ইহার বিশেষ পরিপন্থী। তজ্জন্ম আধ্যাত্মিক-ভিত্তি বা স্বাদেশিক-ভিত্তি অবলম্বন করিয়া যে সব বন্ধীয় যুবক স্বার্থভাগের অলস্ত প্রদীপ বকে লইয়া সাধনা বা দেশকর্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ বড়ই মনুষ্কর হইয়া উঠে। আমরা দেখি, প্রতিক্ষেত্রেই কোনরূপ না কোনরূপ অংকুর মূলে থাকিয়া মিলনের ক্ষেত্রে বিচ্ছেদের বজ্র হানিয়া

দেয়—এইসব দেওয়া শুনিয়া সকল কর্মের মূলে অংকুর-নিরসন ও মিলন-সঙ্করের আবাহনের জ্ঞাত ভগবানের নিকট একান্ত আত্ম-নিবেদনকর পুরো-ভাগে স্থান দিয়া তাঁহারই প্রীত্যর্থ বিমল দেশান্তার ইচ্ছার অনন্যরতী হইতে একান্ত সম্বলপরিণয় হইতে হয়। গাঁহাদের মধ্যে এই সম্বল আশ্রিত হইতে, তাঁহারা বিচ্ছেদের প্রবাহে নিমজ্জিত হন কেন?

একথা সকল দেশকর্মীরই জানা চাই, যে মিলনই আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি—অবশ্য জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রেও কক্ষে মিলনই আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি। আজ যদি আমি ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত দ্বা-বা প্রভাবের জ্ঞাত বা মাশ্রদায়িক স্বার্থকে অবশ্যকরূপে বুদ্ধি করিয়া আমরা ব্যক্তিগত বা মাশ্রদায়িক অবস্থাকে মাছ করা ইহার জ্ঞাত সকলকে মিলিত হইতে বলি, তাহা হইলে তাহাতে জাতীয়তার ভিত্তি স্থাপিত হইবে না—আমি নিশ্চয়ই দূরে পড়িয়া থাকিব, তথাপি আমাদের মধ্যে এমন মিলন-সাধনা চাই, যাহাতে স্বার্থ ও অংকুরগত স্বার্থীরাও একেবারেই ভাসিয়া যাইবে। কেবল নিঃস্বার্থ যাত্রা, কেবল দেশগত-প্রাণ যাত্রা, তাহা যদি ভগবানের নিকট এই মিলন-সাধনায় নিজ নিজ জীবনটা আগাইয়া দেয়, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে মিলন বা জাতীয়তা অক্ষয় হইবে—নচেৎ বিদ্যহয় বংসর যেমন চলিতেছে, তেমনই ভারতবর্ষে ভাঙ্গা-গড়ার মধ্যে জাতীয়তার একটা আকাঙ্ক্ষাই দুর্গগোচর হইবে, জাতি-পঠন তাহাতে সম্ভব হইবে না। অতীত মুসলমান ও গুপ্তান দ্বন্দ্বের আগমনে ভারতে জাতিপট্টর কাঁধ আরও বিষমজুল, এসময় সাধনা যদি তীব্র না হয়, জাতীয়তার আকাঙ্ক্ষা লইয়া কেবল গতাত্মগতিক ভাবেই মিলি আবার চলিতে থাকি, তাহা হইলে ভারতে জাতি-পঠন অসম্ভব বৈধিই। জাতীয়মান

হইবে। হিন্দু ও মুসলমান সংগঠনের ঘনঘটাৎ এ আশঙ্কা খুব নিকটবর্তী হইয়া উঠিয়াছে।

মুসলমান সংগঠন

মুসলমান সংগঠনের কথা এইবার বাংলায় উদ্ভূত হইয়াছে—বঙ্গের ভূতপূর্ণ শিকশাসূচিব মৌলবী ফজলুল হক ইহার অগ্রণী হইয়াছেন; বহু-রমণের তিনি যে অভিজ্ঞতা পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার গুণার্থ তিনি অতি স্পষ্ট ভাষায় মোমা-পালীতে ব্যক্ত করিয়াছেন—প্রত্যেক মুসলমানে ‘সে যে প্রথমে মুসলমান ও তৎপরে ভারতবাসী’ এইরূপ ভাবিয়া বিশেষ অমুখ্য প্রচার হইয়াছে, মুসলমান সম্প্রদায় হিসাবে বলা হইয়াছে তাঁহারা গো-কোরবানী প্রভৃতি মুসলমান ধর্মচার্য পরিত্যাগ করিয়া স্বরাজ-লাভ কিছুতেই শেষ মনে করেন না।—এই ভাবের ভাবুক মৌলবী ফজলুল হক যে মুসলমান সংগঠন করিবেন, তাহার প্রধান উদ্দেশ্য হইবে বাংলায় সর্ববিধে মুসলমানের যে শতকরা পঞ্চাশ ভাগের হিসাব আছে, তাহা কড়ায় গণ্ডায় আদায় করা, অবশ্য মুসলমানদিগের শিক্ষা, উন্নতি প্রকৃতিও তাহার অঙ্গীভূত হইবে।

মুসলমান বা হিন্দু প্রথমে মুসলমান বা হিন্দু এবং তৎপরে ভারতবাসী এইরূপ যদি ভাবিতে থাকেন, আর এই ভাবের উপরে যদি ভারতবর্ষ পুনর্গঠিত করিতে চাহেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষ জাতীয়তা স্বপুষ্ট হইয়া উঠিবে না, ভারতবর্ষ চিরদিন সম্প্রদায় এবং অনাধ্য ঠাইব সমূহের লীলাভূমি হইয়াই থাকিবে—ইহা যদি বিধির নির্বন্ধ হয় তাহা হইলে ইহার বিরুদ্ধে যাওয়া কিছুতেই ঘটিয়া উঠিবে না, কিন্তু এই জগতে মায়াই ও মায়াই আর পাখ ও পাদকের হিসাবে থাকিতে পারে না—বিশেষতঃ

ভারতবর্ষে এক সম্প্রদায় অত্র সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার আশ্রয় বা ক্রোধ বা পাশবিকতা প্রকাশ করিয়া কিছুতেই মন্থক উত্তোলন করিয়া থাকিতে পারিবে না। ভারতবর্ষে এরূপ মন্থকদের উদ্বোধন আবশ্যক যাহাতে সকল সম্প্রদায়ই নিকীয়ে মন্থকত্ব, ধর্ম, ইচ্ছা ও স্বাধীনতা লইয়া নিজ নিজ শ্রীবুদ্ধি সাধন করিতে পারে।

আমরা দেখিতেছি বাংলায় হিন্দুনারীর ইচ্ছা রক্ষিত হয় না, আমরা দেখিতেছি পাঠ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের ধন-জন-জীবন মুসলমান অনেক ক্ষেত্রে রক্ষা করিতে চাহেন না। মুসলমান যদি সভাই সংগঠিত হইতে চাহেন, তাহারা প্রথমেই এই কথা-কটী অম্বন করিয়া চলুন যে, তাহাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে যেন হিন্দুনারীর মর্যাদা রক্ষা ও হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্মান রক্ষার ভাবও বিশেষভাবে সংগঠিত হইয়া উঠে। তাহারা নিজদিগকে কেবল মুসলমানই বলিতেছেন না, তৎপরে ভারতবাসীও বলিতেছেন, এবং তাহারা ভিন্ন এই ভারতবাসী প্রধানতঃ হিন্দু, আমরা বলি ততদিন পৃথিবীতে দুর্ঘা উদয় হইবে ততদিন ভারতবর্ষে হিন্দুও থাকিয়া যাইতে পারে, মুসলমানগণ এই ভাবটীও এখন হইতে বিশেষভাবে পোষণ করিয়া চলুন।

তাহা হইলে এই হিন্দুদিগকে বে-ইচ্ছা করা য় বা তাহাদিগের উপাঙ্গ গো-অতির বধসাধন করা য় মুসলমানদিগের মধ্যে আপন সম্মান আসিয়া পড়িবে, গর্ভঘেটও ইহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন। অধিকাংশ মুসলমান এখনও সংঘত, নিকিত হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থ সংঘর্ষে সমগ্র মুসলমানগণকে একটা বিক্ষোভের স্থিতি হইয়াছে, প্যান-ইসলামিক ভাবও তাহাদিগকে ভারতবাসী-মুসলমান-ভিন্ন অত্র এক প্রকার মুসলমানে পরিণত করিবে—এই সময় হিন্দুকে মুসলমান এবং

মুসলমানকেও হিন্দুর সত্য পরিচয় গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা কেবল এক্ষণে মুসলমান সংগঠন-কার্যদিগকে হিন্দুর অন্তর্নিহিত শক্তি ও তাহার

নিষ্ঠা বাস্তুকির প্রতি লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করিতে অহরোধ করিতেছি।

সংকলন

প্রবর্তক আশ্রমে

মহাত্মা গান্ধীকে অভিনন্দন

মহাত্মন !

বিশ শতাব্দীর প্রথম দ্ব্যৈধ্যয় হইতেই বৃষ্টি, এ যুগের কথ্যপ্রেরণায় এই আশ্রমের ভিত্তিপাত হয়, দক্ষিণেশ্বরের পুণ্য বাণী জীবনে শিকড় গাঢ়িয়া বসে। তারপর বাংলার জাগরণ, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর প্রবাহে আমাদের বাঁপ দিতে হয়। কতকটা ভিন্ন রাষ্ট্র বলিয়া আর কতকটা আমাদের স্বভাবগত সোম অথবা গুণ জ্ঞানি না, চিরদিনই সকল আন্দোলনে ইচ্ছন যোগাইলেও, সকলের সঙ্গে আমাদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া চলিতে হইয়াছে। আজিকার এই পুণ্যক্ষণ আর একবার ঘটিয়াছিল, আজ যেমন উন্মেষের জয়পতাকা উড়াইয়া আপনি আমাদের জীবনে নতুন শক্তি সঞ্চার করিতে শুভাগমন করিয়াছেন, সে দিন নীরবে, লোকচক্ষুর অগোচরে, আর এক মহাপুরুষ এই তপস্করের প্রভাব বৃষ্টি করেন, তিনি আমাদের আরাধ্য শ্রীশ্রবিনন্দ। তারপর কত আবর্তন ও বিবর্তন জীবনের উপর দিয়া বহিয়াছে, অম্লিযুগের উত্তাপেও আমরা বলদ্বিয়া দিয়াছি, ইউরোপের মহাসংগ্রাম যখন ভীমমুষ্টি পরিগ্রহ করিয়াছে, আমরা সে যুগে নীরবে, অবস্থার পীড়নে আত্মরক্ষার কুরতে ব্যবসায়ী হওয়ার প্রয়াস করি। তারপর ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বাংলায় নতুন আবহাওয়া স্থিতি হইলে, আমাদের নীরব তপস্যা মুষ্টি লইয়া ফুটিয়া উঠে। এখানকার

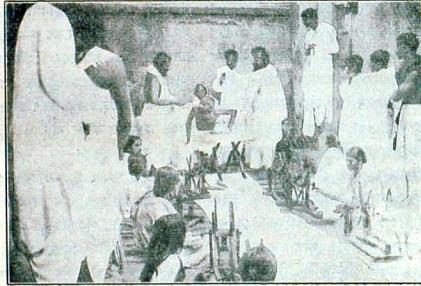
কথ্যপ্রতিষ্ঠানগুলি এই আশ্রমের জীবনরক্ষার আশ্রয়, এই প্রতিষ্ঠানগুলিতেই, সাধকেরা তাহাদের জীবনে পোষণের সংস্থান করিয়া, সাধনা গ্রহণ করে। আমরা শতাব্দিক নারী ও পুরুষের অঙ্গ-সংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া নিধাণের মধ্যে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিতে প্রচার আরম্ভ করি, ইংরাজী ও বাংলা সাপ্তাহিক ও আশ্রমের প্রাণস্বরূপ “প্রবর্তক” আশ্রমের ত্রাবপ্রচারে বাংলায় একটা যে নতুন জীবন আনিয়াছে, একথা তরুণ-প্রাণ হইতে মনোহী-বর্ণও অস্বীকার করেন না।

আমাদের হৃৎগা—যে মহাযন্ত্রে ত্রিশজনের অধিক কণ্ঠী অঙ্গ সংস্থান করিয়া, প্রচার বিভাগে স্থান করিয়াছিল, সম্প্রতি ভারত গবর্নমেন্টের আদেশ-বাণী তাহা রুদ্ধ করিয়াছে। কথ্যপ্রেরণায় এমনই উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলাম, নিজেদের খাসসর্ব্ব্ব চালায়া যখন শতাব্দিক কণ্ঠীর অঙ্গসংস্থানে অসমর্থ হইলাম, তখন লক্ষ মুখা ঝগ করা হয়, আমাদের মূল জীবন-স্রোতে ইহা আজ বাধারূপ হইয়াছে, কিন্তু মহাত্মাজী আপনি আশীর্বাদ করুন, এ জাতি বিনা হিসাবের টাকা লইয়া যেমন অপরায় করে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ, দেশের কাছে থাকিয়াই আমরা এমন পণ পোষণ করিয়া, একটা সমষ্টিসাধনকে জয়শ্রীভিত্তিত করিতে পারি।

এই আর্থিক আঘাত মাথা পাতিয়াই আমরা

বহিষ্কার, আশ্রমের প্রচার বিভাগ আজ কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে, "প্রবর্তক-আশ্রমের" ভাব-প্রকাশের জন্ত "প্রবর্তক" কলিকাতা হইতেই বাহির হইতেছে। অতঃপর চন্দননগর আশ্রমে কেবল নারী পুরুষের জীবনে সাধনার মর্ম্মনয়নই কলার তুলিবে, যে মনে তারা নিরাময় জীবনে, জাতিবর্ণ নির্বিশেষে এক হইয়া, একটা প্রবল সমষ্টি-শক্তিকেই সার্থক করিয়া তুলিবে।

মহাত্মা—বাংলাদেশে আজ আমরা সংসার শতাব্দিক জন হইব, যাহারা ঐক্যমতে দীক্ষা লইয়া, সর্ব্বাঙ্গকরমে নির্দ্বিধবজ্রে আত্মাহুতি দিতে প্রস্তুত।



উদ্ধারিত হইলে, আমরা ইহার জন্ত সাধনাত প্রয়াস করিয়াছি। আমাদের জীবনে নানা সমস্যার মধ্যে, আমরা আজ চট্টলে, কুতুবদিয়ার বিস্তৃত গাদি প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিয়াছি। আশ্রমের অনেকেই দৈনিক অল্প দণ্ডা চরকা কাটিয়া উদাত হইয়াছে। করাসী ও ইংরাজ গবর্ণমেন্টের অনর্থক সশরণপাতে, আমাদের এমনই ব্যাও করিয়াছে, আশ্রমের

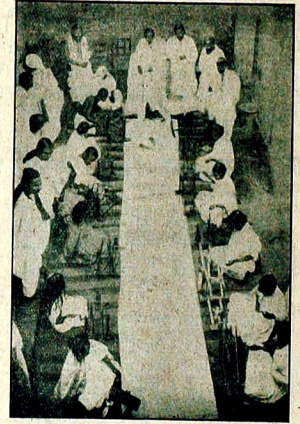
এই আশ্রমের আর্থিক অভাব পূরণেরই জন্তই, আমরা ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে, বঙ্গবন্দন কামশালার প্রতিষ্ঠা করি। তখন চরকার হতা ছাড়াই ছিল, এই কর্ম্ম-শালায় শিক্ষার্থী আশ্রমপোষকের ব্যবস্থা করিয়া লয়, এখনও আমরা ইহাকে পুরা পদ্ধতি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে-রূপে গড়িতে পারি নাই, তাহার কারন, ছাত্রেরা সহজেই মিশ্র পদ্ধতি প্রস্তুত করিতে পারে, ইহাতে উপাধিক্ষের মাত্রা অধিক হয়, এই কামশালা আশ্রম-রক্ষার অর্থ উপাধির ক্ষেত্রেই আমরা, গ্রহণ করিয়াছি।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে আপনার কণ্ঠে পক্ষের বন্ধ

অধিকার অর্জন করে, হিন্দু মুসলমানের মিলনসমগ্রা বাপক আকারে না হইলেও, আমরা আশ্রমে মুসলমান ছাত্রদের হিন্দুদের সহিত সমান অধিকার দিয়াছি। নারী-জীবনেও যাহাতে মুক্তির হাওয়া বয়, তাহার জটাও করা হয় নাই,—সর্ব্বতোমুখী উন্নতি প্রয়াস আমাদের আজ জীবনের সবথানি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এই অবস্থায় একদিকে রাজশক্তির ব্যর্থ সাধনে, অজ দিকে ঋণরূপে অর্থ কর্ম্মপ্রতিষ্ঠান গড়া হেতু ঋণের চাপে যখন আমরা অতিষ্ঠ, তখন আপনার আশীর্বাদ আমাদের দৃঢ় করিয়াছে, আমরা আজ বড় সংযোগ পাইয়াছি আপনার চরণতলে বসিয়া, উচ্চকণ্ঠে স্বীকার করিতে—যে "প্রবর্তক আশ্রমের" ধর্ম্ম

সনাতন, কর্ম্ম ভারতের দেবা, সে ভারত শিক্ষা-দীক্ষার আধিভ্রমণী—অমরবরের অরপূর্ণ। আমরা চাই দিবা জীবন, দিবা সন্ধ্যা হিন্দু মুসলমান, ভারতের অস্পৃশ্য জাতির সহিত ঐক্যব্রতের আবদ্ধ হইয়া, ভারতের সেবা করিতে, ভারতের দিব্য জাতীয়তার প্রবর্তন করিতে,—তাই রাষ্ট্রচর্চার বাহিরে, সহতি গঠনেই আমাদের আত্মদান সার্থক হইয়াছে। আজ মহাত্মা, এই পচিশ বৎসরের সংতি-শক্তি, আপনার মহাযজ্ঞ সম্পাদনে যেন সাহায্য করিতে পারে। আপনার কর্ম্ম ও নির্দেশ, "প্রবর্তক আশ্রমের" ধর্ম্মে বাধে না, সনাতন ভদ্রত সৃষ্টির মহামায়ে আমরা দীক্ষিত—আমাদের আপনি পুনঃ



আশীর্বাদ করুন। আমরা তহ, মন, প্রাণ দিয়া নূতন ভারত গঠনের অধিকারী হই—আমাদের আর কোন প্রার্থনা নাই, প্রার্থনা শুধু আশীর্বাদ! ভারতের দেবতা আপনি, ভারতের মুক্তি বিধানের বিধাতা—আপনার চরণে নিপিল "প্রবর্তক সন্ধ্যা" আজ শ্রদ্ধার অঞ্জলী লইয়া আসিয়াছে, আপনার তপশ্শক্তি আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হউক, আপনার আশীর্বাদ আমাদের মাধ্যম বর্গিত হউক, আমরা আপনার দেওদ্বা ব্রত পালনে যেন কৃতকার্য হই, ভগবানের ডাক আপনার কণ্ঠে যে শব্দ তুলিয়াছে, তাহা কার্যে পরিণত করার বীণা যেন লাভ করি—আমাদের আর অজ কামনা নাই।

মহাত্মাজীর উত্তর

—:—

প্রত্যুত্তরে প্রায় পঁচিশ মিনিট কাল সরল হিন্দী ভাষায় সজ্ঞ ও সমবেত বিশুল জনসমগৌকে সন্তোষজনক করিয়া মহাত্মাজী তাঁর ধর্মবোধ কথা ব্যক্ত করেন। তাঁর বক্তৃতার সার মর্ম এই :—

‘আর্থোক্ষি, আশ্রমবাসী জাতি ও ভয়ীগণ ও সমবেত জনসমগৌ।

আমার বহুদিনের অভিলাষ আজ পরিপূর্ণ করিতে পারিয়াছি বলিয়া কতখানি উল্লসিত, তাহা আপনাদিগকে প্রথমই না জানাইয়া থাকিতে পারিলাম না। “প্রবর্তক আশ্রম” সন্থকে বশন আমি ইতিপূর্বে শুনিয়াছিলাম, তখন হইতেই দর্শন করিতে একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ অহুতব করি। তাহার বিষয় সবিশেষ অবগত হইবার ইচ্ছাও আমি সঙ্ক্ষেপে প্রতিনিবিগণকে জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। ‘আজ স্বয়ং আগমন পূর্বক আমার প্রতি-শ্রুতি পালনে সমর্থ হইয়াছি বলিয়া আমার আনন্দের সীমা নাই। বিশেষ, পথে সঙ্ঘের অস্ত্রমত প্রতিভূ ও সেবক শ্রীমুক নির্মল বাবুর মুখে আমি আশ্রমের ধর্ম ও কর্মসাধনা সন্থকে যেরূপ অবগত হইলাম, এক্ষণে স্বকো অভ্রম পরিদর্শন পূর্বক তাহার বর্ণে বর্ণে সত্যতা অহুতব করিয়াও নিরতিশয় তৃপ্ত ও পূনকিত হইয়াছি। আশ্রমের আবহাওয়া সত্যই এমনই পরিব্রজ্যপূর্ণ, আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মভাবের সকারে জদরকে অভিকৃত ও মোহিত করে, যে তদ্বিষয়ে আমার অহুতবিত্তগুলি একটুকু ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

আমি একথা জানিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম, যে আশ্রমের মূল হইতেছে আধ্যাত্মিকতা। সত্য ও

অস্বস্থসাধনাকে হিত্তি করিয়াই এখানে পূজন ও নারী ধর্মজীবন গঠিত করিয়া তুলিতেছেন এবং তপতা ও ব্রহ্মচর্যই তাঁদের জীবনের পরম নীতি স্বরূপ। তাঁরা বিখ্যাস করেন, অহঃ-প্রেরণাকে আশ্রম করিয়াই বিস্কৃত, সরল ধর্ম জীবন লাভ করা যায়, সত্য ও ব্রহ্মচর্য অমলদন করিয়াই তাঁরা সঙ্ঘের কর্ম ও জীবনযজ্ঞ নিয়মিত করিতে নিরত আছেন। ইহাই ভারতের মুক্তি লাভের অবিকৃত শুদ্ধ মার্গ। এই পথে চলিতে যে রেশ ও সহিষ্ণুতা, তাহা জননী জম্মজন্মির জন্তই তাঁরা বরণ করিয়া ধন হইয়াছেন। আমি শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম, যে সজ্ঞ আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে স্বাবলম্বনের সাধনা যুক্ত করিয়া, আপনাদিগকে স্বপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিতেই ব্রতী হইয়াছেন—ইহার চেয়ে বড় আদর্শ আর নাই। আশ্রমের কষ্টী ও সাধকগণ প্রত্যেকেই যেমন আত্মপ্রায়ী, সযতনী, হৃদয় মনের চাকলা অতিক্রম করিয়া স্ব-প্রেরণা আশ্রমে আত্মজীবন হৃদয়সমন করিতে সত্যই উজ্জ্বল ও উদ্বুদ্ধ, তেমনি তাঁরা সমগ্ৰ আশ্রমটিকে আত্মপদে দৃঢ়ভিত্তি করিয়া দাঁড় করাইয়া তুলিতে এতাদৃশ আশা পোষণ করেন ও সেইরূপ তপস্তাতেই আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ভগবানের কাছে আমি সর্বাঙ্গসংক্রমে আমার এই নিবেদন জানাই, যেন তিনি আশ্রমবাসী ও বাসিনীদের এই শুভ প্রেরণাময় উদ্যম অহুতন-টিকে সর্বতোভাবে পূর্ণ ও জয়যুক্ত করেন। ইহার বেশী আশীর্বাদ আর আমি জানি না।

কথাশ্রমে আমার জীবনের তপস্যার সঙ্গে আশ্রমের মহারতের তুলনা আসে। যেন যেন হয়, আমার জীবনসাধনা এক্ষণে রাজনীতিক প্রেরণাই

বৈরাট, ১৩০২]

মহাত্মার উত্তর

১২৬

বশবর্তী, পক্ষান্তরে আশ্রমের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্পূর্ণ স্বন্থকে কয়েকটি কথা বলিতে চাই। অহিংসা আমার ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা মূলক। এই কথাটি আমি ঐক্য শীকার করিতে পারিলাম না। আমার বিশ্বাস এই, যে আত্মার সমুদায় কর্ম ও প্রেরণা, যে মূলশক্তির অহুতরণ করে, তার গভীর উৎস আধ্যাত্মিকতাই। এখানে আশ্রমের আদর্শের সঙ্গে আমার কোনও আদর্শ বা উদ্দেশ্যভেদ নাই। আমি যেদন্তপ্রসিদ্ধ অর্থও আত্মতত্ত্ব পরম শ্রদ্ধাগহকারে স্বীকার করি ও তাহাই চরমতত্ত্বরূপে শিষ্যার্থী করিয়া, ভগবান ও মাতৃহৃদয়ের দেবার আত্মদমপর্ণ করিয়াছি। নিম্নান কর্মযোগের মধ্য দিয়া আমি মোকই চাই, আমিও যক্ষ্ম: কিন্তু শাযার বিশ্বাস ও অহুত্বিত নির্দেশে আমি দেশ ও সর্গমানবের মুক্তির প্রেরণাতেই উদ্বুদ্ধ হইয়া চলিয়াছি। আমার বিশেষ কথা এই, যে আত্মার জন্তই আমি সকল কর্ম ও অহুতন করি, কিন্তু এই আত্মা সর্গগত বলিয়া আমি জাতি ও মানবের মুক্তিরও গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারি না। ইহা সত্য যে, আমাদের জীবনের প্রথম আত্ম আত্ম-প্রেরণায়, পরে ক্রমশ: জ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আত্ম অভিব্যক্ত হইয়া যুগন্তর সমষ্টি আত্মার পর্যাবসিত হয়। পরিণয়ে পরমাত্মা লাভ করাই সকলের উদ্দেশ্য। আমি আজ মাতৃহৃদয়ের মুক্তির জন্ত যে সংগ্রাম ও তপস্যার অধিকারটুকু পাইয়াছি, তাহার মূলকথা—শিশুকোটি মাংসের সমষ্টি দেশাত্মের রাষ্ট্রীয় আর্থিক ও সর্গবিশ্ব ছুঃখ মোচন করিয়া, যদি আপনাকেই যুগন্তভাবে ধন ও সার্থক করিতে পারি। ইহাই আমার আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য। আমার সমুদয় জীবন ও কর্মের লক্ষ্য—শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্ত। “প্রবর্তক সঙ্ঘের” ধর্মের সঙ্গে এখানে আমার মর্মগত ভেদ বা স্বাতন্ত্র্য কোথায়!

ভাষণের, আমার বিশেষ ব্রতগুলি—অহিংসা, অশুশ্রুতা দূর ও হিন্দু মুসলমানের মিলন এবং চর্য।

স্বন্থকে কয়েকটি কথা বলিতে চাই। অহিংসা আমার ধর্মোচ্ছৃঙ্খলিতই কথা। ইহা আমার আত্মপ্রত্যয়েই মূল। কেন না, আমি যে অর্থও আত্মার বিশ্বাসী। কিসের জ্ঞান, কাহার প্রতি আমি হিংসা করিতে পারি! সবই যে আত্মা—বেদান্তের এই মহাবাক্য আমি অহিংসা ব্রতের মধ্য দিয়াই জীবনে ফলসিদ্ধ করিয়া তুলিতে চাই। আত্মা সর্গব্যাপী, স্রুতরাং স্রুত অহংকারে আপনাকে সর্গীয় করিয়া, পেরটুকুর তোগ্যত্বের জন্ত পরম্পরকে ঘেঁষ হিংসা বাতকতা করা উচিত নয়। এই ধর্ম সমুদয় আত্মা দিয়া হয়ত এখনও আমি সম্পূর্ণ অহুতরণ করিতে পারি নাই—কিন্তু কায়মনোবাক্যে ইহাকই আদর্শ করিয়া অন্ধ দেশ ও সর্গমানবের মুক্তির প্রেরণাতেই উদ্বুদ্ধ হইয়া চলিয়াছি। আমার বিশেষ কথা এই, যে আত্মার জন্তই আমি সকল কর্ম ও অহুতন করি, কিন্তু এই আত্মা সর্গগত বলিয়া আমি জাতি ও মানবের মুক্তিরও গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারি না। ইহা সত্য যে, আমাদের জীবনের প্রথম আত্ম আত্ম-প্রেরণায়, পরে ক্রমশ: জ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আত্ম অভিব্যক্ত হইয়া যুগন্তর সমষ্টি আত্মার পর্যাবসিত হয়। পরিণয়ে পরমাত্মা লাভ করাই সকলের উদ্দেশ্য। আমি আজ মাতৃহৃদয়ের মুক্তির জন্ত যে সংগ্রাম ও তপস্যার অধিকারটুকু পাইয়াছি, তাহার মূলকথা—শিশুকোটি মাংসের সমষ্টি দেশাত্মের রাষ্ট্রীয় আর্থিক ও সর্গবিশ্ব ছুঃখ মোচন করিয়া, যদি আপনাকেই যুগন্তভাবে ধন ও সার্থক করিতে পারি। ইহাই আমার আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য। আমার সমুদয় জীবন ও কর্মের লক্ষ্য—শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্ত। “প্রবর্তক সঙ্ঘের” ধর্মের সঙ্গে এখানে আমার মর্মগত ভেদ বা স্বাতন্ত্র্য কোথায়!

অশুশ্রুতা হিন্দু মসাজের মহাপাপ—কলঙ্কস্বরূপ। এই নিম্নলিখ পাপ উৎপাটন করিয়া হিন্দুজাতি নিরাময় হউক—ইহাই আমার একমাত্র কাম। স্বরাজসাধনার শক্তিও অশুশ্রুতা দূরীকরণের উপর অনেকখানি নির্ভর করে। কেন না, হিন্দু মসাজ আপনাদের মধ্যে এই জঘন্য, অমানুষিক মহাপাপ পুথিয়া রাখিয়া, কোন সাহসে স্বরাজ যাক্সা করিবে? হিন্দুকে এই কলঙ্ক মোচন করিতে হইবে—জল-অলগণের চাক্ষুশের কোড়ে স্থান

দিয়া, আপনাদের উদারতা-প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভয় ও মহাশয়ের খোঁজা রাখা করিতে হইবে। তবেই হিন্দু সমাজের যেমন একদিকে আত্মবল বৃদ্ধি হইবে, তেমনি সমাজশরীর হইতে একটা উৎকট ক্ষত দূরীভূত করিয়া, নিরাময়চিত্তে বর্থাৎ স্বাভাবিক লোকের দাবী করার আমাদের অধিকার জন্মিবে। আমি আজ কতদিন পরিতপ্ত হইয়াছি তুমিও, যে সম্বন্ধের মধ্যে অশুভ জাতিরও স্থান আছে—ইহা বুঝি হৃদয়ের কথা।

হিন্দুসমাজের সমস্যাটি সংক্ষেপে আমি সর্বত্র বাহা বলিতেছি—তার অতিরিক্ত আশা বিনিময় কিছুই নাই। স্বাভাবিক—হিন্দু, মুসলমান সকলের—ভারতবাসীরাই ভায়ে ভায়ে বিরোধ না করিয়া, ঐক্যবল সঞ্চয় করিলেই মুক্তি আমাদের অনায়াস-লভ্য হইবে। দেশের কল্যাণ লক্ষ্য করিয়া, ধর্মগত স্বাভাবিক সংঘর্ষে সামাজিক প্রভৃতি জীবনসম্পর্কে বাহ্যতে এই প্রীতিভাব কোনও প্রকারে ঘুর না হয়—সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রত্যেকেরই কর্তব্য। এ নবদেব অধিক আর কি বলিব—আমাদের আশা, এই মিনের পথে সকলেই য য দান লইয়া অগ্রসর হইবে, ভারতের মুক্তির পথ তবেই শীঘ্রই নিরুপক হইয়া উঠিবে।

পশ্চিমে আমাদের প্রিয়প্রিয় চরকার কথা। সত্যই পাগল আমি—চরকার লজ্জা। দেশের ত্রিশ-কোটি নরনারীকে চরকা ধরাইবার লজ্জা আমি উল্লীষ হইয়াছি—এই অগনন অনশনক্লিষ্ট নরনারী যশের, হুইবেলা ছুইইয়া অর পেট ভরিয়া খাবের জুটে না, তাদের কয়েক আনা করিয়া আরবুদ্ধিও যদি ঘটে, তার ব্যবস্থা করিতে আমি বিশেষভাবে অস্বপ্নপ্রিয়। তাদের একটুকুও আর্থিক অভাব মোচন করিতে পারিবেই, তাগা একটু আশ্বাসের নিমিত্ত পুনঃ কেলিয়া ধর্মের মধ্য আশ্রয় লাভ করিতে অবসর

পার। আশ্বাসের সঙ্গে দেহের খোঁজা রাখা যোগাইলে, ধর্মের, আধ্যাত্মিকতার সকল কথাই কঁাকা কথা হইবে। চরকার ভিতর দিয়াই, আমি কোটি কোটি ভারতবাসীর একটুকু ধর্মসাধনার অবকাশ জুটাইয়া, তাদের আধ্যাত্ম জীবনে উন্নতির তীর্থ আকাখ্য পোষণ করি। ইহা আমার মতে এক সর্বোৎকৃষ্ট আশ্বাস সেবা। এইদিক দিয়া, শুধু পার্থক্য নয়, চরকার আধ্যাত্মিক উপযোগিতা ও উৎকর্ষিতা আমি বুঝাইয়া দিতে চাই। আর শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী আশ্রয় স্বরূপ চরকা না ধরিলে, গরীবাদী জনসাধারণের মধ্যে তার প্রবর্তন করা সম্ভব নহে।

এইজন্ম প্রত্যেক শিক্ষিত দেশহিঁচনী ব্যক্তিকে দেশের বৃত্তক, অনশনক্লিষ্ট নরনারীর মুখ চাহিয়া, চরকা ও খন্দার বরণ করিয়া গইতে অহুংসহ্য করিতেছি। ভাই সব, ভগিনীগণ—তোমরা এই পাগলের এই মস্তাধিক আশ্বাস যদি গ্রহণ কর, তাহা হইলে স্বা স্ব হইতে আপন হাতে কাটা স্থায় ও টাতে বুন বস্ত্র সঙ্গে লড়াইয়া, দেশের প্রতি, ভারতের দরিদ্র জন সাধারণের প্রতি স্বীয় কর্তব্য পালন করিতে যত্নবান হও।

এই প্রসঙ্গে আমি বলিতে চাই, বিদেশী স্বতার কাপড় সম্পূর্ণভাবেই পরিহার করা উচিত। প্রীতি হাত বিদেশী স্বতা কেনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে রাখিতে হইবে, যে ভারতবাসী দরিদ্র জনসাধারণকে বঞ্চিত করিয়াই আমরা সেই পার্থক্য ব্যবহার করিতেছি। কোটি কোটি ভাই ভগ্নীর লজ্জা বদেশী-ব্রত প্রত্যেক ভারতবাসীকে দুঃস্বপ্নের মধ্যে করিতে হইবে।

সমস্ত অর্দ্ধশতাব্দীর হানে শীঘ্রই পূর্ণ বন্দর প্রস্তুত ও প্রচলন করিতে পারিলে—সত্যই আমি সমর্থক হইব। জাতিগঠনের যে পূর্ণ আদর্শ এবাং আমেরি আশ্রয় দেখিবান, তাহা সম্পূর্ণ নিষ্ঠুর হয়—যে দিন পিঙ্গনে

স্বতা কর্তনে ও বুননে, আরও উৎকৃষ্ট ব্যবহার স্থাপি করিয়া, আশ্রমের কর্মীগণ এই দিক দিয়াও দেশকে ভীড়ের দানে সমর্থক উজ্জ্বল করিতে পারিবেন। এবার আমিও যেন আমি যোগ্য করিতে পারি—ও যেখানে যাইব সেইখানেই একথা প্রচার করিতে পারি—যদি ধর্মপ্রাণ ও দেশহিতব্রত চরিত্র গঠনের উৎকৃষ্ট নিদর্শন কোথাও দেখিতে হয়,

তবে চন্দননগরে "প্রবর্তক আশ্রম" সেইরূপ এক উদার ভাণ্ডার—তেননি শ্রেষ্ঠ চরকা ও খন্দার বয়ন-শিল্পের নিষ্ঠুর আদর্শও এই চন্দননগরের আশ্রমে আশ্রিয়াই যেন দেখা যায়। আচার্যশ্রী ও আশ্রম-বাসীগণকে আমি আমার স্নেহপ্রীতিপূর্ণ হৃদয়ের আলিঙ্গন ও শুভাশীষ অর্পণ করিতেছি। ভগবান যেন এই আশ্রমের সর্বস্বাধীন কল্যাণ বিধান করেন।

সমালোচনা ও প্রাপ্তিস্বীকার

—

শ্রী শ্রীবিজয় গঙ্গল—শ্রীবদ্যাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এল সঙ্কলিত। মূল্য ১০/- মাত্র। যুগান্তকালীন শ্রীশ্রীবিজয়গঙ্গলের কল্পভাজন ভক্তিশিখা বরদাস্ত্য বাবু তাহার শ্রীশ্রী প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ নিবিড় আলোচনা ও তদীয় উপদেশবাহী হইতে সঙ্কলিত করিয়াছেন। ইত্যপূর্বে প্রকাশিত "সুগন্ধক সঙ্গ" নামক উপদেশ ও বহুমূল্য গ্রন্থমালা যিনি পাঠ করিয়াছেন, তাহার নিকট এই বইখানিও পরম সমাদরে গ্রহীত হইবে ও ধর্মজীবনাকামী দ্বন্দ্বপরিপাক্ষ নাজেই ইহা পাঠে উপকৃত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

[প্রভুপাদ গোবিন্দী মহাশয় বাংলা জাতি-জীবনের অজতম মৈত্রিক। ধর্ম-জাগরণের উপর ত্রিভি করিয়া যে নবসমাজ গঠনের প্রয়াস, তাহার সূলে আছে বিজয়গঙ্গলের নিবিড় ও নিষ্ঠুর তপস্বী। সে তপস্বীজির মধ্য এখন পর্যন্তও অনেক যত্নে নাই। তাই নবযুগের উদ্যোগে শ্রীশ্রীবিজয় উদ্ভাস জাতিতে স্পষ্ট হইতেছে। শুনাইয়াছিলেন—"the truth of the future which Bijoy Goswami hid within himself has not yet been revca-

led. তার অমর সাধনা ভাবমণ্ডি পরিগ্রহ পূর্ণক গভীরতর, সমাজের রক্ত, রক্ত, অশ্রুপ্রবীর্ণ হইয়া, সমস্ত পাপ, গদগ, ক্ষতপুঞ্জ, এসে এসে গলাধঃকরণ করিয়া দেশ ও সমাজ-জীবন কি হুজাধারে গরমমুক্ত ও পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে, তাহা স্থলদশী বরণ রাখে না। কিন্তু আধ্যাত্ম অস্ত্রভবীর পক্ষে তাহার মর্ম বুঝা ও বুঝান ছুইই প্রয়োজনীয়। গোবিন্দীর গুরুশক্তি এখনও "তপু ভাগ্যবান সম্ভানগণের" কেন, সমগ্র জাতির অস্ত্রশরীরে কার্যকরী, ইহাও কি বাগ্মণীর আজও বুঝিবার সময় আসে নাই! তাই আমরা বরীয় হৃদয়মাজকে এইসব মহাপ্রাণ জাতি-নিষ্ঠার অমর বাণী ও সাধনালোচনা প্রবল ঘোষিতে জাতীর জীবনে বহাইয়া দিতে বলি। উদীয়মান নবজাতির তরুণ জীবনে ইহাদেরই পুণ্যবাস সত্যকে খেলিতে বাবু—ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা। এতখিৎবে ভক্ত গ্রন্থকারের স্তব উদ্যম আমরা সর্বস্বাক্ষর অভিনন্দন করিতেছি ও এমনই সব বই-এর বহন প্রচার হউক, ইহাই আশা করিতেছি।]

সানিয়ার সেন—শ্রীনব্রত নাথ রায়।
মূল্য ৮০ আনা। সানি নবীন চৌনের মুক্তিযুদ্ধের
গুরু। কিন্তু সানের ছাত্র জীবন শুধু একান্ত
চৌনেরই নয়। সানের ছাত্র পুণ্যচরিত্র বিশ্বের মুক্তি-
সাধনকে আশাবিত্ত করে ও বরাভয় দেয়। চীন
এসিয়াবাসী হইলেও, চৌনের ছাত্র ভারতের অবস্থা
সর্বত্র এক নহে। তাই ভারতের মুক্তি সংগ্রামে
তাহাকে চৌনেরই আদর্শ বা পথ্য অনুসরণ
করিতে হইবে, এমন নহে। কিন্তু সানের
স্বদেশপ্রেমিকতা, তাঁর অব্যাভিচারী দেশমনের
দীক্ষা, এ সর্বকালের সম্পদ, সর্ব জাতিরই সাধা।
নতুন যুগের বাঙ্গালী নতুন পথ্য যখন স্বদেশপেদার
সাধনার আত্মনিয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে,
তখন বাহু অহঙ্করণের বার্থ প্রয়াস না করিয়া, শুদ্ধ
ও ভক্তিনিবিশিষ্ট চিন্তে সানের শিক্ষা, দীক্ষা, সাধনার
অনুযান করিলে, তাঁহার অমর আত্মারই আশীর্বাদ
পাইবে। বইখানিতে তাঁহার জীবনলেখো চিত্রিত
হইয়াছে। ভাষার নামে নামে ছ একটা তরল উচ্ছ্বা-
সের অভিব্যক্তি আসিয়া পড়িয়াছে। বাহা হউক,
বইখানি মোটামুটি হৃদয়বিত্ত ও প্রশংসার যোগ্য।

সাহ্য সমাচার—মাসিক পত্র। বৈশাখ
ও চৈত্র সংখ্যা। [লোকসিঁহী ডাঃ কাঙ্ক্ষিত
বহু ভগ্নবাহ্য জাতির মেধাও নতুন বাহ্য ও শক্তি
সঞ্চয় করিয়া, জাতীয় জীবনের ভিত্তি স্থাপন
করিতে চাহেন, তাহারই প্রত্যক্ষ উদ্যম ফল—এই “সাহ্য
সমাচার।”] আমরা নববর্ষের প্রথম চাই সংখ্যা
পাঠ করিয়া তৃপ্ত ও উপকৃত হইয়াছি। প্রথম
সংখ্যার প্রতাবনা বড়ই স্পষ্ট ও প্রেরণাপূর্ণ। “খন্ডা
বিধিবে কে?” প্রবন্ধে লেখক গুরুতর প্রশ্নের
উত্থাপনাই করিয়াছেন। বাহা হউক মাসিকখানি
বিশেষ ও অবশ্যজ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ। আমরা দেশে
তাহার বহু প্রচার কামনা ও জাতিকে ডাক্তারের
শুভ উদ্যমের সর্বতোভাবে সহায়তা করিতে অগ্রসর
করিতেছি।

প্রাপ্তি স্বীকার

সাহ্য ধর্ম্য গৃহপঞ্জিকা—সাহ্য ধর্ম্য সন্থ
হইতে প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীভূপতি নাথ—মূল্য ১০ নাস।



গত সংখ্যা দীপাবলীর “প্রতাবনা” পড়িয়া
শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র নাথ গুহ রায়, এক দীর্ঘ প্রতিবাদ
পঠাইয়াছেন, আমরা স্বাভাবিকবশতঃ এই সংখ্যায়
তাঁহা পত্র করিতে পারিলাম না, তিনি আমাদের
কথাগুলি তলাইয়া বুঝেন নাই, ৬১ পৃষ্ঠার প্রথম
স্তম্ভের “হিন্দুজাতি বুদ্ধ বিগ্রহ অস্বীকার করার
উপায় নাই” এই অংশ পাঠ করিয়াই মন্তব্য প্রকাশ
করিয়াছেন।

আমরা কিন্তু মৌণ্য ও গুপ্ত রাজত্বকালের কথা
বলি নাই, বৌদ্ধ প্রভাবের পর বাংলার অবনতি
জিহ্বের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা তিনি বোধ হয়
খেয়াল রাখেন নাই। তারপর শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ
দেবোপাধ্যায় মহাশয় “ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা”
শীর্ষক বক্তৃতায় যে নজির দেখাইয়াছেন, সে কোন
ভারত! সিন্ধু নদীর তীরে যে সভ্যতা বিস্তার লাভ
করিয়াছিল, যে আদি জাতির জীবনের পরিচয় তিনি
প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সহিত আমাদের বর্তমান
সম্পর্ক, বোধহয়, মিশর পারস্ত জর্জনি জাতির সহিতও
ততখানি সম্পর্ক, আদি জাতির বংশধর বলিয়া এক।

ভারতই আর গর্ভের অধিকারী নহে, সে গর্ভের বড়াই
যুরোপ অধিক মাত্রায় করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

আমাদের ইতিহাস প্রত্নতত্ত্ববিদের কলমের
খোঁচায় বতটা বাহির হয়, মণ্ডিচ্চ চালনার পক্ষে
তাঁহার যথেষ্টই প্রয়োজন, কিন্তু জীবন গঠনের উপ-
যোগী শিক্ষার ক্ষেত্র ইতিহাসেই অধিক মিলে, বাশ-
লীর ধর্মোপবাহে গৌরব ও মহত্ত্বের সংস্কার আজ
যে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, অধোদার সভ্যতা
হৃদয় লগ্নাধীপে রান রাবণের যুদ্ধ বহুই প্রকটিত
হউক, বক্রণ বাণ, অগ্নিবাণের উল্লেখ বতই পাই,
যাহার আসরে দম্ব যুদ্ধের উদ্যোগে, প্রতিদ্বন্দ্বী
কর্তার ডিপাইয়া দর্শকের পক্ষাভে যখন লুপ্ত,
বাংলার এক অধ দিনের নয়, পাঁচ সাত বৎসরের
চরিত্রচিত্র অবিস্মৃত হইয়া পড়ে।

মনে রাখিতে হইবে, একটা খণ্ড গ্রন্থের পর
দেশের ছবিসংগ্রহ কথাই উল্লেখ করিতেছি। মীতাকে
উদ্ধার করিয়া রামচন্দ্র যে পুষ্প রথে অযোধ্যায়
আগমন করিয়াছিলেন, তাহা আধুনিক যুগের উজ্জ্ব-
ল জাহাজের উত্তম সংস্করণ হইতে পারে, রাজা দশরথও
শনিগহের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া আকাশে

অভিমান করিয়াছিলেন, পক্ষ পাণ্ডবের স্বর্গারোহণ, উহার মধ্যেও হয়তো যাদুদি সাজে লইয়া বাণেশ্বর বাবুয়ার কথা পরে বাহির হইতে পারে, কিন্তু প্রাচীন সভ্যতা—এমনই ভাবে এক যুগে নিঃশেষ হইয়াছে, বাহার স্বয়ং ধরিয়া আর আমরা পূর্ণ পরিচয় দিতে সক্ষম হই না। বৈজ্ঞানিক উন্নতির কোন নজির দেখাইবার উপায় নাই, ভারতের দার্শনিক তত্ত্বের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস আছে, ভাবনের অথও ইতিহাস একান্তই প্রস্তুত ও ভাবাত্ত্ববিদদের মুখ-চাহিয়াই লাভ করিতে হয়—ইহা বলিতে আপত্তি নাই।

ভারতের মুক্তিকার্গে—আমরা বসন ক্রম প্রভৃতি—প্রাচীন ভারতের বাস্তব অনেক বস্তুর নদিশ্রী লাভ করি, ক্রম বস্তুকা, প্রস্তুতবোধী, স্বরমা হস্তা, উপবোধী তুলনামূলক চমাপ পাই, কিন্তু সমুদ্র-তটে বসিয়া দিল্লীর রাজপ্রাসাদে এক মুহূর্তে সংবাদ প্রেরণ করার ব্যবস্থার ইতিহাস পাই কি? কুরুক্ষেত্রের যবন, সঞ্জয় প্রভৃতিতে হস্তিনাপুরীতে বসিয়া বসিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা যোগেশ্বরের সাহায্যে—একথা মহাভারতে বিশদ করিয়া লেখা আছে, তবে ভারতের গৌরববৃদ্ধি করিতে হইলে ইহাতে যেতার বস্তুর স্থায়ী স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু স্বপ্নের দ্বারা হইতে দিল্লীতে সংবাদাদি প্রেরণ—অথারোই দৈনিকের দ্বারা দায়িত্ব হইয়াছে, ইহারও উল্লেখ আছে।

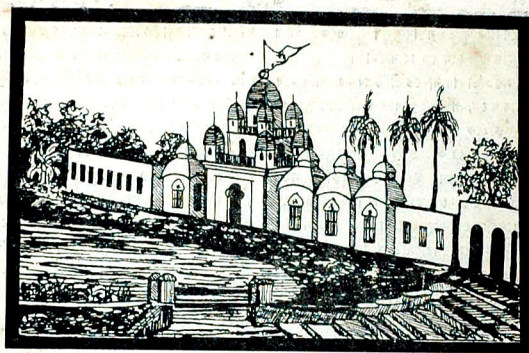
এই সকল অবস্থার কথার আলোচনার আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না—আমাদের স্বীকার করিতে আস্তিত্ব নাই যে মুসলমান যুগের পূর্বে ভারত বৈজ্ঞানিক যুদ্ধ প্রথা প্রচলিত ছিল, আমাদের স্বীকার করিতে আস্তিত্ব নাই যে হিন্দুজাতি বাক্যদের ব্যাঘাত জ্ঞানিত, বন্ধু কামান ব্যবহার করিত, আমাদের বলিবার কথা এইটুকু, ভারতের সিংহাসন তৈলিয়া বৈজ্ঞানিক রাজশক্তি যে দিন অধিনালিকা সাহায্যে ভারত জয় করিল, ভারতবর্ষ সে দিন, ধ্বংসের জা-

রোপণ করিয়া, তরবারি, বাটি হুড়কার সাহায্যে অশ্রুজলিত মুসলমান সৈন্যকে টিকাইয়া রাখিতে পারে নাই, ভারতের সবই ছিল, একজনিকের মুখে বোধ হয় সবই উড়িয়া দিয়াছিল, ভারতের অতীত গবেষণার সামগ্রী—জীবন গঠনের উপাদান নয়।

ভারতের কথা ছাড়িয়া দিয়া দার্শনিক চর্চায় জীবন চালিলে, ভারত কেন, ভারতের কথা উল্লেখ করা যায়, কিন্তু তাহাতে জীবন শক্তিপূর্ণ হয় না। আমরা বাংলার কথাই বলিব, বাংলার মোহনাল, বাংলার মোরকাশি, বাংলার সীতারাম, প্রতাপাদিত্য, বাংলার ভারতচন্দ্র মুকুন্দরাম, রামকৃষ্ণ, বাংলার দাক্ষিণ, কাঞ্চাল, বৈরাগী, বাউল, বাংলার রামমোহন, দেশে, দেশে, বিজয়কৃষ্ণ ঠাকুর রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অবিনন্দ, বাংলার জগদীশ, প্রফুল্ল চন্দ্র, এমনই এই নবজাতি গঠনের বস্তু কৌশলের মধ্যে যে নূতন স্বরের মুহূর্তে উঠিয়াছে, তাহার স্বর ধরিয়াই বাংলাকে নূতন রূপে গড়িয়া তুলিতে হইবে—বাংলার সাহসী, বৈরাগী, তর্কবিদ্যায় ইহার যদি নবাবরূপে না নিয়া প্রাচীনতার আদর্শের ছাঁচে বাঙ্গালীকে ঢালাই করিতে চান, তবে উহারা বার্থ হইবেন। বাঙ্গালী পুরাতনের গর্বে উদ্ভব নয়, ইতিহাসের মত—দার্শনিক তত্ত্বের মত, মস্তিষ্ক চালনার সাহায্য স্বরূপ তাহারা সব কিছু অধ্যয়ন করিবে, কিন্তু জীবন গড়িয়াই যেন তাহারা একটা অথও জাত রূপে জগতে সন্নিবেশিত পারে। বাংলার এইদিকে যোগ আনা সম্ভাবনীয় আছে। ইহারের রাজহস্ততলে বাঙ্গালী আত্মগঠনের যদি অবকাশ পায়, তবে বস্তু-তত্ত্ব ভাবে—এই পাঁচ সাত শত বৎসরের ভারতের মধ্যেই গঠনের যে উপকরণ নিম্নেতে পারে, তাহা সমস্ত করিয়া, বাঙ্গালীকে পুষ্ট ও সংহতিবদ্ধ হইতে বলি। বাংলার এখন এক মাত্র কাজ—আমুং ভাঙ্গিয়া নবজীবনের উপর আত্মগঠন, বাস্তবগতভাবে নয়, জাগ্রিত তাবে, ইহার আয়োজনই আমরা চাই—এ পথে সাহায্য করার উৎসাহী কর্মী কি নাই!

জন্ম সংশোধন—৬৬ পৃষ্ঠায় ৫ লাইনে 'সুহেনিকায়' এই শব্দকপরে 'নয়' হইবে।

[স্থানাভাবে আমরা প্রবর্তনার বিবরণাদি এই সংখ্যা দিতে পারার লক্ষ্য না।—প্রঃ মঃ]
কলিকাতা ৬৬ নং মাদিকতা স্ট্রীট, প্রকাশ প্রেস হইতে ত্রীকোণোদয় বজ্রমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



১ম বর্ষ,
৩য় সংখ্যা

প্রবর্তক

আমার,
১৩০২

আমাদের কথা

—:—

দেশবদ্ধ চিন্তনজনের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উপস্থাপন করিয়া এক দল লোক মহাআর মনোভঙ্গের আয়োজন করিয়াছিলেন, প্রত্যেক প্রমাণ প্রয়োগেও ইহার ক্ষা হন নাই, তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, প্রত্যেক দেখা ও শুনার উপরও আমি প্রত্যয় করি না, কেন না মাহু দেখে ও শুনে তাহাই যাহা সে দেখিতে ও শুনিতে চায়—ইহা মহাআরই যোগ্য কথা, এই জন্তই তিনি মহাশয়।

মহামতি Wells বলেন—Religious intolerance and moral accusations are the natural weapons of the envious against

the leaders of men." অবশ্য "প্রবর্তক সত্য" যে আদর্শ ও উদ্দেশ্য দিচ্চেন, জগদীশ্বর দিন অশেষ বাধা বিয়ের ভিতর দিয়া যে সূর্য্যতে দেশের সন্মুখে আজ উপস্থিত, তাহা এমন বৃহত্তম ও মহত্তম বস্তু নয়, যাহা দেশের প্রাণে নিঃশ্বাস করিতে পারে, কিন্তু তবুও ইহার লক্ষ্য কামনায় একদল লোক আমাদের ধর্ম ও সমাজ জীবনের উপর মনোবৈপ্লব্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে—মাহু মাহু ও ধর্ম প্রোগ্রাম পরীক্ষার আশ্রিতে যখন মোড় ফিরে, তখন প্রতিকার্য হতাশ দীর্ঘ নিরাশ বিষমপ্রবাহের সৃষ্টি করে, ইহা উৎসাহ বিধায় নহে, কেননা স্বজন যখনো পশু ভাব নয়, বস্তু-

তত্ত্ব, সেখানে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে, এইজন্য ইহার প্রতীকার সঙ্গে সঙ্গে হও। ইহা বাক্যনীর।

কিন্তু প্রতীকার বণিতে প্রতিবাদ নয়, প্রতিবাদে দৃকভাব থাকে, প্রতিহত আঘাত প্রত্যাবাহতে দূর হয় না, প্রকৃতিকে জয় করিয়াই এইরূপ অস্পষ্টতার মনোভাবের উদ্ভিগ্ন করিতে হয়। মাহুষের মধ্যে যখন বিবুদ্ধতা জাগে, তখন ইহা অন্তর্গত প্রকৃতির লক্ষণ বলিয়া দ্রষ্টব্য। মনুষ্যত্বের অপমান; লক্ষ্য রাখিতে হইবে গভীরে, কোন মূল প্রেরণার ইহা অভিবাঙ্কি—সেই দিকে। তারপর, অতিবৃদ্ধ মিথ্যার পঙ্ক্তিতেও যে সত্যের সম্ভাবনীয়তা আছে, প্রকৃতির রোষ সংকট ধরিয়া সেই দিক হইতে আত্মশোধনের ব্যবস্থা ইহার প্রতীকার—আমরা সেই পথেই চলিয়াছি।

ইহা একান্তই অস্বস্তির সাধনার কথা। কিন্তু সকল বস্তুর অন্তর বাহির দুইটা দিক আছে, একদিকে নম্রর দিয়া চলিলে অন্য দিক স্থিকিমা পড়ে, এইজন্য বাহিরের দিক দিয়াও ইহার প্রতীকার করার প্রয়োজন, সে প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে, বিশদরূপে আত্ম-প্রকাশে। বহিঃ অস্তরঙ্গ সাধনার উপরেই ইহা নির্ভর করে, তবুও কতকটা আশা আমরা বাহিরের দিকে ছুড়াইয়া নিজেদের অবস্থা মাহুষের আক্রমণ হইতে নিরাপদ করিতে পারি—বর্ধমান প্রবন্ধ তাহাই প্রয়াস, ইহা আমাদের স্বরূপ প্রকাশের চেষ্টা। মাত্র, একান্তই আমাদের কথা, এক পক্ষের কথা—বাহিরের লোক বিনা বাচাইয়ে প্রত্যাহ করিতে না পারেন, কিন্তু আমাদের কাছে বাহ্য মধ্যমতা বাস্তব, তাহার অভিবাঙ্কি সবুজ কণ্ঠে দিব—বাহিরের দিক হইতে ইহা ভিন্ন বর্ধমান অবস্থায় আমাদের আর অন্য পথ নাই।

“প্রবর্তক সত্যের” গাদশ শুধুই সন্ন্যাসী স্বপ্নের ক্ষেত্র গঠন নয়, ইহা প্রবর্তকের পাঠক মাজেই অস্বস্তি আছে, এইজন্য “প্রবর্তকের” ধর্মজীবনের উপর ভিত্তি

করিয়া একটা সমাজ গঠনের আয়োজনও শুরু হইয়াছে, সমাজের সঙ্গে বৈপর্য্যিক ও ব্যবহারিক জীবনের বণিত সখ্য আছে—আমরা যুগপৎ এই তিনটা ক্ষেত্রেই বিপন্ন হইয়াছি। এই বিপন্নতা আসন্ন যুগের লক্ষণ বলিয়া আমরা মনে করি না, ইহা সাধারণ অনিবার্য ফল—যে সাধনা ব্যক্তিগত জীবনের মুক্তিকল্পে অসুচিত নয়, যে সাধনার জাতির মুক্তি, মনুষ্যজাতির কল্যাণ, সে সাধনার যে অন্তরীণ সম্ভাব্য উপস্থিতি হইয়া আমাদের জীবনে আবর্তের পর আবর্ত সৃষ্টি করিবে, ইহা তো জানা কথা। “লয় বহিবে বায়, ভেসে যাব রসে”—সাধন তরঙ্গে এমন হালুকা জীবন লইয়া তো কাঁপ বিই নাই—এই ত্রেতে তুলণ বাধা হাসিতে হাসিতেই পায়ের তলে ফেলিয়া আগাইতে হইবে। একটা বড় কথা মাহুষের শ্রমের রাধা দরকার—কোন নতুন স্বপ্নের স্বপ্ন বণন মর প্রাণে আশ্রয় লয়, তখন মাহুষ সেই কর্মসূত্রের অবি শক্তির সহিত অভিভাব্য রূপে মিশ্রিত হইয়া যায়,—কর্ম করে, বিয় অস্তরায় অতিক্রম করে মাহুষের মন বৃত্তি প্রাণ নয়, সেই শক্তি, সত্যতঃ এইরূপ একটা শক্তিরই বনীবৃত্ত মুষ্টি, প্রকৃতির বাধা এই পরিচর প্রমাণ করে আঘাত ভিন্ন অন্য কিছু নয়।

মাহুষ তুলণ করে এই তর অবধারণ কালে। “প্রবর্তকের” সহিত পরিচিত সকল বন্ধুদের এই কথাটা মনে রাখা চাই, যে “প্রবর্তক” উভাচকণ্ডে প্রথম কয়েক বৎসর কেবল চাঁৎকার করিয়াছে—উৎসর্গ আর আত্ম-সমর্পণ মাত্র। উৎসর্গ করিতে হয় শক্তির কাছে মন, প্রাণ, বৃত্তি, পরিশেষে দেহ,—তবে হয় আত্মদর্শন, এই আত্মার সমর্থনেই স্বরূপ প্রকাশ পায়। সত্য স্বরূপ বেগানে, সেখানে সে অমর, উৎসর্গযুক্ত অবি-উদ্ভাব্য যে মাহুষ দেখে মন লইয়া পিছু ফিরে সে এ তবের মাধোপাঙ্গিক করিবে কেমন করিয়া। স্বরূপে সত্য দর্শন করিয়াছি বলিয়াই অকণ্ঠিত স্পন্দায় মস্তক

অমরত্ব আজ ঘোষণা করিয়া রাখিলাম।

তারপর আমাদের বিবুদ্ধে মর্মখাতী অভিযোগের কথা। দেশের লোকের কাছে, রাষ্ট্রশক্তির কাছে, আত্মীয় স্বজনদের কাছে আমরা উপার দ্বন্দ্বয়ে আত্ম-কথা বলিয়া বাইবে, বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ইহা অসুতকল প্রসব করিবে, মশরীর চিত্তে কালকূট হলাহলের তুফান তুলিবে—আমরা নির্ভীক, মরণও বেথানে জ্বরে দুটি দেহীপায়ান সেখানে আতঙ্কের চাপে রাখা নত নয়।

অভিযোগে ধর্ম সাধনার, অভিযোগে সমাজ ও ব্যবহারিক জীবনে, অর্থ ও রাষ্ট্রক্ষেত্রে দুঃপরনের কলঙ্কের মসী প্রতিদিন ঘনতর হইয়া উঠিতেছে বাধা “প্রবর্তকের” উদ্দেশ্য কামনাঃ হিংসার আগুন বৃকে চাপিয়া, সহ্যহৃত্তি ও কল্যাণ সজ্ঞ বচনে মাহুষের মনে আমাদের প্রতি বিবুদ্ধ ভাব সৃষ্টির আয়োজন করিতেছে, বাহ্যার স্পষ্ট সরল ভাবে অথবা তির্যক পণ্ডিত ইহার অনিষ্টচরণে উত্তত, তাহাদের কোন কথাই প্রতিবাদ নাই—নিজের নিজের অন্তর অস্বস্তি তাহাদের ধর্মজীবন, নৈতিক জীবন, ব্যবহারিক জীবন, সমাজজীবনের অস্বস্তি নয় বলিয়া একরূপ স্তুতি-কটু প্রতিবাদ খুবই বাস্তবিক, ইহার জ্ঞা আমরা আদৌ স্মরণ নাই, কিন্তু ইহার উপর আমাদেরও একটা রক্তবা আছে—আমরা নিরপেক্ষ ভাবে তাহাই ব্যক্ত করিতে চাই।

আজও সে মাহুষ ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত নয়, পণ্ডিত বৎসর পূর্ণে যায় এক সঙ্গে ঈশ্বর লাভের অয়ি-আকাআয় একজু হইয়াছিল, আজও তারা সাক্ষা দিবে, স্তর স্তর কেবল পদপ্রদর্শকের আগমন প্রতীক্ষায় তারা অশ্রু বর্ষণ করিয়াছে পাক্তনেও টানে তারা আজ দূরে থাকিলেও, সে যদুর সমর্থপূর্ণ শব্দদের আশাও কেহই তুলে নাই, তুলিবে না, তুলিতে পারে না—সেই ঈশ্বরদর্শনের আকুলতাই কিশোর জীবনে

উদাহনার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাই বৎসরের পর বৎসর উচ্চকণ্ঠে একদল তরুণ অশ্রুশক্তি নয়নে কেবল চাঁৎকার করিয়াছে—“মা জ্ঞান শক্তি প্রেম দে, জ্ঞান, শক্তি প্রেম দে”। এই সরল প্রার্থনার সবল আকর্ষণেই না ১৯১১ খৃষ্টাব্দে অঘাতিত দেব অতিথির আগমন। অঘাতিত দেবতা কলঙ্কার মুষ্টি ধরিয়াই জিমাগামী বোণের সন্ধান দিলেন, ত্রিকর্মের সাধনার পথ মুক্ত করিলেন, দীর্ঘ ধারণ বৎসর গল্পগুটে রাখিবা যে জীবন পালন করিলেন, সে জীবন বৃক ছিঁড়িয়াই ছুঁড়িয়া দিয়াছেন। আজ চারবৎসর, বাদশ বর্ষের পাণ্ডিত বোণ-শক্তি আশ্রয়তলে, সত্য আত্ম হওয়ার সাধনার পণ্ডিত, এই বৈবচিনের মর্মবোধ না করিয়া, বাধা ইহার ভিন্ন অর্থ প্রচার করেন, ইহা তাহাদের কথা; আমাদের কথা জীবন দিয়া ময় সিদ্ধির জুই আকাশের বজ্র মাথায় ধরিয়াছি—পতীকার কণ্ঠ-পাথরে ঘষিয়া ঘষিয়া মুখে রক্ত উঠিলেও, হৃদয়ের স্বতাসিদ্ধ শ্রদ্ধা উৎস কোনদিন শুক হইবে না, বোণ বার্থ হওয়ার পূর্ণে, প্রাণ বলি পড়িবে। বাহিরের বিচ্ছেদ অন্তরঙ্গ সাধনার গমন সহায় হইয়া আজ আমাদের আত্মবিশ্বাস অচলপ্রতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে, অসুতক এই বোণের দেবতা যে আশীষ বর্ষণ করিতেছেন, তাহা অনির্কলনীয়—সুখঃ ইহা লইয়া বাহিরের লোকের আলোচনা আমরা অনধিকার চর্চা বলিয়াই মনে করি।

আমাদের সমাজ জীবনের উপর কটাক্ষপাত বাঁধাঃ করেন, তাঁহারা যদি প্রাকৃত প্রাণের ক্ষেত্রে পীড়াইয়া আমাদের কথার শংশয় প্রকাশ করেন, তাহারা উত্তরে নিম্নস্তর থাকাই শ্রেয়ঃ, তবে এ কথা বড় গলায় বলিয়া রাখি, “প্রবর্তক সত্যে” আজ পর্যন্ত সমাজ গঠনের বেটুঃ ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা যে অসুট একচর্চা ব্রত পালনের কঠোর সাধনার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা যেন তাঁহারা গণণ রাখেন।

সন্ন্যাস আশ্রম সাধনার অঙ্গ হিসাবেই গ্রহণ করি—লক্ষ্য ভাগবত জীবন। সন্ন্যাসের প্রকরণ অধ্যাত্ম ভাবেই অঙ্কিত হয়, “প্রবর্তকের” সাধনায় অধিকারী ভেদে প্রত্যেককেই পোহাভবিত হইতে হয়। যদি সন্ন্যাসীর মঠ হইত, তাহা হইলে বিষয়টা মালম্বেয় রূতকটা শোধন্য হইত সন্দেহ নাই, কেননা উহা প্রকৃতির কোমল আশ্রয় পাইয়াছে। কিন্তু “প্রবর্তক” বাহা করিতে চাহে, তাহা একেবারেই আনুকোয়া নৃতন জিনিষ, গোড়াভিত্তির নারী পুরুষের মধ্যে মিলনের ভিত্তি স্থাপন করিয়া, অধ্যাত্ম সাধনায়, আত্মজয়ী হওয়ার ব্যবস্থা,—ইহা যদি পশুপুষ্টিচরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে বিন্যাস কেহ প্রচার করে, তবে তাহার চরিত্র সম্বন্ধেই আমাদের সংশয় উপস্থিত হয়।

“প্রবর্তক” আশ্রমের” সকলেই যে এই পথপানী তাহা নহে, স্বতঃস্ফূর্তনের উপরেই, নির্দিষ্ট জীবন গ্রহণের ব্যবস্থা নির্ভর করে, চির কুমার ও কুমারীরাপে অনায়াত ফুলের মত, দেবকার্যে আত্মদান করাই যেখানে জীবনের আদর্শ রূপে দৃষ্টে, তাহা কোন মতে স্ক্রম হয় না—আজ পর্য্যন্ত “প্রবর্তকের” ধর্ম অমূল্য রূপে রাখিয়া, বাহ্যিক দাম্পত্য জীবন গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের পবিত্র মুখমণ্ডলে গোপনের বিকৃত রেখা এখনও দেখা দেয় নাই, বতদিন না দিবে ততদিন কি বলিব না, মিথ্যাবাদীর রসনা রুদ্ধ করিয়া ভগবান তাহাকে স্পৃহণে পরিত্যাগিত করেন।

আমাদের ব্যবহারিক জীবন সম্বন্ধে—অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতার অভাবে আমরা অনেক মারাত্মক ভুল করিয়াছি, ইহা আমরা চিরদিন স্বীকার করি। আসিতো, কলঙ্কিত অর্থ, বাহ্যিকের হস্তে অর্পণ করিয়া ব্যাধি ও বাণিজ্য বিস্তারে অজ্ঞিত অর্থে গুণভার মুক্ত হওয়ার আশা করা হইয়াছিল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহারা আমাদের নিরাশ করিয়াছে। অর্থ সমস্যা সাধনার অন্তর্ভুক্ত না হইয়া বরং প্রতিদ্বন্দ্বী আচরণ করিয়াছে, বাস্তবিক

প্রধান সহায় অর্থ, ইহা সমষ্টিগত করার প্রয়াস প্রতি পদে আমাদের স্মৃতি হইয়াছে, আমরা ইহার লজ্জা হুঃখিত নই,—সমস্ত গুণশোধ করিব, এই মাত্র আশাস ও স্বীকৃতি দেওয়া ছাড়া আমাদের আর অস্ত্র উপায় নাই, এবং গুণশোধই এক্ষণে আমাদের লক্ষ্য—সমষ্টির প্রাণ ইহাতে চুম্বিত নহে। এই ক্ষেত্রে আশা-দেব বিব্রত বত অধিবেশ্য তাহা আমরা মাথা পাতিয়াই গ্রহণ করিব।

উপসংহারে বক্তব্য, আমাদের প্রতি রাজশক্তির যুগ্ম সংশয়। এই সংশয়ের মূল—আমাদের অতীত জীবনের উপরেই একটা মিথ্যা আরোপের ফল, একথা কোনদিন বহির্ভুক্ত কুঠা বোধ করিব না; কেন না সম্ভব জীবন কোনদিন বৈপর্য্যিক নহে, বরং আমরা চিরদিন ইহার বিরুদ্ধ প্রচারাি করিয়া আসিয়াছি, এবং আমাদের অবস্থা পৃষ্ঠ দিবালোকের মত স্পষ্টকন সমক্ষে, এমনকি রাজশক্তির চক্রে উপর রাখিয়াই আমরা কার্য করিয়াছি, এখনও করিতেছি। “প্রবর্তক” সম্বন্ধে ‘মথার্য’ দীক্ষিত মাহুয যদি কোন দিন বিপ্লব সম্পর্কে অভিযুক্ত হয়, তবে যে হেতু ইহা নিষিদ্ধাচ্ছি, সে হস্ত কাটিয়া ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিব। ইহা ব্যতীত দেশ-বাদী ও রাজশক্তির মনে আমাদের প্রতি যুগ্ম সংশয় নিরাসনের আর অস্ত্র কথা বলিবার কি আছে?

আমাদের সকল দিকই বাধায় আচ্ছন্ন, এবং অন্তর দিয়া দেখি—অহেতুক বাধা অন্তর্গত পতীকার লজ্জাই যেন ইদ্যত—“প্রবর্তকের” সাধক দ্বয়ে ক্রমেই দৈবের আসন বিছাওয়া, জ্ঞান, প্রেম শক্তির স্রোতনয় বাংলায় অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে উপর এমন এক সমষ্টি চক্ৰ নির্মাণ করিবে, বাহা ভবিষ্যতে জাতীয় জীবনে শাণ ও শক্তি নিরাস করিয়া, জাতিকে নব প্রাণে উদ্ভূত করিবে। আজ এই পরীক্ষার যুগে আমরা বৈদ্য সাধনার প্রতি আশা হারাইয়া আসনচ্যুত না

হই, প্রলয় দুর্ঘটনাগে আত্মবিশ্বাস না হারাই, সম্বন্ধ-ভয়ের আশ্রয় আমাদের জীবনের সর্বমানিক ভরাইয়া, আমাদের ঐক্য বলকে অটুট রাখে—জাতির

ইহাই মূলসম্বন্ধী বনী—“প্রবর্তক” অমৃতভাণ্ড হতে একদিন এই মহাপ্রেম বিস্তরণ করিবে, এ স্বপ্ন আমাদের বার্ষ্য হইবে না।

মূল-মন্ত্র

—:—:—

আদর্শ হউক ঐক্য। জাতির সাধনার মূল লক্ষ্য যদি ইহাই হয়, অধ্যাত্ম জাতি একটা মহান ও নৃতন জীবন পাইবে। ঐক্যের আদর্শক এ পর্য্যন্ত কোথাও কোনও দিনই আমরা আমাদের গুরু সাধনার কেন্দ্রসাধ্যরূপে স্থাপন করি নাই। জাতীয় জীবনের মূল ভরও তাই এপর্য্যন্ত আমরা বুদ্ধিয়া পাই নাই। ভারতের জাতিচেতনা মুক্তির আশ্রয়-লক্ষ্যে জীবন-সাধনায় প্রবর্তিত করিতে আমরা বাস্তবিক কতদিন ধরিয়া কতই না চেষ্টা করিয়াছি ও করিতেছি, শক্তির উদ্যোগে ঐক্যেরও প্রয়োজনীয়তা যে তীব্রভাবে কখনও উপলব্ধি করি নাই বা আজও করিতেছি না, তাহাও নহে; কিন্তু সে মুক্তিরই সোপান বা সাধন রূপে। আসল ঐক্যের স্বরূপের প্রতীকিতিক অস্তরগত যে টান বা আকর্ষণ, তাহা এখনও জন্মে নাই। মুক্তি বা স্বাধীনতা চায় না কে?—এ পৃথিবীতে এমন হতভাগ্য কেহই নাই, স্বদেশ বা স্বজাতির জন্মে ধাবী যে স্বাধিকার, তাহা যে স্বীকার করে, বা পাইতে প্রয়াসী নহে। কিন্তু চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে যে ব্যবধান, তৎপায়া ব্যতীত তাহার ত নিরাসন হয় না। সে তৎপায়াই আত্মপট্টনের। আর ভারতের জাতীয় আত্মপট্টন—জাতিরূপে আমাদের আত্ম-

লাভ ও পরিণতির মূল ভিত্তি বা বনীয়াধ হইতেছে—ঐক্যত্ব। উহারই উদ্ধার, প্রতিষ্ঠা বা পূর্ণ পরিণতির উপরে, আমাদের জাতিগত শক্তি-সাধনার স্থিতি, পতি ও মুক্তিমান নির্ভর করিতেছে।

ঐক্যের প্রতিষ্ঠা আত্মায়। সম্ভার টানে এই চাওয়া ফুটিলে, তবেই না সে চাওয়া অস্বাভাবিক মূলপ্রবণ ও পার্থক্য হইতে পারে। শুধু কার্যনিষ্ঠির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ঐক্যের স্বরূপতত্ত্ব উপলব্ধ হয় না। অবস্থার দ্বায়ে ও বাধায় আদর্শের নানারূপ বিকার ও বিপর্য্যও ঘটয়া যাইতে পারে। আদর্শের নিখুঁত রূপ যদি কারণে না দৃষ্টে, কণ্ঠের রাজ্যে তাহা কেমন করিয়া পার্থক্য প্রতিক্রিয়া উঠিবে? আমাদের জাতীয় ঐক্যের যে আদর্শ—কারণে তার সিদ্ধ ও কল্যাণরূপ কি আমরা দেখিয়াছি! সে নিঃসম, নিরবস্থা তৎপায়া মুক্তি তিলে আমরা স্বরূপে গড়িয়া তুলিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছি? ইহাই ভাবসাধনা—কিন্তু কল্পের সত্য না পাইলে, বস্তুর সাধনাও কোনদিন অসম্ভব, অকল্পনীয় হুঁচ যে পায় না। ভাবসাধকের দল শুধু কল্পনার লীলাস্রমে মজ্জণ হইয়া চিরদিন কাটার না—তাদেরও আত্মসংসর্গের সাধনা যোগ

কভার পূর্ণ হইলই, জীবনময় ছড়িয়া পড়ে। আর ইহাই তে ভাগবত নির্মাণ। উপরের নিবিড় সমাধিস্তর হইতে নামাইয়াই ভাব বা স্বপ্নাহুতিকের ঘোরে ঘোরে বাস্তবে রূপান্তর করা—শক্তিকে ভিতর হইতেই ফুটাইয়া, পুষ্ট, পরিপক, স্বজনকরী করিয়া তোলা—এই না পথ—ভারতের জাতিগঠনের সিদ্ধ মার্গ। এই নিশ্চিত, সুশুদ্ধ এই পথই আবার গিয়া ভারতের সনাতন সাধনার অব্যর্থ জয়যাত্রা আমরা সার্থক করিব। নির্মাণের বিস্তৃত তপস্যা ও সিদ্ধি অসুপ্ত মহিমায় প্রকট করিয়া দয়া—এই উপায়েই সম্ভব হইবে।

সব ত ভিতরে আছে। শক্তির অপ্রয়োগে বা প্রয়োগে তাহা কোথাও হুগু, নিজিত—অজ্ঞতা জাগিয়া উঠে। জাতির আত্মশক্তির শক্তি তার নিজের অন্তরেই ঘুমাইয়া আছে—সেই অতলগত গুণ—নিহিত শক্তিকেই আঘাতে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। নবযুগের ভারত যেদিন বিস্তৃত সমষ্টি-চেতনায় এই নবীনতর শক্তিসাধনার প্রবৃত্ত হইবে, সেদিনই কুণ্ডলিনী মহাশক্তি জাগ্রবে। মহাদেবীর জাগরণে জাতীয় মনে প্রাণে নবোদ্বোধনার বিদ্রোহ চটে খেলিবে—জাতি নবজীবনের আশ্বাসে সত্যই মাতাল হইবে। শক্তির পথই তন্ময়ের নির্দিষ্ট মংগ পথ। ভারতজাতি শক্তিবাদী না হইলে চলিবে না।

কিন্তু এই শক্তির সাধনা সমষ্টিজীবনে উৎসাহিত হইবে না—যদি না কারণে একেবারেই মূল প্রেরণা লইয়া তাহা জাগে। বেদান্তের মহামন্ত্র তদসিদ্ধ জাতি-জীবনে রূপ লইয়া আঙ্গ দৃষ্টিতে চায়—সে রূপ ব্রহ্মজ্যোতি দিয়া জাতি। একেই তার আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠা।

ঐক্য কি? মিলন। হিন্দু মুসলমান, এমন কি শূদ্র অস্পৃশ্যের মিলনের কথাই প্রথমে বলিতে হইবে। বাহিরের মিলন—অন্তরের মিলনকে প্রতিফলিত করে। অগ্রে চাই অন্তরঙ্গ সাধনা। এই মিলন-সাধনার অন্তরঙ্গ তত্ত্ব কোথাও এখনও ফুটে নাই। বহিরঙ্গ সাধনা ইহারই ত অম্ববর্তন করিলে!

অন্তর-সাধনা—অভেদ তত্ত্বের। সমষ্টি একটী অভেদ দেহী। অমর চেতনা—জগৎ এইবার নয়। যোগে সেই এককেই ত পাওয়া। বিধি—উৎসর্গ ও আত্মসমর্পণ। মন-প্রাণ-দেহ-সর্বস্ব উৎসর্গ করিয়া আত্মসমর্পণ যোগে অদিকারী হইতে হয়। তখন স্বরূপের সন্ধান মিলে। ঐক্য এই স্বরূপতত্ত্বের কেন্দ্র-বিন্দু। জ্ঞান, শক্তি, প্রেম—ইহারই অপর ত্রিশক্তি। অন্তরঙ্গ সাধনায় জ্ঞান, শক্তি, ভক্তি বা প্রেমের ত্রিঃস্রী জীবনবীণায় যখন বাজে, সে যে মহারাগিনী উদ্ভব করে—উহাই ঐক্যময়। তাহাই সমষ্টির প্রাণ।

ইহা সত্য বা সমষ্টি দর্শন। কিন্তু সম্ভবই আদর্শ ভিত্তিতে আমরা যে ভারতের নবীন জাতি-রূপ গড়িয়া তুলিতে উদ্বুদ্ধ, তারও একটা স্পষ্ট সংজ্ঞা নির্দেশে আঙ্গ করা চাই। ব্রহ্মের যেমন স্বরূপ ও ভট্টহৃৎ বিধি লক্ষণে সংজ্ঞা নির্ণয় করা হয়—সমষ্টি ও জাতির পক্ষেও তাই। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ—ইহাই ব্রহ্মের ভট্টহৃৎ লক্ষণ। ব্রহ্মের আসল সংজ্ঞা—অখণ্ড সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। জাতি-দর্শনেই মর্ম্মকথাও ভিন্ন নয়। কবীর যেদিন গাহিলেন—

জাতি হমারা আত্মা

প্রাণ হমারা নান—

অলখ হমারা ইট হৈ

গগন হমারা ঔম

সেদিন অপ্রত্যাশিত প্রত্যাপনেষে আমরা মুখে নিত্য

জাতীয়তার জীবনবেদী এক মূল পর্দায় স্বভাব দিয়া উঠিয়াছিল—উহা ভারতের সনাতন প্রকৃতিরই অনাদি, অমর চাপড়, ব্রহ্ম-জাতীয়তার স্বরূপ লক্ষণ। কথাটা তলাইয়া বুঝিতে হইবে। এই সব সিদ্ধ সাংকেতিক মর্ম্মসাধনের জুব দিতে না শিবিলে, আমরা ভারতের গুঢ় মহাবাণীটী কোন দিন শুনিতে পাইব না।

ভারত জাতীয়তার মূল তত্ত্ব—একটা অখণ্ড নিত্যাহুতি। এই অখণ্ডত্বের উপর ধাঁড়াইয়াই, তাহার জীবনসাধনার বিচিত্র স্বরূপাত। নিত্য প্রাণতনে সে ব্রহ্মস্বরূপ না স্পর্শিলে, তার জীবন-সত্তা মহা-প্রাণের গাড়া পায় বা দেয় না। ব্রহ্ম জাতীয়তাই আমাদের সত্য হু—কবীরের ‘পল্লীকাপান মেঠো ঘরে তারই মুচ্ছনা চেটে তুলিয়াছে—

“জাতি হমারা আত্মা”

এ বড় প্রাচীন কথা। এ যে আমাদের চিরযুগেরই আত্মপরিচয়—সনাতন মর্ম্ম নিবেদন। এই অনাহত মর্ম্ম সংবেদন লইয়াই আমরা জমিয়াছে—ভারত জাতীয়তার ইহাই মরণ বিচলের আসল গান। আত্মার অমর সত্যে অবগাহন করিয়াই আমাদের জাতি-চেতনার অহুত্ব কৈলি হইয়া গিয়াছে—ভাণ কথার মন্দের জড়ই বল, সে জীবনমর্ম্ম আর অঙ্গ হুবে হু ভিড়াইবে না—ইহা অবধারিত। হিমালয়ের গিরিশিখর বাহিয়া যে পুণ্যপ্রস্রাবোত না মিয়াছে, তাহা আর উজান তৈরিয়া ফিরিতে পারে না।

কিন্তু মহাপ্রাণের সন্ধান চাই। সে গতিবেগ কোথায়? ব্রহ্ম-স্বরে বীণা বাঁধিয়া যে জীবন-কন্ড এ জাতির কণ্ঠে স্বভাব তুলিয়াছে, তাহা অহুত্বের স্বরূপ লক্ষণ কবে রমিয়া, লীলাইয়া উঠিবে! জাতির স্বরূপ লক্ষণ কবি আমরা চিনিয়া থাকি, জাতিভেদে ভট্ট

প্রকাশ কবে আমাদের সর্বসাধনার মুক্ত ও সার্বক হইয়া উঠিবে? অন্তরে ও বাহিরে, এই দুইটির পরশ—এই গতির পরিচয়, কবে জাতি-হিসাবে আমরা পাইব? জাতি-প্রাণের বিরাট আধার যে মহা গণসেহ—ভারতের জনবিগ্রহ—সেখানে এই সুপ্ত কুণ্ডলিনী মহা-জাগরণের অপেক্ষার স্বরূপ হইয়া পড়িয়া আছে, তাহার অন্তর চেতনায় ঐ ব্রহ্ম-স্বরেরই ছোঁয়া দিখ। কে এক শুদ্ধ, নব জীবনের স্বচ্ছ গতির চন্দ্র সৃষ্টি করিবে? এসব দিকে এখনও আমরা শুধুই হাতড়াই-তেছি—আঁধার ভেদিয়া আলোকের সন্ধান পাই নাই। জাতিগুরু মহাত্মা, চরকার ব্রাহ্মণ সকালনে বাহা আনিতে চাহিয়াছেন—সে জাগরণের মূল নির্দেশ তিনি এখনও যেন ঠিক দিতে পারেন নাই। ভারতের জাতি-সত্তার অনাদি ব্রহ্মস্বরূপ লক্ষণ ও অহুত্বের রাখিয়া কে জাতিকে সেই জাগ্রত মহা-নির্দেশ দিবে? সারা ভারত আঙ্গ তুলিতে দৃষ্টে কি সেই দেবামিট মহানৈতারই প্রতীক্ষায় শরণার্থী নয়?

কোথায় প্রজ্ঞা? তুমি আসিয়া এই মরণনিজিত জাতি মহাপ্রাণের ব্রহ্মভাবের স্বভাব দাও—জাতি অঙ্গ মূল কাণেই তুলিবে না। সকল জাগরণের চেষ্টা মরুভূমির মত শেখের মাটি শুষ্কিয়া লইবে যদি এই ভাগবত সাধনার তরঙ্গ-প্রবাহ জাতি-জীবনে না নামিয়া আসে, তুমি সেই মহাঘোরে নামাও।

আজও ত আমাদের “মন বুঝেছে, প্রাণ বুঝে না”—অবস্থা! এ অস্বস্তি ও অনিশ্চয়তার অবস্থার নিরাসন হউক—তোমারই অসিদ্ধাঙ্গীরা নির্দেশে, তুমিই আমাদের নব ভাগবত জাতীয়তার দীক্ষা দাও। উৎসর্গে আমরা যেন অকাম, অন্তঃ ও বহিঃ শুদ্ধ হইতে পারি—আত্মসমর্পণে তোমার ভাগবত প্রকৃতিরই স্বাক্ষরকে সকল শক্তি মিলিয়া এক হই। এই স্বরূপগত

একোয় শক্তি দিয়াই ভারতভাতির সিদ্ধপঠনে পুরুষোত্তম—তুমিই আমাদের হাত ধরিয়া পথের সান্নিধ্য হাত দিবার বিন বাদি আসিয়া থাকে—তুমিই তবে স্বয়ং এবার ডাক দাও—ভারতের হে পরম, হে

ধর্মগুরুমণ্ডল

ধর্মগুরু সংস্থাপন মানসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডব দিগকে নিম্নোক্তকৃত করিয়া সূক্ষ্মক্ষেত্র সংগ্রাসে ধর্মবীর্য ভার লাভ করিলেন, যে চক্রবর্ত্ত অংককারে ভারত স্রষ্টার আসন অস্বীকার করিয়া ভোগে ঐশ্বর্য্যে আত্মহারা হইয়াছিল, তাহার সমস্ত বিধানে তিনি ধর্মসম্বন্ধের অহুতান করেন। অহংকার নিরসন করিতে গিয়া রোগ আয়ামের সঙ্গে বোগীও যেমন পঞ্চ ঐশ্বর্য্য হয়, সূক্ষ্মক্ষেত্রও এইরূপ খটখাটিল, অধিপুরণে আছে—

“কৃতবর্ধ্বা কৃপা দ্রৌণিরয়ো মুক্তান্ততো ব্রাহ্ম—
পাণ্ডবঃ সাত্যকিঃ কৃষ্ণঃ শন্ত মুক্তা না চাপরে ॥”
অর্থাৎ রণাবলানে দেখা গেল, কোঁরব পক্ষে কৃতবর্ধ্বা, কৃপ ও অশ্বখামা, আর পাণ্ডব পক্ষে পুরুপাণ্ডব, শ্রীকৃষ্ণ ও সাত্যকি এই দশজন মাত্র জীবিত অছেন, অতএব কৃষ্ণপক্ষের পর ভারতের কি শোচনীয় অবস্থা তাহা সহজেই অনুমেয়!

শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম স্থাপনের ক্ষেত্র নির্ধারণ করিলেন, কিন্তু রাজ্য গঠন করিতে সক্ষম হইলেন না, যে পঞ্চ-পাণ্ডবের সহায়ে ভারতে নবরাজ্য গঠনের আয়োজন করিবেন ভাবিয়াছিলেন, সেই পঞ্চ পাণ্ডবের শিরোমণি যুধিষ্ঠির শোকাকার হইয়া পড়িলেন, হইবারই কথা; ভারতের আকাশমণ্ডলে সে দিন, পতিপুত্রহীনা রমণীগণের যে শোকাকর্ষণাদ

প্রতিধ্বনি তুলিয়াছিল, তাহা মর্মভেদী, মানুষের অস্থির সে নিদারুণ আঘাত সহিধা স্থির থাকিতে পারে না, শ্রীকৃষ্ণের সান্নাৎবাবী যুধিষ্ঠিরে শোকাবেগে নিবারণ করিল না, তিনি দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, দেখিলেন রণভাঙ্গ বাদবগল অবশাদাচ্ছন্ন হইয়া উদ্যোগপানী হইয়াছে, তিনি বিশ্রামশয়ালে মৃগল দ্বারা স্ববংশ ধ্বংস করিয়া, প্রজ্ঞান তীর্থে স্বীয় কলেশ্বর বিসর্জন দিয়া লীলা সাদ্য করিলেন।

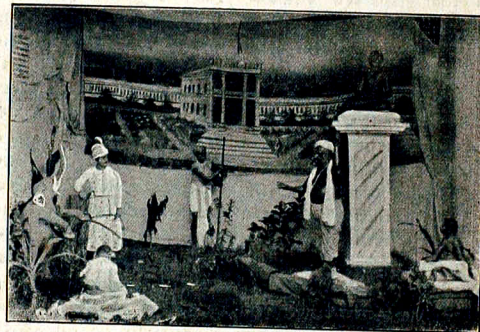
ভারতের আকাশ মণীবর্ণ হইল, ভারতের দৌরব-স্থ্যা দীর্ঘ দিনের জন্ত জ্বর পাকিল।

শ্রীকৃষ্ণের অহঙ্কানে—ভারতের দুর্বলতার ইতিহাস, ঐতিহাসিকের মতে আর কিছুদিনকি পাঁচ হাজার বৎসরের উপর হইবে। এই পাঁচ হাজার বৎসরের অন্ধকার অপসারিত করিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ নির্বাহ, অর তপস্যার সাধিত হইবে না। তাই তৎপন্ন জ্ঞাতীর নিরস্তর ভগ্নমায় প্রবাহ অনাহত রাখার উদ্দেশ্যে চিরযুগ ধরিয়া চলিয়াছে, মহাবীর, বুদ্ধ, শবর, রামাহুজ, কবীর, রামানন্দ, রামদাস, ঐতিহ্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, একই প্রবাহের তরঙ্গহিঙ্গোল, একই সনাতন ধর্ম রক্ত ও পালনের ময়চ্ছন্দ।

শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চ জীবনের উপর প্রতিষ্ঠা পাইতে চাহিয়াছিল—জীবনের অতীত হইয়া নহে, কিন্তু

নশ্বরতার মোহ অমর জীবনযাত্রা বাহু ঠা অস্থায়ী ভাগবত চরিত্র, সে দিবা চরিত্রের মাহু ভগবানের মাহু, অর্জুনকে এইরূপ ভাবেই ভগবান গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছেন।

সে গড়ার আয়োজন সে দিন ব্যর্থ হইয়াছে, কিন্তু সে অমর অরণ্য আরও ক্লান্ত নয়, ভগবানের পাঞ্চ-জ্ঞান আরও অনাহত ধ্বনি তুলিয়া ভগবানের মাহু বিদ্যারেই আশ্রয় পড়িয়াছে, তত মুক্তি হইয়া ধরাকে গড়ার ময় প্রচার করিতেছে, ইহা এক যুগের কাজ



বর্ষে পরিণত করে নাই। অতীতের ইতিহাস ইহার উজ্জ্বল সূচী।

জীবনের উপর আঘাত দিয়াই প্রকৃতি উপ-নিষদের ধর্ম জগতে স্থায়ী হইতে দেখে নাই, ভারতের ভবিষ্যৎ পুরুষগণ যেন স্রবণ রাখেন, মাহাবীর জীবনের ধর্ম নয়, ধর্ম ও জীবনে সামঞ্জস্য বিধানের প্রথম প্রয়াস উপনিষদপ্রণেতা করিয়াছেন, গীতা ইহার স্পষ্ট ব্যাখ্যা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দিয়াছেন। উপনিষদে আছে আশ্রম, গীতা আশ্রম পালনের উপায়গী চরিত্রগঠনের ব্যবস্থা দিয়াছে, সে চরিত্র

নয়, কত যুগ যুগান্তর ধরিয়া হো চলেবে। ভারতের ধর্ম দেশপূর্ণতা নহে, সনাতন; বিশ্বমানবের শক্তি মোক্ষের নিদান। এই ধর্ম সংগঠনের সূচনা যেন আরম্ভ হইয়াছে। নির্ধারণ নীতির এই নিগূঢ় রহস্য কিন্তু অনেকের নিকট অজ্ঞাত। তাই বিস্তৃত প্রবাহ স্রষ্ট হইতেছে না। আমরা ভারতের সত্য যতই জলধরন করিব, ততই ইহার মর্ষণোপাধি করিব, ততই আমরা দিবা জীবনের পথে অগ্রণ হইব, অর্জুনের অপেক্ষা আরও শক্ত, আরও নির্মম মানুষের স্রষ্ট হইবে, এইরূপ অসংখ্য মানব সমষ্টিই

ভবিষ্যৎ ভারতের জীবন সৃষ্টি। আর এইরূপ জাতি-গঠনের ডাকেই ভারতে সাড়া পড়িয়াছে—কে একথা বুঝিবে ?

শ্রীকৃষ্ণ যে ধর্ম জীবনের প্রতিষ্ঠা করলে মহা কুরুক্ষেত্রের স্বপ্নন করিলেন, আপাত সাধারণের অভাবে দারুণ প্রতিক্রিয়ায় ভারত অবসর হইল। তিনি যে শোক চরণের অতীত হইয়া, জয় পরাজয়ে অক্ষুণ্ণ লুপ্ত লইয়া, জীবনে ধর্মোক্তা প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্বের সে তেজ, সে তপসা, রান হইল, কুরুক্ষেত্রের দশাননবৃত্ত ভারতের জাতীয় জীবনের অন্তরতম সত্যের আজও বোধ হয় দশানন বৈরাগ্যের হতাশন প্রকাশিত রাখিয়াছে। পাতীরাশী অর্জুনের আশ্রয় হইতে গোণালয়ের যে দিন যামবনত্রয়ের মাত্র লঙ্ঘ্যে সাহায্যে অপহরণ করিল, অর্জুন সেদিন নিদাক্ষ ফোটে কাতর হইয়া, হস্তিনাপুরে যুধিষ্ঠিরের নিকট এই মধ্যাত্তিক নিবেদন জ্ঞাপন করিয়া, যুধিষ্ঠিরের অন্তরে বৈরাগ্যের আগুন জ্বলিয়া গিলেন, সেইদিন ভারতের উন্নতিমুখী জীবনস্রোত—অনিত্য বোধে উপেক্ষিত হইয়া ধর্মদানবীর অস্থায়ী আশ্রয় রূপে পরিগণিত হইল। ভারতের জীবন এই দিন হইতে অনাবরে নখর বোধে অসামান্য হয়ে—মৃগাল কুকুরের আহার্য স্বরূপ বৃথা ভারবহনের অর্থহীন রেশ বন্দিয়া গণ্য হইল, ভারতের জীবন-প্রাণ নিভিল, আর জলিল না, ভারত অন্ধকার-সমাজ হইল।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরবর্ত্তী দর্শনীয় বনের ইতিহাসে—এই দশাননবৈরাগ্যের ধর্মশূন্য হাচাকারই শুনা যায়, অনিত্য জীবনের উপর অনাস্থা স্বপ্নন করিয়া মোক্ষ বা নির্লিপ্য প্রাপ্তিই জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, এইরূপ বানীই যুগলকৃষ্ণের কণ্ঠে নানা ছন্দে বক্তার দ্বারা; ইহার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না, যে ধর্মে ভারতের কোনো কোনো নর নারী দীক্ষা গ্রহণ করিয়া,

অপারিবে আনন্দে বিভোর হইয়াছে, সে ধর্মের প্রভাব ও মহিমা অনিশ্চয়নীর—আমরা এই ত্যাগ-ধর্মের ধারাবাহিক ইতিহাসের কথাই বর্ণনা করিব।

শ্রীষ্ট পূর্ণ পাঁচত বৎসর পূর্বে, শাক্যসিংহ জন্ম-গ্রহণ করেন, ইহার কিছু পূর্বে আর এক মহাপুরুষ ভারতে এক নূতন ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে ও মহামহোপাধ্যায় উদয়নাচাৰ্য্য ও কুমারিল ভট্টের যুক্তি তর্কের কুরধারে এই ধর্ম হীন-বল হইয়া পড়ে, বুদ্ধদেবের পূর্বে ধারাবাহিক যে ধর্মোক্ত ভারতে প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহাই জৈন ধর্ম। পার্শ্বনাথের পর মহাবীর এই ধর্মের বিজয়-গুণ্ড। পার্শ্বনাথ ১০০ শত বৎসর জীবিত ছিলেন, ইহার পর ২০০ শত বৎসর পরে, ৭২ বৎসর বয়সে মহাবীরের মৃত্যু হয়। ইহার পূর্বে ২০ জন তীর্থঙ্করের নাম পাওয়া যায়, ইহা হইতে স্পষ্টই অস্বহীন হয়, দীর্ঘায়ু প্রচারের পর ভারতে জৈন ধর্ম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। মহাবীর যখন ধর্ম প্রচার করিতে বাহির হন, কথিত আছে তাঁহার সম্বন্ধে ১০০০ হাজাৰ সাধু ৩৬০০০ হাজাৰ সান্থী, ১৪ জন পণ্ডিত, ১০০ শ্রমণ, ১০০০ শত অবাধ জ্ঞানী (ধারাবাহিক জ্ঞান-রত্নলকারীকে অবাধ জ্ঞানী বলে), ৭০০ শত কেবলী, ৫০০ শত মনোবিদ, ৪০০ বাণী, ১০০০০ শ্রাবক, ইহার দিগন্ত শ্রাবিকা ও গৌরম ও স্বপ্নধর্ম নামক দুইজন গুপ্তধর্মের সঙ্গে থাকিত। ইহা হইতেই, মহাবীরের প্রভাব ভারতে কতখানি বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

শাক্যসিংহের মত মহাবীরও কাত্যাবল্যের সিদ্ধার্থ নৃপতির রাজ্য ত্রিশলার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন—ইহার আদি নাম বর্দ্ধমান, কিন্তু মাগধের উপর অসাধারণ কর্তৃত্ব ও প্রভাব বিস্তৃত হইলে ইনি মহাবীর নামে প্রসিদ্ধ হন। মহাবীর রাজকুমার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এক কভা হু, কুমার জামলি এই কভার পাণিগ্রহণ করেন। মহাবীরের পিতামাতার মৃত্যু হইলে, তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়, তিনি দ্বীপ কোঠা ভাঙা নন্দিবন্ধনের হস্তে রাজ্যভার প্রদান করিয়া যতিধর্ম গ্রহণ করেন। দুইবৎসর কঠোর তপসা করিয়া তিনি ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ হন। তারপর ছয় বৎসর কঠোর যোগাভ্যাস করিয়াছিলেন, এই সময় সিদ্ধার্থ নামক এক যক্ষের অহুগ্রহে, মহাবীরের বুদ্ধিবৃত্তি অসুপূর্ণ উৎকর্ষভা লাভ করে, এই দিব্য প্রতিভাবলেই তিনি ভারতে জৈন ধর্ম প্রচার করিতে সক্ষম হইয়া-ছিলেন।

জৈন ধর্মে আচার অমর্ষ ও দ্বৈবের অতিথি স্বীকৃত হইয়াছে। বৌদ্ধ এই উভয় স্বীকার করেন, এইজন্য জৈন ধর্মও বৌদ্ধধর্ম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বুদ্ধ ও মহাবীর উভয়ের তাগ সমতুল্য, বুদ্ধদেবের মতই মহাবীরও পিতামাতার মৃত্যু দর্শনে, সংসারভোগে বীতরাগ হইয়া, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, ভাব্য পরিত্যাগ করিয়া যতি ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার মতে, লজ্জাই পাপ, এইজন্য পরিচয়ের বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া ফেলিলেন, জৈন ধর্মে এখনও ছই দল আছে, দিগম্বর ও বৈশাখ্য।

পার্সনাথের শিষ্যগণ যেতাধর, মহাবীরের শিষ্যগণ দিগম্বর, ইহাদের মধ্যে বিবাদ চলিত। মহাবীর যখন মণিচ ৬ বৎসর মগধ ও অবোধার ধর্মপ্রচারে বাহির হন, তখন বজ্রভূমি, হুজিভূমি, ও লাড়দেশীয় গোয়ন্দন তাঁহার উপর ভীষণ অত্যাচার করে, তিনি তাহাতে বিচলিত হন নাই। কৌশাম্বীর রাজ্য শক্যকী তাঁহার বিশেষ সম্ভার করিয়াছিলেন। মহাবীর যাদশ বর্ষ উপবাস করিয়া ক্লান্তস্বাধ্য তপস্তা করেন, অবশেষে বৈশাখমাসে গুজ্জরাণিক্য নদীতীরে শালগুরুদেব রূপ করিতে করিতে কেবল জ্ঞান লাভ করেন, ইহাই জৈন ধর্মের চরমমোক্ষ। আকাশ হইতে

দেবগণ তাঁহার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন, জ্ঞানের ইয়ত্তা রহিল না, তিনি পরম পূর্ণ প্রাপ্ত হইলেন—“সিদ্ধ যুক্ত যুক্ত অশ্রুগতে পরিমিতকুণ্ডল সর্বগুণে পরিপূর্ণ” সর্ব সন্তাপ হইতে মুক্তি পাইয়া বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিলেন, আপন পূর্বীতে গিয়া মোক্ষ-বিষয়ে মধুরাশী উপভোগ দিতে লাগিলেন। তাঁর বাণী শুনিতে যেরূপ পণ্ড ও সমাগত হইল, দীন ভ্রমী, রাজা প্রজা, পণ্ডিত বৃদ্ধ, সকলেই তাঁর চরণে মাথা নত করিল। মহাবীরের পূজা ঘরে ঘরে আরম্ভ হইল, মগধের বহু প্রাজ্ঞ তাঁর শিষ্য হইলেন, দেখিতে দেখিতে জৈন ধর্ম রাজধর্ম হইল, মহাবীরের শিষ্য ভজ্জবাহুর নিকট মৌগল্যবংশীয় প্রসিদ্ধ নৃপতি চন্দ্রগুপ্ত দীক্ষা লইয়াছিলেন। বিশ্রুতকীর্তি রাজা অশোকও জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন, পরে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। জৈন ধর্ম একদিন ভারতে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রখর কিরণ বর্ণন ক রাইছিল, এবং মহাবীর এই ধর্মের প্রবর্তক না হইলেও, এই মহাপুরুষের জীবনবোধের উপরেই বর্তমান জৈনধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

উপসংহারে সংক্ষেপে জৈন ধর্মের কয়েকটি তথ্য-কথা লিপিবদ্ধ করিয়া, বর্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। জৈন এই ধর্মে উপাস্য দেবতা,—বল, ভোগ, উপ-ভোগ, ধান, লাভ সম্বন্ধে বিদ্বেষ, নিভা, ভীতি, অজ্ঞান, জুগুপ্সা, হিংসা, হিংস্রতা, অস্রুতি, হাঙ্গ, ঘেদ, কাম, শোক, মিথ্যা, মহাপাপজ্ঞান এই ষোড়শগুণি বাহার নাই, সেই জৈন হইতে পারে, মহাবীরের পর আর কেহ জৈন আখ্যা লাভ করে নাই।

প্রাক্তক ও অস্বহীন এই উভয় প্রমাণসম্মত ও জৈনগণ স্বীকার করেন। জগতের ভূত নির্জর—এই মনের মতে, যুগ ত ৩, কাহারও মতে ৭টি। এগুলি আবার নিত্যানিত্য মিশ্রিত। যথা কৌ-অকৌ, পূর্ণা, পাপ, আশ্রব (কর্মবন্ধন স্বপ্নন করে যাহাতে) স্বপ্ন, পক্ষ, নির্জর ও মুক্তি, সম ভাবে

সৃষ্টি করে, এইজন্য এতদিন আমি নীরব ছিলাম—
“Reformer” যে উত্তরের দাবী করিয়াছেন তাহা
ভ্রান্তসঙ্গত, অতএব এই বিষয়ে আমার বাহা বলিবার
তাঁহা নিঃসংশয়েই বলিব, বাহা সত্য, বাহা বাস্তব
আমি তাহারই উল্লেখ করিব, অতএব কোন বাদ
প্রতিবাদের উত্তর দেওয়া যে আমার উদ্দেশ্য নয় এ
কথা বলাই বাহুলা।

“প্রবন্ধক সমাজ” একটা ধর্ম-সাধনার ক্ষেত্র।
বিশ শতাব্দীর অন্তর্যকাল হইতে যদিও ইহার
উদ্যোগপূর্ণ চলিয়াছিল, কিন্তু ইহার গতি প্রতিষ্ঠা
হয় ১৯১০ খৃষ্টাব্দে। শ্রীঅরবিন্দের প্রত্যক্ষ সঙ্গত
ইহার মূল মত, সত্য সেই মন্ত্রের অন্বেষণ করিয়া
চলিয়াছে।

মন্ত্র—আত্মসমর্পণ। ইহা চতুষ্পাশে আমাদের
জীবন কল প্রসব করিয়াছে, উৎসর্গ, আত্মসমর্পণ,
বিজ্ঞান ও সম্মত। উৎসর্গ—দিব্যশক্তির চরণে দেহ,
প্রাণ, মন, বুদ্ধির। পূর্ণোৎসর্গে আত্মার প্রাণের।
উচ্ছ্বাস আত্মার মুক্ততাই—আত্মসমর্পণ যোগ। ইহা
হইতেই বিজ্ঞানের প্রকাশ : বিজ্ঞানের ক্ষেত্র,
সাধকের সঙ্গে সাধকের যে মিলন, তাহাই সম্মত।
এইগুলি সবই আমাদের নিজস্ব অহুত্বিত—এবং পর
পর বহা হইলেও, একটির পর একটা যে ঘটে তা নয়,
সবগুলি যুগপৎ ঘটয়া থাকে, তবে পূর্ণাঙ্গ হওয়া কান-
সাপেক্ষ।

শ্রীমান অরুণচন্দ্র এই সাধনার একজন অগ্রদূত।
১৯১০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে হইতেই এই সাধনা গ্রহণের
এখানে যে উদ্যোগপূর্ণের আয়োজন হইয়াছিল,
তাঁহার মধ্যে যে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল
এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দ হইতে সে এই বাগেই আত্ম-
নিয়োগ করে, এবং দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ তাঁর একনিষ্ঠ
সাধনার কোন ত্রুটি দেখি নাই, কায়, মন, প্রাণ বিরা-
মে উৎসর্গবশত আত্মদান করিয়া, আত্মদৃষ্টি লাভ

করে, ইহা আমার শুধু বিশ্বাস নয়, দিব্য দর্শন,
সত্যোপলব্ধি।

১৯২২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে—শাখোদীয়া
উৎসবের দ্বিতীয় দিনে, মহা অষ্টমীর প্রাতঃকালে
ধানে বসিয়া আমি এক বালিকা স্তম্ভির দর্শন পাই,
এবং তার আগমন বার্তা জানিতে পারি, কথটা
তৎক্ষণাৎ বাহ্যার নিকটে ছিল তাহাদের জানাইয়া
রাখি, এবং কোন্ দিন সে আসিবে তাহাও নির্দেশ
দিই। সেই রাত্রেই, একটা প্রবল শক্তির অবতরণে
আমার শরীর অবসর হইয়া পড়ে, আমার শয্যাসান্না
হইতে হয়, ইহা বাস্তব ঘটনা, উপভ্রাস নয়।

নির্দিষ্ট দিনে শ্রীমান অরুণচন্দ্র আসিয়াই আমার
এই বালিকার আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করে—সে
তাঁহার পিতার সহিত আশ্রমে আসিয়াছিল, আমি
তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা করিতে বলিলাম। তখনও
তাহাকে দেখি নাই, তাঁরপর সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া, যখন
দেখিলাম, তখন আমার পূর্বে দর্শন অভ্যাস বসিয়াই
প্রভূতি হইল।

“প্রবন্ধক সমাজ” সাধনার সম্মান বা রাষ্ট্রহা
একজন কান নির্দিষ্ট বিধান নাই, সেই আত্মোপলব্ধির
উপর নির্ভর করে, হবে আমার, অন্যত্রাত স্কুলের মত
নারী পুরুষের জীবন যাগোতে বিভক্তরূপে গড়িয়া উঠে,
সেই দিকে বিশেষ যৌক আছে। এই হেতু এই পর্যন্ত
শতাব্দিক নারীপুরুষের জীবনে সমাজের সাধনা দৃষ্টিমূল
হইলেও, মাত্র দুইজন ছাড়া আর কাহারও বিবাহ হয়
নাই, এবং ইহাও আশ্চর্য্য পর্যন্ত অস্ট্রি ব্রহ্মচর্য রক্ষা
করিয়া আসিতেছে। এই জন্যই “Reformer” এই-
রূপ বিবাহের কারণ কি?—জানিতে চাহিয়াছেন।

শ্রীমান অরুণচন্দ্রের বিবাহ প্রসঙ্গে আর গুটি-
কতক কথা বলিয়া এই কথার উত্তর দিব।

শ্রীমান অরুণচন্দ্রের সাধনার সঙ্গে, আমি প্রায়
অষ্টাদশ বর্ষ ধরিয়া তাহার কানে যে আদর্শ মূল প্রচার

করিয়া আসিয়াছি, তাহা নিঃসঙ্গ সম্মান জীবন। ব্রহ্ম,
কালের মধ্যেই পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ভারতের
শব্দ, বিবেকানন্দের সমষ্টি গঠনের বঙ্গ আমার
আজও যায় নাই, শ্রীমান অরুণের সম্মত ও সত্যনিষ্ঠা
দেখিয়া আমার সে আশা সফল হওয়ার বিন্দুমাত্র
শংশয় ছিল না, আমার মাথা বজ্রপাত হইল—যে দিন
এই বালিকার আগমনের একপক্ষ কালের মধ্যেই
শ্রীমান অরুণ আমার বলিল—“এই বালিকার সহিত
আমার নিবিড় সম্বন্ধ আছে—এই বালিকা আমার
স্ত্রী।”

আমি জানি—শ্রীমান অরুণকে পৃথিবীর কলুষ
হইতে মুক্ত রাখার জন্য, কি মমতা দিয়া, তাহাকে এই
দীর্ঘ দিন রক্ষা করিয়াছি, আমি জানি, অনুমার
ব্রহ্মচর্যী থাকার কি অপূর্ণ দৃঢ়তা তার এই পরিহত
জীবনকাল পর্যন্ত লক্ষ্য করিয়াছি। আর সহসা
অপ্রত্যাশিত ভাবে তাহার কথা শুনিয়া সত্যই
আমার বড় বিস্মিত করিল, আমার আদর্শের মূলে কে
যেন কুঠারাঘাত করিল, আমার সর্ব শরীর বিচলিত
হইতে লাগিল, অর্ধ অরুণচন্দ্রের অহুত্বিত সম্বন্ধে
আমি একপক্ষের নিঃশব্দ ছিলাম, তজ্জট আশ্রমের
আদর্শ ভাঙ্গিয়া যায়, ইগা আমি সহ কহিতে না
পারিয়া তাহাকে ভৎসনা করিলাম—এবং ইহা
পতনের লক্ষণ বলিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া দিলাম।
এইদিন হইতেই মেয়েটিকে আমার বক্ষ পক্ষুটে
ঢাকা দিয়া রাখিলাম, মাঠাঙ্গী তপস্বিনী, ভয়
নিবেদিতার আদর্শ জীবন গঠনের উপদেশ দিতে
আসত করিলাম, জীবনের সমস্ত শক্তি এই বালি-
কাকে কেন্দ্র করিয়া চালিলাম, কোন মতে তাহার
জিহ্বাঘাত্ত কোন বিষয়ে আসক্ত না হয়, তাহার
লজ্জা সাদা প্রায় রহিলাম। কালের দ্রুতি হইল
অনেক, কিন্তু শ্রীমান অরুণচন্দ্রের সত্য পরীক্ষার এক
প্রকার উদ্ভাব হইলাম, কিছু ভ্রমক্ষেপ করিলাম না,
মিত মন-সংযোগে মেয়েটির অধ্যাত্ম বিকাশ আর

কালের মধ্যেই পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ভারতের
যোগ সজ্জন শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বহু মহাশয়—
আশ্রমের পথে মেয়েটিকে দেখিয়াছিলেন, তিনি
আসিয়া আমার বলিলেন—“আপনার একটা মেয়ে
দেখিলাম, বেশ মেয়ে, তপস্বিনীও স্ত্রী।” আমার এক
অভিন্নহৃদয় বন্ধুর যথেষ্ট এই কথা শুনিয়াছিলেন।
আমি কি যোতর সংগ্রাম তখন করিতেছি, দুই
চারি জন অন্তরঙ্গ বন্ধু ভিন্ন কেহই তাহা জানিত না।
শ্রীমান অরুণচন্দ্র দিন দিন বিমর্ষ হইয়া গড়িতে-
ছিল, সময় পাইলেই সে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিত,
এবং ইহা নিবারণ করা যে আমার শ্রম ও সময়ের
অশয্য হইতেছে একবারও প্রকারান্তরে বলিতে কুঠা
বোধ করিতে না, কিন্তু আমি গণ করিয়াছিলাম, এ
কথা শুনিব না, অন্তরাচার্য্য তার দর্শনের উপর প্রভাব
থাকার, তাহার কথায় ভিতরে একটা সম্মতিভ্রষ্টক
সাদা থাকিলেও, বাহিরে বিপন্নতা আচরণ দেখাই-
লাম। শ্রীমান অরুণ একদিন বলিল—“আপনি এরূপ
বাস্তব হইবেন না, আমি না হয় বিবাহ না করিব, কেবল
স্বীকার করণ আমার দর্শন সত্য—তাঁহা না হইলে,
আমার দীর্ঘ দিনের সাধনা বার্থ বৃথিতে হয়, যদি এ
দর্শন মিথ্যা হয়, তাহা হইলে সমগ্র সাধনাটাই যে মিথ্যা
হইবে!” আমি তাহাতেই সে দিন রাজী—তবুও
আদর্শের মূলে কুঠারাঘাত প্রবৃত্তি হইল না।

সত্য অস্বীকার করা যায় না, ঈশ্বরের বিধান
লক্ষ্যন করা—দীর্ঘ দিন চলে না, তিন বৎসরের সংগ্রামে
আমি অবসর হইয়া পড়িলাম, মৃত্যুপথ থাকিলেও—
আত্মদর্শনের ক্ষেত্রে, যেমন একদিন বালিকা-
স্তম্ভির প্রকাশ হইয়াছিল, এইরূপ এই নরমপতির
জ্ঞান ভাঙ্গিয়া উঠিল। তাই আদর্শ তল করিয়া, অসঙ্গিত
নয়নে একদিন শুভ হুপ্রভাতে উপাশনা গৃহে, সমবেত
নারী পুরুষের সমক্ষে উভয়ের সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থার
এই বিবাহে স্বীকার স্বাক্ষর উচ্চারণ করিলাম। অরুণের

মুখ প্রহর হইল, অমির প্রশ্নন তন্ত্রিত হইল, কেননা এই তিন বৎসর তাহার অন্তরে যে আশ্রয়ের অনবদ্য-মুখি গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহা চুরমার হইয়া গেল, কিন্তু তার অকপট প্রজ্ঞানিষ্ঠা আবার আশ্রয় অহু-সরণে উদ্ভাত ছিল—ভগবান অকপের অহুত্বিক্তে সত্য করিয়া কৃতান্তে, সে হাতখানি বাড়াইয়া মিল, আমি সেই দিন ঈশ্বরের সমক্ষে, তাগবত উপাসক-মণ্ডলীর সমক্ষে উভয়ের মিলন বাক্য যোগা করিল।

এই পরিণয় শোকাচার বিবন্ধ, ভিন্ন বর্ণ, কিন্তু বৈশাচার বিহিত, বখারিত হিন্দু স্বত্বাচার মতেই বিবাহ কার্য সম্পন্ন হয়, এবং সে ক্ষেত্রে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক সুবোধীয়া বাবু, ভারত প্রদেশ হুগলীর প্রধান-নাগ বাবু প্রভৃতি বহু ভাষ্য-মহোদয় বিবাহসভায় ও স্থানীয় বহু বহু বান্ধব উদ্যোগের শ্রেণিকাল পর্যন্ত উপস্থিত থাকিয়া, শুভ পরিণয় সম্পাদন করিলেন।

বাস্তব ঘটনার কথাই উল্লেখ করা হইল। ইহাতে এই বিবাহ যে শুধু একটা—খেয়ালের বশবর্তী হইয়া গঠে নাই, তাহা বুঝা যায়, কিন্তু “Reformer” এর প্রচারে উত্তর হইল না—যে বিবাহে নারী পুরুষের রক্ত মাসের সম্বন্ধ নাই, সে বিবাহের প্রয়োজন কি? ইহার উত্তর দিতে গিয়া মহাশয় গম্ভীর বিব্রত হইয়া ছিলেন; অবশ্য সমাজ বিধানে পরিণয়নীতি সমাজ-পুষ্টির অপরিহার্য ব্যবস্থা, যেখানে ইহার অভাব দেখানো বিবাহ অর্থহীন, ইহা আমরা বুঝি। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, “প্রবর্তক সত্য” আশ্বাদানার অকপট অতিবাক্তি রূপে ইহা গ্রহণ করিয়াছে, তাহার মূলগত লক্ষ্য, ভোগের উল্লেষ স্বল্প তত্ত্বের আবিষ্কার। প্রত্যেক পুরুষ কি নারী, যারা ঈশ্বরসাধনার আশ্ব-নিয়োগ করিয়াছে, তাহাদের জীবনপথে চিরসঙ্গী লক্ষ্য অনন্তবয়স্ক নয়, দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর কামকফন-বিরাগী হইতেও খেজার স্বপ্নাঙ্গীর সন্ধান পাইয়া বিবাহ

করিয়াছিলেন। সমাজ সংস্কারে এই বিবাহের সার্থকতা বুজিয়া না পাইলেও, জীবনের পূর্ণতা সাধনার পক্ষে ইহার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। জীবনকে যৎ করিয়া দেখিলে, আমরা জীবনের মাশে, অনেক অসম্পূর্ণ আশ্ববিকাশকে, দোষ ও জটীর হিসাবেই দেখি, কিন্তু জীবনপ্রবাহের অনন্তত্ব যার অহুত্বিক্তির মধ্যে ফুটিয়াছে, সে তার অকপে সম্বন্ধ-তবকে ছাড়িবে কেন? ঠাকুরের জীবন যুগধর্ম সাধনে আত্মতার ব্রহ্মচর্য্য মুষ্টি, কিন্তু তবুও তিনি স্ত্রী গ্রহণ করিলেন, কালধর্মের অপেক্ষা কালাতীত ধর্ম শ্রেষ্ঠ পুরুষ প্রকৃতির মিলন স্বরূপের মূল তত্ত্ব। সত্যাত্মী তুরীয়া জীবনের ক্ষেত্রে যে বস্তুর সন্ধাননিরত, সেখানে তার চির সঙ্গিনী যদি তাহাকে সাহায্য করে, তবে সে পরিপূর্ণ তৃপ্তি গলাইই সে কাছে আশ্বনিয়োগ করে, শান্তি ও আশ্রয়ের তার সবখানি ভরা থাকিলে, জীবন শক্তিপূর্ণ হয়, নারী পুরুষের মিলনের মধ্যে রিসংগে তাড়না থাকিতে মিলনের আশ্বাদ বহু ক্ষুদ্র হয়, যেখানে কামতৃষ্ণার পেলিহান রসনা নাগাল পায় না, সেই খানেই অগতের দান বিভক্ত মুষ্টিতে গলিত পাবে।

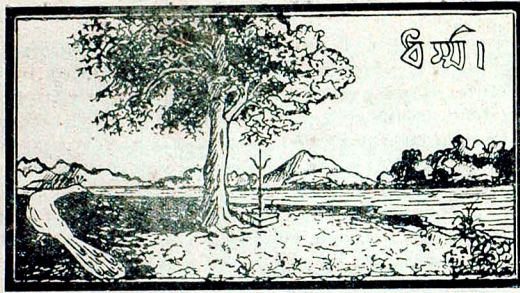
ক্লান্ত তা করিয়া সংঘম রক্ত র দায় বার কীধে চলে—এই বিব্রত হয়, লট হয়—disaster সেই খানেই সম্ভব। এক্ষেত্রে ক্লান্ত তার কোন কথা নাই, সাধনার অমৃত পরশ জীবন ভরাইয়া যুগধর্ম সাধনে আমার সত্য সঙ্গিনীরা আহুত্বা হিতকর হইবে, বহু জীবনের এই সত্যটাকে অস্বীকার করিয়া চলার একটা ক্ষুদ্র অজ্ঞানা ভাবে প্রতি পদে আঘাত দিতে থাকে। দেশে-মিসংগ জীবনের সংখ্যা বড় অল্প নয়, কিন্তু তেমন বিদ্যুৎশক্তি বিজ্ঞাপনের অবকাশ জীবনে কোন ঘটে না, তার কারণ অধেয়ণ করিলে শতকরা নব্বই জনের মধ্যে বোধ হয় এই সত্যই আবিষ্কৃত হইয়া পড়িবে।

“প্রবর্তক সত্য” একটা যুগের সন্ধান পাইয়াছে, সঙ্গিনী নারীর সন্ধান পাণ্ডা, নারী অথবা পুরুষ, কখন সত্যিকার জীবন—অধ্যাত্ম বল বিধানের ভার তারা অহুত্ব করিয়াছে। দক্ষিণেশ্বরে—যে ধর্ম সম্বন্ধের মূল উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহা প্রত্যেক ভাবে কামকাক্ষন ভাগ্য হইলেও, সত্যের উহা একটা দিক, অপরিদ্রষ্ট্য। এখনও ধরা পড়ে নাই, সে দিকটা ঠাকুরের কথা নয়, ঠাকুরের জীবন। বোধ হয় সে কোন সানার একটা ক্লান্ত সাধা প্রায়ঃ দাগু নাগ মহাপ্রবাহের জীবন কলিবার উপক্রম হইয়াছিল—প্রকৃতির কোলে বাহা ফলে, তাহা একক মুষ্টিতে আবদ্ধ থাকে না, একটা শৃঙ্খল গড়িয়া তোলে, কামকাক্ষনের বর্জনে শেখনের কোমল ও নরেন্দ্র আশ্বাছিল, বাগলীর চরিত্রে বোধ হয় অপর দিকটা ঘরীয়া চলার দিন আশ্বিরে। কামকাক্ষনের মধ্যে থাকিয়াই শেখনের ব্যবস্থার, সত্য উদ্ভূত, এই নিগূঢ় তত্ত্বের মূগা দার্শনিক তর্ক বিভায়ে নির্ভারিত হওয়া সম্ভব নয় বলিয়াই আমরা এ বিষয়ে নীরব—কাল প্রতিপাদের উত্তরদাতা, ইতিহাসে ইহা আমরা দেখা করি।

উপসংহারে বক্তব্য—নারী পুরুষের মিলন সত্যই বলিষ্ঠ অধ্যাত্ম দর্শনের ভিত্তি ধরিয়া সাধিত না হয়, জাতি-বর্ণ ধর্ম-নির্কিপণে মাত্রাশ্রম নিজেই ধন নিজেই সম্বন্ধে ব্যাভিচার নিবারণ করা সম্ভব নয়, নারী যদি বাছিয়া লইবে, পাইয়া হারাইতে হইবে না—যাহা তার অহুত্ব স্বরূপ পুরুষ, ও পুরুষ যদি তার সত্য

সঙ্গিনী নারীর সন্ধান পাণ্ডা, নারী অথবা পুরুষ, কখন সমাজসত্ত্ব দোষে আত্মতা হইবে না। কিন্তু শুধু স্বাধীন ভাবে নারী বা পুরুষ, পতি ও পত্নী নির্মাচনের আধিকার লাভ করিলেই যে ইহা সাধিত হইবে, এমন কথা আমরা বলি না—রুরোপীয় সমাজে তাহা হইলে, প্রতিদিন পতি পত্নী ভাগের আবেদন হতে ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হইত না।

কাম—মাত্রাশ্রম অন্ধ করে। ভারতের সাধনা শোভন, আশ্বতত্ত্ব হইলেই, দিবা দৃষ্টি হুটে, ইহা অশৌচিক ব্যাপার নহে। সত্যসঙ্গমপারায়ণ ব্যক্তি যদি যাদব বর্ণ কায়িক, বাচিক, মানসিক ত্রিবিধভাবে সত্যের সাধনা করে, শাস্ত্রে বলে, তার মনে মিথ্যা কল্পনা পর্যন্ত উদ্ভব হয় না, ভাবে চিন্তায় ভাষায় সত্যই বাস্তব হয়। নিকাম কর্মযোগীর অহরে যে দৃষ্টি হুটে, তাহা যে তার অন্তরের সত্য অভিব্যক্তি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারতের নয় নারী—আশ্বসাধনার যে দিন উদ্ভূত হইবে, যেদিন তাহাদের সত্য দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিবে, সেদিন সমাজে, শিক্ষায়, জীবনের সর্ব্ব অবস্থায় একটা দিবা ছন্দ ও শৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে—সে দিন জাতি-বর্ণ ধর্ম-নির্কিপণে মাত্রাশ্রম নিজেই ধন নিজেই বাছিয়া লইবে, পাইয়া হারাইতে হইবে না—যাহা হইবে তাহা অব্যর্থ এবং সনাতন।



ঐশ্বর্য কথামৃত (শ্রীম)*

পঞ্চম ভাগ

দক্ষিণেশ্বর মণিরামপুর ও বেলবরের ভক্তগণের

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঐরামকৃষ্ণ কথিত নিজ চরিত।

ঠাকুর ঐরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে নিজের ঘরে কখনও দাঁড়াইয়া কখনও বসিয়া ভক্তগণের কথা কহিতেছেন। আজ রবিবার ১০ই জুন ১৮৮৩ খৃঃ, জৈষ্ঠ শুক্লাপঞ্চমী, বেলা ১০টা হইবে। রাখাল, মাষ্টার, লাটু, কিশোরী, রামলাল, হাজরা প্রভৃতি অনেকেই আছেন।

ঠাকুর নিজের চরিত্র, গুরু কাহিনী, বর্ণনা করিতেছেন।

ঐরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। ও দেশে ছেলে-বেলায় আমার পুরুষ মেয়ে সকলে ভালবাসত।

*সরস্বতী শরঙ্গিত।

আমার গান শুনত। আবার লোকদের নকল করত পারতুম সেই সব দেখত ও শুনত। তাদের বাড়ীর বউরা আমার জন্ত খাবার জিনিষ রেখে দিত। কিন্তু কেউ অবিধায় করত না। সকলে দেখত বেন বাড়ীর ছেলে।

“কিন্তু স্বপ্নের পায়রা জিন্দা। বেশ ভাল সংসার দেখলে-আনাপোনা কর্তব্য। যে বাড়ীতে ছুঃখ বিপদ দেখতুম, সেখান থেকে পালাতুম।

“ছোকরাদের ভিতর দুঃখজন্য ভাল লোক দেখলে খুব ভাব কর্তব্য। কারুর সঙ্গে সেসাত পাতাতুম। কিন্তু এখন তারা যোর বিধী। এখন তারা কেউ কেউ এখানে আসে, এসে বলে, ও মা! পাঠশালাও যেমন দেশেছি এখানেও ঠিক তাই দেখছি।

আষাঢ়, ১৩৩২]

ঐশ্বর্য কথামৃত (শ্রীম)

১৪৭

“পাঠশালা শুভদ্রা আঁক ধাঁধা লাগত কিন্তু বসিতেছেন, আর বলিতেছেন,—“আমি ঝাউ চির বেশ আঁকতে পারতুম; আর ছোট ছোট মানুষ বেশ গড়তে পারতুম।”

Fond of charitable houses of Ramayan and Mahabharat.

“সদাভ্যন্ত, অতিথিশালা, যেখানে দেবত্ব সেখানে যেতুম; গিয়ে অনেকখণ্ড ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতুম।”

“কোন পানে রামায়ণ কি ভাগবত পাঠ হচ্ছে তা বসে বসে শুনতুম। তবে যদি ঢং করে পড়ত, তাহলে তার নকল করতুম, আর অজ লোকদের শুনাতুম।”

“মেয়েদের ঢং বেশ বুঝতে পারতুম। তাদের কথা, হর, নকল করতুম। কড়োড়ী বাপকে উত্তর দিচ্ছে ‘খাই-ই’। বাবাওয়ে মাগীরা ভাঙছে, ‘ও তোপসে মাছ ওলা’। নই মেয়ে বুঝতে পারতুম। বিধবা সোজা সিতে কেটেছে, আর খুব অহুরাগের সহিত গায়ে তেল মাখছে! লক্ষা কম, বদবার বকমই আলাদা।

“থাক বিধবীদের কথা।

রামলালকে গান পাঠিতে বলিতেছেন। শ্রীমুক্ত রামলাল গান পাঠিতেছেন।

গান

কে রথে মাচিছে বামা নীরদ ববনী,
শোমিত, মাগের যেন ভাসিছে নব মলিনী।
২। এইবার রামলাল রাবণ বধের পর মহাদেবীর বিলাপ গান পাঠিতেছেন।

কি করলে হে কাশ! অবলারি প্রাণ কাশ,
হয় না শাস্ত এ প্রাণান্ত বিনে।

রাম নাম ও গোপী প্রেমে বিহ্বল।

শেষ গানটি শুনিতো শুনিতো ঠাকুর অশ্রু বিসর্জন

বসিতেছেন, আর বলিতেছেন,—“আমি ঝাউ তলায় বাধে করত গিয়ে শুনেছিলাম নৌকার মাঝি নৌকাতে ঐ গান গাচ্ছে; ঝাউতলায় যতক্ষণ বসে ছিলাম থালি কেঁদেছি। আমাকে ধরে ধরে ঘরে নিয়ে এল।

গান

শুনেছি রাম তারক ব্রহ্ম, মাহুয় নর রাম জটাপারী।
পিতে কি নাশিতে বংশ, গীতে তার করেছ চুরি।

শ্রীকৃষ্ণকে রথে বসাইয়া মথুরায় লইয়া যাইতেছেন দেখিয়া গোপীরা রথচক্র আঁকড়াইয়া দরিয়াছেন ও কেহ রথচক্রের সামনে শুইয়া পড়িয়াছেন। তারা অজুরকে দোষ দিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ যে নিজের ইচ্ছায় যাইতেছেন তাহা জানেন না।

গান।

ধোরোনা ধোরোনা রথচক্র, রথ কি চক্রে চল,
যে চক্রে চক্কী হরি, যার চক্রে জগৎ চলে।

ঐরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। গোপীদের কি ভালবাস, কি প্রেম! শ্রীমতী স্বহস্তে শ্রীকৃষ্ণের চিত্র আঁকেন, কিন্তু পা আঁকেন নাই; পাছে তিনি মথুরায় চলে যান।

“আমি এ সব গান ছেলে বেলায় খুব গাইতাম। এক এক বাজার সমস্ত পালা গেয়ে দিতে পারতাম। কেউ কেউ বলত আমি কালীয় দমন যাত্রার দলে ছিলাম।

একজন ভক্ত নূতন উড়ানি গায়ে দিয়া আসিয়াছেন। রাখালের বাসক স্বভাব, কাঁচি এনে তার চাদের ছিল। কাটিতে যাইতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, কেন কাটছিস! থাকনা! শালের মত বেশ দেখাচ্ছে। ইংগা, এর কত দাম? তখন বিলাতী চাষরের দাম কম ছিল। ভক্তটা বলিলেন,—এক টাকা ছয় আনা ছোড়া। ঠাকুর বলিতেছেন, বল কি গো! ছোড়া! একটাকা ছয় আনা ছোড়া!

কিয়ৎকণ পরে ঠাকুর ভক্তকে বলিতেছেন, যাও পশা নাওগে; একে তেল দে রে।

মানান্তর তিনি ফিরিয়া আসিলে ঠাকুর তাক হইতে একটি আয় লইয়া তাঁহাকে দিলেন। বলিতেছেন, এই আমটা একে দিই; তিনটা পাশ করা। আচ্ছা, তোমার ভাই এখন কেমন?

ভক্ত। হাঁ, তার ঔষধ টিক পড়েছে, এখন খাটলে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তার একটা কর্ণের যোগাড় করে দিতে পার। বেশ ত তুমি মুকলি হবে।

ভক্ত। স্বভাব ভাল হলে সব স্থিতি হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীরামপুর ভক্তসঙ্গে।

ঠাকুর আহাৰান্তে ছোট খাটটিতে একটি বসিয়াছেন, এখনও বিশ্রাম করিতে অবসর পান নাই। ভক্তদের সমাগম হইতে লাগিল। প্রথমে শ্রীরামপুর হইতে একদল ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। P. W. ডতে কাজ করিতেন। এখন পেনসন পান। একটা ভক্ত ঔষধিগকে লইয়া আসিয়াছেন। ক্রমে বেলঘরে হইতে একদল ভক্ত আসিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মণি মল্লিক প্রভৃতি ভক্তরাও ক্রমে আসিলেন।

শ্রীরামপুরের ভক্তগণ বলিতেছেন, আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত হলে!

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, না, না, গুণব রজোগুণের কথা—‘ঊনি এখন ঘুমবেন’।

চাপক শ্রীরামপুর, এই কথা শুনিয়া ঠাকুরের বালা সখা শ্রীরামকে উদ্দীপন হইয়াছে। ঠাকুর বলিতেছেন, শ্রীরামের দোকান তোমাদের গুণানে।

ওদেশে শ্রীরাম আমার সঙ্গে পাঠশালায় পড়ত। সেদিন এখানে এসেছিল।

শ্রীরামপুরের ভক্তরা বলিতেছেন, কি উপায়ে ভগবানকে পাওয়া যায়, একটু আমাদের দ্বারা করে বলুন।

শ্রীরামপুর ভক্তকে শিক্ষা—সাধন ভজন

কর ও ব্যাকুল হও।

শ্রীরামকৃষ্ণ। একটু সাধন ভজন কর্তে হয়।

“ছুধে মাখন আছে শুণু বললেই হয় না, ছুধে দুই পেতে মখন করে, মাখন তুলতে হয়। তবে মাঝে মাঝে একটু নির্জন চাই। দিন কতক নির্জনে থেকে ভক্তি লাভ করে, তার পর যেখানে থাকে। ছুতা পায় দিয়ে কাঁটা বনেও অনায়াসে যাওয়া যায়।

“প্রধান কথা বিশ্বাস। ‘যেমন ভাব তেমনি লাভ, মূল সে প্রত্যয়’। বিশ্বাস হয়ে গেলে আ ভয় নাই।

শ্রীরামপুর ভক্ত। আজ, গুরু কি প্রয়োজন? শ্রীরামকৃষ্ণ। অনেকের প্রয়োজন আছে তবে গুরু বাক্যে বিশ্বাস কর্তে হয়। গুরু ঈশ্বর জ্ঞান করলে তবে হয়। তাই বৈষ্ণবের বলে, গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব।

“তার নাম সর্বদাই কর্তে হয়। কবিরে নাম মাহাত্ম্য। ‘অন্নত প্রাণ, তাই যোগ হয় না তার নাম করে হাততালি দিলে পান’ পানী পাঠি যায়।

‘সংসদ সর্বদাই দরকার। গরুর যত কার যাবে ততই শীতল হাওয়া পাবে, অগ্নির যত কার যাবে ততই উত্তাপ পাবে।

“চিমে তেতলা হলে হয় না। যাদের সঙ্গ

ভোগের ইচ্ছা আছে, তারা বলে, ‘হবে; কখন না কর্ণ ঈশ্বরকে পাবে।’

“আমি কেশব সেনকে বলেছিলাম, ছেলেকে ব্যাকুল দেখলে তার বাপ তিন বৎসর আগেই তার হিঙ্গে ফেলে দেয়।

“মা রাঁপছে, কোলের ছেলে শুয়ে আছে। মা মুখে চুসি দিয়ে গেছে, যখন চুসি ফেলে চাঁৎকার করে ছেলে কাঁদে তখন মা হাঁড়ি নামিয়ে ছেলেকে কোলে করে মাই দেয়। এই সব কথা কেশব সেনকে বলেছিলাম।

“কলিতে বলে একদিন এক রাত কাঁদলে ঈশ্বর দর্শন হয়।

“মনে অভিমান করবে, আর বলবে ‘তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ, দেখা দিতে হবে।’

“সংসারেই থাক আর দেখানেই থাক, ঈশ্বর মনটা বেধেন। বিষয়াসক্ত মন বৈদ্য ভিক্ষে দেশালাই, যতো ঘসো জলে না। একলব্য মাসীর হোণ অর্থাৎ নিজের গুরু মূর্তি সামনে রেখে বাণ শিক্ষা করেছিল।

“এগিয়ে পড়” —কার্যের এগিয়ে গিয়ে দেখেছিল, চন্দন কাঠ, রূপার থলি, সোণার থলি; আরো এগিয়ে গিয়ে দেখলে হীরে মণিক।

“বারা অভ্যাস, তারা যেন মাসীর দেওয়ালের ঘরের ভিতর রয়েছে। ভিতরে তেমন আলো নাই, আবার বাহিরের কোন জিনিষ দেখতে পাচ্ছেনা। জ্ঞান লাভ করে যে সংসারে থাকে সে যেন কাঁচের ঘরের ভিতর আছে। ভিতরে আলো বাহিরে ও আলো। ভিতরের জিনিষও দেখতে পায়, আর বাহিরের জিনিষও দেখতে পায়।”

ত্রাণ ও জগৎ-মার্গা এক।

“এক বই আর কিছু নাই। সেই পত্রত্রাণ।

“আমি” যতক্ষণ রেখে দেন, ততক্ষণ দেখান যে আদ্যাশক্তি রূপে সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় কর্ণে।

যিনিই ব্রহ্ম তিনিই আদ্যাশক্তি। একজন রাজা বলেছিল, যে আমার এক কথায় জ্ঞান দিতে হবে। যোগী বললে, আচ্ছা তুমি এক কথাতেই জ্ঞান পাবে।

পানিকণ্ঠ পরে রাজার কাছে হঠাৎ একজন যাদুকর এসে উপস্থিত। রাজা দেখলে, সে এসে কেশব ছুটা আদুল ঘুরাচ্ছে, আর বলছে—রাজা এই দেখ এই দেখ, রাজা আবাক হয়ে দেখছে। পানিকণ্ঠ পরে দেখে, ছুটা আদুল একটা আদুল হয়ে গেছে।

যাদুকর একটা আদুল ঘুরাতে ঘোরাতে ঘোরাতে বলছে—রাজা এই দেখ, রাজা এই দেখ। অর্থাৎ ব্রহ্ম আর আদ্যাশক্তি প্রথম ছুটা বোধ হয়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হলে আর ছুটা থাকে না। অভেদ। এক। যে একের ছুই নাই। অদ্বৈতম্।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বেলঘরের ভক্তসঙ্গে।

বেল ঘরে হইতে গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ভক্তরা আসিয়াছেন। ঠাকুর যেদিন তাঁর বাটাতে শুভাগমন করিয়াছেন, সেদিন গায়কের ‘জাগো, জাগো, ঘননি’ এই গান শুনিয়া সমাদ্রিস্থ হইয়াছিলেন। গোবিন্দ সেই গায়কটিকেও আনিয়াছেন। ঠাকুর গায়ক দেবীয়া আনন্দিত হইয়াছেন। ও বলিতেছেন। তুমি কিছু গান কর। গায়ক গাইতেছেন।

গান।

- ১। দোষ কারু নয় গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্রাম।
- ২। ছুঁ নামের শমন আমার জাত গিয়েছে। যদি বলিস ওরে শমন জাত বেশ কিসে, কেলে সর্বনাশী আমার সমাধী করেছে।

৩। জাগ জাগ জননি।

মূল্যধারে নিঈগত কতদিন,

গত হল কুল কুণ্ডলিনী।

স্বার্থ সাধনে চল মা শির মথো,

পরম শিব যথা সংসদল পক্ষে,

করি ষড়চক্র ভেদ, ঘৃণাও মনের খেদ,

চৈতন্য রূপিণী।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এই গানে ষড়চক্র ভেদের কথা আছে। ঈশ্বর বাহিরে ও আছেন, অন্তরেও আছেন। তিনি ভিতরে থেকে মনের নানা অবস্থা কর্জেন। ষড়চক্র ভেদ হলে, মায়ার রাজ্য ছাড়িয়ে জীবাত্ম পরমাত্মার সঙ্গে এক হয়ে যায়। এরই নাম ঈশ্বর দর্শন।

“মায়া দ্বার ছেড়ে না দিলে ঈশ্বর দর্শন হয় না। রাম, লক্ষ্মণ, আর সীতা, একসঙ্গে যাচ্ছেন, সকলের আগে রাম, মথো সীতা, পশ্চাতে লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণ যেমন সীতা মাঝে থাকতে—রামকে দেখতে পাচ্ছেন না, তেমনি জীব মাঝে মায়া থাকতে ঈশ্বরকে দর্শন করতে পাচ্ছে না।

(মণি মল্লিকের প্রতি) তবে ঈশ্বরের রূপা হলে ‘মায়া’ দ্বার ছেড়ে দেন। যেমন দ্বারওয়ারা বলে, বাবু হুকুম করে দিন ওকে দ্বার ছেড়ে দিচ্ছি।

“বেদান্ত মত আর পুরাণ মত। বেদান্ত মতে বলে ‘এই সংসার ধোঁকার টাঁটা’ অর্থাৎ জগৎ সব কুল স্বপ্নবৎ। কিন্তু পুরাণ মত বা ভক্তিশাস্ত্র বলে, যে ঈশ্বরই-চতুর্ধাশিত তত্ত্ব হয়ে রয়েছেন। তাঁকে অন্তরে বাহিরে পূজা কর।

“যতক্ষণ ‘আমি’ বোধ তিনি রেপেছেন ততক্ষণ সবই আছে। আর স্বপ্নবৎ বলবার যো নাই। নীচে আশ্রয় জালা আছে, তাই হাঁড়ির ভিতরে ভাল, ভাত, আলু, পটোল সব টগবগ করছে।

লাফাচ্ছে, আর যেন বলছে, ‘আমি আছি,’ ‘আমি লাফাচ্ছি।’ শরীরটা যেন হাঁড়ি; মন, বুদ্ধি, জল; ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি যেন ভাল, ভাত, আলু, পটোল। অহং যেন তাদের অভিমান, আমি টগবগ করছি। আর সন্তানানন্দ আর।

“তাই ভক্তি শাস্ত্রে, এই সংসারকেই মজার কুটি বলেছে। রামপ্রসাদের গানে ‘এই সংসার ধোঁকার টাঁটা।’ তারই একজন জবাব দিয়েছিল, এই সংসার মজার কুটি। ‘কালীর ভক্ত জীবমুক্ত নিত্যানন্দময়’। ভক্ত দেখে যিনিই ঈশ্বর তিনিই মায়া হয়েছেন। তিনি জীব তিনিই জগৎ হয়েছেন। ‘ঈশ্বর, মায়া, জীব জগৎ’ এক দেখে। কোন ভক্ত সমস্ত রামময় দেখে। রামই সব হয়ে রয়েছেন। কেউ রাখা-রক্ষণের দেনে। রুম্মই এই চতুর্ধাশিত তত্ত্ব হয়ে রয়েছেন। সবুজ চশমা পরলে যেমন সব সবুজ দেখে।

“তবে ভক্তি মতে শক্তি বিশেষ। রামই সব হয়ে রয়েছেন কিন্তু কোনখানে বেশী শক্তি আর কোনখানে কম শক্তি। অবতারেতে তিনি এক রকম প্রকাশ, আবার জীবতে এক রকম। অবতারের ও দেখে বুদ্ধি আছে। শরীর ধারণে মায়া। নীতার জন্ত রাম কৈদেছিলেন। তবে অবতার ইচ্ছা করে নিজের চোখে কাপড় ঝাড়ে। যেমন ছেলেরা কাগা মাছি খেলে। কিন্তু মা ভাকলেই থেগা থামায়। জীবের আলাদা কথা; যে কাপড়ে চোখ ঝাড়া সেই কাপড়ে পিঠে ‘আটটা’ ইসকুরূপ দিয়ে ঝাড়া। অষ্ট পাশ। লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, জাতি, কুল, শীল, শোক, জুগুপ্সা (গোপনের ইচ্ছা) ঐ অষ্ট পাশ। গুরু না খুলে দিলে হয় না।

বেল যোয়ের ভক্ত। আপনি আমাদের রূপা করণ।

সাধন তত্ত্ব

৩

সত্য, ক্রোড়া, ধারণ, কলি, এই চারিটা যুগ, চক্রের মত ঘুরতেছে। এখন কলি যুগ, ইংল্যান্ডের সহায়গুণে উৎপত্তি হইবে, আবার ক্রোড়া, ধারণ, কলি,—এইরূপ ৭২ বার এই চারিটা যুগের আবর্তন বিবর্তনে, এক মনুষ্যের হয়, ভারতের গণনায়ে এইরূপ আটটা মনুষ্যের শেষ করিয়াছে শাস্ত্রে বলে, চতুর্ধাশ মনুষ্যের শেষ হইলে মহাপ্রলয় ঘটে। আচ্ছা আমি যুগের কথাই কহিব।

সত্য-যুগে মানুষের জীবন যোগ্যযুক্ত, পুণ্যময়। বেদাধ্যয়ন, তপস্যা ধ্যান—সঙ্কল্পজিহ্ম, স্টো বা স্ক্রুজ্জ-সাধা নহে। সত্যযুগের মানুষ দৃঢ়তর, সাধু, সত্যবাদী—সে যুগে পৃথিবী সর্পশতঙ্গমপারা ছিলেন, মেঘসমূহ বধাকালে বারি বর্ষণ করিত, গাভী গর্ভবিনী—রুকণ কলমুণে অবনত ছিল। নারী পতিপরায়ণা, ভাঙ্গন, কলিহর, বৈষ্ণব, শ্রুত, বর্ণাশ্রমগত ধর্ম্যচরণে একনিষ্ঠ—ভারতের জীবন স্মৃতিময় ঈশ্বরপ্রাধান্য সত্য উদ্ভাস থাকিত।

ভারতের সত্যযুগের আবির্ভাব। ধর্মের বাতী-ক্রম উপস্থিত হইল, মানুষ—অপেক্ষাকৃত সামান্য হইয়া পড়িল, বেশবহিত ধর্ম্মহঠানে ক্রোধাহব করিল, অর্থ দোষাচার পরিভাগ করিতেও পারিল না, একাত্ত কাতর হইয়া পড়ায়, মনোবিগল বেদার্থিক হুতি শাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন, হুতির অমুখাশন পালন করিয়া, পোকহুৎ ক্রেশজনক পাণ হইতে লোকে পরিভাগ পাইল।

কথিত আছে, সত্যযুগে ধর্ম চতুষ্পাদ ছিল। ধর্মের প্রভাব অশ্রুত থাকায়, তাহা পালন করা লোকের

পক্ষে ক্রেশের কাণে ছিল না। ততায় এক পাদ ধর্ম হ্রাস হইল, সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ্যহীন হাও খটল। ক্রোড়ার পর ধারণ যুগের উৎপত্তি, ধর্মের অর্ধেক প্রতিপত্তি লোণ পাইল, হুতির ধর্ম পালন করাও লোকের সাধো কুলাইল না, পুণ্য ধর্ম হ্রাস পাইতে লাগিল, পাণের প্রভাব বড়িল, বাদি ও অকাল মুহুরার অক্রমণে ধরাবাগী উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল—বেদব্যাস প্রভৃতি পুরাণকারগণ বেদোক্ত ধর্ম সহজ সুখসেবা করিয়া প্রচার করিলেন, পুরাণমহিতাতির উপদেশ দ্বারা বিপদ ধরাবাগী আশ্রয় হইল।

একণ্ঠে কলিযুগ উপস্থিত—বেদের সত্য এযুগে বুদ্ধিগ্ৰাস হইবে না, হুতির ধর্ম লোকে পালন করিতে সক্ষম হইবে না, পুরাণ সংহিতাদির অর্থও হ্রস্বোদা হইবে, এইহেতু লোকসকল ধর্মবিমুগ হইয়া পড়িব। মহানির্লগ্ন তত্ত্ব কলিযুগের এইরূপ বিবরণ আছে :—

উচ্ছাণা মদোদন্তাঃ পাপকর্ম্মভরাঃ সদা।

কামুকা লোলুপাঃ ক্রুরা নিষ্টুরা হর্ষুখাঃ শঠাঃ ॥
অর্থাৎ লোকেরা সর্বদা পাপকর্ম্মে নিরত, অনিয়ন্ত্রিত, মদোদন্ত, কামমোহিত, হর্ষুখ, লুন্ড, ক্রুর, নিষ্টুর ও শঠ হইবে।

স্বরাষ্ট্র মন্যমতয়ো রোগেশোক সমাকুল্য।

নিঃশ্রী নির্লগ্নাঃ নীচাঃ নোচাঃ গণপরায়াঃ ॥

ইংলান্ড, পরায়ুজ, রোগশোক সমাকুল, শ্রীহীন, হর্ষণ, স্নেহ যবন প্রভৃতির আচার ব্যবহারে রত ও নীচাশয় হইবে।

তত্ত্বসারও বলেন—কলিযুগের গোকেরা খল-
সভাব, নীচসংসর্গত, পরদাশপন্যাসী, পরনিদানপায়ণ
পরদোষী হইবে। পরকৌহরপে ভয়হীন, নির্ধন,
মলিন, দীন, দুঃখী, ভিরোণী হইয়া থাকিবে। কলি-
যুগের আশ্রয় শূন্যের ভায় আচারদগ্ধ, গোষ্ঠী,
দুঃখিত, পাগাচারী, ব্রাহ্মণের চিত্র—“কেবলমাত্র হ্র-
দাধারম্”—ব্রহ্মশক্তি তিরোধান, দেশ শক্তি হীন
ও শ্রীহীন হইয়া উন্নয়ন যাইবে। আমরা এই যৌত
কলিযুগে অনিরা উপস্থিত হইয়াছি, জিপাদ ধর্ম নষ্ট
হইয়াছে, পাপের প্রভাব অতীব প্রবল, ধর্মহীনগণ
এ যুগে দুঃখাধা, প্রকৃতির আশ্রয়তা অভাবে ধর্ম
সাধনার ক্ষেত্র বিরাটুল, যোগ অসম্ভব। শক্তি প্রয়োগ
করিয়া একমাত্র পুণ্য অর্জন ও ঘট্টা উঠে না,
নৈরাশের আশার ঘনীভূত, উৎসাহহীন নোক সকল
নিষ্কার হইয়া পাপের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে।

অনেকেই মনে করিতে পারেন যুগের প্রভাব কি
কেবল ভারতবর্ষের উপরেই পড়িল, জগতের অত্যা-
দেহ শ্রীমদ্ভগবৎ পূর্ব, আর শুধু ভারতের ভূগাণী
বাড়িল? ঈশ্বরের বিধান এমন পক্ষপাত দেখে, দুই
হইতে পারে না, কল্মসাপ্রভৃত যুগলপন—মাহুষের
মনে সন্মোহন স্বরূপ করিয়া, তাহাদের পন্থ, করিয়া
নিচ্ছে। তাই বহু ক্ষেত্রে ভারতের দুরবস্থা
বিমোচনের প্রবল চেষ্টা লক্ষিত হয়, কিন্তু আমরা যে
ভিত্তিতে যে ভিত্তিতে—দীর্ঘে দীর্ঘে আশার আশ্রয়
বনাইয়া আসিতেছে।

চেষ্টা করিয়া সত্যাপের ধর্ম বল জ্যেষ্ঠ
অসুখ রাখা সম্ভব হয় নাই, জ্যেষ্ঠযুগের ধর্মবন্ধন,
দাপের শিথিল হইয়াছে, দাপেরও যেটুকু ধর্মভাব ছিল
কলিতে তাহা একেবারেই নাই, ধর্মওগুণের প্রাণ-
পাত প্রচেষ্টার লোকের মনে ধর্মভাবের প্রতিষ্ঠা সূচ
হইতেছে না, যুগের সভাব মাহুষের চেষ্টায় পরিবর্তন
হয় না, এই সভাব ঈশ্বরের, তিনিই অদ্বৈত, জীব

সাকী ও গোষ্ঠা, প্রকৃতি ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই ভাব
স্বরূপ করিয়াছেন। সৃষ্টির কর্তা প্রকৃতি, ঈশ্বর
নহেন, তিনি ইচ্ছাময় বিস্ত নিশ্চেষ্ট নির্মিতার বিজ্ঞ-
অবিস্তারময়ী মহাশক্তি তাঁর ইচ্ছার অমূল্যরূপ করিয়া
সব কিছু করিতেছেন।

এই ব্রহ্ম ভগবানের ইচ্ছা না হইলে মানুষ কিছুই
করিতে পারে না, যুগে যুগে উত্থান ও পতনের মধ্য
দিগা এই যে সৃষ্টি প্রবাহ মাহুষের অন্তরে স্থগিত
প্রিয় অপ্রিয় পাপ পুণ্য বোধস্বন্দর্য কারণ হয়, কিন্তু
ভগবানের ইচ্ছাতে নিরংগুণ আনন্দ বাতী রাস্তি বা
নিগুণ নই, এই মহতি ইচ্ছার সহিত যুক্ত জীবন যার
দেই যোগী, দেই জীবন্ত পুণ্য।

ভগবান যখন ইচ্ছা করেন—জ্ঞানে, আনন্দে,
শক্তিতে বিশ্ব ভরাইয়া—ভূগণ, পৃথক জীবনে তৃপ্তি ও
শান্তি উছাড়া উঠে, আবার তাঁর ইচ্ছাতেই জীবন
কর্মস্বয় হয়, যে তার তামসিকতার সারাদেশ ভূবিয়া
যায়, পাপে অন্ধতার মাহুষ ছিন্নমস্তার মত আশ্রয়তা
হয়, ইহাই ঈশ্বরের নীলা, ভারত এই নীলাভূমি, এমন
নিম্ন ছিল ভারতবাসী মনুষ্য হইয়াও দেবতার সন্মুখ
ছিলেন, সমধর্মনিরত ও সংপথবর্তী হইয়া এমন উন্নত
জীবন লাভ করিয়াছিলেন যে দেবতার ও মাহুষের
পৃথক ছিল না, আবার এমন দিন আসিয়াছে যার
পাপ আশ্রয় করিয়া স্বার্থপরতার জুহুতায় আমরা
গতবৎ আতরণ করিতেছি, সকলই ভগবানের ইচ্ছা
তিনি যেমন কহাইবেন—প্রকৃতির হস্তে জোড়াপুত্রের
মত আমাদের বোধইচ্ছাই করিতে হইবে, ইচ্ছাতে জুগ
করিবার কিছু নাই। আত্মদানির কারণ নাই, ঈশ্বরের
ইচ্ছা—ভারতের দুরবস্থার কারণ মাহুষ নয়, স্বরূপ
ভগবান।

সত্য যুগের বিশাল পুণ্যশক্তি, সংরক্ষণ করিয়া
তাহা ক্রমেই শুভায়া অপরিহার্য ক্ষেত্রে সংস্থাপন
করিলেন, ব্যাপক জীবনে অন্ধকার সঞ্চারিত হইল,

ক্রমেই ক্রম পরিমণের সত্যযুগের জ্ঞান, সত্য, তপস্যা
সংগোপিত হইয়া পড়িল, সত্যযুগে বাহা দেশবাসী
ছিল, জ্যেষ্ঠা তাহা বিশেষ মণ্ডলীর মধ্যে স্থান লইল,
দাপেরে কথি তপস্বীর কূটাবে সে সত্যের গোমুখ
অতি সন্তর্পণে প্রকল্পিত হইল, কলিতে লোকচক্র
অগোচরে, কেন্দ্র গিরিকন্ডের কেন্দ্র বিশেষ পুরুষের
মধ্যে যে ইহা আত্মগোপন করিল, তাহার সন্ধান
সংজ্ঞ করা যায় না। কিন্তু ভগবান আগার জাগিয়াছেন,
আবার তাঁর ইচ্ছাশক্তি উদ্ভূত, আনন্দ উপভোগের
জন্ম প্রকৃতির মধ্যে লুপ্ত তপস্যার আশ্রয় আগাইয়া
উন্নতি সন্নিধ্যা করিয়াছেন, ভারত তাই ধর্মের
বিষয় বাহিয়াছে—ভারতের অধিবাসী শ্রীভগবানের
দানে ও কীর্তনে যোগ দিতে শোভাযাত্রা করিয়াছে—
ভারতের অন্ধকার আকাশে উজ্জ্বল রক্ত রাগ
বেগা দিয়াছে—প্রলয়ের রক্ত পুঙ্ক, মধুর মলয় পবন
বহিয়াছে, ক্রমে ক্রমে ফুল ফুটিতেছে—শাখার শাখার
বিহগের কলতান, কালরাশি প্রভাতের সূচনা দেখা
দিয়াছে।

তবে কি কলিযুগের অন্তকাল উপস্থিত? না—
কলি এত অসায় নয়, বিশ্বপ্রকৃতির অপূর্ণ বিধান,
একটি অপরূপমায়ার উপরও যে ভাবে প্রভাব বিস্তার
করে, পত, মানস, সত্ত্ব দেশ ও জাতির উপরও
সেই একই ভাবেই বিধান অঙ্গুষ্ঠিত হয়। মাহুষের
দীর্ঘমতে আকাশের এক প্রহরের প্রভাব কালে, পর
পর সল প্রহরের ভোগ যেমন নিশ্চিৎ থাকে, সেইরূপ
এক যুগের অধবর্তী পর পর সল যুগের অধিকাংশের
ব্যবস্থা আছে। কলি যুগের মধ্যে, সত্য, জ্যেষ্ঠা ও

দাপের আবির্ভাব কাল নিশ্চিৎ আছে, আশ্রয়
কলিতে সত্যের আগমন কাল উপস্থিত—সত্যযুগের
উদ্ভূতী প্রেরণার জাতি তাই উদ্ভূত।

কলি অতীত যুগের ধর্ম, শাস্ত্র, জ্ঞান, বিজ্ঞান
সব কিছুই ধ্বংস সাধন করিয়াছে—নব নির্মাণের
পূর্বেই একেবারে আশ্রয় ধ্বংস প্রকৃতির ভিত্তিতে;
বিশেষ কলিযুগাধেসই তাহাদের উৎপত্তি যুগের
মধ্যে কলি এক হিসাবে শ্রেষ্ঠ যুগ, এ যুগেই
ভবিষ্যৎ দিবা যুগের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়, কলির প্রথম
ভাগে ধ্বংস, তারপর ক্রমাধরে ত্রিযুগের আগমন
ও প্রস্থান, পূর্ণ কলিতে পুরাতনের ভিত্তি উপাধিয়া
মহা প্রলয়ের মধ্য দিয়া যিনি নব সৃষ্টির অতীত-
সম্ভারশূল, বিগুণ ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিবেন—তিনি
স্বয়ং ভগবান—সাধক কবি গাহিয়াছেন:—

“মৈচ্ছনিবহনিধনে,
কলয়সি করবালং।

যুগেকৈতুনি কিমপি কলয়ং।

কেশবদত্ত কবিরী

জয় ভগবান হরে।”

আজ এই কলির সত্যযুগে—দাক্ষিণ্য শীতের
শুক বাতাসের শিরংগে মেঘের জড়ত্ব দূর করিয়া
সহসা বসন্ত পবনের এই যে আবির্ভাব, এই যে
গভীর নৈরাশের মধ্যে আশার মঞ্জরী বিকাশ—ইহা
তাপিত ক্রিষ্ট জীবনে স্বাভাবিক লক্ষণ। দীর্ঘ কলির
পরমায় রক্ষার ইহা সম্ভাবনা স্বাভাবিক। ভগবানের ইচ্ছার
জাতির জীবনে ধর্মবল সঞ্চারিত হইবে—ইহা
তাহারই ঘটনা।

কমণ:।



বঙ্গসাহিত্যে সমাজতত্ত্বীয় অনুসন্ধান।

[লেখক—ডাঃ কুপেন্দ্রনাথ দত্ত, এম.এ.পি এইচ ডি]

(পূর্বসাহিত্য)

এই মোটামুটি বিশ্লেষণের ফলে দেখা যাইতেছে, যে বাঙ্গালীর বিভিন্নবর্ণের মধ্যে Dolichoid-mesorrhine typeটা প্রবল। এই প্রকারে আমি পাঁচবার ইস্তরপশ্চিম ও বিহারের রিসলিগ্রন্থিত anthropological data বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছি, যে কেবল নিম্ন ঠাণ্ডা বাতীত সমস্ত হিন্দু জাতিই এই type এর তালিকাভুক্ত হয়। তৎপরে দক্ষিণভারতের anthropological measurement এর data রিসলি প্রকাশিত হয় নাই; কিন্তু তিনি যে সব average indices দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, যে জন কতক তথাকথিত নিম্নবর্ণের সমষ্টি বাতীত সর্বত্রই এই type প্রবল। তথাহীত আমি আমার প্রাপ্য ভাষায় লিখিত 'Doctor's dissertation' এ (an anthropological enquiry in the racial elements of Afghanistan, Beluchistan and the neighbouring lands of Hindukush) এই প্রকারে biometric বিশ্লেষণ

করিয়া দেখাইয়াছি, যে বেলুচিস্থানের মরি ও বগটি পাহাড়ের (Murri and Bugti hills) বেলুচিরা আর পানিপাঠানেরা এই শাণ্ডারিক প্রকৃতি সম্পন্ন। এই সব কারণে ইহা মনোহিত বাধ্য হইতে হইবে, যে এই bio-typeটা ভারতের সর্বত্রই ও সর্বত্র বিরাজমান type। তৎপরে পার্শ্ব dolichoid-mesorrhine type পাওয়া যায়; ও তাহার বাহিরে আরব, উত্তর আফ্রিকা ও দক্ষিণ ইউরোপে এই আকৃতি সঘলিত type, যাহাকে ভূমধ্যসাগরের type (mediterranean race) বলে, বিরাজমান। আমি জানি না, ভারতের এই type-এর সহিত বাহিরের এই type-এর কোন রক্ত-সম্পর্ক আছে কি না; কারণ ভারতবাসী প্রধানতঃ শ্রাবণবর্ণের (brown and dark-brown) ও ভূমধ্যসাগরে type গৌরবর্ণের (olive and brunett) জাতি। কিন্তু Prof. Sergi ও Prof. Ripley বলেন, ভারত বাসীরা ভূমধ্যসাগরের জাতির অন্তর্গত। আমার মত

আমি, ১৩৩২]

বঙ্গসাহিত্যে সমাজ তত্ত্বীয় অনুসন্ধান

১৫৫

আমার পরলোকগত বিখ্যাত লুস্কার Felix von Luschanকে বলিলে, তিনি বলিয়াছিলেন, যে "তুমি যাহা বলিতেছ, Sergiও তাহা বলেন; কিন্তু Moscow conference-এ আমি তাহাকে এই বিষয়ে প্রমাণ বাহির করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্ব করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি তখন তাহার মতের পোষকতা-রূপ প্রমাণ দিতে পারেন নাই।" এ মতে আমি সাহ্য দিই না, কারণ ভূমধ্যসাগরের চর্যার সহিত যে প্রকার ভারতের চর্যা ও সভ্যতার আদান প্রদান এককালে ছিল, আর হইডেন হইতে অস্ত্রোনিয়া পর্যন্ত একটা লাইন টানিলে দেখা যায়, যে ষত লক্ষ মস্তকাকৃতি-বিশিষ্ট (dolichoid) জাতিসমূহ এই লাইনের নীচের অংশে পাশেই রহিয়াছে, তখন যে এককালে ভূমধ্যসাগরের জাতিসমূহের সহিত ভারতীয় জাতির কোন সম্পর্ক ছিল না, তাহা আমি স্বীকার করিতে রাজি নহি। আমার বিশ্বাস, যে পশ্চিম এশিয়ায় যারা ভূমধ্যসাগর ভারতের সহিত সংযুক্ত ছিল, কিন্তু অর্ধাংশ পশ্চিম এশিয়ায় জাতির আশ্রয়নের যারা সেই বন্ধনের শৃঙ্খল ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রফেসার লুগানের মত যে পশ্চিম এশিয়ায় brachycephal-leptorrhine type ভূমধ্য (autochthonous) জাতি, যাহাকে তিনি "armenoid element" বলেন, কারণ আরমানিদের মধ্যে বেশীর ভাগ তিনি এই লক্ষণ সঘলিত পাইয়াছিলেন। সেই জন্তই তিনি Sergi'র মত মনোহিত রাজি নন, কিন্তু তাহার অনুসন্ধান ও গণনা পুরাতন প্রাথমিক, বেনী পরিমাণ তথাকার লোক পরীক্ষা করিয়া biometric analysis করিয়া দেখা উচিত কোন কোন bio-type ওখায় বর্তমান আছে। যাহা হউক, পরে মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন বিখ্যাত অধ্যাপক Anutchin ও তাহার শিষ্য Prof. Bounak-এর সহিত আমার আলাপ হইলে, তাহাদের আমার

সমস্তর কথা বলিলে, তাহারা উত্তরদান করেন, যে স্কম নু-বৈজ্ঞানিকেরা (Daniloff-এর) পুস্তকে সমস্ত বিবৃত আছে) এ প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন, পার্শ্ব হইতেছে ভারত ও ভূমধ্য সাগরের জাতি-সমূহের মধ্যে সেতুবন্ধন। এই আলাপের ফলে আমি কবীর বৈজ্ঞানিকদের অনুসন্ধানের ফল স্বরূপ উপরোক্ত পুস্তক তাহাদের কাছ হইতে গ্রহণ করি এবং দেখি যে এ অনুসন্ধান আমার hypothesis-এর সাহচর্য করে। পার্শ্ব বিশেষভাবে নু-তত্ত্বীয় অনুসন্ধান হয় নাই, কিন্তু যাহা হইয়াছে তাহার ফলে ইহা বল যাইতে পারে, যে পার্শ্ব dolichoid-mesorrhine element বর্তমান আছে, যদিও তাহা সৌন্দর্য। এই সা data দেখিয়া আমার অনুমান হয়, যে ভারতের এই dolichoid-mesorrhine জাতির সহিত ভূমধ্য-সাগরের জাতির কোন প্রকার সম্পর্ক এককালে ছিল।

তৎপরে বাঙ্গালীর এই type-এর পরিঃ সংখ্যায় বেশী হইতেছে dolichoid-leptorrhine type. এই type-টা পাঞ্জাবে শিব জাতির মধ্যে শতকরা ৭৫% পাওয়া যায়, অর্থাৎ এইটা সর্বত্রই সমষ্টি, কিন্তু জাতিজাতিদের মধ্যে কম সংখ্যায়। আর উত্তর পশ্চিমে সর্ববর্ণের ভিতর কম ও বেশী সংখ্যায় তাহা বিরাজমান, যদিও ছাত্রের (রাজপুত) মধ্যে শতকরা ৯; আর কেণ্টের মধ্যে ১৫%। বিহারের বর্ণের সামাজিক স্তর বত নিম্ন, এই element-টার সংখ্যাও তত কম। ইহার পর আর একটি type, যাহা ভারতে স্থানান্তর বলিয়া ধারণা হইবে—brachycephal leptorrhine, যাহাকে লুগান পশ্চিম এশিয়ায় armenoid element বলিয়াছেন ও যে জাতির আন্তঃ alpine race বিশেষভাবে প্রবল, যাহার আন্তঃ alpine race

বলে, ভারতের সেই আকৃতি সম্বলিত type-এর জাতিদের কিংবা আভাষ পাওয়া যায়, যথা বাঙালী কার্হে তাহা শতকরা ১০; আর বাঙ্গালী ব্রাহ্মণে ১০; কিন্তু উত্তর ভারত তাহার অভাবশিথ ও চূড়ায় (Sikh and churah) শতকরা ১; উত্তর পশ্চিমে ও তাহার একেবারে অভাব, বিহারে ব্রাহ্মণ শতকরা ৪; আর কাহারও মুসাহারে আদৌ নাই। (Kahar and Musahar)। যে শারীরিক আকৃতি তৎকালিত মঙ্গোলীয় লক্ষণাক্রান্তি বর্ণিয়া অভিহিত, যথা—Brachycephal-mesorrhine, তাহা উক্ত বাঙ্গালার কৈবর্তের মধ্যে ১৮%; আর গোয়ালার মধ্যে ৭%। শেষে যে শারীরিক বর্ণকে বিতুঙ্গ ভারতের আদিম লম্বাথার dolichoid-chamoerhine, তাহা কৈবর্তের মধ্যে শতকরা ১১; আর কার্হের মধ্যে ১। এই আদিম type পাঞ্জাবে ক্ষত্রিয়ের মধ্যে ৫%; এবং উত্তর পশ্চিমে শোহারের মধ্যে ৪৫%; বিহারে মুসাহারের মধ্যে ৭%।

এক্ষণে কথা হইতেছে, যে বাঙ্গালার “মঙ্গোলো-জাভিড কৌটি” আর পাঞ্জাবে “বিতুঙ্গ আর্ধ্য” জাতি কথায় হইতে রিপলি আদমনি কলিলেন, তাহা আমি বুঝিয়া পাই না। তবে বাস্তবিক লভ্য এই যে পাঞ্জাবে গোল মস্তকাকৃতি ব্যক্তির সংখ্যা কম এবং বর্তমানে পূর্বে আসা যায় ততই গোলামাখার আধিক্যের প্রাধান্য দেখা যায়। কিন্তু লম্বাথার brachycephal-mesorrhine আকৃতিকে যদি মাঙ্গোলীয় লক্ষণবৃত্ত বলা যায়, আর dolichoid-chamoerhine আকৃতিকে যদি আদিম জাতির চিহ্ন বলা যায়, তাহা হইলে তাহাদের আধিক্য বাঙ্গালার এমন বেশী নয়, যে বাঙ্গালীকে জাভিড ও মঙ্গোলীয় জাতি-ধরের সম্মিশ্রণে সমন্বিত বসিতে পারা যায়। এক্ষণে কথা এই, জাভিড কাহাদের বলে? কাহারও মতে জাভিড ভারতের আদিম জাতি, কাহারও মতে ভোল, সীওতাল, ডেকা ও মাস্কারের জাতি নিম্নলিখিত

জাতিসমূহ বাহার্য্য dolichoid-chamoerhine লক্ষণাক্রান্ত, তাহারাই আদিম অধিবাসী। ইহাদের proto-dravidian জাতি বলে, ইহাঙ্গ অধ্য বৈশীর্ষ বিভাগ কিন্তু জাভিড ভাষা কহে। যদি ধরা যায় যে জাভিড ও মঙ্গোলীয় জাতিদের সম্মিশ্রণে বর্ণগুণের বাঙ্গালীর উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা হইলে mendilian সাধারণ ১: ২: ১। (১ homozygote—বাপের দিক, ২ heterozygote—মাতার দিক, ১ homozygote—মায়ের দিক) অস্থাপিত নিয়মানুযায়ী মিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু উপরোক্ত যে percentage-এর তাৎপর্য্য দিয়াছি, তাহা এ নিয়মের পূর্ত্তন অস্বাভাবিক বলিয়া দেখে হয় না।

তৎপরে বি এই গুপ্তের Calcutta Museum হিত ১২ টি “বাঙ্গালীর” Skull-এর Craniological measurement বাহা তিনি Ethnographic Survey of India-তে Craniological data from the Indian Museum Calcutta 1909 প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে ইংলু হুইট (এছল) আমি আধুনিক Lushan-Rudolf Martin-এর indices division গ্রহণ করিয়াছি আর রিসনি ও গুপ্তে পুংজন Topinard-এর indices division গ্রহণ করিয়াছেন। এই জন্ত শ্রীকৃষ্ণ গুপ্তের সহিত আমার indices-এর বিভাগের নাম করণের প্রস্তাব হইবে। এই ১২টি বাঙ্গালী Skull-এর মধ্যে ১১টি dolichoid (dolicocephal and mesocephal) অর্থাৎ লম্বাধরণের মাখার আকৃতি এবং ১ টি brachycephal অর্থাৎ মাথা গোলাকৃতি। আর নাকের indices-এর বিভাগে ৬ টি mesorrhin ও মাঝারি ধরণের নাক ও বাকি ছয়টি chamoerhine (খেম্বা বা চেপ্টা নাক)। ইহাতে দেখা যায় যে এই সমষ্টি মধ্যে বেশীর ভাগ লম্বা মাথাবিশিষ্ট, কিন্তু আদিম জাতির নাকের

চিহ্ন ৬ জনে পাওয়া যায়। অবশ্য এই অল্পসংখ্যক data-তে কোন মত পড়া যায় না। আর পুণ্ডজন Thesaurus craniorum নামক পুস্তকে I. B. Davis ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে গৃহীত কতকগুলি বাঙ্গালী Skull-এর মাপ দিয়াছেন, তাহাতে তিনি বাঙ্গালীকে average-এ Mesocephalic (মাখার মধ্যমাখার) বলিয়াছেন। এক্ষণে জাতি লম্বা মাথা (dolicocephal) ও মধ্যমাখার (mesocephal) উভয়ে একত্র dolichoid (লম্বাপানা) বলিয়া অভিহিত হয়। শেষে শ্রীকৃষ্ণ রায়প্রসাদ চন্দ্র দ্বারা গৃহীত কতিপয় বাঙ্গালী জাতির মাখার মাপে দৃষ্ট হয়, যে ইহাদের মধ্যে dolichoid (লম্বাকৃতি) প্রবল।

হংসলির data দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে লম্বা মাথাবৃত্তি ব্যক্তির সংখ্যা বাঙ্গালার বেশী, আর mesorrhin নাকের আকারের সর্বাপেক্ষা প্রাচুর্য্য, তাহার প্রায় অর্ধেক হইতেছে লম্বা নাক বিশিষ্ট ব্যক্তি (leptorrhin), আর চওড়া নাকের সংখ্যা ইহাদের তুলনায় খুব কম। উপরোক্ত বিশ্লেষণের ফলে স্বীকার করিতে বাধ্য, যে বাঙ্গালার যেটা dominant (সর্বা-পেক্ষা বেশী) type, সেটা ভারতে সর্বত্রই dominant। এক্ষণে দেখিতে হইবে, এই type-টির কি নাম দেওয়া হইতে পারে; তাহাকে কি জাভিড বা আর্ধ্য বা মন-মমর নামে অভিহিত করিতে হইবে। এ প্রশ্নের মীমাংসা কহে করিবে? তৎপরে যে dolichoid-leptorrhine type-টা শিখ জাতি-এর মধ্যে শতকরা ৭৭; আর বাঙ্গালীতে শতকরা ১১; তাহারই বা কি নাম? এই শারীরিক লক্ষণ বেলুচিহানের ওয়ানচি পঠান (waneechi pathans); হিন্দুকুশ পাহাড়ের জাতিদের মধ্যে (কান্দির জাতি); বেলুচিহানের লোরি (Lori), জাট (Jats from Sibi); পাঞ্জাবের বেলুচিও আফগানিস্তান ও ভারতের মধ্যবর্তী পঠান জাতিসমূহের মধ্যে প্রবল। তাহার বাহীরে

পারস্তের লুদিহান, ককসম্ পাহাড়ের প্রাচীন ossett জাতিদের মধ্যে ও আরারট পাহাড়ের উপর-কুর্ডজাতি (Kurds) এই শারীরিক লক্ষণাক্রান্ত (dolichoid-leptorrhine), কিন্তু অধ্যাপক লুগান বলেন, য এই কুর্ডেরা বেশীর ভাগ ভোল, ও তাঁহার মতে ইহারাই বাটী “আর্ধ্য,” বাঙ্গালী অতি প্রাচীন কাল হইতে উত্তর ইউরোপ হইতে আসিয়া এই স্থানে বসবাস করিতেছে এবং ইহাদেরই emigration-এর ট্রেড হারতে বৈবিক আধার্য্যে আপন নামে অভিহিত হয়। ইহারই pan-germanist-ধর্মের মত। জানি না, এই উত্তরে ইউরোপের blond dolichoid-leptorrhin জাতির সহিত ভারত ও তাহার পার্শ্ববর্তী দেশ সমূহের brown dolichoid-leptorrhin জাতির কি সম্বন্ধ; Mendalism ও hybridism নিয়মানুযায়ী ইহা প্রমাণিত হয় নাই, যে ভারত এই type-এর মধ্যে বা ভারতে blond type আধিক্য হইয়াছে। লুগান ও তাঁহার মতাবলম্বীরা বলেন, ভারতের এই brown type-টা এই blond আর্ধ্য জাতির সহিত ক্রমক্রমে আদিম অধিবাসীর সংমিশ্রণের ফল। কিন্তু ইহা hybridism নিয়মানুযায়ী সম্ভব নহে, কারণ তাহা হইলে ভারতে বর্ণগাঢ়তার ফলে অনেক heterozygotic blond dolichoid-leptorrhin element পাওয়া হইত।

আমার অর্ধাৎ বন্ধ Dr E. Von Eickstedt ৮-টি শিখ জাতি (Rassenlemente der Sikh Fiet Schribtftens Ethnologic Bb IV) anthropological measurement দ্বারা যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি পাঞ্জাবে দুইটা বড় racial types (পশ্চিম পাঞ্জাবী বাহার্য্য বেশীর ভাগ মূলগমন, ও পূর্ব পাঞ্জাবী বাহার্য্য বেশীর ভাগ শিখ ও তিনটা ছোট type পাইয়াছেন। এবং dravidoid type (লম্বা মাথা খেম্বা নাক) এখানে দেখানো

ইহাদের মধ্যেও পাইয়াছেন। তাঁহারও একটি type এই dolichoid-leptorrhin লক্ষণাক্ত। বোধ হয় Deniker এই typeটিকেই “Indo-afghan” বলিয়া নামকরণ করিয়াছেন।

Eickstedt কিন্তু পাজ্জাবের শিখদের মধ্যে blond element পান নাই। উপরোক্ত যে সব data আমি হতে পাইয়াছি, তাহাতে যে এই brown typeটা ইটালোপীয় blond type-এর সম্বন্ধিত তাহা স্বীকার করিতে রাজী নই, তবে আমার পূর্ণোক্ত পুস্তকে ইহা স্বীকার করিয়াছি, যে হয়ত অতি পুরাকালে এই দুই type-এর মূল পূর্ণ পুরুষদের মধ্যে (in the ascendency rows of the ancestors) কোন সম্পর্ক ছিল। কিন্তু এইখন আর একটা কথা উল্লেখ করিব, Eickstedt বলেন যে Risley-র নাক মাপা ভুল ছিল, অর্থাৎ যে অভাবে রিসলি নাক মাপিয়াছেন তাহা আরকণ গ্রাহ্য হয় না। এইজন্য নতুন System-এ মাপিলে ভারত আরও বেশী সংখ্যক লম্বা নাকওয়ালা ব্যক্তি (leptorrhin) পাওয়া যাইবে।

তৎপরে brachycephal leptorrhin element পাওয়া যায় বলিয়াছি। ইহারা কি পশ্চিম এশিয়ার armenoid element-এর সম্পর্কীয় বা স্থানীয় সংমিশ্রণের ফলরূপ Pheno type? এই type অঙ্গ-গাণনিহাসনে তাজিক ও গালচা (Tajiks, galtchas); বেলেচিস্তানের মেঙ্গেল, কালাকান্দি, (ফারসী ভাষী) মিরজাতি, ছুই, সঘের, বালিজা (সিদ্ধিভাষী), অ্যাংক, আঁতিন, কাকের (পুস্তভাষী); বেড ও বেলেচ (ফারসী ভাষী) প্রভৃতি মধ্যে পাওয়া যায়।

তাহার বাহিরে ইরান ও পশ্চিম এশিয়ায় এই type বিশেষভাবে প্রবল। এই লক্ষণাক্ত ব্যক্তিদের সর্বদার লোকে ভ্রমক্রমে ইহুদির চেহারা (Jewish type) বলে। বাঙ্গালার এই type-এর সংখ্যা বেশ পাওয়া যায়, যদিচ dolichoid-leptorrhin-এর

চেরে কম element বিপণ্যায় এই type-এর উৎপত্তি কোথা হইতে হইয়াছে? যদি ইহাকে অস্থায়ী সঙ্কর-লক্ষণাক্ত (pheno-type) বলা যায়, তাহা হইলে উক্তের type-কেও তাহা বলিতে হইবে।

শেষে ব্যক্তব্য এই যে, পাজ্জাবে খাঁটি “Indo-aryan” type খুঁজিয়া পাইবার না। রিসলি “আর্য্য ঋগভা”-র পান কটাইয়া বলিয়াছেন, “আমি ‘আর্য্য’ মানে ইহাই বুঝি যে, বেদের আদর্শের যে আকৃতি বর্ণিত আছে, পাজ্জাব ও রাঙ্গপুতানা-র সেই type পাওয়া যায়” (Peoples of India)। এই মতটা যোর অটোজ্ঞানিকের মতন কথা ও একটা গোঁজামিল দেওয়া ব্যাপার। যেসব আদিবাসীরা কি শারীরিক লক্ষণের বর্ণনা আছে, তাহা এইভাবে অধিবাসীদের সহিত মিলে, তাহা আমি বেদে ও তাঁহার নিজের measurement-এ খুঁজিয়া পাইবার না! বোধহয় তিনি এই dolichoid-leptorrhin typeটা দ্বাধাকে সম্বোধন: Deniker, Indo-afghan নাম দিয়াছেন, তাহাকেই বৈদিক আদর্শের বংশধর বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। কিন্তু কোথায় তিনি তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। আবার আঙ্গগানদের উৎপত্তি তিনি অঙ্গলক্ষণের নিশ্চয়ি করিয়াছেন। রিসলির জাতি ব্যতীত পাজ্জাব ও রাঙ্গপুতানার জাতিসমূহ average indices-তে dolichoid-mesorrhin হয়, আর এই typeটা ভারতের সর্বত্র প্রবল। এইজন্য বলি, কোথা হইতে তিনি পাজ্জাবে pure Indo-aryan পাইলেন, আর ভারতকে অভিশপ্তা করিলেন। তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তৎপরে আর্য্যদের বাখ্যার বোনা তিনি একেবারেই গোঁজামিল করিয়াছেন। গায় রে ইতিহাস সিদ্ধি সার্ভিসের বিজ্ঞানচর্চা!

মুসলমানিত্তে বলি, যে ভারতের নৃত্বের অঙ্গসন্ধান এমন বিশদভাবে ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে

হয় নাই যে একটি বিশেষ মত গড়া হইতে পারে। তাহার ঋণকিত্তি অঙ্গসন্ধান করিয়াছেন, তাহার কেহই absolute data-তে উপস্থিত হন নাই। তৎপরে তাহা কিছু অঙ্গসন্ধান হইয়াছে তাহা পুরাতন প্রণালী অঙ্গসারে এবং আবার সম্মেহ হয় কোন কোনস্থলে ভুলও আছে। এই সব কারণে ভারতের নৃত্ব এখনও Subjudice রহিয়াছে, যে বাহ্যে বলেন তাহা ব্যক্তিগত মত বিশেষ। কিন্তু বঙ্গদূর অঙ্গসন্ধান হইয়াছে, তাহাতে ইহা বলা হইতে পারে, যে ভারতের সর্বত্র বিভিন্ন প্রকারের type বর্তমান। একটা homogenous type পৃথিবীর গোণ্ডা পাওয়া যায় না।

Biometric বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায়, যে ভারতে সর্বত্র একটা dominant type বিদ্যমান করিতেছে। সংমিশ্রণ সর্বত্রই হইয়াছে। caste (বর্ণ) race-মূলক নহে। সর্ব বর্ণেই সংমিশ্রণ হইয়াছে, কেবল percentage-এর প্রভেদ হয়, যথা—বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালের race-গত বিভিন্নতা বিশেষ নাই। পার্শ্ব্য সামাজিক ব্যাপার, শ্রেণীসংগ্রাম দ্বারা দ্বিভুক্ত হইয়াছে। বাঙ্গলার যে bio-type-পাওয়া যায়, ভারতের অন্তরংগ সেই type পাওয়া যায়। এইজন্য “বাঙ্গালী কোন জাতি”—এ কথাই কোন অর্থ নাই। ভারতে প্রচলিত দুই ভাষা বর্তমান; আর্য্য ও দ্রাবিড়ী। বৈদিক আদিবাসীদের কি শারীরিক আকৃতি ছিল ও তাহাদের মধ্যে কোন কোন bio-type ছিল (কাণ্ড homogeneity সম্ভব নহে) এবং কোন আকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রাচীন-কালে দ্রাবিড় ভাষা কহিত, এবং প্রবোধ উত্তর আঙ্গ দেওয়া সম্ভব নহে। তৎপরে হালে অধ্যাপক Sylvain Levi পারিসের Asiatic Society-র Journal Asiatique-এ এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, যে ভাষাতত্ত্ব দ্বারা তিনি ধরিয়াছেন, যে ভারতে

পূর্ণ-দ্রাবিড় ও পূর্ণ-আর্য্যকালের সময়ে অঙ্গ-এক-ভাবী জাতি বর্তমান ছিল। ভাষাতত্ত্ব দ্বারা এই দৃষ্টের মীমাংসা এই ভাবে করা যায়, যে বাহ্যার পুরাকালে আর্য্য ভাষা কহিত তাহার আর্য্য ও বাহ্যার দ্রাবিড় ভাষা কহিত তাহার দ্রাবিড়। আর সমাজতত্ত্ব দ্বারা ইহা বলা যায়, যে বাহ্যার নিম্নেদের আর্য্য বলে ও আর্য্য সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত তাহারাই আর্য্য। ভারতে রিসলি প্রণোদিত কল্পিত “আর্য্য” ও মনোর্থের বিবাদ আমিরা রাজনীতিতে বিষম ফল উৎপন্ন হইয়াছে। একটা দেশ (nation) বা লোকসমষ্টি (people) নানা-প্রকার শারীরিক লক্ষণ বিশিষ্ট (different racial elements) লোকসমষ্টি দ্বারা সংগঠিত হয়। ভাষা ও সভ্যতা তাহাদের সংহত শক্তিতে একত্র করিয়া একীভূত করে। ভারতের লোকসমষ্টির শারীরিক বৈচিত্র্য একটা nation গঠিত হইবার অন্তরায় নহে। বাঙ্গলার সমস্ত প্রকারের বৈচিত্র্য প্রদীভূত হইয়া একটা জমট জাতির জন্ম বিকাশ হইয়াছে, তাহার নাম “বাঙ্গালী”। মাধার গঠন বা মাগের বহর দেখিয়া কেহ নিজের উত্তরপুরুষ অঙ্গসন্ধান করেন না; তাহার স্বভাব বা বংশ-প্রেমিকতা তাহার মস্তক্রেণ বেড় বা index অঙ্গদ্বারা স্থিতিভূত হয় না। একটি নির্দিষ্ট দেশে এক ভাষা, এক সভ্যতা ও এক ইতিহাসের অভিব্যক্তি অঙ্গদ্বারা যে সব লোকেরা বহিত হয় তাহা হইয়া একটা nation-এ পরিণত হয়। বাঙ্গলার, তাহা প্রাচীনকাল হইতে হইয়াছে এবং বাঙ্গালীর একটা প্রাচীন ইতিহাস ও সভ্যতা আছে বলিয়া সে প্রাচীনকাল হইতেই একটা জমট জাতিতে পরিণত হইয়াছে। ইহাই বাঙ্গালীর পরিচয়।

এইজন্য আমি মুসলমানের নৃত্বের বিষয় উল্লেখ করি নাই, কারণ মুসলমান race হিসাবে

হিন্দু হইতে পৃথক নহে। তবে যে মূর্তিময় বৈদেশিক মুসলমান ভারতে বা বঙ্গপ্রদেশে আসিয়াছিল তাহারা স্থানীয় জাতির সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। ইহার ফলে একটা জাতির racial character পরিবর্তিত হয় না, কেবল কখন কখন atavistic উপায়ে কোন কোন ব্যক্তির আকৃতিতে বৈদেশিক পূর্ব পুরুষের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

শেষ কথা এই, যে বাঙ্গালী বঙ্গো বঙ্গভাষীকে

বুঝাইবে। যে বঙ্গপ্রদেশে বসবাস করে ও বাঙ্গালী কথা কয় সেই “বাঙ্গালী”।

এই বাঙ্গলাভাষী সমষ্টির ভিতর শারীরিক নৃতত্ত্ব হিসাবে নানা প্রকারের racial elements আছে, কিন্তু সকলের আজ জাতিতত্ত্ব (ethnology) ও ভাষাতত্ত্ব হিসাবে বাঙ্গালী।

ক্রমশঃ

জীবন-বেদ

(উপভাস)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গনঃ মুক্তারাম বাবুর গণি। একখানি দ্বিতল বাড়ীর সদর দোরেরে কড়া ধরিয়া বাহির হইতে কে নাড়া দিল—খট-খট-খটখট, খট, খট।

বাড়ীপানি ছোট হইলেও বেশ ব্যাবস্থা আছে। নোচে ছুইখানি বড় বড় ঘর, উপরে একখানি, এক পাশে কল ও পাথরখানা, সিঁড়ি দিয়া উঠিবার এক কোণে একটা চোর ঘুঁইরী—দক্ষিণদিক বেগা, একটা ক্ষুদ্র বাতায়ন দিয়া হু হু করিয়া হাওয়া আসে, একটা ছোট টেবিলের পাশে টুলের উপর বসিয়া এক যুবতী কারপেটের আসন বুনিতছিল।

যতটা পরিপাটি—কিন্তু ক্ষুদ্র, প্রায়ে আড়াই হাতের অধিক হইবে না, লম্বা একটু বড়, প্রায় হাত চার হইবে। সেওয়ালা ঠাকুরের ছবিখানিতে চন্দন ছিটান, ইহারই মধ্যে একটা ছোট আলদারি—বাধান

বাইগুলি তাহার মধ্যে শুছান, টেবিলটার পানিশ স্বচ্ছ করিতেছে, মেয়েটা আঁশের মত তক্ত তক্ত। ক্ষুদ্র জানালা দিয়া যুবতী উকি মারিয়া দেখিল, জানালার নীচেই সদরদোর, তাড়পদর হাসিতে হাসিতে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া দোর খুলিয়া দিল। নোচের রান্নাবর হইতে এক বয়ীসরী রমণী বলিল—“কে ঠাকুরবঁী।” যুবতী উত্তর দিল, “ছোটদা”—রমণী ঘর হইতে বাহির হইল।

কলজের ছুটা ফুয়াইয়াছে, অপরেশ একহাতে মগ্ন এক ব্যাগ, ও অন্য হাতে একটা কাপড়ের পুঁটলী লইয়া প্রবেশ করিল। নোচের ঘর হইতে এক বৃদ্ধা একটা আঁটবছরের মেয়ে ও ছুইটা ছোট ছেলে লইয়া সমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অপরেশ ব্যাগ ও পুঁটলি নামাইয়া, ভাষাকে প্রণাম করিল, তারপর সেই বয়ীসরী রমণীর চরণধূলি লইয়া বলিল—“মাশি মা, ভাল আছেহে? বৌদি যেন রোগা হয়ে গেছেন।”

ছেলে ছুটা অপরেশের হাত ধরিয়া লক্ষ লক্ষ জুড়িয়া বিল, যুবতী বলিল—“ছোটদা আমার কথাটা জিজ্ঞাসা করলে না।” এই বলিয়া সেও ঢিলু করিয়া অপরেশের পায়ে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। অপরেশের আগমনে বাড়ীতে যেন উৎসবের ধূম পড়িয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে অপরেশের পুঁটলি ধরিয়া টানা টানি পড়িল, আঁটবছরের মেয়েটা, ছোট ছোট ভাই ছোটীকে ধমক দিয়া, পুঁটলি খোলার অধিকার যেন তার একারই—এঁতাবে অতর পাছীধোর সচিত কাপড়ের ফাঁপ গুলিতে আরম্ভ করিল। ফলে দাঁড়াইল ছোট খাঁট মুক্তক্লেত্র, মেয়েটা অগহিহু একটা ভায়ের পিঠে এস কিলি বসাইয়া দিল, সে তার প্রতিশোধ লইতে ছাড়িল না, তিন ভাইবোনে বটাটা লাগিয়া গেল। অপরেশ হাসিয়া, এক জনকে কোলে তুলিয়া, আর একজনকে হাতে জলছবির পাতা দিয়া নিরস্ত করিল এবং বলিল—“মহা! পুঁটলি খুলে, গাছের কচি শশা এনেছি—বার কর।”

কলিকাতার বাগ বাগ করে, গাছের সামগ্রী দেখিলে তারা যে কি আনন্দ অহত্ব করে তাহা গম্ভীর লোকে বুঝিবে না, অহ পুঁটলির ফাঁপ গুলিতেই সবুজ রঙের টাটকা দশ পনরটা কচি শশা বাহির হইয়া পড়িল, সকলের চক্ষুতে তৃপ্তি ফুটিয়া উঠিল, তারপর এক গোছা নদর লাউডায়া, বিশ পঁচিশটা কাপড়ের পেরু—একটা পাকা কুমড়া, কাঁচা ও পাকা এক রাশ গন্ধু, কলাপাতার জড়ান আম কুল প্রাকৃতিক আচার, কীরের ডেলা। বৃদ্ধা বলিল—“অপরেশ, কেরেছিস কি? বাড়ী যে মাথার করে এনেছিস।”

অপরেশ হাসিয়া উপরে উঠিয়া গেল—সুহ তাহার হাত হইতে ব্যাগ কাড়িয়া লইল, অপরেশ এই বাড়ীতে থাকিয়া কলোজে পড়ে, বাড়ীর চেয়ে অধিক সুখ, অধিক স্নেহ।

অপরেশ পিতা কলিকাতার যখন চাকুরী করিতেন, তখন তাঁর এক পোদরপ্রতিব বন্ধুর সহিত সপরিবারে এক বাসার থাকিতেন—উত্তর পরিবারের মধ্যে এরকম বন্ধি সখ হইয়াছিল যে তিনি পরলোক গমন করিলেও, অপরেশের সহিত ইহাদের সমান ব্যবহারই চলিয়া আসিতোছে। অপরেশের মাতা এত বয়ীসরী রমণীকে সহোদার মত ভালবাসিতেন, কয়েক বৎসর ইনিও বিধবা হইয়াছেন, তাঁর এক পুত্র কোন এক সপ্তাহগরের অগ্নিসে কার্ণা করেন, একটা কল্যাণ স্মৃতি বিধবা হইয়াছে, তাহার নাম অম্বশমা, পুত্রবধু লক্ষ্মী—তাহারই একটা মেয়ে ও পিনীতি ছেলে। অপরেশের পিতার মৃত্যু হইলে, তাহার মাতা কলিকাতার থাকিতে রাজী হইলেন না, কিন্তু অপরেশ এই পরিবারের মধ্যেই রহিয়া গেল, পর বলিয়া অপরেশের এই বাড়ীতে কোনই সন্ধ্যা ছিল না, বৃদ্ধার একমাত্র সন্তান নীরদবরণকে সে নিজের জ্যেষ্ঠ সহোদরের মত সম্মান ও ভক্তি করিত। অপরেশ এইরূপে কলিকাতার বড় সুখে দিন বাপন করিত।

অম্বশমা বিধবা হইয়া এই বাড়ীতেই আসিল। অম্বশম বিবাহ হইয়াছিল, অপরেশের সহিত সে এক সনে খেলা করিয়াছে—বয়সে ছুইচার বছরের ছোট হইলেও, অপরেশের সে নিত্য সঙ্গী ছিল, বিধবা হওয়ায় পুত্র, কিছুদিন তার ত্রিভিন্ন ছিল। তারপর অপরেশের আদর ও মেহে শোক হ্রাস হইল, অপরেশ তাহাকে সহোদার মতই যত্ন করিত, অপরেশের বাহা কিছু কাণ অম্বশমা তাহা নিজের হাতেই করিয়া দিত, কেহই আপত্তি করিত না—অপরেশ যে শর, এখারো কাহারও ছিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নীরদ বাবু নোচের ঘরখানিতে বসিয়া অপরেশের

সহিত কথা কহিতেছিল। সংসারের খবর, গ্রামের অবস্থা, হরিনাথ ও বিশ্বদাসের সংবাদ প্রভৃতি।— অপরেশ বিনয় ও সন্ধানের সহিত সব কথাই উত্তর মিল। পরিশেষে নীরদ বাবু সহসা প্রশ্ন করিল—“অহু তোমার সঙ্গে বেশী মিশে, তোমার কাজ নিষেই ব্যস্ত, সাধনা তা পেয়েছে, কিন্তু তার ভবিষ্যৎ কি? তার খন্তরবাড়ী থেকে চিঠি এসেছে, তাকে পাঠিয়ে দেবার জন্ত তুমি কি বল?”

অপরেশের উত্তর দিতে বিলম্ব হইল, কেননা সে এই বিষয় লইয়া এপর্যন্ত কোন চিন্তাই করে নাই, অহুকে সে ছেলাবেলা হইতে ভালবাসে, যখন তার বিবাহ হইল, তখন কোমর বান্ধিয়া অপকেশ বরষাভী-দের পরিবেশন করিয়াছে, যে দিন অহু প্রথম খন্তর-বাড়ী যায়, সেদিন তার চক্ষে অশ্রু দেখিয়া একই বিচলিত হইয়াছিল, সেটা খুব স্বাভাবিক। তারপর অহুর কপাল পড়িল, বাড়ীতে বুকচাটা কন্দন উঠিল, অপরেশের অস্তরে কিন্তু ব্যথার আঁচড় লাগে নাই, তারপর সৌমস্তের সিল্পুর মুখিয়া বিষয় মুখে যে দিন সে বাড়ী ফিরিল, তার মুখ দেখিয়া অপরেশ কিছুক্ষণ স্তম্ভিত ছিল, পরে অহুর মুখে হাসির রেখা ফুটিলে সে আশ্চর্য হইল, ব্যাপারটা যে তেমন গুরুতর নয় ইহা বুঝিয়া সে নিশ্চিত হইল। আজ নীরদ বাবুর প্রশ্নের যে কি উত্তর দিবে তাহা বুঝিয়া পাইল না, তাহাকে অনেকক্ষণ নীরব থাকিতে দেখিয়া নীরদ বাবু আবার বলিল—“কোন জবাব দিচ্ছ না, অহুকে যদি না পাঠাই, তাহলে তারা ভবিষ্যতে তার আর কোন খোঁজই যেনে না।”

“তা না নিলেই বা।” হঠাৎ এই কথাটা অপরেশের মুখ দিয়া বাহির হইল। নীদ বাবু বলিল—“তাইতো জিজ্ঞাসা করছি, অহুর ভবিষ্যৎ কি।”

অপরেশের আর উত্তর নাই। অহুর আবার ভবিষ্যৎ কি? সে যেমন আছে, চিরদিন তেমন

থাকায় বাধা আছে নাকি, কে বাধা দিবে। অহুর অস্তরে কোন দিন তার ভবিষ্যৎ সন্দেহ ছিল। জাপে বলিয়া তা বোধ হয় না। বিবাহ হইয়াছিল, উহা যেন স্বপ্ন, সুরল ও মিষ্ট হাসি তার ঠোঁটে সর্বদা লাগিয়া আছে, কপালে চিত্রার রেখা পর্যন্ত পড়ে নাই, প্রহুসমূহী আকাশের পাখীর মতই তৃপ্তি ও শান্তিতে ভরিয়া আছে—অপরেশ অস্বমনক ভাবেই বলিল—“অহুর ভবিষ্যৎ।”

নীদ—“হা সেই কথাই ভাবি। এখনও সে ছেলে মাছ, তার যে কি সর্বস্বান হরছে তা জানে না, সংসারের তার আপনার বলতে কেউ নেই—পেটের ছেলে থাকলেও একটা বাঁধন থাকে, যে দিন আমার আশ্রয় তার পর বলে বোধ হবে, সেদিন এই স্বপ্নের সাধনা, এই মোহের হাসি খুসি কর্তৃপের মত উপে বাবে, মাথায় তার আকাশ ভেঙ্গে পড়বে, অহুর জন্ত আমার বড় ভাবনা হয়।”

অপরেশের সমুখে আজ একটা নূতন চিন্তার জগৎ যেন ফুটয়া উঠিল—এই আশ্রয়, তার নিজের সহোদর—তাক কোন দিন পর বলিয়া সে মাথার হাত দিয়া বসিয়া পড়িবে। নীরদ বাবুর উল্লেখ চিন্তার সে মর্মেস্তেব করিতে পারিল না, তাহার মনে হইল অহু যেমন আছে, এমনি ভাবে থাকিলেই সে স্থায়ী হইবে, ভবিষ্যৎ সন্দেহ চিন্তা করার কোনই কারণ নাই, অহুর ভবিষ্যৎ আর স্তম্ভটুকু—নীরদ বাবু তা যদি অস্বাধ্য হয়, অপরেশ সে তার অনায়াসে মাথায় তুলিয়া নইবে। সে চিন্তিত নীরদ বাবুর মুখের দিকে সরল দৃষ্টিতে চাহিল, নীরদ বাবু বলিল—“কি জবাব দিই ভাবছি—অহুকে ডাক দেখি।” ডাকিতে হইল না, ছই কাপ চা একটা রেকাবীতে লইয়া অহু ঘরে ঢুকিল—চায়ের বাটি হইতে ধূঁয়া উড়িতেছে, নীরদ চায়ের বাটি উঠাইয়া অপরেশকে বলিল, “চা খেতে শিবেছ?” অপরেশ—“অহু আমার

মাথা খেলে। কদিন ধৈর্য দেখি—মন্দ নয়, রোজই থাকি” নীরদ—“বাচন্য আজ্ঞা জন্মে ভাল।” অহু হাসিয়া ঘরের বাহির হইতেছিল, নীরদ বাবু ডাকিয়া কহিল—“তুমি যা, একথানা চিঠি এসেছে, কি জবাব দিই ভাব-চি—এই জাপ” —এই বলিয়া চিঠিখানা জামার পকেট হইতে অহুর হাতে দিল। অহু চিঠিখানির নীচে নাম পড়িয়াই তক্তাপোষের উপর রাখিয়া, ঘর হইতে বাহিরে হাইবার উপক্রম করিল, নীরদ বাবু বলিল—“একটা জবাব দিবে যা, দিন কতক না হয় বেড়িয়ে আয়—কি বলিস্।”

“আমি জানি না”—এই বলিয়া লজ্জায় রক্তমূহী হইয়া সে বাহিরে হইয়া গেল। নীরদ বলিল—“অহুর

ঘোরতর আপত্তি নেই, এক দায়িগার থেকে মাঝে মাঝে একটু হাওয়া বদলান ভাল, পাঠিয়েই দিই, কি বল—না বনে আবার নিয়ে, এলেই হবে।”

অপরেশের মুখ যেন কালি বর্ণ হইল, নীরদ বাবু এক চুমুক চা খাওয়া বলিল—“তাই গিবি, খন্তরের সংসারে কাজে লেগে গেলে হয়তো অহু সাধনা পাবে।” অপরেশ একমনে চা খাইতে লাগিল, নীরদ বাবু আর কোন কথা কহিল না, অহুকে বাবার জন্ত প্রশ্ন হইতে গেল, অপরেশ তক্তাপোষের উপর ভিত্তি হইয়া শুইয়া পড়িল। সে দিন সে দেখিল, ঘরপানিতে চার গুনি কড়ি, ওতি বাটালে ১২ পানি করিয়া পাঁচ বাটালে ৬০ পানি বরগা আছে।

গ্রামের ছবি

আমাদের গ্রামের পাশেই নন্দনপুর গ্রাম; আমাদের গ্রামটা ক্ষুদ্র, কিন্তু বহুক্ষণ বোকে গ্রামটাকে বেশ সাজাইয়া রাখিয়াছে—ক্ষুদ্র গ্রামে একটা মাজ নীথি, আজকালের বাজারে দীঘির পল্লবোদ্ধার একটা বৃহৎ ব্যাপার, কিন্তু ভূদেব চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এই দীঘির পল্লবোদ্ধার করিয়া চারিদিকে বেশ সুনাম অর্জন করিয়াছেন। দীঘির অনতিদূরে একটা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়। নন্দনপুরের ছেলেরা এই বিদ্যালয়ে পড়িতে থাকায় উত্তেজিত হইয়া তাহারা সকলকেই স্থপানীদের দিকে লক্ষ্য রাখিতে বলিতেন, নন্দনপুরের ছেলেরাও তাহারা বিশেষভাবেই বলিতেন। গ্রামা শিক্কে—তাখাটা তাহাদের সকল সময় সজ্জিত হইত না, অনেক সময় নন্দনপুরের ছেলেরাও

চন্দ্র ভট্টাচার্য্য তাহার চিরস্বরণীয়া মাতৃদেবী দামোদরীণীর স্বত্বকরে এই দীঘির পল্লবোদ্ধার করিয়াছেন।” লেখাগুলি পড়িতে পড়িতে নন্দনপুরের ছেলেরদের দিকে তাকাইয়াই আমরা হাসিয়া উঠিতাম, তাহাদের ছায় পিলেবোপা ছেলে আমাদের বিদ্যালয়ে খুব কমই ছিল। শীতকালটা তাহারা জ্বরে জ্বরেই কাটাওয়া দিত—তজ্জ্ব শিক্কেরা মাঝে মাঝে তাহাদিগকে ধবক দিতেন, ভূদেব বাবুর কথায় উত্তেজিত হইয়া তাহারা সকলকেই স্থপানীদের দিকে লক্ষ্য রাখিতে বলিতেন, নন্দনপুরের ছেলেরাও তাহারা বিশেষভাবেই বলিতেন। গ্রামা শিক্কে—তাখাটা তাহাদের সকল সময় সজ্জিত হইত না, অনেক সময় নন্দনপুরের ছেলেরাও

বলিয়া উঠিতেন,—“হাঁরে চাষার তেউড়, তোদের গায়ে না-হয় বড় বড় দীঘিমুখে গেছে,তোদিকে পাক জলই খেতে হবে, কিন্তু সে জলটাকে গরম করিম না কেন? হোঁর মা পিসী হাড়ি হাড়ি ধান সেক করতে পারে, এক হাড়ি জল কি তারা ফোটাতে পারে না?” শিক্ষকের কথা শুনিয়া জেলদেবের গা কাঁপিয়া উঠিত, তাহার কথার উত্তর দিত না, কিন্তু উপেক্ষা নাথ হাজরা দীঘির পাড়ে গিয়া আমাদের সহিত কথা-কাটাকাটি করিত, বলিত “দীঘি কাটাবার আগে তোমাদের গ্রামেও ত পিলেরোপা ছেলে বিদ্যালয়ে পড়তে আসত।” একদিন সে এই কথাগুলি এত জোরের সহিত বলিয়া উঠিল যে আমার আশ্চর্য্য হইয়া উঠিলাম, মনে হইল তাহার চোখের কোণে জল দেখা দিয়াছে।

বেশ বুক্‌লিাম, আমাদের ‘হাসি ও শিক্ষকদের কঠিন ভাষায় উপেন মর্মান্বিত হইয়াছে—সে আমার অপেক্ষায় বয়েস বড়, কিন্তু নিয়ম শ্রেণীতে পড়িয়া থাকে, আমাদের সৈ তুমি বলিয়াই যথোদয় করিত, আমি তাহাকে তুই বলিতাম। আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ, ভিন্ন গ্রামের অধিবাসী, উচ্চ শ্রেণীতে পাঠ করি, অতএব আমি নিরীচাদের তাহাকে তুই বলিতাম। ওদিকে ব্রাহ্মণ শিক্ষক মহাশয়ও উপেন ও তাহার গ্রামবাসী বালকদিগকে নিরীচাদের ধমকের ভাষা ব্যবহার করিতেন, কিন্তু উপেনের অন্তরাঙ্গার বোধ হয় একটা তীর প্রতিবারে উপেন হইতেছিল। বাইধ’ক উপেনের সেইদিনের চীৎকার আমি আজ পর্যন্ত ভুলিতে পারি নাই।

আমি বহুদিন গ্রামে যাই নাই, বর্ধমানের অনতিদূরে একটা গ্রামে আমি শিক্ষকতা করিতেছি; বেশ সম্মানের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই, কিন্তু বাবা আমার আর পড়াইতে পারেন নাই। আমি চেষ্টা ও কষ্টবীকার করিয়া বর্ধমান

রাজ কলেজে এক, এ, পর্যন্ত পড়ি, কিন্তু পরীক্ষায় অসহজীর্ণ হই—সে সময় আমাদের কি চুপসময়ই না গিয়াছে!

পূর্বোক্ত ভূদেব বাবুর ইচ্ছা হয় তাঁহার দীঘির পাশে আমাদের ক্ষুদ্র পুষ্করিণীটা তিনি কিনিয়া লইবেন, এ পুঙ্খের আমাদের আর কিছু হইত না, কিন্তু পুঙ্খের চারিদিকে কয়েক বিঘা জমিতে জলসেচনে ইহা সাহায্য করিত। ইহাতে আমাদের ও গ্রামবাসীর ফসলের বেশ সাহায্য হইত, এমন কি পুঙ্খের পাশে ছ’ এক কাঠা জমিতে আক আলু বা অন্তকোন রবিকসল দিয়া রাঢ়দেশের চাষীরাও একই জমিতে দুইটা ফসলের মূখ দেখিতে পাইত। রাঢ়দেশের চাষীদের কেবল অল্পই সন্ধ্যা, দীঘি বা পুঙ্খের জলসেচনের সুবিধা পাইলে তাহারা অনাবৃষ্টির সময় কোনরূপে ধানগুলি বাঁচাইয়া লয়, অথবা কোন কোন উমাইয়া চাষী জলের সাহায্যে আক আলু প্রকৃতির চাষও করিয়া থাকে। আমাদের গ্রামে ভূদেব বাবুর দীঘির পাশে এই জম্ভই অধিকাংশ জমিতে কখনও অজম্ভা হইত না, দীঘির পাশে অনেক জমিতেই আক ও আলু হইত, বিবিধ রিপনশ্রেণেও অনেক জমি পূর্ণ থাকিত। আমি বহন মধ্য-ইংরাজী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গ্রামান্তরে উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে থাকি, সেই সময়ে ভূদেব বাবুর দীঘির ক্রমিক উন্নতি বিবেচনায় একান্ত হয়। দীঘির পাড়েই গ্রাম্য শ্মশান ছিল, আমাদের পুঙ্খের পাশেই তাহার এক খণ্ড জমিতে তিনি শ্মশানক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন; গ্রামের লোকে তাঁহার কথায় সম্মতি প্রদান করেন, আমার পিতাকে বলিয়া কহিয়া তিনি আমাদের পুঙ্খ হইতে মৃতের সংকারের জন্ত জল লইবার ব্যবস্থা করেন। অবশ্য তিনি সহজে গ্রামের সম্মতি পান নাই, ঈশ্বাকে ঐ শ্মশান

ক্ষেত্রেই তিনটা মার্বেল পাথরের ফলক প্রতিষ্ঠা করিতে হয়—একটাতে লিখিয়া দেন, ব্রাহ্মণদের শ্মশান, একটাতে লিখিয়া দেন শূদ্ৰদের শ্মশান, আর একটাতে লেখা থাকে অন্তঃজদের শ্মশান! তাহার উদ্ভাবনী শক্তি ও শ্মশানক্ষেত্রেও জাতি বিচারের প্রতিষ্ঠায় গ্রামবাসী বিন্দু হইয়া পড়েন, বোধহয় তাহাতেই তাহার শ্মশানক্ষেত্রে পরিবর্তনে সম্মতি প্রকাশ করেন; অতএব বাবা আমার আমাদের পুঙ্খ হইতে মৃতের সংকারের জন্ত জল লইবার কোনরূপ আপত্তি করেন নাই।

এদিকে দীঘির পাড়ে শ্মশান বন্ধ করিয়া ভূদেব বাবু দীঘির পাড়ে চাষ করিবার আয়োজনে প্রবৃত্ত হন। পাড়ের উপর পছন্দাকারের নূতন মাটি পড়ায় দীঘির পাড় ফসল উৎপাদনের উপযুক্ত হইয়াছিল। তত্পর ভূদেব বাবু নন্দনপুত্রের মজা দীঘি হইতে শুকনা পাক অনাইয়া পাড়ের উপর কেলিতে থাকেন, মাটি চাটাইয়া ও মাটি কুপাইয়া এই জমিতে তিনি প্রথমে কলাগাছ লাগাইয়া দেন। রাঢ়দেশে কলাগাছ বিল, ভূদেব বাবুর দীঘির পাড় কদলীপুঞ্জে পূর্ণ হইয়া যখন আমল পর্বতের আকার ধারণ করিল, তখন সকলেই ধস্তা ধস্ত করিতে লাগিল, অনেকে আবার এই দীঘি বেধিতে আসিতে আরম্ভ করিলেন, ভূদেব বাবু কাহাকে-কাহাকেও মোচা বা খোড় দিয়া আপাদ্যিত করিতে থাকেন।

তিনি কলাগাছের মায়ে মায়ে কলমের আম ও লিচুগাছ বসাইয়াছিলেন, অনেকে সতৃফনরনে তাহা লম্বা করিত; ভূদেব বাবু অনেকের নিকট গাছের ও ফলের বর্ণনা করিতেন, স্পষ্ট করিয়া গোলাপ জাম, তেজপাতা, বগড়া প্রভৃতি গাছও তিনি লাগাইয়া ছিলেন, বিভিন্ন প্রকারের ফুলগাছও তিনি পাড়ের এককোণে স্থান দেন; দূর্গাষ্টমী ও অনন্ত চতুর্দশী ব্রতের সময় আটরকম ও চৌদরকম ফুলের আবশ্যক

হয়, সকল গ্রামে আটরকম ও চৌদরকম ফুল সহজে মিলে না, তাই দূর দূরান্তর হইতে ভূদেব বাবুর দীঘির বাগানে লোকে ফুল লইতে আসিত; ইহাতে আমাদের গ্রামের ভূদেব বাবু বিশেষ প্রতিষ্ঠান ও যশস্বী হইয়া উঠেন, অনেকে রাম বা যুগিষ্টরের ওপাবনী তাঁহার মধ্যে দেখিতে আরম্ভ করেন, আমরা কিন্তু এই সময় তাঁহার সংকল্পের চাপে মারা চাই।

৩

কথাটা তুলিয়াছি অনেক পূর্বে—ভূদেব বাবু আমাদের পুষ্করিণীটা কিনিবার প্রস্তাব করিলেই আমাদের মাথায় বজ্রপাত আরম্ভ হয়। আমরা ইহার কিছু পূর্বে ব্রীতে আরম্ভ করি, আমাদেরও তখন পর্যন্ত গ্রামের ক্ষেত্রের কেউকেটা ভূদেব বাবু দীঘির পাড়ের বাগানটা গুছাইয়া লইয়া স্থানে স্থানে কলা গাছ তুলিয়া আসি আলু দিতে আরম্ভ করেন, দীঘির জলের তাহার আবশ্যক হয়, তিনি দীঘির পাশের জমিতে জল দিতে আপত্তি তুলিতে থাকেন, তখন তাঁহার কথা—“জমিতে জল দিতে কার আনন্দ, তবে দেশ বিদেশ হইতে এতগুলি গাছপালা আমাদের গ্রামটীতে অনেক গ্রামের দুটি আকর্ষণ করিয়াছি, এই গাছগুলি রীচান আমার এখন পরম খদ্দ, ইহারা আমার সন্তানসদৃশ, গ্রামেরও গৌরব স্থল—বিশেষতঃ আম ও লিচু গাছের জন্ত আমি সর্ব্ব অর্পণ করিতে পারি! তোমরা যদি জলসেচনের জন্ত নাগিল কর, আমাদেরও বাধা হইয়া যোকদ্দমা করিতে হইবে, আমি স্বাক্ষী দিয়া প্রমাণ করিব, তোমরা সকলে আমার পক্ষোদ্ধার করিতে ও বাগান করিতে সম্মতি দিয়াছিলে, সম্মতি দেওয়ার অর্থই হইতেছে তোমরা আমার দীঘি হইতে জল লইবে না, ইহা গ্রামবাসীর পানীয় ও আমার বাগানের গাছ পালার লভ্য ব্যবহৃত হইবে।” এতগুলি কথা

বলিয়া ক্রুদ্ধবাবু শেষে মৃদুহাস্তে এই কথাগুলিও বলিতে পারেন, “আমি প্রমাণ করিব ত্রিহরি চক্র-বর্তী (আমার পিতা) যেমন মৃতের সংস্কারের জ্ঞান নিজের পুত্র হইতে এখন জ্ঞান দিতে সম্মত হইয়াছেন, তেমনই এইরূপ একটা মৌখিক মুক্তি ছিল যে আমি যখন দীঘির পুত্রগণ হইতে জল দেওয়া বন্ধ করিয়া, তখন তাঁহাদের পুত্র হইতে সর্বত্র জল দেওয়া হইবে; এতদর্শে পুত্রের জলাভাব হইলে তিনি আমার হস্তে পুত্রগণ উচিত মূল্য প্রত্যাশ করিবেন, আমি পুত্রগণকে ঝালাইয়া ও বাড়াইয়া সকল জমিতে জল দিবার ব্যবস্থা করিব।”

ক্রুদ্ধবাবুর এই কথা শুনিয়া আমার পিতার (গ্রামের ত্রিহরি চক্রবর্তী) মুখ একবারে বিবর্ণ হইয়া গেল, তিনি ক্রুদ্ধবাবুর মূগের উপর কিছু বলিলেন না, দীঘির পাড় কাঁপাইয়া নিজের চণ্ডী-মণ্ডপে চলিয়া আসিলেন, তাঁহার সহিত গ্রামের অনেকগুলি চাষীই: আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত হইল। ত্রিহরি চক্রবর্তী হতুম দিলেন, “ধাঁড়ু হইতে বাউরী আনাও, আমি নিজের আর্থেই পুত্রের কাটাইয়া দিব।” অবশ্য এই জিদ বন্ধায় করিতে আমার পিতা ক্ষণের বোঝা মাথায় করিলেন, এই ক্ষণের দায়ে আমাদের ঘরবাড়ী জমি ও সেই জ্বিদের পুত্রগণী সকলই নষ্ট হইয়া গিয়াছে—এক বৎসরের মধ্যেই স্বপ্নদাতা বাঁশপাড়ী করিয়া আমাদের সম্পত্তি নিলাম করাইয়া দেন, ক্রুদ্ধবাবুই বৈনাসী করিয়া তাহা ক্রয় করিয়া লন। স্বপ্নের বিষয়—বলিতে বাধ্য হইতেছি!—মোকদ্দমা চালাইবার সময়ে পিতা আমার মালেরিয়া জরে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি ইচ্ছা করিয়া আমাদের গির্জা পুত্রের জলপান করিতে আরম্ভ করেন, দীঘির জল পানও করতেন না, এইরূপ জল ও উদ্রাবের তাহার প্রাণত্যাগ হয়। আমি সেই সময় প্রবেশিকা

পরীকার উত্তীর্ণ হই, ইহার পরে হতাশার আমার মন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে, এক, এক পড়িলেও অহুতীর্ণ হই। মা ও ছোট বোন মাতুলগণ, বোনটীর বিবাহের জ্ঞান কিছু টাকা জমা হইতেছি—কিন্তু গ্রামের জ্ঞান বিশেষতঃ আমাদের সেই পুত্রটির জন্য প্রাণটা বড় কাঁদিয়া উঠে!

৪

আমার অন্তঃকরণ আমি আপনাদের নিকট স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছি—আপনারা অনায়াসেই স্মৃতিতে পারিতেছেন, গ্রামোন্নতির নামে নিঃস্বার্থ কথায়োজনের আঁজকাল যে চেষ্টা হইতেছে তাহাতে আমি আন্তরিক সহযোগিতা প্রকাশ করিতে পারি না, আমার সকল সময়েই সংশয় হয় উহার মধ্যে বোধহয় কোন বিরাট স্বার্থ আত্মগোপন করিয়া কাহার সর্বনাশ নাশন করিতে জর মিথ্যা-জাল বিস্তার করিতেছে। অবশ্য আমার বয়স অধিক নয় এবং অভিজ্ঞতাও অল্প, তজ্জন্ম কাহারও সহিত তর্ক করিতে ও কাহারও উৎসাহ ভঙ্গ করিতে আশ্চর্য্য ঘটনা হইতেই নাই—তথাপি আমি গ্রামে উন্নতির বিরুদ্ধে মনে মনে বিশেষভাবে সংগ্রাম করিয়া থাকি। আমি দুঃখী লইয়াছি, নিজের স্বার্থ রক্ষাও-বিস্তার করিয়া যদি গ্রামের কোন উন্নতি হয় হইতে পারে, কিন্তু নিঃস্বার্থপরতার প্রচার একেবারে ভাণ, উহা আমার কিছুতেই বিবাস্য হয় না।

একথা লোকের নিকট বলিতে আমার ভয় হয়, দেশসেবার প্রবল বচায় দেশ ভাগিয়া চলিয়াছে, এসময় এ কথা বলি কি করিয়া!

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় নন্দনপুরের সেই উপজ্ঞান হাজরা, যে এখন বহুমানের একজন বড় কল-ওয়াল (ধান), যে কংগ্রেসে সময় সময় হাজার হাজার টাকা দান করিয়া বহুমান জেলার প্রত্যেক গামায়া অবিবাসীর বিষয় উৎপাদন করিয়া থাকে,

দে দিন তাহার বাসায় প্রাণ খুলিয়া আমি এই কথা বলিবার সাহস অর্জন করি যে, “তোমরা সকলকেই হাত দিয়া বল দেখি, কোন্ স্বার্থের উদ্দেশ্যে তোমরা কংগ্রেসের নামে ও দেশসেবার নামে ঘন ঘন অর্থ-হুলি দিয়া লোককে বিমোহিত করিতেছ। ইহার মধ্যে ভ্রূবেব বাবুর ভ্রায় তোমাদের কোন স্বার্থ আছে কি না!”—আমার কথা শুনিয়া উপেনহাসিয়া উঠিল, এই হাসির মধ্যেও কিন্তু তাহার চোখের কোণে অশ্রু দেখা গিল—আমি বলিলাম,—“উপেন! তোর ঐ চোখের কোণের অশ্রু আমার কিছুতেই সহ্য হয় না, হেলবেলার ঠাট্টাগুলো তোর মনে আছে কি? সে সময় একদিন তোর চোখের কোণে জল দেখে আমি বিষয়াবিস্ময় হই, আমার ধাতে ধাতে তা’ এখনও বসে আছে।”

উপেন বলিল,—“না নরেশ, বেশী কথায় কাছ নাই—আজ আমি তোকে তুই বলেই সংগোধন করি—তোর কথাগুলোয় বা শিক্ষকের কথায় আমার মনো-কষ্ট হয় নাই, কিছুদিন আগে মালেরিয়া জরে আমার বেহেরে একটি বোন মারা যায়, তার কথা শ্রবণ হইলে আমার চোখে জল আসে! কিন্তু ভ্রূবেব বাবুর দীঘির বাঁধান ঘাটের লেখা পড়ে আমার চোখের প্রাণে পুত্রের পকেছারের প্রবল প্রতিজ্ঞা নিহিত হয়। এই প্রতিজ্ঞার ফলে আজ আমি ধনাঢ্য, কিন্তু জান কি আমি আমার গ্রামের একটি দীঘিরও পকেছার করিতে পারি নাই, একটা দীঘির অধ-আনা যার ভাগ আছে, সে কিছুতেই আমাকে দীঘি দিতে রাজী হয় নাই! ইহার প্রধান চক্রী গ্রামের জমিদার—আমি ধনে বড় হইয়াছি, প্রায় জমিদারের সমানে সমানে খাই, বোধহয় তজ্জন্ম ঐবাংগোদিত হয়ে তিনি আমার কার্যে বাধা দিয়েছেন। আমি তারপর কল্যাণ কি জান?—গ্রামে পোটা কত কোয়া কাটিয়েছি, পুত্রগুলো যাতে

লোকে পরিষ্কার করে তার জ্ঞান তাদিকে অহরোহ উপরোধ করি।”

ইহার জন্য আবার উপেনের বা বিপদ হইয়াছে তাহা শুনিয়া আমি বিশেষ আশ্চর্য্য হইলাম, তাহার কথাগুলি শুনাইয়া যাই। দেখি, স্বার্থপরতা ও নিঃস্বার্থপরতা চক্রের ন্যায় ঘুরিয়া চলিতেছে—যেদূর কার্যের পশ্চাতে কাল দেখিলাম স্বার্থপরতা, ঠিক সেইরূপ কার্যের পিছনে আঁজ দেখি নিঃস্বার্থপরতা। জুনিয়ায় ত বড় হিসাব করিয়াই চলিতে ও দেখিতে হয়।

৫

কথাগুলি বড় বেশী নহে—নন্দনপুর গ্রামের ছই অঙ্গ বহিয়া একটি ক্ষুদ্র খাল চলিয়া গিয়াছে, গ্রামের লোক আদর কুরিয়া তার নাম দিয়াছে ‘হুনন্দা’। হুনন্দা দশকোশ পশ্চিমের একটা হ্রদীয় দীঘির জল-সেচন স্থান হইতে বহির্গত হইয়াছে, তৎপরে মাঠের জলনিকাশী জলের সংযোগে সে ক্রমে ক্রমে একটি খাল বা ক্ষুদ্র নদীতে পরিণত হইয়াছে—অতিকষ্টে ফাটনময় পর্য্যন্ত স্থির স্থির করিয়া জল বহে। নন্দন পুরের চাষীরা উপেনের কথায় খালে একটি বাঁধ দেয়, এই বাঁধ দিবার ফলে খালে বেশ জল জমিয়া যায়, খালের ধারে অনেক জমিতে আক আন্ প্রভৃতির চাষ শুরু হয়, উপেন মহা-উৎসাহে চাষীদেরকে খোল বাঁধ প্রতৃতি দিয়া সাহায্য করে। ইহাতে উপেনের নাম ও মণ ঐ অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে।

দ্বিতীয় বৎসরে বর্ষার শেষে নন্দনপুরের চাষীরা বাঁধ দিতে আরম্ভ করে, সেই সময় তাহার খালের ধারে কতকগুলি ছোট ছোট অর্জুন গাছ কাটিয়া ফেলে। অর্জুন গাছ জমিদারের সম্পত্তি, খালটাও জমিদারের, এই বৎসর জমিদার আপজিত তাদেনে, “আমার হুকুম লইয়া বাঁধ বাঁধা হয় নাই কেন, তাদেনে, “আমার হুকুম লইয়া বাঁধ কাটিয়া দিব।”

ইহাত হইল তাহার কথা ও আপত্তি। এমিকে কতকগুলি অস্ত্র (বর্তমান ভাষায় অস্ত্রশস্ত্রে) তিনি উত্তেজিত করেন, তাহারিগকে নিষাহতা বেন, "তোরা উপেন বাবু সদরে গিয়া তাহার প্রতি কটু-ভাষা ব্যবহার করিবি, স্ত্রীলোকের প্রতিও অবমান সূচক ভাষা প্রয়োগ করিবি, সেখানে গিয়া বলিবি 'আমরা অর্জুন গাঁহী জমা গয়েছি তুই—তাহা কাটিনি কেন?'"

অস্ত্রাঙ্গতা নন্দনপুরের অধিবাসী নহে, তাহার পার্শ্ববর্তী গ্রামে বাস করিয়া থাকে, তাহার অশস্ত্র উপেনের সম্বন্ধে আসিয়া কোন কথা বলিতে সাহসী হয় নাই; একদিন উপেন একটা চাকর লইয়া বর্দ্ধমান আসিতেছিল, মাঠে তাহার উপেনকে সত্য সত্যই অপমান করে। উপেন তাহার চাকরকে প্রতিশোধ লইতে নিষেধ করিয়াছিল।

উপেন এখন সর্বভাগী সমাদৌর মত বাস করি-

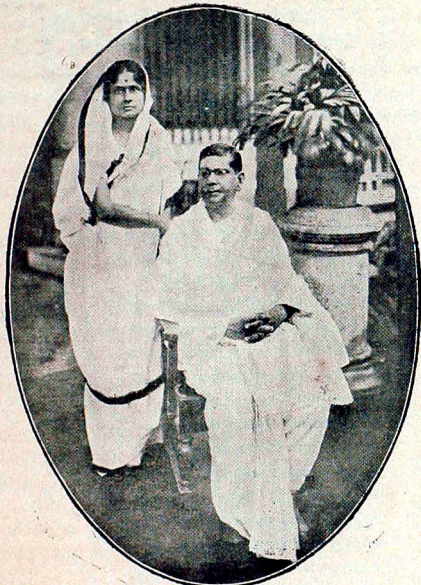
তেছে—তাহার একান্ত ইচ্ছা, দেশের প্রত্যেক লোক তাহার স্বার্থ বুঝিয়াই চলুক, কিন্তু তাহার পদের স্বার্থ ও পদের মান অপহরণ করিয়া সংসারে খ্যাতি বা অখ্যাতির মাগা ছলাইয়া চণিতেছে, দেশের প্রত্যেক ব্যক্তি যেন সেই সব যশবীরী (১) বা নিদৃশককে উত্তম-রূপে চিনিয়া লইয়া তাহাদের নিজ নিজ স্বার্থ বজায় রাখিতে পারে—এই সার্কসনীর স্বার্থরক্ষার সুখেন্দো-বস্ত্রের লব্ধ উপেন অস্বপ্নে যথেষ্ট অর্থ অর্জন করিয়া দেশে সার্কসনীর জ্ঞানবিস্তারের জন্ত কখনও কংগ্রেসের হস্তে কখনও বা অন্য কোন প্রচার সমিতির হস্তে রাশি রাশি অর্থ প্রদান করিতেছে। সে যেন আমার এই শশরচিত্ততা দূর হইলে আমাকে সে তার নিজস্ব প্রচারকার্যে ব্রতী করিবে। আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, সে হস্তান্তর, আমার অপেক্ষা তাহার অধঃকরণ কত গভীর কত সমৃদ্ধ—কোন ভিনিবই তাহার নিকট অপরিগ্রাহ্য থাকে না, ধন্য উপেন!

দেশবন্ধু-স্মৃতি-তর্পণ

“চিত্তরঞ্জন”

লেখক—শ্রীশ্রী মুখোপাধ্যায় এন্. এ।

ভারত মাতার চিত্তরঞ্জন! কোলের আলো হে মহাসন্তান, অর্ধগনীর বুকের পিছর—কোথা আঁজি করিলে শয়ান! অমাত্যবে শীর্ণকায়া বর বিনা কাশ্মিনী উলকিনী-প্রায় তঁল বিনা কক্ষকেশ সোনার বেহ প্লিতে লুটায়, ত্রিশ কোটি-বৃত্তান্ত অঙ্গার সন্তান জননী রিক্ততার নয়নায় রাজগণী হায়! ধ্বংস ভিখারিণী! বড় সাধে ভারত মাতা নিছের শেষ বন্ধ রক্ত দিয়ে হৃৎ তুমি করিবে দুঃ—হে আশাটা সন্ধ্যাপনে নিয়ে যোগ্য করি জুলেছিল তোমা গণো অজ্ঞের নয়ন; সে আশা চূর্ণ করি গেলে চলে হে চিত্তরঞ্জন! ইত্যর বাখায় আজি অলিছে যে মায়ের পরাণ—অক্ষ-প্রপাত বেগে উঠে আজ তবু হ'নয়ান—সে শোকের ভাষা নাই আছে শুধু তবু কাতরতা অশ্রি-পিরির পর্বে বহি বাহিরেতে যেমন নীরবতা! কত গুনের গুণী ছিলে হে সমাদৌ গণো বন্ধবীর! সুখী ছিলে করি ছিলে সর্বভাগী ছিলে হে সুখীর! সব চেয়ে বড় ছিলে অন্তরের উদারতা প্রসারতা নিয়ে দেশমাতার অর্জুনাদ অহনিশি তব প্রাণ ফেলেছিল ছেয়ে, আগ্রতের ধ্যান জ্ঞান সুস্থির পদ হ'য়ে যেই বাখা হ'ল সর্বজয়ী জননীর হৃৎ প্রাণের মরণে তিলে তিলে করিলে বরণ গণো সত্যশ্রী! যুগা আজি হ'ল যুগীয় শিরে ধরি তোমা হেন পুরুষ রতন, ভারতমাতার বকে আজি অকস্মাৎ হ'ল যে গো অশনি-পতন!



সদীক চিত্তরঞ্জন

মহাপ্রয়াণ

—৩০—

দেশবন্ধু তিরোদানে বাঙ্গালী মর্মান্বিত—মর্শের উঠিয়াছে—বেদনা যতই অধিক হউক, তাঃ হাঃ রব
বিশ্বব আঘাতে চাণ্ডিক হায়-হায় শব্দে পূর্ণ হইয়া যতই ক্ষুদ্র বিদারক হউক বাঙ্গালী অন্তরের মধ্যে

বেন নুতন বলের সন্ধান পাইয়াছে—দেশবন্ধু বাহার
মনা সর্ব্বপূর্ণ অর্পণ করিয়াছিলেন, বাহার প্রেংগায়
তিনি আত্মহারা—বখাৰ তাঁর আত্মলয়—স্বদেশের
দেই অমর আত্মা আত্ম কর্ণকের তরে বাঙ্গালীকে
সজীবিত করিয়াছে। এই সজীবনী স্বপ্না অক্ষুণ্ণ
ধারায় বহে না—দেশবাসীর গভী দেহা কুহু অন্তঃ-
করণ স্বদেশীর মর্ম্ম কণে কণে ভুলিয়া যায়, দুলে দুলে
বিভক্ত হইয়া “স্বদেশী” গণ এ সময় যে হ্রাসময়ের সৃষ্টি
করেন, তাহাতে প্রাণপাতই সত্য স্বদেশীর একমাত্র
কাৰ্য্য; অন্য উপায়ে বোধহয় প্রাণের পীযুষধারা দেশকে
নিরাময় করে না! জিনি—স্বরাজের পথে অগ্র-
সর হইয়া দেখাবাদী যে বিকৃত ও অপদার্থ মনের
পরিচয় কিছুদিন ধরিয়া প্রদান করিতেছিলেন, তাহাই
বিস্তারিত পণিত হইয়া দেশবন্ধুর অন্তঃকরণ বিকল
করিল কি না!

সত্যই বঙ্গবাসী শ্রেষ্ঠ স্বদেশসারক ও মহাপ্রাণ
জননায়ক—প্রতি চিরকাল অবিকার করিয়া
আনিয়াছে—দেশবাসী মৃতের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞান অর্পণ
করে, কিন্তু জানি উচিত একান্ত আত্মীয় বোধ বাহার
প্রতি না জন্মিয়াছে তাহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাভরণ হয়
কি! আমি আর পুণ্যতন কথার অবতারণা করিব
না—আমী বিবেকানন্দেও প্রতি আনন্ড শ্রদ্ধাজ্ঞান অর্পণ
করি, স্বদেশী যুগের কুহুকেসরক যুবকদিগের প্রতি
আমরা স্ববয়স গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকি,
কিন্তু তাহাদের তেজস্বিতা ও ক্ষয়বহতা যেন দিন
দিন আমাদের নিকট হইতে দূরে ও অতীতের
দূরীয়া চলিতেছে। তাহাদের তেজস্বিতা ও স্বয়ং-
বতার সতিত বাঙ্গালীর ঘনি এতটুকু সামিধ্য ঘটিয়া
থাকিত, তাহা হইলে যে সময় স্বরাজের পথে সাধু
চিত্তরঞ্জন জীবনের সকল ঐক্য বিসর্জন দিয়া এক
মাত্র তাঁর চেতনায় অন্তঃকরণ ও বিশাল জোছনয় লইয়া

গভর্ণমেন্ট কাউন্সিলে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ আশ্রয়ান হইরাছিলেন,
সে সময় কত, কিছু ছল ধরিয়া দেশের পুরাতন ও
নবীন স্বদেশী ও অসহযোগী কি তাঁহাকে এইরূপে
বিরত করিবার চেষ্টা করি অর্জন করিতে পারিতেন।
সত্যই তাঁহার প্রতি কণ্ঠে অশ্রুত প্রেংগায়ের
অপভাষা বিস্তার করিয়া প্রত্যেক সজ্ঞান ব্যক্তির
অন্তঃকরণে তাঁহার আন্যায়রূপে বখার সঞ্চার করিয়া
ছিলেন। গোণীনাথের প্রস্তাব উপলক্ষে এমন মনের ও
প্রকাশ হইয়াছিল যে, তাহারা চিত্তরঞ্জনকে গভর্ণমেন্ট
কর্তৃক দেশকর্ম্ম হইতে অপসারিত করিতে পারিলে
যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া উঠিতেন। যাক সে সব
পুণ্যতন কথা, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সবচে বাঙ্গালার কোঁঠি
দেখিয়া লাগা লক্ষণত্বয়ের দীর্ঘাঙ্গ ও মহাআচার
হতাশাস্ত্র দ্বরণ করিয়া দেশবাসীর যে ক্রটিও কথা
স্বরূপ হইল, মৃতের নিকট—পরার মহাপ্রাণ এই
অতিথির নিকট সেই সব ক্রটি একান্ত মনে স্বীকার
করিয়া মনে হয় যেন বঙ্গবাসী একটা শক্তির সন্ধান
পাইয়াছে—আজ এই যে চারিদিকে হাফাকার, ইহার
মধ্যে প্রত্যেক বাঙ্গালীর ও প্রত্যেক ভারতবাসীর
অন্তরাত্মা তাহার মনপ্রাণের অন্তর ও আন্যার কোঁঠি
জনা সত্যই একটা গভীর জটা স্বীকার করিয়া নিঃ-
দিগের মনের ও প্রাণের ময়লা পরিবর্তিত করিতেছে
—ইহা জানাজানির ভিতর না হইলেও ইহার মধ্যে
আন্তরিক ক্রটি স্বীকার স্থান পাইয়া বাঙ্গালীর ধাতুক
নুতন বলে বলীয়ান করিতেছে—কিন্তু বাঙ্গালী কি
এই শক্তি চিরকাল সঞ্চারিত রাখিতে পারিবে?

কে আর বাঙ্গালীর সংসার ছাড়িয়া মহাপ্রাণে
গমন করিলেন তাহা যদি আমরা স্মৃতিতে পারি, যিনি
আজ স্বার্থত্যাগ ও অহং-ত্যাগের বিরতি ভূমিতে স্বরাজ
সঙ্কল্প বীজ বপন পূর্ব্বক নিজের মহাতীর্থে গমন
করিয়া তাঁর অপতাদিগের কার্য্যকলাপ লক্ষ করিবার

কল্প সঙ্গীত সাগ্রহণী নিম্পন্ন করিতেছেন তাঁহাকে যদি আমরা জানিতে পারি, আর যদি আমরা বুঝিতে পারি দেশবন্ধু আমার পরম আত্মীয়, আমারই পূর্বপুরুষ, পূর্বপুরুষের সঙ্গসঙ্গদান আমারই কার্য, তাহা হইলে দেশবন্ধুর মহাপ্রাণের বাগদার পুণ্ড্রবাক্য আগরণের শিরশ্বেদে আজ যে দ্বিগুণ উঠিতেছে তাহা আর শক্তি হিলাগাঢ়াবে কখনও নিস্তরঙ্গ হইবে না—আজ এই জ্ঞানের ভূমিতে বাগদারী উদ্রোত হইতে পারিবে কি?—তাহা হইলে শক্তি তোমার অক্ষুণ্ণ হইবে—তাহা হইলে বদেদপ্রেমের প্রেমহিলাগা বিজয়তাকা ধারণ করিয়া প্রত্যেক বদেদীর বিদগ্ধ অঙ্করণে অনন্ত শক্তি প্রদান করিবে। দেশবন্ধুকে জানার উপরেই বাগদার শক্তিমত্তা নির্ভর করিতেছে।

দেশবন্ধু 'দেশবন্ধু' হইবার পূর্বে মহাপ্রাণ চিত্ত-রঞ্জন রূপে বাঙ্গালীর নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন; মহাপ্রাণ বিশেষ চিত্তরঞ্জনকে পূর্বরূপে বিশেষিত করিত, চিত্তরঞ্জন বিলাত প্রবাসকালে ছাত্রাবস্থা হইতেই একজন দেশপাণ কণ্ঠী, বঙ্গেশ্বরীর প্রথম অবস্থাতেই তিনি নূতন মনের একজন নেতৃপুংগব, কিন্তু তাঁহার মহাপ্রাণতা দেশমন্ডা প্রতিষ্ঠিত হইল যে দিন তিনি শ্রীঅরবিন্দের মোক্ষদ্বার বিনা-পারিশ্রমিক নিমুক্ত হইয়া অতি সহজানো তাঁহাকে আলিপূরের মধ্যস্থ মোক্ষদ্বার হইতে মুক্ত করিয়া দেশের প্রিয়প্রাণ হইয়া উঠিলেন; তখন শ্রীঅরবিন্দই সকলের "হে বন্ধু হে দেশবন্ধু", এই মোক্ষদ্বার পরে শ্রীঅরবিন্দ বলিতে হইলেনই মহাপ্রাণ চিত্তরঞ্জনের চির একান্ত কৃতজ্ঞভাষা অস্ত্রকরণে প্রতিফলিত হইয়া উঠিত। এই উপলক্ষে আমরা সকলে তাঁহার ত্যাগবন্দে প্রীতি প্রকৃতি ওপর্যায় অহুত্বানো বাপুত হইতাম, কিন্তু তিনি সরল বুদ্ধীতির পূণ্য পরশটুকু

দ্বয়ে ধরিয়া গভীর শ্রদ্ধা আতি-গুরু অরবিন্দের মুক্তি-কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া নিজকে ধন্য করিয়াছিলেন। আর কাল কোন কোন পুরাতন নেতৃ-পুংগব দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে নেতৃব্রতপ্রায়ী অহঙ্কারী জোড়পদ প্রণাণ করিতে কৃতজ্ঞ হইয়াছিলেন, তাঁহার বোধহয় নিজদিগের অহঙ্কারের পরিচয় এই সরল কথার দ্বারা করিতেন, কিন্তু দেশবন্ধু প্রথম হইতেই প্রীতির ওপরে প্রেমের পরম-আশায় সকল কার্য করিয়া বাইতেন—প্রতি কার্যে। তাঁহার বিরাট অস্ত্রকরণ পুণ্য শিরশ্বেদে নাতিয়া উঠিত, তিনি এই-রূপে সঙ্গ দ্বয়টি পেম ও পরাধীনতা! প্রত্যক্ষ



শ্রীঅরবিন্দ

স্পর্শগতে এমন পরিপূর্ণ করিয়া ভূগিয়াছিলেন যে আজ মহাপ্রাণের সময় সে-দ্বয়ের সহিত বোধহয় আর কোন বঙ্গদ্বয়ের তুলনাই হয় না। এই দ্বয়ের দ্বারে প্রথমাবস্থায় বদ্ধপ্রীতি অতি পরিচিতের তাহ বিমনসনে প্রবেশ পূর্বক নব নব অহুত্বানো তাঁহাকে এক নূতন মানসে পরিবর্তিত করিতেছিল।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বাঙ্গালীর মধ্যে এক নূতন মানব, এই মানব তাঁহার চল চল অঙ্গকরণ লইয়া বঙ্গসমাজে প্রীতিপুংগব নিজমধ্যে যে রূপচক্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই শেষে "চিত্ত"কে সকলের নিকট fascinating চিত্তরঞ্জনরূপে পরিণত করে। চিত্তরঞ্জন বাহ্যিকই সমক্ষে পাইতেন, প্রীতির মুষ্টি-রূপে তাহাকে আলিঙ্গন করিতেন, তজ্জন্ম যে কেহ সমুখে আসিয়া বাহ্যিক প্রাণনা করিয়াছে, তখনই তাহা পূর্ণ করিবার জ্ঞাত তিনি বাতিবাস্ত হইয়া উঠিতেন, কেননা ইহা না করিলে তাঁহার প্রেমময় স্বরূপেরই যেন বিমর্ষভরে তাঁহার অস্থির ভাঙ্গিয়া দিত। দ্বয়ের এই তাৎপর্যটুকু গ্রহণ করা আমাদের সকলের ভাণ্ডা বটে নাই, এই দ্বয়ের প্রেমতরঙ্গ অক্ষুর রাবিবার জ্ঞাত তাঁহার গাণ সর্বশ্ব পণ করিয়া তাঁহার মহাশয় পরিচয় দিয়াছে—এইরূপে চিত্তরঞ্জন যেন মহাপ্রাণতার বীজ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাই বিরাট অর্থক মুখে পরিণত হইয়া বাঙ্গালীকে অশ্রুচোঁচা করিয়া ভূগিয়াছে—পরপাশ্চাত্য আভি প্রাণ বড় সমুচিত হয়, কিন্তু চিত্তরঞ্জন মহাপ্রাণের ব্যর্থনায় নিজকে ও দেশকে নূতন পথের সন্ধান নিয়োজিত করিয়াছে—ইহাই বুদ্ধি তাঁহার প্রথম ও প্রধান মুক্তি-বার্তা 'দেশ যদি মহাপ্রাণ না হয়, তাহাই হইলে দেশ বন্ধন মুক্তি বা স্বাধীনতাতে কৃতকাণ্ড হইবে না'—মহাপ্রাণ চিত্তরঞ্জন হইতে মহাপ্রাণ হইবার দীক্ষা যদি দেশ গ্রহণ করে, তাহাই হইলে তাঁহার প্রতি প্রজ্ঞাগুলি প্রদানের মর্মে আমরা গ্রহণ করিতে পারি। দেশবাণী প্রত্যেক ব্যক্তিকে অতি প্রজ্ঞার চক্ষে—অতি প্রীতির চক্ষে দেখিয়া তাঁহার সমগ্র দোষ দ্বয় পাতিয়া গ্রহণ পূর্বক তাঁহার গুণবাণী প্রকৃতি করিবার একান্ত অস্থির-নিবেদনই বদেদভক্ত মহাপ্রাণ ব্যক্তির একমাত্র কার্য—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বশী জীবনে এই মহাপ্রাণের

প্রতিষ্ঠা বহিন্দে কি? নাচে দেশের মুক্তি যে অন্তর!

আমরা দেখিয়াছি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের চিত্ত প্রেম-প্রীতি অন্ত হিলাগা বহিয়া বাইলেও তাঁহার অন্ত-তলে এক বিদ্যাবর্ণ প্রতিজ্ঞা সকল সময়েই বিরাজ করিত—প্রথমমুখে পিতৃপণ উদ্ধারের তীর প্রতিজ্ঞা অতিসদোপানে নিমিত্ত করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ হইয়া তাঁহার মহাপ্রাণ আরও উৎকল হইয়া উঠে। তিনি চিরজীবন উদার ও মহৎ—মহৎ ও বিরাটের উপগম্যই তাঁহার জীবনের ধর্ম, কিন্তু তাঁহার সকল মহৎ ও বিরাট দেশপ্রীতিরূপে পূজিত হইয়া উঠিয়াছিল। পিতৃপণ গরিমাশাঙে তাঁহার মহাপ্রাণ বিদগ্ধ উল্লাসে দেশের বৈশিষ্ট্য ও ধর্ম পরিজ্ঞাত হইতে তাঁহার মহাপ্রাণ যে বিরাট আয়োজনের সময়ে জীবন-উৎসর্গে তরিয়া উঠিতেছিল তাহ প্রকাশ পায় তাঁর "নারায়ণ" পত্র—সাহিত্যে ও জাতীয়তায় বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যে জীবন-সাধনা তিনি প্রবর্তিত করিতে আগ্রহান হন, তাহার সহিত বিপিনচন্দ্রের তখন বেশ একটা অঙ্গাঙ্গী সংযোগ ছিল, কিন্তু তা' বিন্যাস হীরক কখন ভাষ্যাদিত হয় না, এসময় তিনি বিপিনচন্দ্রের উত্তরমাধকরূপে গণ্য হইলেও তাঁহার মধ্যে বাঙ্গালী এক নূতন শক্তিরহিলাগ তখন হইতেই অহুত্ব হয়—অনেকে বলিতে থাকেন চিত্তরঞ্জন, রবীন্দ্রনাথ হুয়েন্দ্রনাথ প্রভৃতির আসন অধিকার-আশায় অহুত্ব বায় করিতেছেন, কিন্তু মর্দী বাহারা তাহারা বুঝিতেছিল চিত্তরঞ্জন "বদেদী" হইবার নবায়োজনে প্রমত্ত হইয়াছে—বদেদীর জ্ঞাত এই পাণ্ডাকে আমরা পরে প্রাসাদ বিলাইয়া কুটীর-বাগী হইতে দেখিয়াছি, এইরূপ পাণ্ড-হুওয়া বদেদী বাঙ্গালীর বিরল, ইহা মহাপ্রাণের প্রতিষ্ঠার উপরই সম্ভব হইতে পারে, ইহা অবিদ্যার প্রেমতরঙ্গে

হিঙ্গালিত বিনয় স্বপ্নে-সমুদ্রে উদ্ভাসিত হইতে পারে, এরূপ স্বপ্নেই হওয়ার বীজ তখন চিত্তরঞ্জন দ্বন্দ্ব ভরিয়া ও প্রাণ গুরিয়া গ্রহণ করিতেছিলেন—সাহিত্যে ও জাতীয়তায় বাঙালীর বৈশিষ্ট্য উদ্ভাৱে তখন তিনি প্রাণেণ চেষ্টা করিতে ছিলেন, বাঙালী জাতির সহস্র-মলে যে ভাব-মানসিক সাধনা সাহিত্য ও জাতীয় জীবনে আভা বিস্তার করিয়া এখনও তাহাকে প্রতিভালোকে সজীবিত রাখিয়াছে, সেই প্রতিভাপুঙ্খ ভেদে কবিবার ক্ষুদ্রত প্রকাশ আত্মা তাহার মধ্যে লক্ষ্য করি—এখন হইবেই তিনি বিশেষভাবে জাতীয় প্রতিভাশীমণ্ডিত হইয়া উঠেন, তাহার সূক্ষ্ম ও দৃষ্টিপূর্ণ বুদ্ধির সহিত এই প্রতিভাপুঙ্খ সম্বন্ধিত হইয়া তাহাকে যে আত্মা কবির স্তায় সত্যই মনোহর ও গভীরমন অবস্থার সমুদ্র আগনে স্রুতিপ্তি করিতেছিল, তাহা এখন আর কাহারও নিকট অপরিস্ফুট থাকিলে চলিবে না—আমাদের জাতীয় জ্ঞান চইতে ইহা দূরে সরিয়া যাইলে আমরা শক্তিশূন্য পল্লু হইয়া পড়িব।

‘তেন তাক্তেন ত্বীপা’—সর্বশব্দ ভাণের ভিতর দিয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সর্বশব্দ মহত্তর প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, ইহা তিনি দেশের অজ গুণিগুণে ভোগ করিয়াছেন—যতদিন তিনি সাধক, যতদিন তিনি গৃহ ছাড়িয়া, কর্ণবন্ধন মুক্ত হইয়া দেশের উজ্জ্বল স্রাস্তরে সমাধীন হন নাই, ততদিন যেন কতক পরিমাণে ব্যক্তিগত আবেগের মধ্যে তাহার মহাপ্রাণ বিশাল ক্ষুদ্র ও সহস্রবল-বিস্তারী প্রতিষ্ঠা পুষ্ট হইয়া পরিষ্কট হইতেছিল—মহাশক্তি পক্ষীর স্পর্শে সর্বল বন্ধন মুক্ত হইয়া যেদিন দেশবন্ধু দেশের দ্বারে আঘাত দিলেন, সেদিন সকলেরই স্বপ্নোৎপত্তি হইল—দ্বার চাপিয়া এই যে বিশাল শক্তি বাঙালীকে মহত্তর পথে চলিতে

চাহ তাহার কিন্তু আমরা সম্যক পূজা করিতে পারি নাই—পূজা কবিবার শক্তি আমাদের ভাণে থাকে নাই—যে কল্পনায় যুবক তাহার গুণেতে হইয়া তাহাকে নিরিখা ছিলেন, তাহা হইয়া বরাহ পঙ্কজগে কোনরূপে চিত্তরঞ্জনের চিত্তে শাশ্বি প্রদান করিয়াছে—সমগ্রদেশ দেশবন্ধুর মহাজীতির প্রতিদান দিতে সক্ষম হয় নাই।

আম্র দেশপ্রাণ মহাপ্রাণের পথ শেষ করিয়া অন্তর্যামে সমুৎখিত—তাঁহার সমগ্র জীবনের পক্ষাতে যে সকল অগ্নি উদ্ভিগ্নাছিল, তাহাকে কেহ প্রশংসিত করিতে পারিবে না, কিন্তু তাগা বকে ধারণ কবিবার গৌরব কই? এক প্রশ্ন তাঁহারও মনে জাগিয়াছিল, তিনি যুবক ও যৌবুর মধ্যে সেই অগ্নিচোদ্ভী চরিত্রের সম্মান পান নাই, তজ্জন্য স্থানে স্থানে তপোবন সৃষ্টি করিয়া বালক চরিত্রে মহাবীর্য উদ্দেশ্যে ব্যৱস্থার তিনি বিশেষভাবে চিন্তা করিতে-ছিলেন।

তবে তিনি মৈনিক রূপেই প্রাণযোগ করিয়াছেন, স্বরাঙ্কয়ে যোমাননে তিনি আত্মাভ্যন্তর প্রবাহ করিয়া ছেন, এই অগ্নির আলোকপাতে দেশবন্ধুর অন্তর মধ্যম মহায় বদি আমরা উজ্জ্বল করিতে পারি, সেই মহায় দ্বন্দ্বের ধারণ কবিবার সাধনা বদি আমরা গ্রহণ করি, তাহা হইলে দেশবন্ধুর প্রতি প্রজ্ঞাগুলি প্রাণে আত্মা যে দ্বন্দ্বের বল পাইতেছি, তাহা চিত্তমিন অঙ্গুর থাকিবে—শক্তিকে অঙ্গুর না করিলে সকল আশাই বিফল, তজ্জন্য দেশবাসী! দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রতি প্রজ্ঞাগুলি অর্পণের সহিত তাঁহার সত্য পরিসর গ্রহণের জন্য মহা-সকল গ্রহণ করুন। স্বরাকের জন্য নান্য গতি অন্যান্য।

দেশবন্ধু তর্পণে

—

চিত্তরঞ্জন গিয়াছেন, আর জাতি শুধু তাঁর স্মৃতি ও আশীর্ষদের অবিকারী। চিত্তরঞ্জনের দেওনা জাতি সার্থক করিবে কি না, করিতে পারিবে কি না, জানি না। তাঁর জীবন ভরিয়া যে বাকী মুষ্টি হইয়াছিল, সে বাকী দেশের মহাবীরনে বিশাল ও উদার অঙ্গগৌরব ছুটিবে কি না—এ সব আর ভবিষ্যতের গর্ভে—অন্ধ তমাজ্জর। সেই নির্বিড় তিমিরজাল উদ্ভিন্ন করিয়া, ভবিষ্যৎ আপনি আপনাকে স্রুত করিয়া তুলুক—সহস্র বিপদ, সহস্র স্বপ্না তুলান বিদারণ করিয়া, আপনার সিদ্ধি পথে ছুটুক—

তাঁহারই চরিত্রের আদর্শে তাঁহারই জীবনের মহিমায়, ভাণের অর্পণ দীপ্ত কিরণছায়া জাতীয় সমষ্টি জীবন সমুজ্জ্বল হউক, গৌরবযুক্ত হউক—এই আশা, এই উদ্দেশ্য কম্পিত হুক বকে, জাতির দ্বন্দ্ব-শোণিত স্পন্দিত হউক, ধর্মমতে ধর্মমতে তর-তর ধরতর তরঙ্গ নব প্রেরণা সন্ধানিত, উজ্জ্বলিত হউক—কিন্তু চিত্তরঞ্জনের সিদ্ধ স্বরঞ্জন বীরমুষ্টি আর ত দেখিবে না, তাঁহার স্মরণপ্রাণে বিভ্রাজিত সন্ধানিগি অবগামদ্বারীরা সিংহকণ্ঠে অজ্ঞানতার আর ত জনিব না—তাঁর স্মৃত পদাঙ্ক ভরা, অন্ধকারে তিনি আলোকবিকারীকরী অবন্য অন্তরবিধাণ ও ভগবদ্রক্ততার বল, জাতি ত উদ্ভাব্য বাহুল হইয়াও তাঁর স্মৃতি চাহিয়া পাইবে না, নবোৎসাহ উৎসাহমুগ্ধ, গভীর নৈরাঙ্ক নৃতন আশা ও অন্তঃস্বাভাব্য সন্তানবীর পরম পাইয়া উজ্জ্বল দুর্ঘম পথে—অবগামী হইতে পারিবে না!—এই ত

দ্বন্দ্ব, আর এ দ্বন্দ্বের বিষময় মন্দাহত ত বুড়িবার নয়!

চিত্তরঞ্জনকে জাতি আত্ম চিনিরাছ কি? সেই মহাপ্রাণ, যিনি মহাদাতার বংশে দাতাকণের বীজ লইয়া স্রাজ্জল করিয়াছিলেন—যিনি জীবনের তরুণ উদায় রামচন্দ্রের স্তায়, পিতৃকৃত মহাপ্রাণের মহাতার শেখার শিরে তুলিয়া, এ যুগে পিতৃসত্যের মধ্যাদা রক্ষা করার অনন্তোজ্জ্বল উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন—যিনি তর্কের প্রপাত, ভাণের সিদ্ধ মনন করিয়া, বিপক ভাববিধারদের দুর্ভক্তিক্রম জেনেচু পুট হইতে দেশের জীবনমনিকে সগৌরবে দ্বিগাইয়া আনিয়াছিলেন সেই মহাতাগী, যিনি একটি মুহুর্তের শুভ প্রেরণার, অন্যতরসিদ্ধ দেশওকর আহ্বানে দেশমাতারই প্রাণের ডাক স্নানিতে পাইয়া, বৃদ্ধের স্তায় নৈর্দেখতা ডালি দিয়া পাড়াইলেন—থাকিল পড়িয়া বিপাদের স্বপ্নাশা, স্বপ্নাঙ্কিত ইন্দ্রবন, কবিবীর রসকুঞ্জ রাষ্ট্র-ভাণের আশ্রমে গণিত হইল—সেই মহাবীর, বীর মুহুর্তে কোণেও টকাবে, এক একটা স্বপ্নের গুহ শব্দ ও কর্তৃক উভয়ের স্বকল্প সৃষ্টি করিয়া জুগিত, কোথা হইতে এ ব্রহ্মসংগ তিনি সক্ষম করিলেন, এ বীর্যবান আশ্রয়প্রায় ও সর্বব্যাপ্য হিমশরীর একাকিন্দে বিবর শক্তি লাভ করিলেন, নোকে যার আভ্রও হুগ কিনারা খুঁজিয়া পাইল না—যিনি একেবারে সহস্র বিপকের সঙ্গে মুন্সিলেন, যিনি গুহ মীন বড়বরকারীর অস্বপ্ন স্বপ্না কলহস্তে সহস্রবার মুখিয়া প্রাণ করিলেন—তিনি

অকলঙ্ক, চরিত্রে দুর্ভিক্ষে দোষ বস্ত্রের ভ্রাম্য অমান, চিরন্তন বিমগিরির ভ্রাম্য উদার, উন্নতচিত্ত, ধল কণ্ঠ ভণ্ড বিধানিক্তর দলের ছায়াপাত ও তাঁহাকে স্পর্শ করে না—সেই মহাত্মা, যিনি দেশদান, দেশপ্রাণ, কবির ভাববৃষ্টি, মনীষীর চিন্তাশক্তি, ভক্তের আকুল হৃদয়ের একধারা অবিকারী হইয়া কর্মীর বজ্রাঘাত ও সঙ্গে সঙ্গে পাইয়াছিলেন ও তাহা দেশমাতার কার্যোদ্ধারে নিয়োগ করিয়াছিলেন, নিজের লাভ কতি গণেন নাই, ক্ষুদ্র স্বার্থ হিংসাবুদ্ধির অন্ধ কথাকবির দ্বার ধারণে নাই, পরন্তু আপনগণের আকুল বোধের মতের মর্মভেদনাকেই অধিনিশি প্রতিফলিত করিয়া তুলিয়াছেন—বুঝি অমৃত্যব করিয়াছি, মায়ের সহিত তিনি একাঙ্ঘই হইয়াছিলেন—বিনি বাঙ্গালীর সত্যই দেশবন্ধু, দেশ-বিগ্রহ, দেশ-প্রীতির প্রত্যক্ষ নিষ্ঠুর, বাংলার রূপরং-প্রাপ্তের জাগ্রত উপাসনা, সাফাং ভক্তিপ্রতিমা ছিলেন—তাঁহাকে বাঙ্গালী স্মরণ কর, মৃত্ত মহিমা প্রশংসা কর—সমস্বার কর, নমস্কার কর, তাঁর স্মরণচরীর চিত্রাঙ্কনের শেষ ধ্বংস হইয়াছে, তাঁরই আশীর্ব্বত্যা বাংলার ঘরে ঘরে, সারা জাতির জীবনধারিতে অথবা অমৃত্যবের মণিকোটায় তুলিয়া রাখ।

বেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন—সত্যই বাঙ্গালীর কাছে আবার নতুন করিয়া গোমার জীবনপরিচয় কি দিব? কৃষি যে বাঙ্গালী ছিল, জীবনের কষ্টসাধ্যের কবিদা, নাকিরা, কত রকমে ব্যাটী করিয়া দেখিলে ও দেখাইলে সাহেবী বোনা, সাহেবী নিকা দীকা, সাহেবী বিগাণ সাধনার ঘোঁচাকচিকো কাখন-কৌণীতে তোমার ভূগাইতে পারে না, বাঙ্গালীর আসল প্রাণ কখনো মরেই না, আশ্চর্য্যবস্ত বাঙ্গালী জাতির হইয়া, পরকণী রাই-সাধনার মোহবিহার জড়িতে বহর সকল অভিলাষের গুচ্ছগাণ আপন

মতকে তুলিয়া লইলে—মায়াব ভাস-বর মহাবীরাগের ফুৎকারে ফুৎকারে উড়াইয়া, অস্তিত্ব বিরহ বাসটি হুঙ্কারনিষেধে শাখিকোড়ে ফেলিয়া চানিয়া গেলে—বহিঃ প্রত্যো কি বিরাট, অনন্তসাধারণ বিদগ্ধ ইতিহাস রচনা করিলে—কিন্তু অন্তরাজ্যে বাঙ্গালী তোমার নিড়ি প্রাণদানবার মর্ম কি আশ্রয় বুদ্ধি! হায় ভাববোনা দেশ প্রাণ! তোমার চির পিয়াদী মর্মস্বার্থের গভীর, নিগূঢ়, অতুল্য বেদনার আর্জনাধ কি জাতি ভুলিল, তোমার নয় বহুগুণি ভুলিল, সেই অমর প্রেরণ ময় সত্য মাহুটকে ধ্বংসের অশানভয়মি বাঁচিয়া বুদ্ধি বাহির করিতে পারিল?

বাঙ্গালী একটা বিশিষ্ট জাতি—ইহাই চিত্তরঞ্জনের জীবনের বাণী। বাংলার মর্ম-ছেঁড়া সাধক, শুদ্ধ বৈষ্ণবভাবের ভাবুক, এই বীর তাত্ত্বিক সন্তান—বাংলা মায়ের বড় সত্য মনঃপরিচয় প্রাপ্তের মধ্যে পাইয়া-ছিলেন। বাংলার সংজ্ঞাভাব, প্রকৃতি নিষ্ঠিত সন্তোষ, তাঁর প্রাপ্তের কৃপে হৃৎ উপছায়া ছেল দিত, তিনি ভাবোদ্ভাব হইয়াছিলেন, দানের, জানের, প্রাপ্তের মণিকোটায় মায়ের রূপ অরণে কণে কণে পরিচরিত, জাগ্রতে স্বপনে ভুব দিয়া থাকিতেই ভালবাসিতেন, শেষ জীবনে বড় নির্ধন নির্ভর তপস্যা আকর্ষণে ভাব সাধনা হইতে আপনাকে ছিঁড়িয়া, কর্মসাধনের তাহাকে রাখাইয়া পড়িতে হইয়াছিল। বলভঙ্গের মত প্রোট কখনো বাংলায় রাষ্ট্র জীবন বিমলিত করিতেই বীর অদীম বিধান, অদম্য ইচ্ছা ও তপশক্তি প্রয়োগ করিলেন—সে অমৃত্যব বিধান, তাঁর জীবনের ডাক ছিল বুদ্ধি অজ—কল্পপ্রবাহের মত উহা শুধু তাঁর অন্তরে অগ্নিরেই বহিতে বহিতে আর জাগ্রত প্রবাহে ফুটবার মনকাণ পাইল না—উগা তাহার উত্তরসাধক দেশবাসিকেই তিনি স্বাধিকারের সঙ্গে নিখণ্ডভাবে ছাঁইবার ভার দিয়া গেলেন—বাঙ্গালী,

এই দেশের বাক্য কৃষি বড় পবিত্র পুণ্যময় অর্থায় —পরকণী খানী আনগ, তাঁর সে মনঃপাতীত দার রূপ পূরণ করিয়া দাও।

স্বপনের দেখা কালের বশে তাঁর জীবনে আসন ছাড়া দিয়াছিল—ভারবের রক্ত দেবগণকে। তাই তাঁর বয়স, তাঁর মনোপাশ নিটে নাই। অকালে তিনি চানিয়া গেলেন। এ জীবনে বাহা মিটিল না

—পরকণী খানী আনগ, তাঁর সে মনঃপাতীত স্বপনের দমন প্রেক্ষাপট কি তাঁর কল্প হইতে আরও অবলি পাইব না? আবার কি তিনি অপরিবেশ না? বাংলা ও বাঙ্গালী জাতির ভাগিনী নেতা, কবি, তোমারই মূহুর্তী অঙ্গর আধারের বাসাই লইয়া মরি—তোমারই ত কথা "মাঝি



বাঙ্গালী হইয়া জীবন মরিব— আবার জীবন, আবার মরিব —আবার আর অজ সাধ রমনা নাই।" —এ বণী যে মৃত্যুর করাল বিনোদিকে মরি অট্ট হাত করে, ইংগুৎ হোমার জীবনের মহাসত্যকেই আবিষ্কার করির দেখে—মরিয়া কৃষি আর অর্থ হইয়াছে— চিত্তরঞ্জন, আবার কৃষি আশ্রয়, গণীতির অধিনিষ্ঠান, স্বপ্ন পুনর্নির্জান করিয়া আবার মনঃমায়ের কোলে নতুন বোনা লইয়া আবির্ভূত হইও যুগসঞ্চারিত, নতুন জাতি নিখাণের প্রেরণা লইয়া। নতুন দেশ যেন তোমার জীবন মরণ জিনিয়া নতুন জীবনদা গাছের বণে করিয়া লইতে পারে—বাংলার নবস্রষ্টা রূপে জাতিজীবনে তোমার বিরাট চিহ্নি রাখক অমৃত্যবাহন করে। বন্ধ

মাক্তম্।

কার্যভিত্তি পরামেশ্বর।

দেশবন্ধুর বাণী

বাংলার কথা

১৯১৭ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতিত্ব করতিনি “বাংলার কথাই” আপন অধরের আকর্ষণীয় ধ্যানলব্ধ গুঢ় মর্মকথাই ব্যক্ত করিয়াছিলেন—সেনানি তিনি বাঙ্গালীকে তার জীবনের সন্ধান করিতে বলিলেন, রাষ্ট্রসাধনার সুশীলিত এই তার জীবন-সাধনার পরঃয় না পাঁহিলে যে বঙ্গালী

মাছুষ হইবে না! তিনি করিলেন—
“.....কিন্তু ঐ রাষ্ট্রীয় চিন্তা বা চেষ্টা, ইংরাজ সার্বভৌমত্ব কোথায়? এক কথা বলিতে হইলে, যে কথা অনেকবার শুনিয়াছি তাহাই বলিতে হইবে, বাঙ্গালীকে মাছুষ করিয়া তোলা। বাঙ্গালী যে অসামান্য তাহা আমি কিছুতেই স্বীকার করি না। আমি যে আপনাকে বাঙ্গালী বলিতে একটা অনির্গুণত্বের গুণ অস্বীকার করি, বাঙ্গালীর যে একটা নিজের সাধনা আছে, শাস্ত্র আছে, দর্শন আছে, বর্ণ আছে, ধর্ম আছে, বীর্য আছে, ইতিহাস আছে, ভবিষ্যৎ আছে। বাঙ্গালীকে যে অসামান্য বর্ণ, যে আমার বাংলাকে জানে না। কিন্তু এই ক্ষেত্রে দরিদ্র লগুয়া বাউক, যে বাঙ্গালীর কতকগুলি ধর্ম আছে যাহার সশোষণ আবশ্যিক

এবং সেই ভাবে দরিদ্র লগুয়া বাউক যে বাঙ্গালী অসামান্য। তাহাকে মাছুষ করিয়া তোলাই রাষ্ট্রীয় চেষ্টা বা চিন্তার উদ্দেশ্য।”

অধ্যাপকদের ইতিহাসের ছিন্নশূন্য টানিয়া পরে তিনি গাহিলেন—“১৯০৩ সাল হইতে স্বদেশী আন্দোলনের বাজনা বাজিতে লাগিল। বাঙ্গালী আপনাকে চিনিতে যুক্তিতে আরম্ভ করিল। স্বাধীনতা পাঁহিলেন—



অধ্যাপক বিপ্লবদীপ্যালে চিত্রকরন।

“বাংলার মাটি, বংগের মূল সভ্য কর, সভ্য কর, হে ভগবান” বাংলার মূল, বাংলার মাটি আপনাকে সার্বক করিতে লাগিল।”

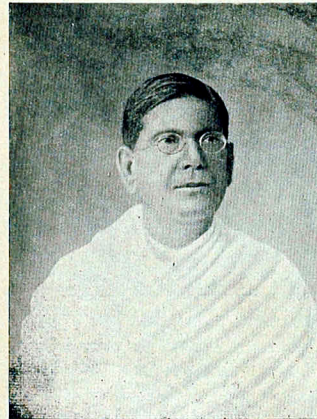
আষাঢ়, ১৩৩২]

দেশবন্ধুর বাণী

১৭২

এই আগরপ যে প্রাণের জাগরণ, মানবী বুদ্ধির গনণা-প্রাপ্ত নয়। তাই মুখর আবেগশূর্য কণ্ঠে বড় বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ শব্দে উজ্জ্বল তিনি কৃতদেব—“প্রাণের যে বর! সে ত অকপাল মানেন না, যে যে মূল্য মাপ-কাটা ভাসাইয়া লইয়া যায়। স্বদেশী আন্দোলন একটা বড় মত বহিরা গিয়াছিল, একটা প্রবল বজার আমদের ভাগ্যই বইয়া গিয়াছিল। প্রাণবহন জাগে

“এই যে মহাবজ্রের কথা বলিলাম, তাহাতে আমরা ভাসিয়া, ভুবিয়া বাঁচিয়াছি। বাংলার যে নীচব্র প্রাণ তাহার সাক্ষ্য পাইয়াছি। বাংলার প্রাণে প্রাণে অবহমান যে সভ্যতা ও সাধনার স্রোত তাহাতে অবগাহন করিয়াছি। বাংলার যে ইতিহাসের ধারা তাহাকে কতকটা বৃত্তিতে পরিয়াছি। বৌদ্ধের বুদ্ধ, শৈবের শিব, শাক্তের শক্তি, বৈষ্ণবের



দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।

তখন ত সম্ভাব্য করিয়া গাণে না। মাছুষ যখন ঘৃণায় দে ত দ্বিগুণ করিয়া জন্মায় না। না জন্মাইয়া পারে না বলিয়াই সে জন্মায়। আর না জাগিয়া থাকিতে পারে না বলিয়াই প্রাণ একদিন অকপাল জাগিয়া উঠে।”

বাঙ্গালীকে ডাকিয়া, তারকণ্ঠে স্বরগাম পদ্য বাদ্য চড়াইয়া আরও শুনাইলেন—

ভক্তি, সবই যেন চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হইল। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির গান মনে পড়িল। মহাপ্রভুর জীবন-গৌরব আমাদের প্রাণের গৌরব বাড়াইয়া দিল। জ্ঞানদাসের গান, লেচনদাসের গান, সবই যেন এক সঙ্গে সাড়া দিয়া উঠিল। কবিগুণ্যাদেশের গানের ধ্বনি প্রাণের মধ্যে বাজিতে লাগিল। রামপ্রসাদের সাধন গদ্যেতে আমরা মন্ত্রমুগ্ধ। বুদ্ধিগাম কেন ইংরাজ এদেশে আগল, বুদ্ধিগাম রামমোহনের তপস্রায় নিগূঢ় মর্ম কি? বুদ্ধির সে ধ্যানের মুক্তি সেই—

“তুমি নিগা তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম
হি প্রণা শরীরে।
বাহতে তুমি মা শক্তি,
স্বপ্নে তুমি মা ভক্তি,

তোমার প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে”—
সেই মাকে বেখিলাম, চিনিলাম। বুদ্ধির গান আমাদের “কাণের ভিতর দিগা মরমে পশিলা।”
বুদ্ধিলাম রামকৃষ্ণের সাধনা কি—সিদ্ধি কোথায়।
বুদ্ধিলাম কেশবচন্দ্র সেন কহার ভাক শুনিয়া ধর্মের তর্করাজা ছাড়িয়া মর্মরাজো প্রবেশ করিয়াছিলেন।

বৈবেকানন্দর বসতিতে গাং ভরসা। ইটল বুকিং
বাক্যই হিন্দু হইক, মুসলমান হইক, খৃষ্টান হইক,
বাহাদুরী বাহাদুরী। বাহাদুরীর একটা বিশিষ্ট রূপ
আছে, একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে। এসাঁ। স্বতন্ত্র
এক আছে। এই ভগবতের মধ্যে বাহাদুরীর একটি
এক আছে, অবিচার আছে, সাদা আছে, স্বতন্ত্র

বিশিষ্ট, সে জ্ঞা। অন্যত। ভেদমা। হিসাব করিতে
হয় কণ, তর্ক করিতে চাও কর—আমি সে জ্ঞানের
বাহাই হইয়া মরি।
কি করণ ক্ষয়বিধর্ককী দায়িত্ব তিনি বাহাদুর
পূর্ণাঙ্গের বাস্তব অবস্থাত্তি মীকিতে সিদ্ধান্তিলেন—
“..... পশ্চাত্য। সত্যের সংঘর্ষে আজ আমরা



মহাপ্রাণনা।

“এনেছিলে মাঝে ক’রে যত্নহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করি গেলে দান।”

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আছে। বুদ্ধিমান মানুষকে প্রকৃত বাহাদুরী হইতে
হইবে। বিন্দুবিদ্যার যে অন্যত বিশিষ্ট সৃষ্টি,
বাহাদুরী সেই সৃষ্টিপ্রত্যয়ের মধ্যে এক বিশিষ্ট সৃষ্টি।
অনন্তরূপ শীলাধারের রূপবৈচিত্র্যে বাহাদুরী একটা
বিশিষ্ট রূপ হইয়া উঠিয়াছে। আমার বাংলা সেই
বিশিষ্ট রূপের প্রাণ। যখন জাতিসম, তা আমার
মানসে যোগের তাহার বিদগ্ধ দণ্ডবিধি বিলেন।
সে রূপে প্রাণ জুড়িয়া গেল। দেবিলাম সে রূপ

নিজের গুণ জুড়িয়াছি, কিন্তু এ-ই ত আমার
জিগাম না। সবই ত আমাদের ছিল, টেটর ভাঙ
কাটির বজ্রনিবারণ—অমরা নিজেরাই আমাদের
সে বজ্র নিগারন করিতাম। অগ্নিপনা দেওয়া
আমি, মুক্ত আকাশ, শ্রমল পঞ্জীবীষি, শ্রমজ
অম পদশব্দের গ্রীতি সই অমদের ছিল। আজ
যদি বজ্রী নাষ্ট, তাহ আমার বজ্রী জা—কন
আমরা লক্ষ্যভাঙা হইলাম? দেখ আমাদেরই—সব

পোষকি, আমাদের? ইতিহাস নিজের দোষকে
কখনও ভাঙ করে না। তবে প্রবলের মাথাতে
ছুরলের দোষ শতভাগ বাড়িয়া যায়। আমাদের সেই
সময়কার ইতিহাস যের অন্ধকারে মগজকী নিখাস
বহু ও দিক্ত, সে কথাই বিচার আর করিয়া কান
নষ্ট, বিচার কহিলেই গরল উঠিবে। আমি বলনের
দিনে সে কথা ভেগাই ভাল।

ছিল একদিন—বংগা শুধু নিজের লজ্জা নিবারণ
করিত না, জগতের ঘরে ঘরে কাপড় বিগাইত। সে
বসন ও বৈভব জগতের নুনোতার সৌন্দর্যকে
চুটাইয়া তুলিবার অতুলনীয় উপাধান ছিল। ইংরাজ
আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তখন শত শত স্ত্রীর শেখড়াগে
বাংলার সেই বৈভব নষ্ট হইয়া গেল।

.....সেই দুই শতাব্দীর অন্ধকারে যখন চোখ
ফিরাইয়া দেখি—সকলেই বিনীতিকামণ, ভয় হয়,
যেন হয় সে কি বস! আমরা বাস্তবিকই মনুষ্য
হরাইয়াছিলাম, দাবী করিবার কিছুই ছিল না, শুধু
প্রাণের দাবী ছিল। হার ভূত্যাগ বাহাদুরী,
আমরা যের লক্ষ্যকে গলা টিপিয়া মারিয়া দেখিলাম।
আমরা যে অক্ষম—তাই দেখা করো নয়, শেষ
আমাদেরই, আমরা “স্বাধা-বিনে জুড়িয়া মরিলাম।”
অনাচারের অশ্রদ্ধা, শক্তিহীনতা, ভক্তিহীনতার
আমাদের গৃহধর্মকে, আমাদের স্বভাব ধর্মকে বিসর্জন
দিলাম।

এই মরা-কাতির প্রাণের সন্ধান কোথায়? সে
সবছর তাঁর প্রাণনয় অজন্ত নির্দেশ বাহাদুরী পুনঃ পুনঃ
শ্রম ও মনন কর—শিক্ষিতাভিনানী আমাদের চক্ষে
অসুবি দিয়া তিনি আমাদের দারব ব্যাধিটই
ধরাইয়া দিয়াছেন—

“এখন যে আমাদের সম্মুখে বিস্তৃত কার্ণাভ, তাই
এই যে দেশের কাণ, তাহা হিন্দু মুসলমান একত্র
হইয়া নিমিষা বিশিষ্ট করিতে হইবে—ব্রাহ্মণ বৈদ্য

কাণ স্ব স্ব জ্ঞান, সব একত্র হইয়া না করিলে কোন
কার্যই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিব না। যে বংশপ্রম
ধর্মের অভিনয় এই কার্যের অন্তরায়, আমি সেই
অভিনানের কথাই বলিতেছিলাম। বাহাদুরী পুনঃ
বাংলার চারিকোণী মাটলক্ষের মধ্যে চারিকোণী,
বাংলা দেশের সার বজ্র, বাংলা মাথার ঘাম পায়ে
দেখিয়া মাটি বর্ণ করিয়া আমাদের বজ্র শত উৎ-
পাদন করে, বাহারি ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যেও মরিতে
মরিতে বাংলার নিজের শভাটা ও সাধনাকে রাজাগ
হাথিয়াছে, বাহারী শ্রমপ্রকার সেবার নিরত থাকিয়া
আজিও বাহাদুরী ধর্মকে অটুট রাখিয়াছে, বাহারী
আজিও শুদ্ধ চিন্তে সংল হলে মর্মে মর্মে বাংলার
মন্দিরে মন্দির পুণা দেয়, মন্দিরে মন্দিরে প্রার্থনা
করে, বাহারের বজ্র বাহাদুরী আজিও বাহাদুরী, বাহারী
বাংলার মাটি ও বাংলার জলের মধ্যে এক হইয়া,
বাহাদুরীর জাতির জাতিত্বকে জানে কি অজ্ঞানে
সারিকের অগ্নির মত আগুইয়া কাগাইয়া রাখিয়াছে,
বাহারের আমরা বিলাতি শিক্ষার মোহ, আন
আনন্দের প্রভাবে, কমিটারির বাধনা স্রাবাভাবে
কি অজ্ঞায় করিয়া বাড়াইবার জন্ত, শত প্রণোদন
দেখিয়া, শত অত্যাচার করিয়াও একবারে নষ্ট
করিতে পারি নাই, বাহারী বাস্তবিকই বাংলাদেশের
একধারের রক্তমাংস প্রাণ, তাহার বজ্র কি আমরা
বজ্র? কোন্ মাংসে, কিসের অন্ধকারে তাহাদের
জন্মপূর্ণ করি না, কাছে আসিলে জ্বলিত কুন্ডলের
মত তাড়াইয়া দিই? এত অহংকার কিসের? এত
দাঙ্কিতা কেন? আমরা বাহারী হিন্দু হিন্দু বনিয়া
চাঁৎকার করি, আফালন করি, আমরা যে দিনে
দিনে হিন্দুধর্মের যে মর্যাদা সেইখানে ছুরিকাঘাত
করিতেছি। এমনই আমাদের মোহ, আমরা কি
তাহা দেখিয়াও দেখিব না, বুকিয়াও বুঝিব না? বর্ষ
অভিনাম লইয়া এমনই করিয়া মরণের প্রোভে চাষিয়া

যাইব? ওই যে মা ডাকিয়েছেন, সাংখান! সাংখান! ডাক, ডাক, সবাইকে ডাক! প্রাণের ডাক জনিলে কেহ না আসিয়া থাকিতে পারে? কঠ! জাগ! ডাক! আপনাব কল্যাণকে ভাগাও! বল এস ডাই, জুম মুসলমান হও, বুটন হও, শূদ্র হও, জোব হও। তোমাকে আধিরন বড়ি, এবে আমার কাছ এ যে তোমার কাছ, এবে আমার কাছ! একবার



শিলাদেহ স্টেশনে শবদেহের অপেক্ষার

শূদ্র হউক, চণ্ডাল হউক, উহারা প্রত্যেকেই যে তব ডাকবার মত ডাক, দেখিবে সকলেই আসিবে, সাক্ষাৎ নাসায়ণ! কবিশ্রদ্ধী তোমার শুদ্ধ প্রাণে দেখিবে সকল কার্যই সার্থক হইবে। আমি আবার বলি, আবার বিশ্বাস ভাগাও, ভাগাও। তোমার শূদ্রকে যে উঠ, জাগ, ডাক। আপনাব কল্যাণকে ভাগাও! নাসায়ণ! আততায়ী! তোমার হাতের ছুরি গেলিয়া উঠিত ভাগাও! তোমার হাতের ছুরি গেলিয়া দাও—জন্মের মত গেলিয়া দাও, তোমার সম্মুখে যে

“ইতিষ্ঠিত ভাগ্যত প্রাপ্যবান্নিবাধত—
—নাশ পথঃ বিদতে অয়নায়।”

তার শেষ কথা, দেশবাসীর কাছে আকুল নিবেদন তাহা এই :—

“আমার স্বদেশবাসীদের নিকট আমার প্রাণের নিবেদন এই যে, বাংলার কথা যেন অচিরে বাঙ্গালীর কার্যে পরিণত হয়। সমবেত চেষ্টা চাই, সকলেঃ উদ্যম চাই, বাঙ্গালীঃ স্বার্থভাগ চাই। এই যে ঐশ্বর্যজ্ঞ, ইহা শুদ্ধ পবিত্র প্রাণে আরম্ভ করিতে হইবে। সকল বিধে, সকল স্বার্থ ইহাতে আচ্ছাদিত হইবে। ইহাতে বর্ণ-ধর্ম-নিক্রিংশে সকলকে আছন্ন করিতে হইবে। কর্মক্ষেত্রে অনেকে বাধা, অনেক বিয়। অসহিষ্ণু হইলে চলিবে না, নির্যাস হইলে চলিবে না। যে অধিকার আর আমাদের দাবী করিতেছি, তাহা মুক্তিগণত, জাতিগণত, আমাদের স্বভাব ধর্মগণত, মাতৃ-বধু স্বাভাবিক অধিকারগণত, আমাদের ধর্মগণত, জগতের ধর্মগণত। এই অধিকার হইতে আমাদের কেহ বঞ্চিত করিতে

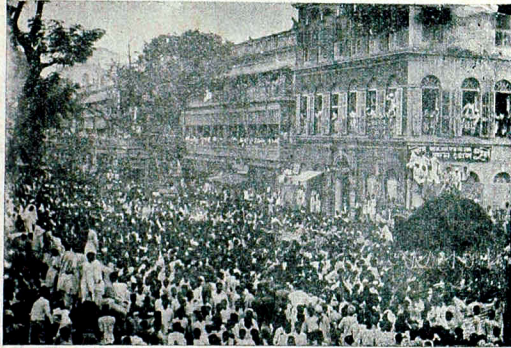
পারিবে না। একবার এস আমরা সকলে সম্মুখে বলি, “চাই এই অধিকার আমাদের, বাহা আমাদের তাগ চাই।” একবার এস আমরা হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, সম্মুখে বলি—“চাই এই অধিকার আমাদের বাহা আমাদের তাগ চাই।” একবার এস ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, শূদ্র, চণ্ডাল সব একত্র হইয়া সম্মুখে বলি, “চাই এই অধিকার আমাদের, বাহা আমাদের তাগ চাই।” সকল প্রজা যখন একত্র হইয়া আন্তরিক মিলনে মিলিত হইয়া বলে “চাই।”—জগতে এমন কোন রাজশক্তি নাই বাহা সেই সমবেত আকাঙ্ক্ষার অগ্রতিহত বেগ বোধ করিতে পারে।”

স্বরাজ মুক্তির চিরজয়ী সেনাপতি—দেশবাসীর কণ্ঠে আজ নীরং—তার বাণীর মুখ—আর দুকারিয়ঃ বাজিবে না। হায়, বাঙ্গালীকে বাংলার কথা এমন করিয়া আমার কে শুধাইবে? আজ কে তার আলোঙ্গা আজ—হৃদয়গে জাতিকে মুক্তিপথে সঙ্গে এই! আগাইয়া চলিবে?

শ্রদ্ধ-বাসরে

বিনামেঘে বজ্রগাতের ছায় দেশবন্ধুর প্রাণ-
স্বাদ বাঙ্গালীর কাণে যখনই পৌঁছিল, তখনই
তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল, বুক ধসিয়া পড়িল। এ
নিষ্ঠুর সংবাদের দ্বন্দ্ব আমরা শ্রুস্ত হিলাব না।
বাঙ্গালীর জীবনে এমন নিদাক্ষ অশনিপাত আর

ভবিষ্যতের বৃষ্টি কুলকিনারা গুলিয়া পাইতেছিলাম
না—কে জানে তখন এমন অবার্থ শতায়ি অশ্রু,
হৃদ্যদেবতারই শাবিত চোরাবাব হানিরা, গোপনে
গোপনে বঙ্গমাতার নাকী ছিঁড়িয়া তাঁরই নাকী-ছেঁড়া
ধনকে অপরূপ করার আয়োজন চলিতেছিল! কি



হাবিদন রোডের শোভাযাত্রা

কল্পনা করা যায় না। আমাদের “প্রবর্তক আশ্রমে”
এ ব্যক্তি যে রাতে পৌঁছিল, তাহাই অববহিত
পূর্বাহ্নে কি জানি কিনে বরাল ছায়াপাতে, বহু
নিমবচিন্তে আমরা কয়েকটি প্রাণী বসিয়া কালের
তেউ পথিতেহিলাব—বিশেষা হইয়া, জাতির

দাক্ষ মধুভেদী তীক্ষ্ণ শেন দেখিন বাঙ্গালীর দরুনাম
সাধন করিয়া স্বাতীয় মন্তাকে বিস্ত করিল—বলিয়া
ফাটিল—একমুহুর্তে তার সমস্ত আশার লুপ্ত,
উৎসাহের বরগাছা পণ্ড, চূর্ণীকৃত করিয়া মাটিতে
লুটাইল।

মঙ্গলবার রাজ ৯। সময়ে এই সংবাদ আমাদের
কাণে পৌঁছে, বৃহৎপতিবার প্রাতঃকালে মুহাম্মান
হৃদয়কে কোন রকমে বাঁধ দিয়া, আমরা আশ্রমের
সভাপুর্বে সকল নরনারী সমবেত হইলাম শুধু অশ্রু-
পাতের জন্ত! হায় চিত্তরঞ্জন! আমাদের আর
আছে কি, দিবার ত আর কিছুই নাই শুধু, কয়েক
কোটা চোখের জল, তাই দিয়া তোমার তর্পণ করি।
জাতির ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বুক ঢুকরিয়া কাঁদিয়া
লুটাইতে চায়—কাঁদিবারও যে ভাষা নাই! তাই
শুধু নিমিষান্তরিত্তে অশ্রুসর্গের শ্রদ্ধার অর্ঘ্যগুলি-
টুকু উদ্দেশে উৎসর্গ করিলাম মাত! এই অশ্রু

নিবেদনের সঙ্গে আশ্রমপ্রাণ মতিবাব তাঁর জীবন-
সাধনায়, চিত্তরঞ্জনের সহিত কয়েকবার খুব নিকট
অন্তরঙ্গ পরিচয় ফলে, যে নির্বিড় দেশাত্মকৃতির পরশ
অহুতব করিয়াছিলেন, সজলকণ্ঠে তাহা ব্যক্ত
করিলেন। চিত্তরঞ্জন আজ নাই, কিন্তু তাঁর অমর
আত্মা পরলোকের কোলে কোলে বাঙালার বাণী
উচ্চারণ করিয়া ফিরিতেছে—তাঁর অশ্রুরী প্রেরণা
ও আনীরদ দেশ কি ব্যর্থ হইতে দিবে? সজ্জের
ব্রত—নিখাণ। এই নিখাণ-যজ্ঞে দেশবন্ধুর আত্মিক
সংগ্রহভূতপূর্ণ, অলস্ত উৎসাহবাক্য আজও তাঁর কর্ণে
আশার রাগিণীর ছায় বাজিতেছে, হৃদয়ে নৃতন
তেজস্বকার করিতেছে। বাঙালীমাতার বুক-ফাটা
মধুজালা, যাঁহা চিত্তরঞ্জন অহমিশি সজনে নিচ্ছনে,
একখানি দীপ্ত আয়েগিরির ছায় বহন করিয়া
ফিরিতেন, সেই অশীম বাখার অভিযেক্কে আজ
বশেক তাঁহাকে স্মরণ করিয়া নৃতন চরিত্রের
দীক্ষা হইতে হইবে—বিদেহী দেশ-পুরুষ আজ
স্বায়েদেরই দ্বারে তাঁর অন্তর-স্বপ্ন যে মব জাতি
সংগঠনের প্রেরণা, তাহারই সম্পূরণের জন্ত
আকুল আহ্বান ফুকারিতেছে—ঈশ্বরের কাছে
প্রার্থনা, সন্ম বেন দেশাত্মার মধ্যান্তিক চাওয়া এই

নিখাণ আজ যোগ্য তপস্রায় হৃৎস্পন্দ করিয়া তুলিতে
পারে।

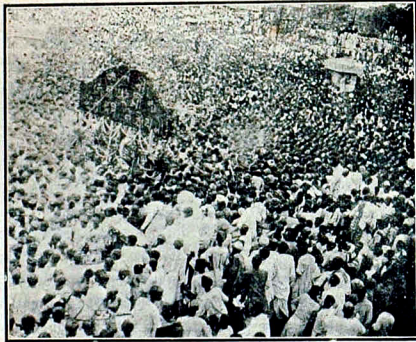
১লা জুলাই, মহাত্মার আদেশে দেশবন্ধুর প্রতি
দেশবাসী গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশের আয়োজন করা
হইল। কলিকাতা টাউনহলে মহারাষ্ট্রাধিরাজ
বর্দ্ধমানপতির সভাপতিত্বে ও উজ্জ্বল মদ্যনে মহাত্মা
গান্ধীর অনিন্দ্যক্ষে যে বিরাট মহাসভার অধিবেশন
হইল, এমন অপূর্ণ শোকসভা আর কেহই প্রত্যক্ষ
করে নাই। সংবাদপত্রে তাহার সকল বিবরণই
বাহির হইয়াছে, আমরা এখানে বাহ্যভায়ে আর
তাহার পুনরাবৃত্তি করিলাম না।

এতদ্বলক্ষে, আমাদের ক্ষুদ্র পল্লী চন্দননগরে
“হুতাগোপাল স্মৃতিমন্দির” স্থানীয় মেয়র শ্রীনারায়ণ
চন্দ্র দেব কর্তৃক একটা সাধারণ শোকসভা আহত হয়।
অপরূপে, মহাত্মা কর্তৃক নির্দিষ্ট মুহূর্ত ৭টা বাজিলে,
সভার কার্য উদ্বোধন করা হয়। তখনও কলিকাতা
হইতে সভাপতি শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র চন্দ্র মহাশয় মটরে
আসিয়া পৌঁছিতে পারেন নাই। “হিতবাদীরা”
সহঃ সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়ের
প্রস্তাবনায়, শ্রীমতিলাল দ্বায়কে সভাপতিত্ব অবস্থানমে
কিছু কালাবধি সভার উদ্বোধনাদি করিতে অহ-
বোধ করা হইল। মতিবাব দণ্ডায়মান হইয়া
অশ্রুনেত্রে সমবেত জনমণ্ডলীকে পরলোকগত মহা-
নেতার প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে দশ
মিনিটকাল মৌনভাব অবলম্বন করিতে বলিলেন।
সমগ্র সভাজন নীরব নিস্তক হৃদয়ে দশমিনিট মৌন
ধাকায়, বড় গভীর, অপূর্ণ, গভীর শোকমুগ্ধ সৈন
প্রত্যক্ষ করিয়া দ্বিত হইলাম।

ইতঃপরে সভাপতি শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র চন্দ্র
মহাশয় সভাপত্রে উপনীত হইয়া সেই মৌনযোগ্যে
যোগদান করায়, তৎকালীন আন্তর-ভাব বেন আরও
গুরুগাঢ়ীও বহিমাণু হইয়া উঠিল।

অতঃপর মৌনভঙ্গ, সভাপতির আদেশে, শ্রীমুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু উঠিয়া দেশবন্ধুর স্মরণে গুটিকতক কথা বক্তা করিলেন। তিনি কহিলেন—“দেশবন্ধু চিন্তনধনের সহিত আমার তেমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে নাই। কিন্তু একটামাত্র বার তাঁর সহিত সাক্ষাৎকার হইলেও, সেই একটাবারে তাঁর অস্তিত্বপরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। সেদিন বস্তুত পারিয়াছিলাম, কয়েক মূহুর্তের আলাপে,

সেই মুগ্ধ হইয়াছে, আপনা হারায়াছে—তাহাকে কেহই না ভালবাসিয়া থাকিতে পারে নাই।” অতঃপর শ্রীমুক্ত মতিবাবু চিত্তব্রজনের সহিত তাহার পরিচয় প্রসঙ্গে, দেশবন্ধুর অন্তর্নিহিত জীবন-বাণী কিছু প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন—“আমি আজ বহুহিত বাঙালীর অশ্রুসমূহে আমারও কয়েকফোটা—শুধু কয়েক ফোটা অশ্রু মিলাইতে এখানে উপস্থিত হইয়াছিলাম। যে ব্যাথা আজ



শোভাযাত্রা

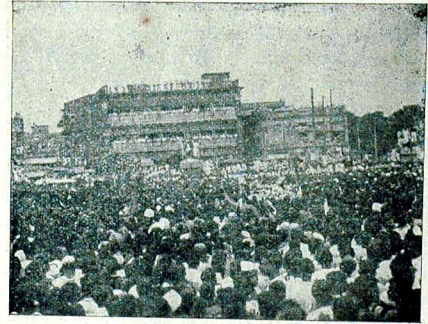
উল্লস মুক্ত হৃদয়গানি সবগানি ঢালিয়া, কেমন করিয়া এই অসাধারণ মাহুটি আর একজনকে বাছ করিয়া ফেলিলেন। সত্যি আমি যেন তাঁর শুধু কতদিনের নয়, কত অনন্তরাস্তরের পরিচিত; এমনই সব-কাড়া হৃদয়গানিই দেশবন্ধুর ছিল, তাঁর ভালবাসার গীতা ছিল না, গভী কেশ খুঁষিয়া পাইত না। প্রীতির স্বেহনির্ধর—যে একবার তাহার স্পর্শে আদিয়াছে,

হৃদয়ে জমিয়া উঠিয়াছে, এরূপ ব্যথা ভাষায় প্রকাশ হইতে পারে না, অথরের মণিকোটায় নির্লক্ষ্য ধ্যান-বেদীতলে আছাড় থাইয়া মৃজিত হইয়া থাকিতেই চায়। কোন্ ভাষায় আজ দেশবন্ধুর ব্যাথা-প্রকাশ করা সম্ভব? তাঁর পারলৌকিক জীবনের কল্যাণ কামনায় আমরা আজ শুধু শ্রীভগবানের দ্বারাে হৃদয়ের বাক্যহারা অনাহত প্রার্থনা-সঙ্গীত

তুলি—সেই লোকান্তর হইতে তাঁর দেশাত্মপ্রীতি-মূলক অমর আশীর্বাদে ধারাভিমুখে শুষ্ক হই, ধ্বংস হই।

কিন্তু অস্তরের রক্ত আত্মনিবেদন ছাড়া, জাতীয় জীবনে বহিঃস্থ অহুষ্ঠানেরও একটা উদ্বেগ আছে, সার্থকতা আছে। বাহিরকেও ত একেবারে উপেক্ষা করা যায় না। দেশবন্ধুর সহিত আমার সৌভাগ্য-ক্রমে যে কয়েকবার প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভের সুযোগ

তিনি বাংলার বনামঞ্চ ব্যারিষ্টার চিত্তব্রজ মজুমদার— তাঁর গৃহ বিলাতী চণ্ডা সাম্রাজ্য বিলাসবস্তুর বলিলেও চলে—আমাকে নিভৃত ডাকিয়া যে কয়েক মিনিট আলাপ করিলেন, তাহাতেই একটা অপূর্ণ মহাহৃদয়ের অব্যক্ত স্পর্শ পাইয়া আমি কৃতার্থ হইয়াছিলাম। সেদিন অহতব করিতে পারিয়াছিলাম, সেই মধুর প্রীতিভরা হৃদয়গানির মধ্যে যে শক্তির উৎস লুকাইয়া রহিয়াছে, তাহা



শিখালদহে জনতা

ঘটিয়াছিল, সেই কয়েক মূহুর্তের অবিস্মরণীয় পরিচয়ের একটু উল্লেখ করিয়াই আজ আমি নিবৃত্ত হইব। আমার প্রথম নিকট পরিচয় তাহার সনে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে। ইহার আগে যে ছুই একবার তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম, তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের নিবিড় স্পর্শ পাইতে পারি নাই। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তাঁর রমারোডস্থিত ভবনে, কোনও বিশেষ কার্যোপলক্ষে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপস্থিত হই। তখন

মুক্তি পাইলে একদিন [সারা বাংলায়] মহাপ্রাণন আনিবে। তখনও এ শুধু আমার হৃদয়ের অহুতি—কে জানিত, চিন্তে ভবিষ্যতের যে আভাসটুকু প্রতিকলিত হইয়াছিল, তাহা সত্যই বাঙ্গালীর স্বপ্ন, একদিন তাহা অগ্নের অগ্নরে বাতবে পরিণত হইবে।

তারপর আমার চিরাগত নিত্যদেবতা শ্রীশ্রীশ্রী, চিত্তব্রজের লেখা কাব্য “গাথর

সম্রাটের" ইংরাজি অনুবাদের ভায় লগুয়ার উপলক্ষে
খিষ্টিয়ার তাঁহার সহিত নিবিড় সংস্পর্শে আসিতে
হয়। তদবধি তাঁহার সহিত ঘন ঘন পরিচয় ফলে,
তাঁর ক্ষমতার যে ব্যাধার প্রশংসাই—সে ক্ষমতায় যে
বাংলার সাধনার অধিশিখা ধক্ ধক্ জলিতেছিল,
নিগূঢ় যে কঠিন, অপরূপ তপস্কার প্রকৃতি চলিতে
ছিল—তার আভাস পাইয়া আশ্চর্য্য হইয়া যাই।
এ যে বাঙ্গালীর জীবনবেদ—ভিলে ভিলে ভাব-
সাধকের রূপগত প্রকৃতি হইয়া উঠিতেছে—আশ্চ-
র্যবিশত জাতির ঘরে ঘরে একদিন ইঁহারই বিজয়
ক্ষমার, জাতি-সাধনার তত্ত্ব প্রচারে যদি উদ্ভূত হয়
—বাঙ্গালী আপনাকে জানিবে, পাইবে—এই
আশার সম্ভাবনায়, সেদিন আমার ক্ষমতায় মন আনন্দে
চুলিয়া উঠিয়াছিল। দেশান্তার আশীষ-ভার সেদিন
চিত্তরঞ্জনকে দেখে মনে আবিস্কৃত্যমনে দেখিয়া সত্য ই
পুলকে কণ্ঠকিত হইয়াছিল।

তারপর গ্রন্থকের আবর্তনে, উভয়ের জীবনে
কত বিচিত্র পরিবর্তনের পর, তৃতীয়বার তাঁহার
সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল—এবার আমারই দীন
আশ্রমকূটীয়ে—তিনি নিজে দয়া করিয়া আসিলেন।
এ তাঁর ছদ্মস্বাস কার্যমুক্তির ঠিক অব্যবহিত পরে,
কর্ত্তমান সভাপতি নির্দলচক্র ও বাবু মদনমোহন বর্ধন
মহাশয়কে সেদিন তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন। এক
দেখিলাম! ত্যাগবৈরাগ্যের অলস্ত মুক্তি, কল্প কঠোর
তপস্কার রোম্বে একে আমার ঘরে উপস্থিত—এতো
আর সেই বসারোদের ব্যাবিষ্টার চিত্তরঞ্জন নয়।
ভোর কৌশল প্রচ্ছন্ন রাগিয়া, ছদ্মবেশী বাউল
সকলির—এ যে প্রেমের সম্রাটী নৃতন চিত্তরঞ্জন—
ভিখারীর মত ঘাটীয়া ঘাটীয়া প্রেম বিলাহিত—
বাংলার পলীকূটীর উপস্থিত—তখনও শ্রীর তাঁহার
খুবই অস্থল, কারাবাসে বজ্রদেহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,
যিকি যিকি জ্বর আসে—অবসন্ন, তপস্কার মুক্তি—

আমার পানে অপরূপ কাষণ্য নেড়ে চাহিয়া কহিলেন
—“আজ আমার খুব কম সময়, এখনই কলিকাতায়
কিরিতে হইবে—আমার সঙ্গে কলিকাতায় একবার
শীঘ্র দেখা করিও—অনেক কথা আছে।” কি
আশ্চর্য্যকরতাপূর্ণ আশ্চর্য্যমুগ্ধ কথার পিছনে
থাকিয়া মরমে অধিপশর দিতেছিল, তাহা আমি
আজও অস্বপ্নরূপে করিয়া শিহরিয়া উঠি। দেশবাসীর
এ সম্বন্ধে অস্বপ্নরূপে কে একাই—সত্যের, সপ্নময়
তাঁহার ভাবানুপূরণে গৃহে নিদ্রিষ্ট দিনে উপস্থিত
হইল। বাটারও পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। সে
রাজভবনতুল্য হুমুজিত প্রাসাদ আজ পুণ্য আশ্রম-
কূটীর মত সরল অনাড়ম্বরতাময়—এ যে রাষ্ট্র-
যোগীর তপোবন—বুকিলাম আজ আমি মহাত্ম্যে
আসিয়াছি। কয়েকটা আশ্রমমুখি তরুণ বন্ধু
পরিবেষ্টিত হইয়া দেশবন্ধু কথা কহিতেছিলেন—
আমি যাইয়া প্রণাম করিতেই তিনি চেয়ার ছাড়িয়া
উঠিয়া আসিলেন, আমাকে টানিয়া পাখের ঘরে
লইয়া গিয়া, মেহের উচ্ছ্বাসে বেন একেবারে
ভাসাইয়া দিলেন। কিঞ্চিৎ জলযোগের পর, যে
কথাবার্ত্তা হইল, তাহার সব কথা সবিতারে এখানে
বলিবার নয়। সংক্ষেপে এইটুকু শুধু না জানাইয়া
পাকা যায় না—চিত্তরঞ্জনের অন্তরাখ্যা সেদিন এক
নূতন উজ্জ্বলোকে সঙ্গরণ করিতেছে—রাষ্ট্রগতের
কলকোলাহলের উজ্জের এক ভাক যেন তাঁর কাণে
বাজিতেছে—এ গম্য কংগ্রেসে যাইবার মাস কয়েক
পূর্ব্বের কথা। তিনি চিন্তাতুলকণ্ঠে কহিতেছিলেন
—“প্রচার কংগ্রেসে যাইব কি—এ সব hetero-
genous কর্ম্মচক্রের উপর আর আমার বড় আস্থা
নেই—সেখানে আমার বাংলা বৈশিষ্ট্য কি বজায়
রাখিতে পারি? আমি চাই বাংলার সাধনার
সার্থকতা, কি সমাজে, সাহিত্যে, কি রাষ্ট্রজীবনে
বাংলার জাতীয় বৈশিষ্ট্য যদি ধীরে ধীরে লুপ্ত

হইয়া যায়, তাহা হইলে যে সব ব্যর্থ হইয়া যাইবে।
আমার ইচ্ছা—এই সাধনার উচ্ছ্বাসেই সর্ব্বাঙ্গরূপে
আত্মনিয়োগ করি—শিবপুরে এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা
করি—জানিও সব ঠিক করা হইয়াছে—কিন্তু
অনুষ্ঠানের বিধান কি—তাহা জানি না!

তিনি বলিতেছিলেন—“কংগ্রেস, বনকরাপ,
বক্তৃতাধি করিয়া আর বেশী কিছু হইবে না—এস,
আশ্রমে আশ্রমে মানুষ গড়ার আয়োজনের ভিত্তি-

রাষ্ট্রতরী কে টানিয়া লইয়া চলিবে? তবুও ইঙ্গদের
উপর নির্ভর করিয়াই নিশ্চিন্ত হইলাম।
দেশবন্ধুর সহিত বখায় সেদিন বুকিলাম—তিনি
অহিংসা নীতির মধ্যদিয়া বাংলার সেই উদার প্রেম-
সাধনার কি নূতন উজ্জ্বলনা অনুভব করিতেছেন—
তিনি আমার ভিজ্ঞাসা করিলেন—“এ সম্বন্ধে
তোমার কি মত?” আমি আমার রিদ্মবন্ধুদের
সমুদয় অভিজ্ঞতার উপর, যে বিস্তৃত জাতি-গঠনের



রাতায় শব্দেহ

পাত করি—তোমরা বেশ এই দিক দিয়ে কাজ
আরম্ভ কর—উহাই আসল কাজ—জাতি-গড়ার
উহাই প্রথম পর্যায়।”

আমি এমট শিহরিলাম—রাষ্ট্রসাধনা পরিত্যাগ
করিয়া চিত্তরঞ্জন আজ কি করিবেন? দেশের
রাজনৈতিক জীবনে নূতন মন্ডাকিনী রায় ছিটাই-
বার যদি কাহারও অধিকার থাকে, সে চিত্তরঞ্জনের
—তিনিও আজ হাল ছাড়িয়া দিলে, জাতির

সত্য অর্জন করিয়াছি, তাহার ভিত্তি যে নিরাময়
দিবা চরিত্র—ভাগবত প্রেমের তাহার প্রতিষ্ঠা—
তাহাই বাক্য করিলাম।

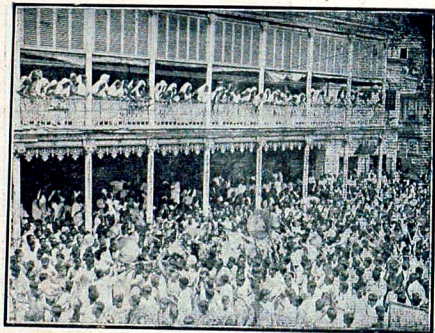
তারপর চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ্যজয়ের কথা। কি
আশ্চর্য্য বিরাট হোমস্কেও তিনি স্বেচ্ছাকারে স্বেচ্ছাকারে
আলাইয়া তুলিলেন—বাঙ্গালী তাহা দেখিয়া বিম্বিত,
অস্তিত, পুণ্যকিত হইল। চিত্তরঞ্জনের এই তুফানময়
কর্ম্মজীবনে কত মিথ্যা কলঙ্কের আরোপ, কত যজ্ঞ

তাঁহার বিরুদ্ধে চলিল, স্বয়ং মহাত্মাও তাহা শুনিয়া বিরক্তিতে বলিলেন—যাহদের বিরুদ্ধে মাহুয যাহা দেখিতে ও শুনিতে চাহে, তাহাই দেখে, শুনে ও বিশ্বাস করে—এ সব ঘটনার কোনই ভিত্তি নাই।

এ সব শুনিয়া আমি ভাবিতাম—এই রাষ্ট্রনেতার গিছনে যে ভিতরের মাহুযটা, তাহাকে দেশ আজও চিনি নাই। রাজনৈতিক জীবনের বত উর্দ্ধ উর্দ্ধতর

নির্মম—হৃদয় শুকাইয়া যায়, চক্ষে অশ্রু পর্যন্ত ঝরে না—ভগবান, বাঙ্গালীকে তুমিই একমাত্র সাহান দাও।”

মতিবাসুর প্রাণময়ী ভাষায় এই মর্ম নিবেদনের পর “প্রবর্তক সম্মেলন” শ্রীশ্রীশচন্দ্র ঘোষ—দেশবন্ধুর জীবনালোচনা প্রসঙ্গে, তাঁর চরিত্রে ত্যাগ, প্রীতি, ও জাতীয়তার এই ত্রিগুণের অপরূপ প্রকাশের কথা হুটাইয়া তুলিলেন। অতঃপর, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র প্র



ওয়েলিংটন ষ্ট্রিটের শোভাযাত্রা

স্তরে তাঁহার স্থান—লোকে তাহা জানিল না। চিত্তরঞ্জন যে বাংলায় নবজাতীয়তার যুগপ্রেরণা অন্তরে অন্তরে পোষণ করিতেছিলেন, তাহা হয়ত আজও ব্যক্ত নয়, যে দিন প্রকাশ হইবে, সেদিন সারা বাংলায় অভিনব ধর্মজাগরণের প্রাবণ আসিবে!

হায়, ইহারই পর অশনিসম্পাত! অপ্রত্যাশিত কলিঙ্গাঘাত! বাংলার জয়যমি লুপ্ত—বড়

চিত্তরঞ্জনকে বহিষ্কৃত করিয়া রাখিলে, সভাপতি মহাশয় উঠিয়া সভার পক্ষ হইতে—নির্মম লিখিত শোক-সঙ্গর পাঠ করেন—

প্রস্তাব

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বিদায়ক স্বার্থত্যাগ, অসীম বদান্ততা, সফটে এবং বিপদে অনন্তসাধারণ সাহস ও বৈরাগ্য, প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত অকপট সরল

ব্যবহার, জন্মভূমির প্রতি প্রগাঢ় অহুরাগ, দরিদ্র এবং সহায়হীনদের সহিত মিত্রোচিত ব্যবহার এবং সাহসভূতি প্রভৃতি অশেষ গুণাবলী সশ্রদ্ধ ও সন্তোষের সঙ্গে স্বরণপূর্বক করাসী চন্দ্রনগরের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশ্রদ্ধাবলী নাগরিকবর্গ এই সভাতে সমবেত হইয়া দেশবন্ধুর অকাল মৃত্যুরাজ্য আন্তরিক শোক-প্রকাশ করিতেছেন এবং এই সভা লোকান্তরিত মহাপুরুষের পতিবিরোধ বিদ্বেষ সহধর্মিণী গৃহস্বজ্ঞা

হইতে দেশবন্ধু সন্থকে কিছু শুনিতে প্রত্যাশা করেন। কিন্তু আমি চেষ্টা করিছি, পাবুছি না—তাঁহার মৃত্যুতে আমি বড় দুর্ভাগ, সত্যি আমার হৃদয় একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে।—সে একটা প্রবল বেহের আকর্ষণ, যাহা আমাকে তাঁহার দিকে টানিয়াছিল। আমার পিতৃব্যের সহিত দেশবন্ধুর সৌহার্দ্য ও পরিচয় ছিল—তাই তিনি আমার গিট-স্থানীয়—আমার জীবনে তাঁর অপরূপ স্নেহপ্রভাব ও



চিতা

শোকাক্ত পরিবারবর্গের শোকে গভীর এবং আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন। “বন্দে মাতরম।” সমস্ত উপস্থিত জনগণী আসন ছাড়িয়া দণ্ডায়মান হইয়া গভীর শ্রদ্ধাভরে এই প্রস্তাব অন্তরের সহিত সমর্থন করিল।

অতঃপর মাননীয় সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত বক্তৃতা করিলেন :—

“আমি জানি, আপনাদিগকে সকলেই আমার কাছ

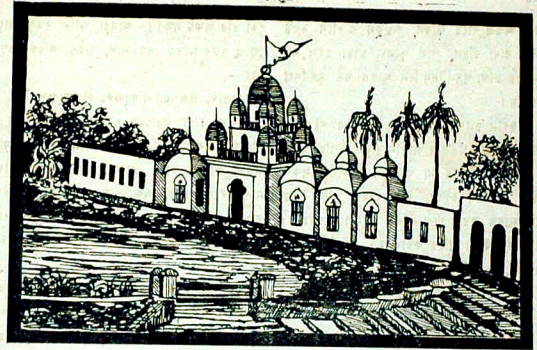
শক্তির প্রেরণা যে কতখানি উন্নতি ও পরিবর্তন সাধন করিয়াছে, তাহা আমি আপনাদের বলিয়া বুঝাইতে পারিবে না। অলস আমাকে, তাঁহারই আদেশশক্তি সচল করিয়াছে, তিনিই আমাকে তাঁর বিশ্বাসের সন্ধারে আশ্রয়প্রদায়ী, আমাকে সকল বিপদে সফটে দৃঢ় অধ্যয়ন করিতে, বীরভাবে কল্যাণ নিরপেক্ষ হইয়া বিশাসস্বায়ী কর্ম করিয়া যাইবার উপদেশ ও উৎসাহ দিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে

ছিলেন—নির্ভীক কবীশ্রেষ্ঠ। তাঁর সত্যনিষ্ঠা, অদম্য শক্তিপূর্ণ, অসাধারণ চরিত্র আমার চকের সমুখে—উজ্জ্বল, মহান, দিবা আদর্শের মতই একটু হইয়া বহিয়াছে। আমার বিশ্বাস মাহুজের মধ্যে দেব-ভাবের প্রকাশ ফুটে—সে প্রকাশ অস্বীকার করা যায় না। তাই ত রামকৃষ্ণের ছাত্র দেবদাসবাবু কাকে বিবেকানন্দ আত্মজীবন বিবাহিয়া ধর হইয়া ছিলেন, দিবা হইয়াছিলেন। দেশবন্ধুর আলোক-সাম্রাজ্য চরিত্রে একটা অসাধারণ বিশেষ ছিল—তাঁর নিজের মধ্যে ভগবৎ-সত্তার এক বিশেষ বাণী, বিশেষ প্রেরণা ছিল। আই তিনি তাঁর রাষ্ট্রগুরু মহাত্মা গান্ধীর কাছে দীক্ষা লইলেও, শুধু তাঁর প্রতি-ধর্মনিষ্ঠা মাত্র ছিলেন না। তিনি স্বয়ং অগ্রে এমন এক শক্তির পরিচয় পাইয়াছিলেন, যাহার অহতুত ব্যাকুল উৎসাহে তাঁরাকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন, তিনি সেই অস্ত্রব্যাণীকে ভাষা দিবার জন্ম যেন পাগল হইয়াছিলেন—আহার নিশা বিস্মাযজ্ঞান সমগ্র তুলিয়া-ছিলেন—মাতৃহৃদয়ের মূলকামনায় তিনি অস্থির চিত্তে শেষ জীবনটা কাটাইয়া ছিলেন।

লোকে বলে—তিনি একজন আত্মপুত্রী autocrat ছিলেন। মিথ্যা কথা। যাহারা তাঁরাকে জানে না তাহারা ই তাঁরাকে autocrat আখ্যা দিয়া থাকে তাঁহার চরিত্রে যে রাষ্ট্র-সাধারণ প্রত্নতত্ত্ববিদ্য বিন্ধ-মাত্র ছিল না। যদি তাঁহার সে অধঃকার থাকিত, তাহা হইলে গয়া কংগ্রেসে অধিকাংশের সহিত মত বৈধম্য ঘটিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ কংগ্রেস হইতে চলিয়া আসিয়া—একটা নূতন কংগ্রেসেরই স্থাপ্তি করিয়া লইতে পারিতেন, কারণ সে ক্ষমতা তাঁহার মধ্যে ছিল—কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই। যদি তিনি

নেতৃত্ব-নিপুণ হইতেন, তাহা হইলে তাঁর বধন শুধু কলিকাতার নয়, সমগ্র বাংলায় প্রভাব ও প্রতিপত্তি সীমা নাই, সে সময়ে নির্ভীকনে হুজুর মল্লিকের সহিত আপোষ করিবার জন্ম এমন করিয়া তাঁহার ঘরে দৌড়াইতে পারিতেন না। দেশবন্ধু আপনাকে নেতা বলিয়া বুঝিতেন না, বুঝিতেন, প্রাণে প্রাণে সত্যই অকৃত্রিম করিতেন—তিনি দেশের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ সেবক—মাঘের পুঙ্খানুপুঙ্খ। তিনি দেশের স্বাভাবিক অধিকারী ছিলেন। কিন্তু শুধু তিনি একজন সর্বোত্তম দেশপ্রেমিক রাষ্ট্রনেতা মাত্র ছিলেন না—তিনি ঈশ্বরবিদ্যায়, ভক্ত ও সাধকশ্রেষ্ঠ ছিলেন। ভগবত প্রেরণার ইচ্ছাতেই তিনি জীবন চালনা করিতেন—তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল—দেশের নরনারায়ণের উপাসনা করা, সেবা করা। এই অনাবিল ক্রীতি-প্রণোদিত সেবাই তাঁহাঃ সাধনার মূলীভূত বিশেষ ছিল। সেই প্রেমের বান্ধীই তিনি সর্বত্র প্রচার করিতে চাহিয়াছেন—কদিমপুর সভার সেই ক্রীতির মুখুন্ডা ছবিই তিনি বাংলায় নূতন ডেউ আনিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। তা' ছাড়া—তাঁর অস্ত্রাভ্যাস সর্বপ্রধান কাম ছিল বাংলার সভ্য প্রাণ ও সভ্য বৈশিষ্ট্যের উদ্ভাধন করা, যাহার বিষয়ে তাঁহার পূর্ববক্তা মতিবাবু ইতিপূর্বেই প্রকাশ করিয়াছেন। বাংলায় বিশিষ্ট শিক্ষা, দীক্ষা, সাহিত্য সভা, বিশিষ্ট প্রাণ, সাধনা, জীবন ও জাতীয় ফুটাইয়া তোলাই ছিল তারপক্ষ—সেই মহাভারতই তিনি তাঁর দেশবাসীর উপরে উত্তরাধিকার হুয়ে অর্পণ করিয়া যিয়াছেন।

এই বলিয়া নির্দল বাবু নীরব হইলে, যের নারায়ণ বাবু সভাপতি হইতে সভাপতিকে প্তবাব দিয়া, অতঃপর সভাভঙ্গ করা হয়।



১ম বর্ষ,
৩র্থ সংখ্যা

প্রবর্তক

প্রাবণ,
১৩৩২

দেশ-গঠন

—:—

এই বিশ বৎসর বাংলার ভাগরণ কালের মধ্যে আশিকার মত এমন গ্রহিন কোনদিন ঘটে নাই। বহুতর অন্বেষণ উপলব্ধ করিয়া, বাঙ্গালী সমাজে, ধর্মে, রাষ্ট্রে, শিক্ষায়, সর্বক্ষেত্রে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিতে উদাত হইয়াছি, ফলে সর্বত্র বিরোধের সাজাই বাড়িয়াছে, কর্মক্ষেত্রে মিলনের রাগিণী বন্ধার দেয় নাই।

তন্মায়ম জাতি নবচেতনা স্পর্শে যখন জাগে, তখন আত্মস্বার্থ সংক্ষেপে পঙ্গুর পরপঙ্গুর সহিত কলহে প্রবৃত্ত হয়, যাহার যাহা ছিল, তাহা ফিরিয়া পাওয়ার চেষ্টায়, সমাজে, ধর্মে, রাষ্ট্রে হুড়াত্তি পড়িয়া

যায়। অপরূপ সম্পদ নিজেদের মধ্যগত থাকিলে জাতির প্রকৃতি হুগুয়ায় বিলম্ব হয় না, কিন্তু আমাদের হুজুগা, সে শক্তির অধিকার হইতে আমরা বঞ্চিত। হুযোগে বিশ্বাস তোমার আমার হাত ছাড়াইয়া—জাতির প্রধান বল, তৃতীয় বাক্তি আত্মত্যাগীনে আনিয়াছে। নৃপংস জাতির আত্মকলহ অকারণ; দুর্বলতাই বৃদ্ধি করে।

বিরোধের মাত্রা বাড়িতেছে বৈ কমিতেছে না, আত্মবিরোধে জাতির মেরুদণ্ডে যদি শক্তি-সঞ্চার হইত, বিরোধ শেষে ভাবিতাম, কিন্তু তা নয়; বিবাতীয় আশীর্বাদ আজ বিশ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালীর

মাথার অঙ্গুল ধারে বসিল, অঙ্গুল বাতাসে তরলি
ঘাটেই বাঁধা রহিল, পাল তুলিয়া ছাড়া হইল না,
আমাদের ভাগ্য-গগন দিন দিন আরও ঘন মঙ্গলি
হইতেছে।

অন্তরীক্ষ হ্রদের কারণ যে আমাদের শক্তিশীন
অবস্থা—আর ভাতির সার্বভৌম শক্তির উপায় স্বরূপ
সে শক্তির অধিকার না থাকিলে আমাদের সকল
চেষ্টাই যে ব্যর্থ হইবে, ইহা আমরা বুঝি, কিন্তু
তাহা অস্বস্ত করার পথে—বিশ্ব আমরা নিজেরাই।
কাঁটা দিয়া কাঁটা বাহির করার মত, একটা শক্তির
সহায়েই, বড় অধিকাংশটা অর্জন করিতে হয়, সেই
শক্তি ভাতির একা—আমরা নিজেরাই সে পথের
অন্তরায়।

শুধু সমাজ জীবনে ভাগরণের চাকলা—এক
লক্ষ্যে চাষিয়া নয়, আত্মপ্রাণকে প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা
আয়োজন, ব্যস্তির অঙ্কুর নির্বাণ, তাই চোটে
পাকাইয়া ইহা প্রকাশ করি, সমাজের অগ্রদূত যে
ব্রহ্মশূন্যকি উহাই আমা মাথা তুলিতে চায়, মধ্যদার
উচ্চ মুখ আদায় করিতে—অন্তে পরে কা কথা।

রাষ্ট্রধর্মে নৈশাচার কথাই আজ দেশের জরাজীর্ণ
মুক্তি নয়—মুহুর্তা নিবারণের সল বাহ্যে যে আজ
পঞ্চাশতাব্দী, অথচ অস্ত্রপ্ররুতি বোধ করার
সামর্থ্য নাই, কাজেই কর্তে বিকৃতি, ভাবের ঘরে চুরি,
যে দিকে দুই দাঁড়, কদাকার জীবনপ্রোত বিয়ের
ফলশ্রুতি বহিয়া বাহ্যের মূল্যের করিতেছে—
তৎপাত্তর জাতি, চক্রে কি ঘুর নাই? আবার
মুগাও, বিশ্বিত- আলা নিবারণ করে।

ধর্মসাধনার ক্ষেত্র অহংকারের তীর্থ। বিশ্বের
অন্যনিকা দেখানে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। যে সাধনা
অন্তরের নিমি, গোপন মণিপুরের স্পন্দনি, হাটে
বাঁজারে তার ক্রয় বিক্রয়ের বচনমুখর দালালের
কলবর। জাতি যে উৎসবের পথে ক্রত অগ্রসর,

ইহা তার প্রকট লক্ষণ—আমরা জানি ধর্মসাধনার
ক্ষেত্রে গুরুত্ব অধিক তবু নাই, গুরুত্ব অধিক তবু
নাই—

“সমাধি: শ্রীকৃষ্ণাথো মদুগু: শ্রীকৃষ্ণগুণঃ।”

কিন্তু তাহা প্রচারের ধন নয়, ইহা সাধনা—
সাধনার মর্মকথা বড় নিমুগ্ন, মধ্যে মধ্যেই ইহার আশ্রয়
অন্তত্ব করিতে হয়। একের সাধা অপরের সাধা
নাও হইতে পারে, অন্ধ ভক্ত এ জ্ঞান হারাইয়া
বাংলার ধর্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রগুলিকেও প্রতিদ্বন্দ্বীতার
কোলাহলে কলহময় ও শান্তিহীন করিয়া
তুলিয়াছে।

আত্মশ্রমের পথে হঠাৎ এইরূপ বিশৃঙ্খলার
জীবনের অভিব্যক্তি অনিবার্য ইহা পড়ে, কিন্তু
শূন্যবর্তী উপায়হীন অবস্থায় চুপন বাওয়া মৃত্যুকই
সমিকট কথা; এই অবস্থা হইতে আমাদের অচিরে
মুক্তি পাইতে হইবে, এবং বিস্তৃত ক্ষেত্রে একাক
লক্ষ্যে রাখিয়া, বাহ্যে সার্বভৌম উন্নতি সাধিত হয়,
তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

সাধা বস্তু লাভ করিতে হইলে সাধনার উপরেই
ভোর দেখাওঁ। মুক্তি বোঝে বাহ্যের মধ্য
ভাঙ্গারের কাই স্বতন্ত্র, আমরা জীবনের সামান্য
উদ্বুদ্ধ বেশবাসীর কাণেই মর্মময়ের স্বভাব
তুলিতেছি।

কি সমাজ, কি ধর্ম, কি শিখাপ্রতিষ্ঠান—সর্ব-
ক্ষেত্রের উন্নতি রাষ্ট্রশক্তির উপরেই নির্ভর করে,
রাষ্ট্রবল হাতে না থাকায়, এবং ইহার অর্জন সুখসাধা
না হওয়ায়, আমরা বুঝাইয়া নাক দেখাই, এই চুরি—
জীবনকে নিরাপদ করে, কিন্তু স্বয়ং ও সবল রাখে না,
পক্ষ হইয়া বাঁচিয়া থাকার সুখ বোধ হয় মৃত্যু ভয়ের
অপেক্ষা অধিক, কিন্তু মরণ তো এ বারণ শুনে নী,
অতএব জীবনের সীমাকাল পর্যন্ত, জাতি বাহ্যে
তোষে, বীর্ঘে, স্বখে, স্বাধীন ভাবে বিশ্বের বৃক টিকিয়া

ব্যক্তিগত পারে, প্রত্যেক কলা, শিল্পকারীর তাহাই করা
কর্তব্য।

এই রাষ্ট্রীয় অধিকার বৃত্তগত করিবার জ্ঞাত,
জাতির ক্ষীণ প্রচেষ্টা নানা আকারে দেখা দিয়েছে,
কোন চেষ্টাই দক্ষিণের পথে আমাদের অগ্রসর করে
নাই এবং সে আশাও অল্পময়ের মধ্যে করা যায় না;
তবে সমাজি রাষ্ট্রগুরুগণ যে পন্থা দরিয়া অগ্রসর
হইতে চাহেন, সে পথে বিশৃঙ্খল উপাদান বাহ্যেতে না হয়,
এদিকে সর্বশ্রেণীর কর্মী যদি দৃষ্টি রাখিয়া চলেন,
হঠাৎ হতল কলিতে পারে।

এইরূপ মনোভাব রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলে,
ঐক্যবল সক্ষম হয়, কিন্তু ইহাই রূপাধা হইয়াছে, কি
বুঝে কি ক্ষুদ্র অস্বাধ্য দলের অস্বাধ্য মত লইয়া,
বিরোধের আশ্রয় ফুৎকারে ফুৎকারে প্রবল করিয়া
নিশ্চেষ্টের পর আশ্রয় ধরাইতেই আমরা পটু—দীর ও
স্বয়ং মতিভেদ, একই লক্ষ্যে গতিশীল বিভিন্ন জীবন-
প্রবাহ একত্র করিয়া বিস্তৃত সৃষ্টিতে জগৎগত দাবী
অধ্যায়ের জড় বহিঃ আশ্রয় প্রতিপক্ষের সমুদয়ে গিয়া
পাঁড়াইতে পারি। ছয়বস্ত্রের প্রতীক হইত, কিন্তু
ইহা আজ অসম্ভব।

প্রাণশক্তির বাধে খরচ দিনে দিনে বাড়িতেছে—
হিসাব করিয়া ব্যয় মতোচের বিধান কল্পনার স্থান
হইতে কাজে পরিণত করা আর ইচ্ছা উঠিতেছে
না, জীবনে যেন শনি লাগিয়াছে, এমন করিয়া
আর কিছুদিন চলিলে, এই বিশ বৎসরে যে আশার
বিদ্যুৎ বৃক দরিয়া দেশের তরুণ প্রাণ উৎসাহের
ইন্দ্রেনে তাজা আছে, তাহা মুছিয়া পড়িলে,
অবশ্যের চাপে এমন মড়ক আসিবে—তাহার দায়
হইতে একজনও রক্ষা পাইবে না।

বিশৃঙ্খলিত তালে তালে পা ফেলিয়া চলার
বদল ভ্রামহীন হই, উগুড় হইয়া পড়িতে হইবে,
অপরের পদভায়ে আমরা চূর্ণ হই। বিচার ময়

উচ্চারণ না করিয়া, মধ্যাচার মূল্য আদায়ের কোণ-
হল, আজ বড় ভীষণ অজ্ঞতা—দূরদৃষ্টিহীনতার
পরিচয়। আভিজাত্য, সম্পদ, বিজ্ঞা, ধর্ম প্রভৃতির
গৌরবময় আশ্রয় ছাড়িয়া প্রত্যেককে আজ দরিয়া
পাঁড়াইতে হইবে, কাজালের মাঝে, দীন দরিয়া
মুগের দলে। এই বিশাল কক্ষক্ষেত্রে আত্মাধারের
পরিমায় ব্রাহ্মণের মধ্যাচার, কৃষিকার তেজস্বিনী,
বৈজ্ঞানিক বণ, শিল্পের বিনয়, স্বতঃ প্রকাশিত হইবে।
জ্ঞান, ধর্মের সহস্র কেরী করিয়া প্রচারের প্রয়োজন
নাই, বর্ণাশ্রম ধর্মের বিচিত্র ধ্বজাও হস্তে পথে
পথে শোভাযাত্রা করিয়া হিন্দুধর্মের জয় দিতে হইবে—
না, বিশ্বের ধরবরে জাতিগততার সর্বোত্তম কর্মী
স্বয়ং বিচার্য আত্মাধারের বর্ণাধার বিতরণ করিয়া
আমাদের স্বজ্ঞ করিবেন।

আমাদের মটকায় আশ্রয় ধরিয়াছে—বাতুলের
মত বংশমর্যাদার সুগুণী তুলিয়া আমরা আত্ম-
পরিচয়ের বাহ্যক্ষেত্রে আত্মহারা, কাণ্ড কর্তে সমাজ-
সাধারণের বাঁধা গুণ, কেহ বা আত্মসাধনার মাপ-
কাঁড় হাতে পঞ্চ জীবনের পরিচয় দিতে উদ্ভূত—
অলস ছাদের চাপে, আমাদের যে জীবন্ত সমাদি
হইবে—সে হুঁস নাই, আমরা তো আজ মানুন্স্ব
নাই, যে হুঁস হইয়াছি—নিচু অহংকারে। অঃ-পার-
শুভ অহংকার!

শক্তির অপব্যয় বন্ধ করিতে হইবে। এ জাতির
আজ সমাজ নাই, বর্ণ নাই, ধর্ম নাই, বাহা নাই
তাহা লইয়া কালক্ষয় ঘোরতর তামসিকতা, প্রচণ্ড
জ্বর। আমরা মজ্জার দল, নৃতন ভারত-
নির্মাণের কাজে শ্রম দিতে জন্মিয়াছি, বয়সের মত
প্রাক্তর আত্মাধার হইয়া, দীন দরিয়া, ব্রাহ্মণ চতালে,
জ্ঞানী মূর্খ নির্ভিশেষে প্রাণচালা শ্রম দিব, জগতের
এই ভ্রামহীন হই, উগুড় হইয়া পড়িতে হইবে,
অপরের পদভায়ে আমরা চূর্ণ হই। বিচার ময়

মহেন্দ্রই বিকৃত ভাবভ্রান্তি পরিশোধিত হইয়া নূতন সৃষ্টি লাভ করিবে, সে ভবিষ্যৎ ভারত জাতির সমাজ নির্ময়ের আর প্রয়োজন নাই, উহা শুধু অঙ্গল বল্লন—বিকৃত মস্তিষ্কর বশ্রচরন।

ভারতের চারুপুষ্টি যদি অমর—হবে জাতির মুক্তির বর প্রাধে মাথা দিয়া সে পৃথিব্য সার্থক কর, ভারতে বহি জগৎগুরু অধিষ্ঠান সভ্য, তবে বিশ্বের মাথা তাঁর চরণে লুটাইয়া তার সাক্ষ্য দাও, ভারতের ধর্ম যদি সনাতন, শাস্ত্র, তবে সে তোমাদের জীবনের পৌরবে সফল হউক, বিশ্বের কণ্ঠে সে বাক্যতির অধ্বনি উঠুক,—আর বাচ্যোপরে দিন, বিনা পরে শুধু কথার জগতের হাটে ভারতের মূল্য নির্ধারণ হইবে না, সমাদরে কেহ তার উচ্চ বিবেচন দিবে না।

চাই জীবন—জীবন হইতে দূরে দাঁড়াইয়া, ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র—কোন কথারই মূল্য নাই, আর এই জীবন, ব্যক্তিগত জীবন নহে, সমষ্টির জীবন, জাতির জীবন। ব্যক্তির জীবন ধর্মের প্রভাব বহুবার প্রদর্শিত হইয়াছে। আর একটা জাতিকে ধর্মজীবন লাভ করিয়া, বিশ্বব্রহ্মের আরতির বাদ্য বাজাইতে হইবে। এই আরোজনের বাহিরে যে কর্ম, যে প্রতিষ্ঠান, যুগধর্মের সহিত উহাদের সম্পর্ক নাই, আগাহার মত মূল সুদের রশপোষক এইগুলি বাহ্যতে কোথাও প্রসার না পায়, মিতব্যয়ী জাতির সৈনিক খর চুটি রাখার পরকার, অপর নিবারণ না করিতে পারিলে, আমরা সর্ববাস্ত হইব।

শেণে যে সকল ঋণও খণ্ড অসংখ্য সংহতি গঢ়িয়া উঠিতেছে—তাহাদের লক্ষ্য যেখানে জীবন, অবশ্রান্তাবী রাষ্ট্রীয় মুক্তির সেখানে একটা প্রবল ঝোক থাকিতে পারে, ইহার অস্বীকার চাতুরী অবশ্য স্বেচ্ছাচিত্র অস্ত্র কিছু নহে, অস্পষ্টতার খেয়ে

সত্যের উপর নিখার আবরণ নবর জীবনে তোরাজের উত্তাপ দেয়, কিন্তু পরিণামে শ্রেয়ঃ বিধান করে না, তাই গোড়া হইতে সভ্য ভিত্তির উপর ভর করিয়াই নির্মাণের সৃষ্টি গড়া ভাল, পৌজামিল আপাততঃ চলিতে পারে, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে ইহা বিয়ের কারণ হয়।

রাষ্ট্রীয় অধিকার—জাতির সার্বভৌম উন্নতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজন, এই রক্ত এইদিকে শাণ্ডাবিক আকর্ষণ ও সঙ্গে সঙ্গে ইহা আয়োজন করার উপায়ের কথা অগ্রাহ্য করা যায় না। উপায় লইয়া মত-বিরোধ হয়, রাষ্ট্রক্ষেত্রে এইদিক সৃষ্টির ইচ্ছাই কারণ। আমরা রাষ্ট্রস্ফীতির বাহিরে দাঁড়াইয়া কাজ করিতে চাই, রাষ্ট্রসাধনার প্রয়োজন নাই বলিয়া নহে, প্রকৃতিভেদে কার্য ভেদ হয়, তাই বলিয়া রাষ্ট্র-সাধকদের কাছে অনাস্থা প্রদর্শন করা আমরা মুক্তিযুদ্ধ মনে করি না, কোন পথ দিয়া জাতির মুক্তিপথ পায়ে হইবে, তাহা ছোর করিয়া কেহই বলিতে পারে না। বর্তমান ভারতে—জাতীয় কর্মের দুইটি ধারা পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে—রাষ্ট্র ও জাতি গঠন। এই দুই কর্মধারার অঙ্গাদী সখ্য আছে; ইহাও দুই পক্ষ বিহনের মত, এক পক্ষ কাটিয়া বাদ দিলে বোধ হয় জাতীয় কর্মস্রোতে ভাঁটা পড়িবে। মহাত্মা গান্ধী তাই, রাষ্ট্রক্ষেত্র দেশবন্ধুর হস্তে নির্ভর করিয়া জাতিগঠনের কাজে আশ্বিনিয়েয় করিতে উত্ত হইয়াছিলেন। চিত্ত-রসায়ের অকাল সূচ্যুতে কর্মক্ষেত্রে বিস্কৃত হইলেও, তাঁর সে সঙ্কল্প অটল আছে। কংগ্রেসের কার্য পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর হস্তে প্রস্ত করিয়া, খুব সম্ভব স্বয়ং জাতিগঠনের কাজেই তিনি জীবনের সব শক্তি ঢালিয়া দিবেন।

রাষ্ট্রক্ষেত্রেও ঐক্য প্রতিষ্ঠার সাড়া পাওয়া যায়, কিন্তু যে মন ও জ্ঞান পুষ্ট হইয়া ঐক্য আদর্শ চাই,

পে জ্ঞান মনের ক্ষেত্রে ঐক্য সম্ভব নয়। ঐক্যাল মুক্তির কথা আমাদের অন্তর্ধানীর কথা নয়, সুবিধা-বাদের কথা, স্বাধীনিকির কথা, যেখানে সুবিধা, স্বার্থ, সেইখানেই সর্বাধীন। অন্ধতা; ঐক্য দ্বিত্য শক্তি, নিঃস্বার্থ ঐক্যগতপ্রাপ্ত জীবনেই ফলে, তেমন ভাগবতপারায়ণ মাম্বব কর্মক্ষেত্রে খুব বিরল, কাজেই অটনেশ্বর বাবা জাতিকে মারও দীর্ঘ দিন ভোগ করিতে হইবে, কিন্তু মুমূর্ষু অমরা—আরও আঘাতে কি আমরা টিকিব? রাষ্ট্রনীতির ঊটল সমস্ত মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি মহাপ্রাণ নেতৃগণের স্বদরশনে অনেক পরিমাণে দূর হইয়াছে, বিপ্লবানীতি ভারতের রাষ্ট্রসাধনার যে একেবারেই উপযোগী নয়, অন্তরে বাহিরে ইহার প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। এই বিশাগ শেণে, বিপুল জন সাধারণ মধ্যে বিপ্লবের বাণী কারও কণ্ঠে যদি অল্পদূরে ধ্বনি জ্বলে, তাহা উপেক্ষার, অনাহার নীরব হইবে, তাহার অজ্ঞ অনন্যতাদের বা রাজপুরুষদের ব্যস্ত হওয়ায় কোনই প্রমাণ নাই। তারপর সহযোগী অঙ্গসংযোগের কথা, ইহার মীমাংসাও হইবে, সহযোগ বলিতে ভারতের বৈশিষ্ট্য, ব্যতীত লুপ্ত করা বা আশ্রয়-প্রাপ্ত হওয়া তেজ না, সম্মানে সহযোগ নীতির ব্যবস্থা দেশনেতৃগণ করিতে চাহেন, রাজপুত্রের সহায়ত্বের উপরেই ইহা নির্ভর করে, এই ভ্রম পর-হস্তগত ধনের মত, ইহার চরম মীমাংসা না হইলে রাষ্ট্রক্ষেত্রে দেশের অবস্থা কিঞ্চিৎ দাঁড়াইবে, তাহা নির্ধারণ করা যায় না। তবুও পরাধীন জাতির পক্ষে, রাষ্ট্রক্ষেত্রেও বাহ্যতে একমতে রাষ্ট্রনেতৃগণ কার্য করিতে পারেন তাহার উপায় স্থির হওয়াই বাঞ্ছনীয়, ব্যক্তিগত মত বা আদর্শের সংখ্যানি রক্ষা না হইলেও, ঐক্যবল মুক্তির জন্ত, নেতাদের আজ একটা সামঞ্জস্য করার পরকার হইয়াছে।

কিন্তু জাতিগঠনের কাজে—বিভিন্ন কর্মস্রোত বিচলিত হইয়া না হইয়া, সংবৎ ভাবে বিশাণবক

সমুদ্রের মত বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে রচনা করিতে যেন পরাধীন না হয়। নির্মাণের কাজে রাষ্ট্রনীতির চুল-চেরা স্বার্থ ও আত্মক প্রবল রাখার চাতুর্য্য নাই, ইহা আত্মদানের ক্ষেত্র, দেশবন্ধে আত্মহুতি দিরা সার্থক হওয়াই এক্ষেত্রে পরম পুরুষার্হ, দেশের সর্ব-বিধ কর্মক্ষেত্রে কর্মীগণ সম্মিলিত হইলে, গঠনের কাঙ্ক্ষিত সম্পাদিত হইবে, অবশ্রান্ত ব্যক্তিগত জীবনের স্বাধীনতা যেমন সমষ্টিগত জীবনোপায়নের ক্ষেত্রে কুঠি হইয়া কিন্তু ব্যক্তির ক্ষুধিত অগেকা সমষ্টি জীবনের ক্ষুধিত বিধান যে জাতির অধিক কল্যাণের কারণ ইহা অবশ্যই, এইজন্য ব্যক্তিগত স্বয়ং স্বাচ্ছন্দ্য স্বাধীনতার হানি ক্রিয়াও আমরা সমষ্টি গঠনে অঙ্গদার হই, সমষ্টির সঙ্গে ব্যক্তির যল্লৎপরিচয় স্থাপন হইলেই কুঠা-টুহু অপসারিত হয়,—এইজন্য প্রতি সমষ্টির আত্মদান এই বৃহৎ কর্মে প্রযুক্ত না হইলে, নির্মাণের কাজে আমরা আশাহুপ্ত কল পাইব না। তাই বাংলায় অগণ্য কর্মীগণকে আর একমু হইয়াই, জাতি-গঠনের কাজে অঙ্গদার হইতে বলি, “প্রবর্তক সম্মত” ইহার জন্ত প্রস্তুত হইয়াছে, মরত এই বিশাণ সম্মত রচনার আয়োজনে ব্যক্তির উৎসর্গের মত, হুনিমিত্ত জুস্ত জুস্ত সমষ্টির আত্মদান ঈশ্বরের আশ্রান, কৃপ-মণ্ডলুকের ক্ষমতা হইতে তৎবান আমাদের মুক্ত করুন, আমাদের মর্গাদা, বোগতা, আমাদের কর্ম-নিপুণতার গর্ভে উৎসর্গক্ষেত্রে মধ্যে আত্মহুতি দিয়াই ইহার মূল্য নির্ধারণ হউক। বাংলার জুস্ত জুস্ত সম্মত বৃহৎ সম্মত রচনা করিয়া, ঐক্যশক্তি বিজয় করি স্থাপন করুক, ব্যক্তির অঙ্গদার দূর করার আত্মদান অগেকা সমষ্টির অঙ্গ-ভঙ্গ করিতে আরও মর্মভেদী, চীৎকার উঠিবে, নিরাম কর্মযোগী বাংলায় নব্য-ভাষিক—উদার বৃহৎ স্বয়ং পুষ্ট হইয়া রাষ্ট্রনীতির বাহিরে, বিপুল কর্মক্ষেত্রে রচনার জন্ত আর মহাসম্মত পূর্বে আত্মদান কর, অঙ্গদার হস্ত হইতে জাতি মুক্তি লাভ করুক।

জাতি-দর্শন

—••—

আর নয়—উঠ। বসিয়া বসিয়া দিন গণিও না, মণিগাইয়া গড়িয়া উঠিবে তোমার অহুত্বের খেলাই কাশক্ষয় করিও না। জীবন প্রসারিত করিয়া দাও—ভগবানের ইচ্ছায়। তাঁর শক্তিতেই তোমার সবখানি উর্দ্ধমুখী প্রেরণাপূর্ণ, সমুন্নত করিয়া ধর। আর যুক্তিভঞ্জন, মনের ছোট বড় প্রবোচনাদি আপনাকে বিভ্রান্ত করিও না। সরল, অনাহত গতি-বেগে, তাঁর সত্য স্বতন্ত্র ইচ্ছাটিকেই সর্বত্র করিয়া লও—অগ্রসর হও, দিবাধাণ তোমার সমুখে। তুমি চলিলেই; চরনের দাপটে পথ করিয়া লইবে, পথের জ্ঞান ভাবিও না—পাথের ঐশ্বর্য উপকরণ, তাহার জ্ঞানও চিহ্ন আর অবশ্যক কি?—চিন্তায় ত বস্তুরূপিত হয় না। তপস্তার অনিবার্য আত্মপ্রকাশ যে সিদ্ধি ও ঐশ্বর্য, তাহা তপস্তার অঙ্গগামী হইয়া সঙ্গে সঙ্গে ফুটিয়া উঠিবে—তপস্তাই সব কিছু সমাধৃত করিবে, স্থান ও কালকে কবায়ত করিবে, জীবনের রিক্তি-নিঃশব্দ নদীমধ্যে কণাধোগ্য রাষ্ট্র-মধ্যে নিমগ্নিত করিয়া তুলিবে। তুমি শুধু ভাগবত লীলাসমূহে পাল তুলিয়া ভাসাইয়া দাও তত্ত্বাধানি, আর অহুত্ব হাওয়ায় পৃথক প্রতীক্ষা করিও না। প্রতিফল অহুত্ব কি, সবই ভগবানের ইচ্ছা-রূপিণী মহাশক্তি হস্তে চালিত, তোমার জীবননীতি, সাধনশোভন সবই তাঁর লীলা-প্রবাহধারণের ভক্ষীমাত্র। উঠ, আর কালের ঢেউ গতিতেই অমূল্য জীবন খোঁষাইও না—ভগবানের আনন্দরূপটি বৃক্ষে ধরিয়া, সচল পুঙ্কে, আগাইয়া চল—তুমি আত্ম শক্তি-মুষ্টি, তোমার মুক্ত গতি-বিলাস আর কেহই রুদ্ধ করিয়া ধাঁড়াইতে পারিবে না, বন্ধ, বটনা, মন, চিন্তা, সাধা প্রকৃতি তোমারই গতির ছন্দে, লীলার আনন্দে তালে তালে ছন্দ

করিলে কি? কেন এ ভাবনা? প্রথমে কণ্ঠ-স্রোতে বাহ্য ভাষিয়া আসে, তাহাই আনন্দ চিন্তে করিয়া যাও, তাহাই ইচ্ছা, এইটুকু ওপু নিত্য স্মরণ রাখিও; ফলাফলের জ্ঞান উদ্বিগ্ন হইও না। অভ্যাসে মন ফলাফল আর চিন্তামুক্ত হইবে, নিকাশ চিন্তাপটে নির্মল চিন্তাভাস ফুটিয়া উঠিবে—তাহাতে ভাষিয়া উঠিবে কত সত্য-রূপ, নূতন বিচিত্র চিন্তা-বাণী—একটি বিত্তময় আদেশ-জ্ঞান বোধে উদয় হইলেই আর ভাবনা নাই; তখন কণ্ঠের নিরন্তর হইবে সেই অস্বাভাবিক আদেশবাণী। উহারই অবাধ্য নির্দেশে উঠিবে, বসিবে, চলিবে, ফিরিবে—তোমার নিজের আর তখন কিছু করিবার থাকিবে না। সবই দেশাইয়া, জনাইয়া, ব্যাখ্যা দিবে সেই ভগবানের বাণী, তুমি যন্ত্ররূপ, নিশ্চিন্ত অকৃত্ত জন্মে উহার কেবল অঙ্গধারণ করিও—কোথাও উঠাকে বাহ্যত, ক্ষুদ্র, নির্বাক হইতে দিও না। সিদ্ধ যোগীর ইহাই কণ্ঠনীতি, তুমি এই প্রকৃষ্ট কণ্ঠস্বর্য অবধারণ করিয়া অগ্রবর্তী হও। ভগবানে যে আত্মসমর্পণ করে, তিনিই তাহাকে এই যোগপথে আকর্ষ করিয়া ধরেন, তাঁর পরম আশ্রয়ে অটল ও নির্ভর হইয়া তুমি যোগ-পরায়ণ ও সিদ্ধ চরিত্র লাভ কর। যে ভাগ্যভাষ্যী, তাহার বর্ণে ব্যত্যয় মাই, সাধনার প্রত্যাবার নাই; ভগবান স্বয়ং তার মধ্য দিয়া কর্ম করেন। সাধনাও

আবশ, ১৩৩২]

জাতি-দর্শন

১৩২

তার নয়, ভগবানের। এক্ষণ যোগজীবনের উপর তার করিয়াই ভারতের সিদ্ধ কর্ম সম্পাদিত হইবে। যোগীর সমষ্টি লইয়াই নূতন ভারতের দিবা জাতি গড়িয়া উঠিবে।

হাই যোগমুক্ত চরিত্র। আর এক্ষণ যোগসিদ্ধ, ঐশ্বর্যপাতি, অনাহত, দেবভাবপূর্ণ চরিত্রের হার গাঁথিয়াই এক দিবা জাতির নির্মাণ করা—আমাদের সাধনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সাধনা মাহুত্বের নয়—ভগবানের। উদ্দেশ্যও আমাদের নয়—তাঁহাই। ভাগবত ইচ্ছার যে স্বতন্ত্রত্বের সন্ধান পাইয়াছি তাহাই ধরিয়া নব সমষ্টি নির্মাণে আমরা বহুদিন উদ্যুক্ত আছি। সমষ্টির মিলন আত্মা। উহাই ‘স্বয়ং মণিগণাইব’ বিশিষ্ট প্রাণকণ্ঠকে একত্র গাঁথিয়া, এক দিবা শক্তির ঘনমুষ্টি রচনা করিয়া তুলিতেছে। এই নির্দেশাধিন, আত্মার সম্বন্ধেই প্রধান কথা। তাই অভেদ সম্বন্ধতঃ আশ্রয় করিয়াই, সমষ্টির সাধক ও সাধিকাকে সম্মত-তপতা বরণ করিয়া লইতে হয়। অভেদ অহুত্ব নীতি হইলে সর্ব-স্বরূপ সিদ্ধ হয় না। সত্য অসিদ্ধ হইলে, জাতিভেদ প্রচিহ্নিত হয় না। এ জাতি—ভারতের নব জাতি। তার ভিত্তি—একটা অসামধারণ স্বাধীনত্ব। তার তপস্তা—দিবা, যোগিক, মিশ্রশাস্ত্রিক এক নূতন জন্ম ও কণ্ঠের অবধারণ। ‘জন্ম কণ্ঠ চ মে দিব্যং ন বেদিত তৎকঃ’—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই অবতরণ-বাণী যুগে যুগে নূতন ভাবে ও রূপেই সম্প্রসৃত হয়। এ যুগের বিশেষরূপ—এক মহাব্যতীত, অখণ্ড সমষ্টি-বিগ্রহ। এই সমষ্টি-বিগ্রহেই নরনাগরণের সম্মিলিত স্বরূপ এবার আত্মপ্রকাশ করিবে। বিশ্বের ইতিহাসে—তাই ইতিহাসে পাঠ করি, ধার করা জাতি-নিকিত্তি যুক্তি মৌলিক আত্মজ্ঞানের দায় ত আর মাথায ধরিতে চায় না। তাই আমরা এমন শিক্ষা সংগতি প্রতিষ্ঠান সব গড়িয়া, কোথাও জাতিশাস্ত্রিক স্থির রূপবিগ্রহ দিয়া উঠিতে পারিতেছি না। Organism কি মহাজীবী নব, যে গড়নের জড়ভাবে তাকে দেখিলে ও পাশ্চাত্যের অহঙ্কার গাঠীর দাঁতের অহঙ্করণে ফেলিয়াই চলিবে? জীবকে যে জন্মদান করিতে হয়; জাতির সৃষ্টিও যে একটা নবজন্ম; তাই তপ-

বদিয়াই কি তাহা আত্ম আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা ব্যাকুল, গর্ভবেদনাতুর—প্রসূতির মত নব জাতির স্বজন-কামনায়, নিঃশিঙ ওপস্ত্রাঃ আপনায় স্বখানি উদ্বিগ্ন তুলিয়াছে? জাতীয়ত্বের ওপস্ত্রা যদি নির্মাণ হয়, তবে তার মূল, কেন্দ্রস্বরূপটিই আমরা পাইয়াছি। এক্ষণে ইহাকে তিলে তিলে স্বজনের পরিপন্থিত ও পরিপূর্ণতার মধ্যে লইয়া বাহিতে হইবে।

জাতি একটা সৃষ্টি—এই কথাটি মনে রাখিতে হইবে। বাটীর স্থায় সমষ্টি—ইহাও আত্মবান, বিশিষ্ট, মৌলিক স্বরূপতঃ। সমষ্টি—এক মহাপ্রাণ মহাজীব, আত্মপ্রতিষ্ঠিত, অখণ্ড মহাবিগ্রহ। প্রকৃতির এই যে নব সৃষ্টি—তার উপাদান কারণ, বিশেষ বিশেষ বাণী আত্মা ও প্রাণ। কিন্তু স্বজনে উহা অখণ্ডতায় হইয়া যায়, অভেদাদ্বন্দ্ব না হইলে সৃষ্টি-শিল্পই সার্থক হয় না। পাশ্চাত্য ভাবদীক্ষিত বিকৃত বুদ্ধিবৃত্তি লইয়া আমরা এই কথাটি আত্মকাল বড় সাংজ্ঞে তলাইয়া অবধারণ করিতে পারি না। সাংজ্ঞা একটা organism বৃষ্টি—ইহা পাস্চাত্য নব সমাববিজ্ঞানেরই কথা; কিন্তু জাতি-নির্মাণে ইহার ভারতীয় স্বরূপ ও ক্রমোপবিভাগও জানি না। Organism স্বজন না করিয়া, federation গড়িয়া তুলিতেই কৃৎসিত গড়ি। কারণ, উহাই যে আবার ইউরো-আমেরিকার ইতিহাসে পাঠ করি, ধার করা জাতি-নিকিত্তি যুক্তি মৌলিক আত্মজ্ঞানের দায় ত আর মাথায ধরিতে চায় না। তাই আমরা এমন শিক্ষা সংগতি প্রতিষ্ঠান সব গড়িয়া, কোথাও জাতিশাস্ত্রিক স্থির রূপবিগ্রহ দিয়া উঠিতে পারিতেছি না। Organism কি মহাজীবী নব, যে গড়নের জড়ভাবে তাকে দেখিলে ও পাশ্চাত্যের অহঙ্কার গাঠীর দাঁতের অহঙ্করণে ফেলিয়াই চলিবে? জীবকে যে জন্মদান করিতে হয়; জাতির সৃষ্টিও যে একটা নবজন্ম; তাই তপ-

দিক্ মহাশয় ভাব-মুখে এমন এক বড় গুণার্ণবগত বাক্য-বাহির হইয়াছিল—“..... A nation is born; if time is ripe, its birth is but a moment's affair.”

চাই নব জন্ম। শুধু হই একটা বস্তুর নয়— একটা মহাশক্তি। এই জাতীয়তাই ভারত জন্ম-গ্রহণ করিতে চাহিয়াছে। জন্মের পূর্বে যে বিশেষ দশ শতাব্দীব্যাপী গর্ভবৎসনা—তাহাতেই বুঝা যায়, কত বড় একটা মহা-সম্ভাবনার এখানে ছিলে ত্রিণে অঙ্গুপুষ্টি চলিয়াছে। আমাদের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, রাষ্ট্রনৈতিক—অন্তর ও বহির্জীবনের সকল শক্তিবৃহৎ সমাহৃত, বহুদিশাগ্রান্ত মিলিত প্রেরণার চাপে, যে মহাভক্তের চুম্বিত হওয়ার দিন বনাইয়া আসিতেছে—স্বতন্ত্র একটা পরম মুহূর্তের জন্তই এই যুগযুগান্তরব্যাপী যে আনন্দ-প্রকাশের আয়োজন। সে মহাভক্ত যে কোণে ও কলমেই সম্ভবিত পাঠে—এমন তীব্র, আশ্রয়, বলস্বত্ব অধিন্যে বিশ্বাস নাই—আমরা কেন সমষ্টি-চেতনার কেন্দ্রে কেন্দ্রে আত্মহতীর অবদান লইয়া পিছুইব না? জীবদেহে জীবাত্মপরমায়ের মত, আমাদের ছোট বড় সকলদিক্ ব্যাপ্তি প্রাণকর্ণাণ্ডগণিকে ‘মহাপ্রাণ’দেহে নিশািহা, একাক, একাক কথিতা তুলিব না? স্বতঃবৎ মহাপুরুষ হই, বিচুতি হই, অবতার হই, এই যে না জাতক—সকল মহাপুরুষের চেয়ে মহান, পূর্ণ পূর্ণ রূপের শ্রেষ্ঠ বিচুতি, স্বেচ্ছাচর্য্যের চেয়ে বিরাট মহাপুরুষ, সকল অবতার বা বিচুতিশক্তি এই মহাদেবীই জীবাত্মকমিতা মাত্র হইয়া আপনাকে নিশািহা সে মহাপুরুষকে সম্বরণ করিয়া তুলিবেন। এত বড় একটা জাতীয়ত্বের মহাদেশ—ইহাই আশ্চর্য্য ভারত বিশ্বকাগ্রে লাগিতেছে, ওগো তোমারা যদি

জ্বর বিশাশী হও, আপনাদের সত্য বুদ্ধি দিয়া এই মহা-ব্রহ্মপুত্রকে চিরিয়া বিশ্লেষণ বা পরিমাপ করিতে চাহিও না—অপেক্ষা কর, শুধু এই মহাসম্ভার ঘোর নয়ন উদ্দীপন অপেক্ষা কর—অহুতীশক্তি সজ্জ হও, তার প্রবাহমান মহাশাস্ত্র শাসপরশ অহুতব করিয়া আশ্রয় হও,—আকাশে দেববালাবুগ, তেমনা নবজাতকের জন্মকণ্ঠে উল্লু উল্লু জয়ধ্বনি দাও—বিশ্ববরণ্য দেব-বাহিনী, তোমরা সম্মিলিত ক্রোচ্ছকার আবারণ এই নব শিশুকে সকল আপদ হইতে ভয়ভুক্ত কর, সুরক্ষিত কর—একাদশ গ্রহাধিপ, নিকপাল ও প্রজাপতিগণ তোমরা সকলে ক্রতযোগ্যবৃষ্টি দানে এই নূতন জাতি-দেবতাকে চিরদিন আশীর্ষিত কর।

এই নবজন্ম-পেদ, নব জাতি-দর্শনই আজ পাটনাম— ভারত এই সমষ্টি-শক্তি লাগিতেছে, ভারতের মহাভীর্ষে যুগ-শক্তি নব বিগ্ৰহে ন্যাসিতছেন— তাঁর আবির্ভাবের দিন আগত প্রায়। আর-প্রথম জননী আমাদের—অবহিত হও তোমরা, উৎকর্ষ রও, প্রস্তুত রও—বুঝা কলকঠের শোরগোল তুলিয়া মায়ের যোগনির্ভাভব করিও না।

আজ কে আজ ঘোর, যুগদশী, ভবিষ্যদ্বিশাশী, ভারতের ভবিষ্যৎ বড় উজ্জ্বল, বড় হিম্মতম,— আত্মপ্রাণের অবদানে মায়ের নব নিশািহাণের উপাধায়া যোগাও—ঐ যে জননী বিশ্বকারণভূতা, মা আমাদের স্বত্বগর্ভাধিগণী, নবজাতকস্তির প্রণবিনী! তোমরা তাকে বোঁয়া, প্রণব করিয়া পিছুও— ভারতের পুণ্য হৃদয়কাগ্রে আজ নব জন্মান মহাভারত-জাতিরঞ্জণী (New Indian Nationalism) দেবশিশুকে বন্দনা গাহিয়া অভিনন্দন করিয়া লও।

হিন্দু সমাজের ধারা

—:—

হিন্দু ভূমির নিকট বেচ্ছার বহনদশা গ্রহণ করে, কিন্তু ভূমার আনন্দ বহন তাহাকে স্পর্শ করে, তখন সে কাহারও কথা শুনে না—“কারও কথা আর কি শুনি, আমার প্রাণের ঠাকুর জেগেছে,” ইহা ভূমানন্দে মাতোয়ারা হিন্দুরই গান। হিন্দুজাতির উন্নতির মূলে এই গান-ও-প্রাণ চিরকাব্য কাব্য করিয়া আসিয়াছে।—মূলমানবরূপে এমনকি তৎপূর্ব রাত্তপুতরূপে হিন্দুগণ কঠোর সমাজনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিজনিগের মধ্যে আত্মরক্ষণী সংহতিশক্তির বিকাশ সাধন করেন, কিন্তু তাহাতে ঊঁহার প্রত্যেক মানবকে সমান আসন প্রদান করেন নাই, রাষ্ট্রীয় ও অর্থ-নীতিক জগতের ছায় ধর্ম-ও-সমাজ জগতের ঊঁহার শ্রেণীবিভাগকে ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। অনেকে অধুমান করেন, মূলমানবদিগের নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্ত হিন্দুগণ জাতীয় বিবিন্ধ্যনিষেধগুলি প্রবল করিয়া তুলেন, অতদিক্ বৌদ্ধ-প্রভাব নিম্ন করিতে তাঁহারা প্রতিমাপুঞ্জার বিপুল আয়োজনে হিন্দুসাধারণকে বিমুগ্ধ করেন, কিন্তু মূলমানবরূপের মধ্যেই আমরা ভূমানন্দে মাতোয়ারা কতগুলি সন্ত ও সাধুকে দেখি, যাহারা হিন্দুদিগের পূর্বোক্ত সমাজনীতি একবারে অমাত্য করিয়াছিলেন, যাহারা ঐ যুগের প্রচলিত ধর্ম-নীতিও অগ্রাহ্য করেন—ঊঁহারা সকলেই নিজ নিজ অশ্বরম্যম্বা জাগ্রত ‘ঠাকুরের’ কথাই কহিয়া দিয়াছেন। এখানে ছিল না ভেদ বা বহন—অপবিত্রবীর্য্য নিকট সকলেই সমান আসন গ্রহণ করিতেন। আজ হিন্দুদিগের সমাজসম্বন্ধে আলোচনার দিনে আমরা

পূর্বোক্ত দুইটা ধারার ফলাফলই লক্ষ্য করিতেছি, অধিকন্তু আমরা দেখিতেছি, ইংরাজরূপে হিন্দুসমাজ আত্মরক্ষার পথ ছাড়িয়া যেন আত্মসম্প্রদায়বর্গের করণাও করিতেছেন।

আত্মরক্ষাই হ’ক আর আত্ম-সম্প্রদায়বর্গই হ’ক তাঁহার মধ্যে শক্তি অন্তর্নিহিত থাকে। চাই—হিন্দুগণ সমাজকে যখন অধঃপদনে শক্তি করেন, তখন ঊঁহাদিগের মধ্যে ভূমাদিকারীর শক্তি স্বর্ধমান ছিল, মূলমানবরূপে ভূমাদিকারীর শক্তি ছিল মূল রাষ্ট্রীয়-শক্তির ভাণ্ডার-স্বরূপ—বস্তুমান—আইন-পরিষৎ বা জমিদার অপেক্ষা তাঁহার শক্তি ছিল সবিশেষ কাব্য-কবী, বিশেষতঃ সমাজবিষয়ে ঊঁহা একরূপ কেন্দ্রশক্তির কাব্য করিত। ভূমাদিকারী ভিন্ন গ্রাম্য অর্থনীতিক শক্তি গ্রাম্যমণ্ডলদিগের তথা ভূমাদিকারীর অধীন মণ্ডলীবিশেষের অধিকারভুক্ত ছিল, অতএব হিন্দুগণ মূলমানব রাষ্ট্রশক্তির উন্নততলে বাস করিবার ও কথঞ্চিৎ রাষ্ট্রশক্তি এবং একরূপ সম্পূর্ণ অর্থনীতিক শক্তির অধিকার-বলে এমন সামাজিক বিবিন্ধ্যনিষেধ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন যে, সে-সময় বহু হিন্দু মূলমানব হইলেন ও হিন্দুসামাজিক শক্তি মূল দূর্বল মূলমানবগণ হতক্ষেপ করিতে সক্ষম হন নাই। ইহা হিন্দুদিগের পরাজয়ের কি জয়ের কথা তাহা প্রশ্নবদ্ধে সবিশেষ আলোচনার আবশ্যক নাই, কিন্তু ‘ঠাকুর’পাণন সাধুগণ অশ্বরম্যম্বা জাগ্রত ‘ঠাকুরের’ কথাই কহিয়া দিয়াছেন। এখানে ছিল না ভেদ বা বহন—অপবিত্রবীর্য্য নিকট সকলেই সমান আসন গ্রহণ করিতেন। আজ হিন্দুদিগের সমাজসম্বন্ধে আলোচনার দিনে আমরা

আবার মুসলমান ও হিন্দু সম্মিলন ক্ষেত্রে ধর্মের যে তারতম্য ও বিরোধ স্থান পাইয়া ভারতের ধর্মবুদ্ধিকে বিচলিত করিত, তথায়ও তাঁহারা শাস্তিবারি সেচন করিতেন, তাঁহারা কখনও ধর্ম ও সমাজে বিরোধ ও বিভাগের ব্যথা বহন করিতে পারিতেন না, তাঁহাদের নিকট সবাই সমান সবাই রাজা—অন্ততঃ জগতের প্রাণবৃদ্ধ্যার নিকট সকলেই রাজরাজেশ্বরী-রূপে ভাগবত ভক্তি-ঐশ্বর্য সমস্তোপ করুক, এ-সামু-ইচ্ছা তাঁহারা পোষণ করিতেন।

পূর্বোক্ত রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিক-ও-সামাজিক এবং ভাগবত প্রেমের শক্তিতে পূর্বযুগে হিন্দুগণ একটিকে সমাজবিধির সৃষ্টি করিয়া এবং অত্য়দিকে সমাজবিধি-অতিরিক্ত মুক্তি-বাঁধা বহন করিয়া বেক্ষণে হিন্দু-সমাজকে ইংরাজযুগে লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহাতে হিন্দুগণ আত্মরক্ষায় মুসলমানদিগের নিকট হইতে সম্পূর্ণ নৈতিক হইলেও, নিজদিগের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার নৈতিক অধঃপতন লক্ষ্য করিয়াছিলেন। বাইবেল ও ইংরাজ সমাজের আদর্শ নৈতিক জীবনের মর্ম তাঁহারা এই সময় গ্রহণ করিতে থাকেন। এই সময় একজাতির সহিত অজ্ঞাতের ঘনিষ্ট সন্মিলনের ফলে হিন্দুদিগের মধ্যে জীবনচাঞ্চল্য লক্ষিত হয়—এসময় তাঁহারা সমকক্ষতার দাবী লইয়া উদ্ভুদ্ধ হইতে থাকেন; এরূপ উদ্বোধনের কালে প্রায় শত বৎসর পূর্বে হইতে হিন্দুসমাজ কতকগুলি সংস্কারের ভ্রষ্ট বন্ধনপরিবর্তন হইয়াছেন, বাহারা এইরূপ সংস্কারের অগ্রদূতরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও বহুবিধ শক্তির সমাবেশ হয়। ধর্ম-ক্ষেত্রে সর্ব জাতি মিলিয়া ব্রহ্মোপাসনার স্থান করিয়া একটিকে সামাজিক একত্ব প্রতিষ্ঠা ও অত্য়দিকে ধর্ম-ও-সামান্যমান্যতা দ্বর্নতির মূল স্থাপনাদি পূর্বক রাজা রামমোহন বাঙ্গলাদেশে যে শক্তির প্রবর্তন করেন, তাহার বলেই তিনি সতীদাহের পথ

বন্ধ করেন, স্ত্রী-শিক্ষার প্রবর্তন করেন, ইংরাজী শিক্ষার ব্যাধ দূর করেন—তখন হিন্দুদিগের কোন-রূপ রাষ্ট্রীয় অধিকার থাকে নাই, ইহার জন্ত যেরূপ রাজশক্তির প্রয়োজন হয়, তিনি নিজবলেই তাহার অহুকূলা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সর্ববিধ শক্তির কেন্দ্র ছিল ব্রাহ্মধর্মের শক্তি—এ-শক্তি যে সামু সন্তদিগের সত্য ভাগবত প্রেমনিঃসৃত, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই, বাহারা রাজা রামমোহনের ধর্মজীবনের মর্ম অবগত আছেন, তাঁহারা ইহা অবগত করিবেন না।

রাজা রামমোহন কিন্তু সেই সময়ের হিন্দুদিগের জাতি ও আচার রক্ষা করিবার কাঁচা করেন নাই, তিনি আচার নষ্ট করিয়াছিলেন; এমন কি যে প্রথার মধ্যে হিন্দুবিধবার উচ্চ আদর্শ অন্তর্নিহিত ছিল, অনেকে বলেন, তিনি সেই প্রথা নষ্ট করিয়া হিন্দু বিধবার উচ্চ আদর্শকে দূর করিয়া গিয়াছেন—তাঁহাদের মতে তিনি এই কাঁচা করিয়া না যাইলে পরবর্তী কালে স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ প্রবর্তন করিবার আবশ্যক হইত না—ঈশ্বরচন্দ্র উক্তশ্রেণীর বালবিধবার দিগের ব্রহ্মচর্য্যজীবনের কঠোরতা দেখিয়া পতিহীন স্ত্রীজাতির যে অল্প যত্ননা নিজমনো অহুভব করেন, তাহা তিনি অল্পভবই করিতেন না, যদি বিধবাদের মধ্যে অধিকাংশ স্বামীর চিতায় পড়িয়া ছাই হইয়া যাইত!—এরূপ চিন্তা ও মতের স্থান এপ্রবন্ধে না হইলেই ভাল হইত, যাইহ'ক সতীদাহ নিবারণ, বিধবার বিবাহ ও অসর্ব বিবাহের মধ্যে হিন্দু সংস্কারকণ তখন যে-আশ্বর্ষের অহুভব করিতে ছিলেন, তাহা হিন্দুদিগের জাতিরক্ষা প্রকৃতি আত্ম-রক্ষাযুক্ত সর্বত্র অর্থাৎ কোনরূপ-বাচিরা-ধাক্কার আদর্শ নষ্ট—ইংরাজ বিরটি সত্তার—ভ্রমার—স্পর্শে মানবজীবনে যে মুক্তির আশা গ্রহণ করেন, সেই

মুক্ত ও বহুজন জীবনগতি প্রচলিত আচাররূপ স্বল্পশ্রমাল হইতে উৎখাত করিতে প্রাণপন্থ করিয়া-ছিলেন; তাঁহাদের মতে, পুরাকাল হইতে হিন্দুগণ যে-বর্ষে আচ্ছাদিত হইয়া নিজদিগকে চিরকাল রক্ষা করিয়া যাইবেন মনে করিতেছেন, তাহা বাহ বস্ত, তাহা চিরকাল হিন্দুদিগকে রক্ষা করিবে না, যদি তাহারা অস্ত্রবস্ত্রের সন্ধান না পায় এবং যদি তাহারা সেই অস্ত্রবস্ত্রের মধ্যস্থ অস্ত্রতম বিন্দু ভাগবত রস-নাথের নিমজ্জিত হইয়া অস্ত্ররাজ্যের অধিবাসীরূপে নিজদিগকে স্বপ্রতিষ্ঠিত করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহারা চিরকাল “হিন্দু” বা “সনাতনী” হইয়া বাচিয়া থাকিবে না—বিধি-নিষেধের জটিল বেড়াবালে আবদ্ধ হইলে তাহারা আবদ্ধই থাকিবে এবং আবদ্ধ বস্ত্র অবস্থাই যথাসময়ে লয় পায়।

পূর্বোক্ত ভাগবত ভিত্তিী সৃষ্টি করিয়া হিন্দুসমাজের সংস্কার বা পুনর্গঠন আরম্ভ হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি বোধ ঘটিতে পারে; যেটুকু মুসলমানযুগের সামু সন্ত হইতে ইংরাজ যুগের রাম-মোহন-দয়ানন্দ-কেশবচন্দ্র পর্য্যন্ত সর্ববিধে ভাগবত জীবনের গভীর স্পন্দন অহুভব করিয়াছিলেন, সেই যুগে নিজ নিজ জীবন ভরাইয়া তাঁহারা নিজদিগের নির্দিষ্ট কর্ম করিয়া গিয়াছেন; ইহাতে হিন্দুসমাজ বেক্ষণে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা অবশ্য পুনর্গঠন এবং সংস্কার, এবং ইহা নতুন যুগেরই বিশেষত্বমণ্ডিত পুনর্গঠন, ইহাতে কোনরূপে আত্মরক্ষার কথা নাই, ইহাতে হিন্দুর সনাতন জীবনপ্রবাহ প্রবহমান করিবার পন্থা ইচ্ছিত লুক্কায়িত আছে। হিন্দুদিগের সনাতন জীবন কি এবং তাঁহাদের সনাতন ধর্মচেতনা কোন লক্ষ্যে আত্মপ্রকাশ করিবে, তাহা স্ত্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবনে আমরা স্পষ্ট লক্ষ্য করিয়াছি। এই ছুটি জীবন যেন পূর্ব পূর্ব যুগের সমগ্র চেষ্টার অসংখ্য শক্তিতে জীবন সঞ্চার

করিয়া তাহার স্থান ও কালাগোচ্যে স্থা বিশদ-ভাবে প্রকট করিয়াছে—আমরা স্ত্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সান্নায়ে পূর্ণসিদ্ধি লাভ করিয়া পূর্ণ যোগাশ্রয়ে যদি জীবন, তথা অবিনশ্বর শক্তিপূর্ণ সমাজজীবন গঠন করি, তাহাই হইলে সংস্কার পরম্পরার কোনটি গ্রহণ করিব এবং কোনটি বর্জন করিব, কোন ভাব আশ্রয় করিব এবং কোন ভাব ত্যাগ করিব, তাহা অনায়াসে লক্ষ্য করিতে পারি। এই লক্ষ্যে স্থির-প্রতিষ্ঠ হইয়া সমাজগঠন আরম্ভ হয় নাই, কোথাও কোথাও হুচনার আভাস পরিলক্ষিত হইতেছে—ইহার ভাব ও মূলনা বর্ষে-বর্ষে অহুপ্রবর্তি না হইলে বিরাট জাগরণের ভিত্তিরূপে বিজয়ী হিন্দুসমাজ গঠিত হইবে না—কিন্তু ইতিমধ্যে বাহারা নিজ-দিগকে হিন্দুসমাজের অস্ত্রভূক্ত বলিয়া জ্ঞানিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা চারিদিক দিয়া হিন্দুসমাজের ক্ষয় লক্ষ্য করিয়া হিন্দুসমাজে শক্তির সঞ্চার করিতে বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন; ইহার মধ্যে আমরা আত্মরক্ষামূলক শক্তিরই দ্যোতনা দেখিতে পাই, অবশ্য আজ কাল হিন্দুদিগের মধ্যে ভক্তি, সংগঠন ও অস্পৃশ্যতা নিবারণের যে প্রবল ষোত বহিতেছে, তাহাতে আত্মরক্ষা ও আত্মবিশ্বাসের সম্মিশ্রণ গুণ-প্রোতভাবে লক্ষ্য করা যায়।

অনাচার ও ব্রাহ্মপ্রভাব হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্ত শশধর তর্কচূড়ামণি যে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, তাহা ষাটি আত্মরক্ষামূলক—বিধিনিষেধ ও আচারনিয়মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি হিন্দুকে বাঁচাইতে চাহিয়াছিলেন; এদিকে অত্য়দিক দিয়া হিন্দুগণ যে মরণের পথে অগ্রসর হইতেছিলেন, তাহা তখন তাঁহার লক্ষ্য করিবার অবসর হয় নাই, তখন তাহার সময়ও উপস্থিত হয় নাই। হিন্দুগণ বিশেষতঃ হিন্দু অস্পৃশ্যত্ব যে দলে দলে মুসলমান ও বৃষ্টান হইয়া যাইতেছিল, তাহা তখন ভাবিবার লোক থাকে

নাই। এখন এই দুর্ভাবনা হিন্দুদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে, তজ্জন্তই ও অস্পৃশ্যতাবন্ধনের আয়োজন, তজ্জন্তই হিন্দুদিগের সংগঠনের প্রচেষ্টা। ইহাতে একদিকে আশ্রয়লাভ ও অন্যদিকে হিন্দু-সমাজসংস্কারের ভাবও স্থান পাইয়াছে।

আমরা এতদূর পর্যন্ত দেখিয়া আসিলাম, হিন্দুগণ মুসলমানদিগের আগমনের পর হইতেই বিশেষ-ভাবে ক্রন্দনীয় অবলম্বন পূর্বক হিন্দু রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন—সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-সমাজের অন্তর্নিহিত ভাগবত উৎস উৎখাত করিয়া এক ভেদহীন দ্বিবা সমাজগঠনের প্রচেষ্টাও ক্ষীণ ধারায় বহিয়া চলিতেছে। দ্বিবা ভাবে নাই হইলেও, উহারই প্রেরণায় ইংরাজ আমলে গত শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত নব সমাজ গঠনের উন্মাদ পরম্পরাক্রমে কতকাটা কার্য্য করিয়া গিয়াছে। কিন্তু দ্বিবা ভাবটীর আলোক ও প্রকাশ রামকৃষ্ণ-বিনোদনন্দে যেমন সম্যকরূপে ফুটিয়া উঠে, সেই সম্যক ও বিচ্ছিন্নজ্ঞকর্ণ হিন্দুসমাজের উদ্যোদন এখনও হয় নাই।

ইহার উদ্যোদন করিতে হইলে ভগবজ্জন্মের পরম প্রকাশ একান্তই আবশ্যক।

কেননা, হিন্দুদিগের সমাজজীবন ভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত, বহির্গত ভেদলীলাই আয়তন, এই বহির্গত বা বাহ্যিক নীতি অঙ্গসংগ করিয়া তাহার নিম্নদিগের সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছেন। রাষ্ট্রীয় ও অর্থনীতিক কারণে ইহাকে যতটা সংহত ও দৃঢ় করিবার আবশ্যক হইয়াছে, হিন্দুগণ তাহা সংশ্লিষ্ট করিয়াছেন। অসিক্ত হিন্দু ঋষি ও দার্শনিকদিগের মানবপ্রকৃতি আলোচনার ফলে যখন বুঝা গিয়াছিল, মানবপ্রকৃতি চতুর্লক্ষপংক্ত, তখন হিন্দু-সমাজে চারিটা বিভাগ-নীতিতে বিভক্ত করা হয়— কিন্তু সমাজজীবনে চারিটা ভিন্ন বহুবিধ বিভাগ

বর্তমান ছিল, তাহাকে চিন্তারাজ্যে বিভাগের পরি-বর্তে বিভাগের শাখা-প্রশাখা ধরা হইত, কিন্তু মূল তাহার বিভাগই ছিল; অন্ন-অনাচরীয় ও জন-অনাচরীয়ের মধ্যে তাহা বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

এই বিভাগ ও বৈচিত্র্যে মানুষের যাহা পাইবার হিন্দুগণ তাহা পাইয়াছেন এবং এই বিভাগ ও বৈচিত্র্যের নিবিড় বাধায় হিন্দুদিগের যাহা পাইবার তাহা গিয়াছে—মুসলমানদিগের আগমনের পর হইতে আমরা বুঝিয়াছি, সমান সমানে ভিন্ন সমাজের সমুখীন হইলে আমরা অনেক বিষয়ে হঠিয়া নাইতে পারি।

তাই হিন্দুসমাজের মূল ভেদপ্রকৃতি বজায় রাখিয়া, উহাকে বাহির হইতে দৃঢ় ও দৃঢ়তর করিবার অল্পত প্রয়াস আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে।

কিন্তু মানুষ ত গাছ পালা নহে, যে তাহারাই বৈচিত্র্য লইয়াই ভেদ বা অঙ্গকারের পথে চলিবে, এবং মানুষ ত কেবল একক বা সামান্য গোষ্ঠী মধ্যেই আবদ্ধ নহে, যে সে কেবল একক বা নিজের পরিবার বা গোষ্ঠীটী লইয়াই জীব্য ও ভগবানের পথে চলিবে, সে-যে সমগ্র মানব সমাজকেই তাহার সম্ভারুপে, তাহার পরিবাররূপে, তাহার গোষ্ঠীরূপে দেখিতে পারে, এইরূপে সে-যে সমগ্র বিশ্বমানবকে তাহার জাগ্রত-ঠাকুরের আয়তনরূপে পরিণত করিতে পারে! এইরূপ জাগরণের সাড়া পাইয়াই মহম্মদ ও মহম্মদ-পন্থী জগৎ ও ভারতকে তাহারই আয়তন রূপে পরিণত করিতে চাহিয়াছেন।

প্রাণের ঠাকুরকে রোকে নিজ নিজ ভাবেই পাইয়া থাকে—নিজের মত করিয়া নিজের বৈশিষ্ট্য দিয়া সোঁ তার ঠাকুরের আয়তন নির্ধারণ করে, তার নিজ বৈশিষ্ট্য দিয়াই সে বিশ্বমানব জয় করে। হিন্দু তাহার ঠাকুরকে যেদূর পাইয়াছে, তাহারও

কিন্তু একটা বৈশিষ্ট্য আছে—তাহাতে কোন মানব-সমষ্টির কোন মৌলিক সাধনাই স্থগ্ন হয় না—মহা-মানবের পরিপূর্ণতায় সে সকলকে টানিয়া লয়।

এতদিন পর্যন্ত এই ভগবানের পথের নির্দেশ সে “হিন্দু”কে দিবার চেষ্টা করিয়াছে—সামাজিক হিন্দুকে সে সম্পূর্ণরূপে ভাগবত হিন্দু করিবার ইচ্ছিত বার বার প্রদান করিয়াছে—প্রাকৃতিক ভেদ-ভিত্তি ছাড়িয়া ভাগবত অভেদ ভিত্তির উপর হিন্দু-সমাজ গঠন করিবার প্রয়াস এখন হিন্দুদিগের মধ্যে স্থান পাইয়াছে।

কিন্তু রাষ্ট্রীয় ও অর্থনীতিক অবস্থা ও সাম্প্রদায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভিতর দিয়াই কেবল হিন্দুগণ কতকগুলি উচ্চ সংস্কার গ্রহণ করিতেছেন। ব্রাহ্মণ ও পঞ্চমভেদে সকল হিন্দুই যে হিন্দু একথা উচ্চারিত হইতেছে—কিন্তু ভেদভিত্তি বজায় রাখিয়া যে সমাজ অভেদ ও ভাগবত এক্যত্বের স্বপ্ন গ্রহণ করিয়া পুটে হইতে চায়, তাহার আশা মরীচিকার ছায় পরিণামে একান্ত ঠৈরাশ্রে পরিণত হইবে! আজও হিন্দুগণ এ বিষয়ে যে সামান্য স্বপ্ন অর্জন করিতেছেন, তাহার

প্রধান কারণ তাঁহার। এক্ষমূলক আর্ধ্যসমাজের সহিত সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন—ইহাতে তাহাকে অধিকদূর অগ্রসর করিবে না!

মোটকথা, সংস্কার গ্রহণের পশ্চাতে হিন্দুদিগের মধ্যে আজ যে শক্তির লীলা আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তাহাকে ভাল করিয়া চিনিয়া লওয়া আমাদের একটা কাজ এবং তাহার পরে আমাদের বিশিষ্ট কাজ হইতেছে :—

এমন একটা এক্যবদ্ধ ভাগবত সমাজ গঠন করা, যাহা বিজ্ঞাচ্ছিন্নরূপে কার্য্য করিয়া হিন্দু সমাজের ভেদাত্মক মূলে বিশ্বম আঘাত পূর্বক তাহার মূল প্রকৃতিটা পরিবর্তন করিয়া দিবে এবং যাহা ভারতবাসী হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টানের মধ্যে এক মহামানবের স্বর্গ-স্থল উন্মার করিবে।

ইহার সম্ভব-সাধনা-ও-প্রকাশই হইতেছে ভারতের জাতিত্ব—এই ধর্মের স্বরূপ আর শুধায় নিবদ্ধ নহে, সন্ধান জানিলেই বুঝা যায়। ইহার সম্প্রতি সন্ধান দিবার জন্ত আমরা অত্র সময়ে আলোচনা করিব।

ধর্মগুরুমণ্ডল

৩

ভারতের বৈশিষ্ট্য যেমন রহস্যময়, বৈচিত্র্যও তেমনি তুন্দনাইন, উন্নত গিহিমাণা ও দিগন্তব্যাপী মরুভূমি, নদী, বন, প্রদেশ, চরণ চূষনে উন্নত সাগরতরঙ্গ, ভূবায়ুর্ত হিমালয়শৃঙ্গ, নানা বিদেশের ধর্ম ও সভ্যতার সমাবেশ, ভারতকে মহিমান্বিত করিয়াছে। ভূমধ্য-সাগরতীরে অথবা উত্তর থেকে ক্রমশঃ হইতে আর্ধ্য জাতির আগমনের বহু পূর্বে হইতেই, ব্রহ্মা, শিব, ক্রীটন ও মিশরের মত ঐবিড় সভ্যতা ভারতের আদিম অধিবাসীর নিষ্কৃষ সম্পদ, ভারত কোনদিন একান্ত বুনে বর্ষের জাতিরা আবাদভূমি ছিল না, আর্ধ্য ধর্মের অন্বেষণে, ভারতের আদি সাধনার বহুল রূপান্তর হইয়াছে, কিন্তু নির্মূল হয় নাই, ভারত বিশ্বের নব নব সভ্যতা ও ধর্মের অবদান আকর্ষণ করিয়া, অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে অধিকতর ঐশ্বর্যশালী হইয়া উঠিতেছে।

ভারতবাসী—ভারতবাসী, আর্ধ্য বলিঙ্গ ভারতবাসীর যে গর্ভ, উঠা বিজয়ী আর্ধ্যের শিখা দীপ্যায় বিদিত জাতির অভিজ্ঞত অথবা, আত্মবিস্তৃতি। আজও দেখা যায়, হিন্দু শোণিত বক্ষে ধরিয়া, ভারতের স্থানে স্থানে হিন্দুজাতি নিজেদের বিস্তারকামী বলিয়া পরিচয় দেয়, গর্ভ করে, আর্ধ্য জাতির মুক্ত রূপান্তর-তলে মাথা বসি দিয়া, ভারতের আদিম জাতি যে নিজেদের আর্ধ্য বলিয়া স্বীকার করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি?

যে জাতিকে পর-রাজ্য অধিকার করিতে হয়, তাহাদের মধ্যে সামাজিক, নৈতিক, ও আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলা দূত রাখিতে হয়, আর্ধ্যজাতির মধ্যে যে

সদৃশ্যাবলীর নিদর্শন দেখা যায়, তাহা প্রকৃতিরই হান, আর ভারতবর্ষ, কোনদিন বহিঃশত্রুর আক্রমণ আশঙ্কায় চিন্তা করে নাই, বিস্তার্ত্ত উর্ধ্বের ক্ষেত্র ফলে ফলে শব্দে পরিপূর্ণ, প্রচুর ঐশ্বর্য—সুখ ভারতের বেহেমী জননীর আগেরের সন্তান সংকেই প্রচুরিজ, সমাজজীবনে উদাসীন, ধর্মজীবন বিষয়ী, স্বাধীনতা-মগ্ন, উদ্যম ক্ষেত্রচারের লীলাক্ষেত্র। ভারতবাসী সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে, শক্তিপীকারে জ্ঞাত প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত বজ্র বহায়ে পশ্চাতে অস্থাবন করিত, সিংহ-বাঘ-সমাকুল বনভূমি পর্বতন করিয়া, শ্রমজন্মসিক্ত শরীরে, নদীতীরে, শ্রাম বিটপীতলে, কোমল শাপ-শয্যায় গা হেলাইয়া বেগু বাজাইত, গান করিত, প্রণয়িনীর গলা ধরিয়া নাচিত, ভারত সেদিন প্রেমের কুহ, অমর্যায় নন্দনকানন ছিল। তারপর উত্তর পশ্চিমের সৌর্যোজ্জ্বল উল্জয়ন করিয়া গিরি নদীর বুক বাহিয়া, যেদিন হৃদয়বদ্ধ, নিয়মিতাচারী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন, উন্নতকায় একদল মাহুগ ভারতের উপত্যকায় আসিয়া দাঁড়াইল—সেইদিন হইতেই ভারতের স্থানের ঘর ভাঙ্গিল। তখনও বার্ককা ছিল, মরগের বাঘা ছিল, কিন্তু ছিল না চাতুর্ঘ্য—ছিল না বুদ্ধির মার-গাঁত, আর ছিল না, হিমাচল করিয়া চলার কলরব। উমার আকাশতলে সমুদ্রের কূলে কূলে বনবাসীরা বেলা, আর পাছাড়ের কোলে কোলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদ, অনার্যগণে উপগম হুহুলা শালক্ষেত্র, ঘরে ঘরে অনুভবতী গরবিনী। ভারতের এই নবনব অতিথি ভারতের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিতে আসে নাই, আসিরাছিল নিজ বাসভূমে ভারতকে পরবাসী করিতে,

আশ্বিন, ১৩৩২]

ধর্মগুরুমণ্ডল

২০৭

আশ্বিনে বসিত করিয়া, ভারতকে শূন্য করিতে, ভূতা করিতে, সেবার অধিকার দিতে—বিরোধের আলন সেই যে অলিঙ্গ, আর নিষ্ঠা না। জৌনে লইয়া মহামহান আরজ হইল। বিপর্যয়ের পর বিপর্যয়, বিক্ষোভ ও সংঘর্ষে সমগ্র বিশ্বশক্তি যেন ভারতের বুক হানা দিল, মহাবিপ্লবের তলে বিধাতার চতুর হস্তযানি কিন্তু একদিনের জ্ঞাতও ভবিষ্যৎ নির্ণাণে নিরস্ত রহিল না, ভারতের গাভু দিয়া বিবের উপাধান একত্র করিয়া, এমন এক মূর্তি গড়িয়া তুলিলেন, সমগ্র বিশ্ববীর মাথা দেবতার চরণে অবনত হয়, ভারত তাই আজ বৃহৎ, অগতির তীর্থ।

আর্ধ্য জাতির সম্মিশ্রণ, ভারতের ধর্ম কর্মের তরুী বহুই পরিবর্তিত হইল, কালান্নিক দেবতার উপাসনামন্দিরে, ভারতবাসীর কণ্ঠে, অস্ত্রযাতির আধারদানসকৌত নব নব ক্ষম ময়ে বক্ষায় তুলিল, জাতি ও বর্গ ভেদ তখনও আধিকার মত এমন শোচনীয় মূর্তি পরিগ্রহ করে নাই, কিন্তু আর্ধ্য-মৌরব দূতপ্রতিষ্ঠ হওয়ার আক্রমণ শক্তির প্রভাব অসাধারণ রূপে বুদ্ধি পাইল, ধর্ম ও রাজকীয় কণ্ঠে, আক্রমণের প্রাধান্য আতিশয়া লাভ করিল, যে ধর্মসাধনার, উপাসনাক্ষেত্রে সর্ব বর্ণ ও জাতি সমবেত হইয়া ক্ষমময়ে আকাশমণ্ডলে প্রতিজ্ঞা নিত, তাহা ক্রমেই আক্রমণ একচেটিয়া সম্পদে পরিণত হইল, তপস্তায় কঠোর মূর্তি প্রকাশ হইয়া

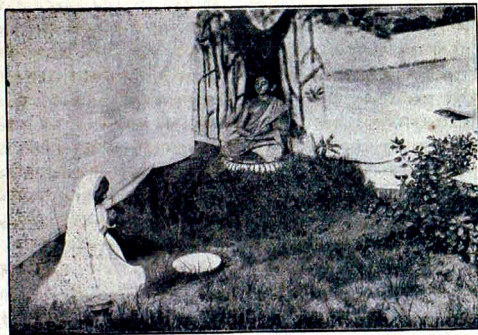
পড়িতে লাগিল,—ঈশ্বরের সাধনা কল্প-সাধ্য ও সর্ব সাধারণের পক্ষে চর্যকোষ হইয়া উঠিল, ধর্ম আক্রমণের সাধারণই পরিগণিত হইল। অজ্ঞাত জাতি ধর্ম-মূলক আধ্যাত্ম অঙ্কুরিত সাধনা কর্মরূপে বেলা ছিল, অশ্বমেধ যজ্ঞ, রামেশ্ব যজ্ঞ প্রভৃতি বিষয় ও যখন দৌত বুদ্ধকে কল্পবলে একসঙ্গে বসিয়া বৌদ্ধধর্ম বিভিন্ন ধর্মকারা সাধনে আক্রমণের ঐতিহ্য দেখাইতে লাগিলেন, সমাজে বৈধম্য দেখা

দিল, আক্রমণের নিজেদের সন্ধান ও প্রতিপত্তি রক্ষায় নানারূপ শাস্তি রচনা আরম্ভ করিয়া দিলেন, মন্থ পরাশর প্রভৃতির মত মূর্তির বাধনে জাতিকে অষ্টপাশবদ্ধ করার আয়োজন চলিল, চাতুর্ভাব্য—গুণভেদে না হইয়া, অবস্থাভেদে মাহুগের উন্নতির পথ যোগ করিল। এই আক্রমণশক্তির উৎকট প্রভাবের যুগে, নেপাল রাজ্যের সীমান্তে যে মল্ল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র রাখা পড়িয়া উঠিয়াছিল, এই-রূপ একটা ক্ষুদ্র রাজ্যে গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয়। ইনিই ভারতে এই অস্বাভাবিক আক্রমণাত্মক বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া—ধর্ম ও সমাজে ভেদ নীতির মূলাচ্ছেদ করিয়া সাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। বৌদ্ধ প্রভাব অধিক হইলে ভারতে যদি স্থায়ী হইত, তাহা হইলে, আজ জাতি গঠনের পথে, বিভিন্ন ধর্ম ও নীতির সামঞ্জস্য বিধানের এত বেগ পাইত হইত না।

তৎকালীন প্রাথমিক্যায়ী, শাক্য আচার্যের শিষ্য আক্রমণ আচার্যের নিকট শাস্ত্রাধারন করিতে হইয়াছিল, দিব্যজ্ঞান ও শক্তি অর্জন করিতে হইলে, পঞ্চতপার মত কল্পসাধ্য তপস্তা ব্যতীত যে ইহা সিদ্ধ হয় না, এ ধারণাও তাঁর বহুদূর হইয়াছিল। এইজন্য প্রথম বৈরাগ্য সপার্যে তিনি, ব্রহ্মহীন আক্রমণ শাস্যায়ী নিকট অধ্যাত্ম বিদ্যা অর্জনের যে সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহাতে তিনিও প্রথমে উপবাসাদি নানা কঠোর তপস্যায় ত্রুটি হইয়াছিলেন। তাঁর ধর্মসাহসারগের একাত্মিকতার ও অমাহুগিক তপঃ-নীতির অতিরিক্তান মধ্যেই চতুর্দিকে বন্য-মৌরব ছড়াইয়া পড়িল—বুদ্ধ স্বয়ং কিন্তু তখনও সত্যের শাক্য পান নাই, সেই সময় তাঁর পাঁচজন শিষ্য সঙ্গে ছিল। তাহারাই বন্য, অশ্বমেধ যজ্ঞ, রামেশ্ব যজ্ঞ প্রভৃতি বিষয় ও যখন দৌত বুদ্ধকে কল্পবলে একসঙ্গে বসিয়া বৌদ্ধধর্ম বিভিন্ন ধর্মকারা সাধনে আক্রমণের ঐতিহ্য দেখাইতে লাগিলেন, সমাজে বৈধম্য দেখা

বিনের পর দিন অতিবাহিত করিতে দেখিল, তখন

আবিল, সিদ্ধার্থ সিদ্ধ হইয়াছেন। তাহারাই বুদ্ধের উত্তম পায়দায় হস্তে করিয়া, মহাপুরুষের চরণে প্রচার আরম্ভ করিয়া দিল। নগর ও গ্রাম হইতে মাখানত করিয়া বলিল, "প্রভো! শত গাভীর ছুঁ মহাপুরুষ দর্শনে মেলা বসিতে আরম্ভ করিল।" দোহন করিয়া এই পরমায় রতন করিয়াছি। বন-তিনি বিরক্ত হইয়া, অরণ্যপ্রান্তবাহী নদী তীরে দেবতার উদ্দেশে ইহা উৎসর্গ করিব—আমি যেন যৌর পদে পদচারণা করিতে লাগিলেন। শরীর পুস্তবতাই হই।" উপবাসদীর্ঘ, তপস্বী শাক্যনিগ্ধের অবসর, চক্ষু দৃষ্টিশক্তিহীন, চর্যল পদব্রহ্ম দেহভার ভাষার মূর্তি দর্শন করিয়া, গোপকন্ডা ইহাকেই বন-বহন করিল না। মাথা ঘুরিয়া হতচেতন হইলেন, দেবতা বিন্দা ধারণা করিয়াছিল—বুদ্ধদেব রমণির শিব্যবর্ণের যত্নে জ্ঞান সঞ্চার হইলে, আদেশ হস্ত হইতে পরমায় লইয়া ভোজন করিলেন—



বুদ্ধদেব ও অস্তিত্ব।

করিলেন—গ্রাম হইতে থালাবার লইয়া আইস, অনাহারে তবের সন্ধান মিলে না। অধ্যায় অহুশীলন, স্তম্ভ শরীর মতিকের দ্বারা হই হয়, কুণ্ডু তায় হয় না। শিব্যবর্ণ আশ্রয় হইল, শাক্যসিংহকে যোগে ব্রহ্ম ভাবিয়া, তাহার ঐশ্ব্যকে পরিচায়্য করিল, তিনি গভীর অরণ্যে দীর্ঘ চরণে ভ্রমণ আরম্ভ করিলেন। ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্টিমতী বেশে, তাঁহার লক্ষ্যে উদয় হইল, সূজাতা নামে এক গোপকন্ডা

আশীর্বাদ করিলেন, "বাছা, তুমি পুস্তবতাই হস্ত।" বুদ্ধের ক্লান্ত শরীরে বিদ্রাঘ খেলিল, তিনি সরিকটবর্তী বোধিসত্ত্বমূলে আসন করিয়া বসিলেন—প্রতিজ্ঞা করিলেন :—

"হিহাসনে শুভাতু মে শরীর।

অপ্রতিমাসং প্রলয়ক যাতু।

অপ্রাপ্য বোধিঃ বহুকালং তপঃ।

নৈবাসনাং কাম্যত্বলিঘাতো।"

এই আসনে আমার শরীর শুকাইয়া যাক, শুষ্ক, অস্থি, জীবের হৃৎ অগ্ন্যোহনের পথ আবিষ্কার করিতে মাংস পলয়ে ডুবিয়া যাক, দুর্গত বোধিচ্ছান লাভ না হইলে, এই আসন হইতে আমার শরীর টলিবে না।

তীর এই কঠোর সন্ন্যাস সিদ্ধ হইল, জীবনের পথ পাইলেন, দৃষ্টি নূতন আলোকে ভরিয়া গেল, ধ্যান-যোগে জগতের সৃষ্টিমূল্য প্রত্যক্ষ করিলেন। তিনি দেখিলেন :—

১। অস্তিত্ব হইতে সংসার।

২। সংসার হইতে বিজ্ঞান।

৩। বিজ্ঞান হইতে নাম রূপ।

৪। নামরূপ হইতে যজ্ঞাতন। (মন ও পঞ্চকেন্দ্র)

৫। যজ্ঞাতন হইতে স্পর্শ।

৬। স্পর্শ হইতে বেরন।

৭। বেরন হইতে তৃষ্ণা।

৮। তৃষ্ণা হইতে উপাদান। (আময়িক)

৯। উপাদান হইতে ভব।

১০। ভব হইতে জরা।

জরাই হৃৎপথের কারণ, জন্মবন্ধন ছিন্ন করিতে হইলে আবিষ্কার মূলোচ্ছেদ করা চাই, তিনি সর্গজন্মের মূলের সন্ধান পাইয়া তাহার উচ্ছেদ মানসে যত্নপর হইলেন, বজ্রকণ্ঠে গাইলেন :—

অনেকজাত সংসারং সদ্ধাবিসমুদ্

গহকারকং প্রাথমতঃ প্রাণাত্যন্ত পুনঃ পুনঃ।

গহকারক দিষ্টটোষি পুনঃ সংহং না কাহসি

সম্বতে বাহুকা ভগণা গহকুটং বিদ্যতিং

বিদ্যং যতঃ চিত্তং তন্মানং যতঃ মজ্জয়া।

বহুজন্ম সংসার পথে কিরিতোক্তি, এ গৃহ বে নির্গণ করিয়াছে সে কোথা পোষনে আছে, তাহার সন্ধান পাই নাই। পুনঃ পুনঃ হৃৎ ভোগ করিয়া এবার দেখা পাইয়াছি, যে গৃহকারক, তন্তু ও গৃহ ত্রিভি চুববার করিয়াছি, তিত সন্ধানহীন হইয়াছে। তৃষ্ণা ক্ষয় পাইয়াছে, আর গৃহ রচনা করিতে পারিবে না।

জীবের হৃৎ অগ্ন্যোহনের পথ আবিষ্কার করিতে সর্বত্যাগী বুদ্ধ জীবনের বিকক্ষেই সংসার বোধনা করিলেন, তাঁর চর্যল তপশক্তি জীবন নিরানয় করিল না, জীবনের ভিত্তি উপাধিরা হেলিতে উজ্জত হইল, ধর্মজীবনের ইতিহাসে এইরূপ মারাত্মক ভুলের ইহাই প্রথম ভিত্তিপাত। বোধিসত্ত্বের বিকল্পমাত্রাও পরাক্রান্তি যুগে এক প্রকার এই শূন্যতারেই সমর্থন করিয়াছেন। জীবনের সূণ্য আশ্রয়ের ক্ষয় পাইয়াছে; এ ক্ষয় সহজে পূরণ হইবার নয়, অতীত ধর্মের বিকক্ষে বিপর্যয় সংসারের উপর ভবিষ্যতের জয় নির্ভর করিতেছে, তাহা ভাবিবেও শরীর শিথলিয়া উঠে।

বুদ্ধ বিচার করিয়া দেখিলেন, সংসার হৃৎপথ, এই ক্ষেত্রে হৃৎপথের সন্ধান নির্দুষ্টিত, জন্মে হৃৎপথ, যোগে হৃৎপথ, জন্মমরণে হৃৎপথ, জীবন থাকিলেই এইগুলি নিত্য। সম্যক হইবে—অগ্রিম বস্তুর দগ্ন নিরন্তর হৃৎপথের কারণ, প্রিয় বস্তুর বিরোধে হৃৎপথ, এ সংসার বর্জনেই শ্রেয়ঃ।

সংসারের সৃষ্টি, বিধাতৃক্ষয়। আশুক্রিই হৃৎপথের কারণ, আশুক্রি বর্জনেই। আশুক্রির সম্যক মূলোৎপাটনেই আত্মাত্মিক হৃৎপথসৃষ্টি।

তাহার তিনি যোগের ঐশ্ব্য নির্ণয় করিলেন।

ইহাই বুদ্ধ ধর্মের প্রসিদ্ধ অষ্টাঙ্গিক পথ।

১। সম্যক দৃষ্টি।

২। সম্যক স্পর্শ। (জটু স্পর্শ বাক্য-শক্তি)

৩। সম্যক বাক্য। (সত্য বাক্য)

৪। সম্যক বর্জিত। (সত্যচারণ)

৫। সম্যক আত্মীবা। (অহিংসা সাধন)

৬। সম্যক ব্রাহ্মণ। (সংযম সাধন)

৭। সম্যক স্মৃতি।

৮। সম্যক সমাধি। (ধ্যান ধারণা ও

নিদিষ্টাধ্যান যোগে, সৃষ্টিশীল তত্ত্ব অধ্যয়ন)

সাধনকেই প্রবল করিয়া তুলিলেন, অষ্টাপ সাধন-বিধি দ্বারা অবিস্মার্য বীধন কাটিবার পথে, তিনি আরও বন্ধনগ্রন্থীর সন্ধান পাইলেন, দশবিধ শৃঙ্খলের কথা বোদ্ধ ধর্ম্মে সুপ্রচারিত।

- ১। সজার দৃষ্টি (অবহার)
- ২। বিচিকৎসা (সংসার)
- ৩। ঈশ্বরত (কর্ম্মকাণ্ডে অনাহা)
- ৪। কাম
- ৫। প্রতিদ্বন্দ্ব (ক্লেদ)
- ৬। রূপ রোগ (বাসনা)
- ৭। অরূপ রোগ (স্বর্গ কামনা)
- ৮। মান (অভিমান, সংসর্গ প্রভৃতি)
- ৯। শুদ্ধতা।
- ১০। অবিজ্ঞা।

নির্মাণের পথে যে ভাবগুণ গতিরোধ করিয়াছিল, তিনি সেইগুলির এইরূপ নামকরণ করিয়াছিলেন। সাধকের নিকট ইহা দ্রষ্টব্য নাহে, অবিস্মার্য শিকড় উৎপাটন করার পূর্বে, অহং ভাবের প্রয়োজন, বোদ্ধ কর্ম্মকাণ্ডের মোহ পূর না হইলে, অবাধ্য পথে অগ্রসর হওয়া দুঃস্বপ্ন, কাম ক্লেদাদি রিপু নিরসনের কথা নুতন নহে, বাসনা, স্বর্গাশি কামনা ভাবের কথা হিন্দুর যোগশাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে; তবে বুদ্ধসেব চাহিয়াছেন, এইগুলির আনুলঙ্ঘন; গীতা ও উপনিষদে আছে শোভনের ব্যবস্থা—বোধিসত্ত্ব রিপুস ধমন চাহেন না, চাহেন নৃগোপাটন করিতে, ঠাকুর যেমন বসন্তে—“অহং ধমন যাবে না, তখন থাক ইহা দাস আমি হইবে”

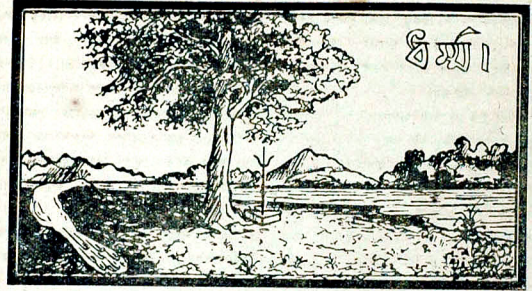
ভক্ত আমি হইবে”—কিন্তু বুদ্ধ তো জীবন চাহেন নাই, চাহিয়াছিলেন নির্মাণ। শূলতাই তাঁর চক্ষে নিত্যাবস্থারূপে প্রতিভাত হইয়াছিল, স্বপ্নের বিশদমানভার মধ্যে অমৃতের সন্ধান অসম্ভব দেখিয়া-ছিলেন, তাই জন্ম সংসারের মুখেই কুঠারপাত করিয়াছেন, বোদ্ধধর্ম্মের মূলতত্ত্ব অবিকৃতভাবে রক্ষা করার ভারত অক্ষমতা জ্ঞাপন করিল, ইহার পরবর্ত্তী যুগে, এই জীবনের বিতোপী ধর্ম্মতত্ত্ব হস্তম করিয়া, শকরাচাণের জ্ঞান ও কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিষ্ঠা চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছে, বোদ্ধপ্রভাবই শব্বরের ধর্ম্মপ্রচারের জরদুস্ত হইয়াছে, কর্ম্মকাণ্ডে জীবনের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। বুদ্ধের অবিস্মার্য জয় ও নির্মাণ তত্ত্ব আর শব্বরের মায়াবাদ—একই সামগ্রী।

বোধিসত্ত্ব জীবনের কার্য্যকারণশৃঙ্খলা নিগদিত প্রত্যক্ষ করিয়া, অষ্টাপ সাধনার শক্ত হাতুড়ী উঠাইয়া এক্ষীর পর এক্ষী চূর্ণ করিতে সজ্ঞত হইলেন, স্বর্গ হইতে দেবতার ঠাঁর মস্তকে পুষ্পবর্ণন করিলেন, ব্রহ্ম বৃহস্পতি তাহাকে ধর্ম্ম প্রচারে উদ্বুদ্ধ করিলেন, তিনি প্রথমেই ত্রিপুণ্ড ও ভিন্ন নামক বশিকধরকে এই ব্যাগ সঙ্গে দীক্ষা দিলেন, ভাগ্যের ভাগীরথীতীর দর্জিত ভারতের মহাতীর্থ বারাবগী নামে গিয়া, তাঁর পূর্ণ পূর্ণসিঁড়ি ধরে বুদ্ধিযা বাহির করিলেন। তাহার প্রথমে বুদ্ধদেবের কথাই আস্থা স্থাপন করে নাই, কিন্তু অপারিষি অধরবলের প্রভাবে, বুদ্ধ তাহাদের বয় করিলেন, এই পূর্ণসিঁড়ির মাথাও বুদ্ধের চরণে অবনত হইল, ভারত বোধিসত্ত্বের ধর্ম্মপ্রচারের ইংহা হুচনা।

ক্রমশঃ

অম সংশোধন

২০৮ পৃষ্ঠার ছবিতে নিম্নে ‘অজিত’ বলে ‘সুজাতা’ হইবে।



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (শ্রীমঃ)

পঞ্চম ভাগ

বেলঘরের ভক্তকে শিক্ষা—

ব্যাকুল হয়ে আর্জি কর।

টিক ভক্তের লক্ষণ।

—:—:—

শ্রীরামকৃষ্ণ। তবে ব্যাকুল হয়ে আর্জি করত

হয়। এমন আছে, তিন টান একগুণে হলে, ঈশ্বর

দর্শন হয়। সম্বানের উপর মায়ের টান, সতীর

বানীর উপর টান, আর বিষয়ীর বিষয়ের উপর টান।

টিক ভক্তের লক্ষণ আছে। গুরু উপদেশ

তনে দ্বির হয়ে থাকে, বেহুনার গানের কাছে

জাত সাপ দ্বির হয়ে তনে; কিন্তু কেউটে নয়।

আর একটা লক্ষণ; টিক ভক্তের দারবা শক্তি হয়।

গুরু সাঁতার উপর ছবি দাগ পড়ে না, কিন্তু কালি-

মাখান কাচের উপর ছবি উঠে; যেমন ঝট্টোগ্রাফ।

ভক্তি রূপ কালি।

“আর একটা লক্ষণ। টিক ভক্ত জিতেন্দ্রিয়, হয়। এমন আছে, তিন টান একগুণে হলে, ঈশ্বর

দর্শন হয়। সম্বানের উপর মায়ের টান, সতীর

বানীর উপর টান, আর বিষয়ীর বিষয়ের উপর টান।

টিক ভক্তের লক্ষণ আছে। গুরু উপদেশ

তনে দ্বির হয়ে থাকে, বেহুনার গানের কাছে

জাত সাপ দ্বির হয়ে তনে; কিন্তু কেউটে নয়।

আর একটা লক্ষণ; টিক ভক্তের দারবা শক্তি হয়।

গুরু সাঁতার উপর ছবি দাগ পড়ে না, কিন্তু কালি-

মাখান কাচের উপর ছবি উঠে; যেমন ঝট্টোগ্রাফ।

ভক্তি রূপ কালি।

“মাদের ভোগ একই বাকী আছে, তারা সমসারে থেকেই তাঁকে ডাকবে। নিতাইয়ের বাবস্থা ছিল, মাদুর মাদুরে যোগ, ঘোর যুগতির কোল, বোল হরিবোল।

“টিক টিক ত্যাগীর আলদা কথা; মোমাছি দুল বই আর কিছুতেই বসবে না। চাহকের কাছে ‘সব জল ধু’; কোন জল থাকে না, কেবল স্বাতীনকন্ডের বৃষ্টির জল হাঁ করে আছে। টিক টিক ত্যাগী অন্ত কোন আনন্দ নেবে না, কেবল ঈশ্বরের আনন্দ। মোমাছি কেবল দুলে বসে। টিক টিক ত্যাগী সাধু যেন মোমাছি। গৃহী ভক্ত যেন এই সব মাছি, সন্দেশেও বসে, আবার পচা দাড়েও বসে।

“তোমরা এত কষ্ট করে এখানে এসেছ, তোমরা ঈশ্বরকে খুঁজে বেড়াচ্ছ। সব লোক বাগান দেখেই সন্তুষ্ট, বাগানের বস্তুর অহুসান করে ছ একজন। অগতির সোন্দরীই দেখে, কর্তাকে বোঁজে না।”

হঠযোগ ও রাজযোগ ও বেলঘরের

ভক্ত। বড়চক্র ভেদ ও সমাধি।

(গায়ককে দেখাইয়া)

“হীন মড়কুরে গান গাইলেন। সে সব যোগের কথা। হঠযোগ তার রাজযোগ। হঠযোগ শরীরের কটকগুলো কদম্ব করে; উদ্দেশ্য সিদ্ধাই, দীর্ঘ আয়ু হবে; অস্তি সন্তি হবে; এই সব উদ্দেশ্য। রাজযোগের উদ্দেশ্য ভক্তি, প্রেম, জ্ঞান, বৈরাগ্য। রাজযোগই ভাল।

“বেদান্তের সপ্ত ভূমি, আর যোগ শাস্ত্রের বড়চক্র অনেক মেলে। বেদের প্রথম তিন ভূমি, আর গুণের মূল্যধার, বাহিতান, মণিপুত্র। এই তিন ভূমিতে গুহ, নিশ, নাহিতে মনের বাস। মন

যখন চতুর্ভূ ভূমিতে উঠে অর্থাৎ অনাহত পথে, জীবাশ্মকে শিখার ভায় দর্শন হয়। আর জ্যোতি দর্শন হয়। সাধক বলে—এ কি! এ কি!

“পঞ্চম ভূমিতে মন উঠলে, কেবল ঈশ্বরের কথাই জন্মেছে। এখানে বিতৃষ্ণ চক্র। ষষ্ঠ ভূমি আর আত্মা চক্র এক। সেখানে মন গেলে ঈশ্বর দর্শন হয়। কিন্তু যেমন লঠনের ভিতর আলো” ছুঁতে পারে না, মাঝে কাচ ব্যবধান আছে বলে।

“জনক রাজা পঞ্চম ভূমি থেকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিতেন। তিনি কখনও পঞ্চম ভূমি, কখনও ষষ্ঠ ভূমিতে থাকতেন।”

“বড়চক্র ভেদের পর, সপ্তম ভূমি। মন সেখানে গেলে মনের দর হয়। জীবাশ্মের সমাধি এক হয়ে যায়; সমাধি হয়। দেহবৃত্তি চলে যায়; বাহুশ্রু হয়; নানা জ্ঞান চলে যায়; বিচার বন্ধ হয়ে যায়। “ইহলল স্বামী বলেছিল, যাবির অনেক বোধ হচ্ছে; নানা বোধ হচ্ছে। সমাধির পর শেষে একশ দিনে মুক্তা হয়।

“কিন্তু কুল কুলিনী জাগরণ না হলে চৈতন্য হয় না।

ঈশ্বর দর্শনের লক্ষণ।

“যে ঈশ্বর লাভ করেছে, তার লক্ষণ আছে। সে হয়ে যায় বাসকবৎ, উদ্ভাবন, জড়বৎ, পিশাচবৎ। আর তার টিক বোধ হয়, ‘আমি যত্ন আর তিনি যত্ন; তিনিই কর্তা, আর সকলেই অকর্তা’। শিখরা যেমন বগোছল, পাতাটা নড়ছে সেও ঈশ্বরের ইচ্ছা। রামের ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে, এই বোধ। তাতি যেমন বগোছল, ‘রামের ইচ্ছাতেই কাপড়ের দান এক টংকা ছয় আনা, রামের ইচ্ছাতেই ডাকাতি হলো; রামের ইচ্ছাতেই ডাকাতি ধরা পড়লো।

রামের ইচ্ছাতেই আমাকে পুণিগে নিয়ে গেল, আবার হইতেছে। এইবার মণিভামপুর ও বেলগোয়ার রামের ইচ্ছাতেই আমাকে ছেড়ে দিলে।

সদ্ধা। আগত প্রায়, ঠাকুর একবারও বিশ্রাম গ্রহণ করিয়া ঠাকুর বাকীতে ঠাকুরের দর্শন করিয়া করেন নাই। ভক্তসঙ্গে অবিশ্রান্ত হরি কথা নির নির স্থানে প্রত্যাগমন করিতেছেন।

সাধন তত্ত্ব

৪

পূর্বাশ্রম—ঈশ্বরের করুণায়, নিজের শক্তি দ্বারা নহে। শরীর মনের চেতন্য পরিমিত কর্তব্যই সিদ্ধ হয় না, অনন্ত ঈশ্বর উপলব্ধি তো দূরের কথা। এই ঈশ্বর উপলব্ধির পথে মানবের বর্তমান প্রকৃতি উপযোগী নহে, ইহার পরিবর্তন প্রয়োজন হয়। কেননা বর্তমান স্বভাব—স্বভাবই ঈশ্বরবিমূখ, যোগের দ্বারাই ইহাকে ঈশ্বরমুখী করা যায়।

কলি যুগের স্বীকৃত অন্নায়ু—কাল ও অবস্থার চাপে মুখ্য, বৈদিক যোগ এগুণে সার্থক করা হুস্মাধ্য। মহ বৈদিক, “আচার্য্যিচ্ছাতো বিপ্রঃ ন বেদ-ফলমশ্নতু” —যে বিপ্র বেদোক্ত আচার পালনে অক্ষম, সে ইহার ফল লাভে বঞ্চিত হয়। দেশের বর্তমান অবস্থায়, বেদোক্ত পালন করা শুধু হুস্মাধ্য নয়, একবারেই অসম্ভব। ইহা অস্বীকার রামের জোর, অন্তরাত্মার কথা নহে। কেননা ব্রাহ্মণ উপনীত হইয়া গুরুগৃহে পরিণত বয়স পর্যন্ত আস করেন? পঞ্চাশ বর্ষ বয়সক্রমে বয়স প্রাপ্ত করেন? বেদের শাসন অসম্ভব করিব, অথচ বেদোক্ত দীক্ষাভঙ্গের

দোহাই দিব, ইহার মত ভগমী আর কি হইতে পারে!

শাস্ত্রে ধর্মসাধনের যে সাতটা আচার আছে, তার কোনটাই আমরা পালন করিতে সক্ষম হই না। স্বস্তি-সহিতাসম্মত শৈবাচার, বা পৌরাণিক বৈষ্ণবাচারও সম্যক পালন করিয়া, ধর্মসাধন দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। তবে বলিতে আগম শাস্ত্রের অহুসরণই কর্তব্য, এইরূপ উক্ত হইয়াছে। উহার মধ্যে দক্ষিণাচার, বামাচার এবং সিদ্ধান্তাচার এই ত্রিবিধ মার্গের উল্লেখ আছে, বামাচার ও সিদ্ধান্তাচার প্রবৃত্তিমূলক, দক্ষিণাচার ব্রহ্মসাধন—জীবের অবনত প্রকৃতির লক্ষণ দেখিয়া, বামাচার ও সিদ্ধান্তাচার পালনের নির্দেশই স্পষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। দক্ষিণাচার ও কুলাচার ধর্ম, এবং ইহা একপ্রকার গীতোক্ত আত্মসমর্পণ যোগেরই রূপান্তর। ইহার অহুসান বিধি দেখিয়া এই অহুমানই বন্ধমূল হয়।

সাধন তত্ত্ব—ভোগ ও মুক্তির সামঞ্জস্য নাই, “যজ্ঞাতি ভোগো ন চ তত মোক্ষঃ, যজ্ঞাতি মোক্ষো

ন চ তত্র ভোগঃ”—ইহা তজ্জের স্বপ্ন, বিস্তৃত ভোগ-প্রবৃত্তি দেহাশ্রমের অপরিহার্য নীতি, রক্তচাপ ইহা মৃত্যবৎ থাকিলে, আমূল ধ্বংস হয় না, তাই তর সামঞ্জস্য করিলে, ক্রীড়ার সাধনে ইহকালে ভোগ ও চরমে মোক্ষলাভ হইবে,—গতন্তর না দেখিয়াই এই বিধি, তজ্জের সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াস প্রশংসনীয়।

মোক্ষ লক্ষ্যে থাকায়, ঐহিক জীবন—মোট ফলের মতই ভারবহু হইয়াছে। মর্ত্যের সাধনা দিচ্ছ করিতে হইলে, ঐহিক ও পারত্রিকের মধ্যে যে অলম্ব্য ব্যবধান তাহা দূর করিতে হইবে—গীতার যোগ এই যেতু মুখার্জি, জীব ও ব্রহ্ম নিত্য সঙ্গ স্বাপনের স্বব্যবস্থা ইহার মনেই আছে। জগৎ এবং ব্রহ্ম, পরমায়া এবং জীব, উভয়ের মধ্যে নিত্য সঙ্গ প্রতীতি করার পথ আবিষ্কারেই জীবনে স্বর্গপ্রতিষ্ঠা সম্বল হইবে,—বৃক্ষ, শস্য ইহাতে আগম শাস্ত্রবিদ মনীষিগণ পর্যন্ত মোক্ষের পথই প্রশস্ত করিয়াছেন, শৈবাচার ঐক্যত বেদ ও স্মৃতি শাসিত বিধি নিষ্ঠুর ভাবে জীবের বর্জ্যরোধ করিয়াছে, তর শাস্ত্র ভিলে ভিলে সহিয়া সহিয়া, মানুষ প্রকৃতির সাহায্যেই যাহাতে নির্লিপ্য লাভ করে, তাহার ব্যবস্থা দিয়াছে। যুগে সেই একই তত্ত্ব, মোক্ষ আর নির্লিপ্য। জীবনের সমস্ত ইহাতে দূর হয় নাই। অনন্ত কালের প্রতি মুহূর্তটা যে সচ্চিদানন্দময়, ঐহিক, পারত্রিক, স্থাবর, জঙ্গম, জীবন, মৃত্যু, স্বপ্ন, দ্রব, শান্তি অত্যাচার, দারিদ্র্য সম্পদ, সবই যে ব্রহ্ম-স্বরূপ, এই অমর অহঙ্কৃতের স্পর্শ সর্বকালে, সর্বাবস্থায়, সর্বত্র রক্ষা করার সাধ্য যদি মানুষের সামর্থ্যে ফুলায়, তবে সেই সাধনাই মর্ত্যবাসীর পূর্ণ যোগ, বিদ্যা সাধনা—ইহা ভিন্ন খণ্ড, পারত্রিক মঙ্গল-বিধানের অপূর্ণ বিধি ব্যবস্থার বোঝা বহিয়া ভারতবর্ষ আজ প্রাণে মরিতে বসিয়াছে, ব্যক্তিগত

মোক্ষ নির্লিপ্যের আকাঙ্ক্ষা, সমগ্র জাতির জীবন-প্রদীপ বৃষ্টি নিভিয়া যায়।

ভারতের দীর্ঘ অতীতে মানুষ যত ইহবিষয় ইহাতে চাহিয়াছে, ততই তার দৃষ্টি নত হইয়াছে, দেহ প্রাণ-মন-বুদ্ধির দায়টাই বড় হইয়া উঠিয়াছে। মানুষ মর্ত্য শরীর-প্রাণ-মনের মূলা নির্ধারণ করিয়াই চিরবৃৎ সাধনার গতি নির্ণয় করিয়াছে, দেহ যে পথে চলিতে চাহে না, প্রাণ মন যেখানে অবসর, জীব অমনি হয় সে পথ ছাড়িয়াছে, নয় জীবন নশ্বর বোধে বলনায় স্বর্গ রচনা করিয়াছে। এই হাতের কলমটা একটা উপলক্ষ্য। হাত ইহাতে মস্তিষ্ক পর্যন্ত একটা গড়ানে রাস্তা, যেখান দিয়া লেখাটা গড়াইয়া গড়াইয়া, কাগজটার উপর ছড়াইয়া পড়িতেছে, এই বোদটা আমরা মূর্খদা স্বরূপে রামি না। রক্ত-প্রবাহ বহিয়া যে শক্তির শরীরকে তাজা রাখিয়াছে, তাহার অহমত্বান না করিয়া, রক্তের মাজা স্রাস্ত বুদ্ধি ইহাতে দেখিলেই, বিষময়ের আগ লইয়া অস্তিম ব্যাকার জ্বল ঘাটে গিয়া বসি। ভারত অধ্যাত্মবাদী বলিয়া যতই বখাউ করুক, একেবারে জড়বাদী না হইলেও, হাজার বৎসর আমরা যে বুদ্ধের মত শূন্যবাদী সে বিষয়ে আর সংশয় নাই।

এই তুলায় শক্তির সন্ধানের চেষ্টাই যোগের প্রথম সোপান। সাধন ভজনের ভিতর দিয়া ইহার সাফল্য যেখানে না মিলে, সেখানেই নৈরাশ্য। পূর্বেই বলিয়াছি, পরিমিত দেহ প্রাণের সাধ্যও পরিমিত। অপরমিত ঐশ্বর্যতত্ত্ব চলার ভরসা অনন্ত শক্তির সফলত, অনন্ত শক্তির আশুকুলা। এই অলক্ষ্য শক্তির বিদ্যমানতার উপর অটল শ্রদ্ধা ও প্রত্যয় সহজে পালে না, তাই প্রয়োজন হয় শাস্ত্রের উপদেশ, গুরু মন্ত্রশক্তি, সাধু সন্তের সঙ্গ। আর্ন্ত বিপর হইয়া অনন্ত শক্তির চরণে হাঁটু গাঢ়িয়া উপবেশন কর, ডাকার মত ডাক,—প্রত্যয়হীনের ডাক বন্ধা

নারীর পুস্তাকাক্ষরমত নিফল, বিশ্বাসীর কণ্ঠে আকুল প্রাণনা। সদা ফলপ্রসূ,—পৃথিবীর সফট এক ক্ষেঁটা শক্তির বর্ণণে অপসারিত হয়, অধ্যাত্ম সফটে চাই শক্তির প্রাবন, তাই সাধককে সর্ব প্রথমেই শক্তিময় ইহাতে হয়, আত্মসাধন শক্তির দ্বারা মাথা পাতিয়া ধারণ করিতে হয়, শক্তির বরপুল যে, সেই ঐশ্বর-লাভের অধিকারী।

ভগবানের রাজ্যে পক্ষপাত নাই, প্রত্যেক জীব সে হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খৃষ্টান হউক, অস্পৃহ হউক, পুণ্ড্র হউক, নারী হউক, জগন্নাথার মন্দির-ঘর সকলের পক্ষেই মুক্ত, সকলের পূজা গ্রহণের জন্ম না আবার দিগ্ভ্রম, চাই অটলপ্রতিষ্ঠ আত্মিক বুদ্ধি, নিঃসংশয়চিত্ত, যোগের পথ তবেই প্রশস্ত হইবে।

এই মহাশক্তি এক এবং অনন্ত, সচ্চিদানন্দময়ী, সর্বভূতসংস্বেষী, ইহাকে জানার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণশক্তির জাগরণ হয়, ও জীবনের গতি তির্যক পথ ছাড়িয়া স্বল্প রেখায় উচ্চমুখী হয়, এই মহাশক্তির মধ্যে জীবের ক্ষুদ্র অহমিকা যতই তলাইয়া যায়, ততই আনন্দ ও অমৃতত্বের পথে আমরা অগ্রসর হই, ততই জ্ঞান ও কর্ম একতানামুক সত্ত্বাতের মত জীবনকে যথুদয় করে, ইহা একদিনে সত্ত্ব নয়, সারা জীবন চালিতে হয়। কামনাহীন চিত্ত ও প্রশান্ত হৃদয় না হইলে, মুক্ত জীবন লাভ হয় না। চাই যেমন অটুট দৈর্ঘ্য, তেমনি বুদ্ধির সাহস, প্রাণ দিয়াই অমৃতের সন্ধান মিলে, ভাঁড় পক্ষে এগুণ নয়।

প্রথম ভাঁড় শক্তি সঞ্চয় অটুট জ্ঞান। এই প্রাথমিক জ্ঞানের জড়ই, শাস্ত্র, কাল, গুরু ও উপদেশের প্রয়োজন হয়—শাস্ত্র প্রার্থীর আঙুন আলাইয়া রাখা সাহায্য করে, কালের আশুকুলা নিত্য, গুরু হৃদয়ে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেম নিষ্ঠার উৎস,

শিষ্ণ, সঙ্গ, মহাপুরুষগণের বাণী বিশ্বাসের হোম-কুণ্ড, সাধনার পথে এইগুলির যোগাযোগ অবশ্যজ্ঞানী, না হইলে, সবই নিরর্থক।

দেহরপার জন্ম মানবকে যেটুকু শক্তি প্রকাশ করিতে হয়, সে শক্তিতুকুও অনন্ত শক্তির বৃদ্ধি, প্রয়োজনমত প্রাণপথে আরও শক্তি টানিয়া বাহির করার প্রয়াস, প্রত্যেকের জীবনেই দেখা যায়, উদ্দেশ্যসিদ্ধির সঙ্গল যেখানে, দৃঢ় সেখানে শক্তির একটা প্রবাহ স্রষ্ট হয়, সাধারণ লোকের চেয়ে এই শ্রেণীর কণ্ঠী জীবনে শক্তির বিভ্রাৎ অধিক হইবে, ইহার কারণ আর কিছুই নয়, আমাদের প্রত্যেক সামর্থ্যটুকুর পশ্চাতে সীমাহীন চিৎশক্তি বিদ্যমান আছে, যাহার যেমন দাবী সে উজ্জ্বল লাভ করে, শক্তির ধারণসামর্থ্য যার যত অধিক, সে তত পরিমাণে শক্তিশালী হয়। শক্তির সাধনাই প্রথম সাধ্য, শক্তিসিদ্ধ হয় সেই, যে যত শুদ্ধ, সত্য ও প্রেমের অধিকারী।

স্থগা-বিষেখ-কাম-কলুষিত জীবনে, শক্তির বৃদ্ধিই প্রকাশ পায়। গীতার নিকাম কর্মযোগে বিস্তৃত জীবন লাভের প্রকট উপায়। মানুষ অসাধারণ শক্তি চায়, অমাহিমিক জ্ঞান চায়, কিন্তু ঠাকুরের কথা বলি—“তোরা যেমন ভাব তেমন লাভ”। চাই প্রমাণ দেন কড়ি প্রতিপত্তি অর্জনের জন্ম যত খটী, ঐশ্বরশক্তি অর্জনের জন্ম তত কি আমরা প্রাণ চালি? ধনকড়ি লাভের অপেক্ষা এই বস্তকে সহজপ্রাণ মনে করি, আর এইমিকে আমাদের স্বাভাবিক সৌক্য থাকায়, পরিশ্রম বিমূহ হইয়া কালনিক সাধনায় তামসিকতায় আচ্ছন্ন হয় না পাই ঐহিক সম্পদ না পাই ভগবান, বাড়ে আত্মরানি, নৈরাশ্য, নিজের হাতে মুখে কালি মাখিয়া সবাই সভাসজুক, এই হয় কামনা, নিজের ভাল না দেখিলে কার ভাল দেখায় ব্যাধা জন্মে,

ধর্মসাধনার ক্ষেত্রেই তাই আজ পরীক্ষাতরতা রূপ মহাপাপ আশ্রয় করিয়াছে ধর্মের নামে যত পন্থ, অমনৈকা, হিংসাবিদ্বেষ, অন্যায়, এমন আর কোথাও দেখিবে না; ধর্ম ভণ্ডের ছদ্মবেশ, ধর্মক্ষেত্র জুয়াচুরী ও মিথ্যার অভ্যাস, অথচ ইহারই উপর ভারতের ভবিষ্যৎ, মহামায়াভ্রান্তির কলাশ নির্ভর করিতেছে। ভারতের নরনারীকে এ পাপ হইতে মুক্তি পাইতে হইবে।

শোণনের নানা ব্যবস্থা আছে, দেশের বর্তমান অবস্থায়, জীবনের ভিত্তি বজায় রাখিয়া, জীবনের ত্ত্বিক বিধান এক প্রকার চুই। পতঙ্গলীর অগ্ৰাধ যোগপদ্ধতি সময়ের প্রতিকূলে সিদ্ধ করা কক্ষক্ষেত্রে সম্ভব নয়; অথচ নৈকর্য্য আজ মৃত্যুত্যাগ। নামধর্ম জীবনের অঙ্গকাল দেওয়া যায়, অষ্টাদশে ক্ষত, দুই দণ্ডের ঊনষ প্রয়োগে ইহা নিরাময় হইবে না। তবে একবার নাম গ্রহণে জীবনের পাপ দম্ব করার মত প্রবল প্রত্যয় যার আয়ত্তে, তার কথা স্বভঙ্গ, আমরা সাধারণ জীবনের কথা বলিতেছি, সামারভার মাথায় বহিয়া, মান নয়নে যাদের অশ, ভ্রম বৃক নৈরাশ্রের অন্ধকার, আর্ন্ত কাতর কর্তে যারা হা ভগবান বলিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছে, এই শত সহস্র ভাইবোনদের ধমনীতে দিব্যশক্তির বিদ্যুৎপ্রবাহ কেমন করিয়া বহিতে পারে, তাহারই একটা ব্যবস্থা চাই। আশায় প্রাণ ঝাঁক, নৈরাশ্রে অটল পদে কেমন করিয়া দাঁড়াইব, স্বপ্নে সম্পদে মুখে হাসি ফুটে, শোকে দারিদ্র্যে কেমন করিয়া অটল রহিব, নিম্ন-স্বস্ত-সখার সেহ জীতি পাইলে

উৎসাহ জাগে, শত্রুবেষ্টিত কারাগৃহে জীবনপ্রদীপ কেমন করিয়া উজ্জল রাখিব, তাহারই একটা ব্যবস্থা চাই।

আজ যে আমাদের উদয়াত পরিশ্রম করিতে হইবে, নানা অপ্রিয় স্থান ও বিষয় লোকের সম্পর্কে গিয়া অবস্থান করিতে হইবে, আজ আমাদের পথ সমতল ক্ষেত্র হইতে বক্র বন্ধুর গিরিমাঝে গিয়া দেখা দিয়াছে, সে শক্তি কোথায় পাইব, বাহা এই অবস্থায় আমাদে সাধনা দিবে, বাহা দিবে, ধমনীতে ধমনীতে বল সঞ্চার করিবে।

আজ তিরকার, লাঞ্ছনা, মিথ্যা মানি, আততায়ীর শত অত্যাচার আমাদের ঘিরিয়াছে, সে প্রেমকোথায় পাইব, বাহা আমাদের অন্তরে মৈত্রীভাবেক অটু রাখিয়া, হিংসা ও বিদ্বেষের প্রস্তরখাত দিবার প্রস্তুতি হইতে আমাদেরিগকে রক্ষা করিবে।

আজ আমাদের দরকার হইয়াছে, অহুকুল প্রতিফুল, স্বপ্ন দুঃখ, বশ: নিদ্রা, সম্পদ বিবদ সকল অবস্থায় সত্য-শক্তি-প্রেমের বিমল গৌরব বিতস্ত, অবিকলভাবে রক্ষা করিয়া জীবনকে ধস্ত করা, আর আর কথায় নয়। সতাই নগর ফিরিয়া যাদের মন্দির প্রদক্ষিণের অহুকুল, শাকার ভোজনে উদরফুটির পরিবর্তে যাদের আহুতি প্রদানের প্রত্যয়, প্রিয় অপ্রিয়, কষ্ট মিষ্ট সকল কথাই যাদের বাণী, এইভাবে জাগ্রত রাখার দরকার হইয়াছে।

জীবন যোগে এই শোণনের উদার নীতিই যুগ সাধনের একমাত্র পথ—আমরা বারান্তরে ইহার আলোচনা করিব। (ক্রমশঃ)

ধর্ম-কেন্দ্র

—:—

“অথোহি জ্ঞানভাসা, জ্ঞানান্ধারো বিশিষ্টতঃ।
যানানং কর্মফলতাপগুণাচ্ছাশ্রিনননরম্।”

অভ্যাসের চেয়ে জ্ঞান বড়, জ্ঞানের অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ, কর্মফল ভাগ্য সর্বশ্রেষ্ঠ, তাগে শাস্তি লাভ হয়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর লাভের পর পর তিনটা পহার কথা বলিয়াছিলেন:—

“অথ চিত্তং সমাধাতু: ন শঙ্কোহি মরি হিরম্।

অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপুং ধনঞ্জয়ম্।”

হে ধনঞ্জয় আমাতে চিত্ত সমাহিত করিতে যদি অসমর্থ হও, অভ্যাসের দ্বারা, অর্থাৎ বিকল্প চিত্তকে পুন: পুন: আমাতে যুক্ত রাখার অভ্যাস দ্বারা আমাকে পাইতে চেষ্টা কর।

যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও? “মৎকর্মপরমো ভব”—আমার ধন্য কর্মপরায়ণ হও, আমার জীতি সাধনের জন্য কর্ম করিও—“সিদ্ধিমবাগ্যাসি”—সিদ্ধি লাভ করিবে।

ইহাতেও অশক্ত হইলে—“মদযোগমাশিতঃ”, আমার পরাধীন হইয়া, সর্বস্ব-ফল পরিত্যাগ কর। ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

যাহা পরম, তাহা একেবারেই সিদ্ধ হয় না—অভ্যাস যোগে অসমর্থ যে, সে ঈশ্বরে আশ্রয়মর্পণ করিতেও অসমর্থ হয়, কর্মফল ভাগ্য আরও শক্ত কথা।

এই অভ্যাসযোগ আমাদের দ্বাতে সহ্য না। প্রাচীন যুগে, বালাকাল হইতে ঈশ্বরে ভক্তিপরায়ণ হওয়ার শিক্ষা পিতা মাতার নিকট হইতেই পাওয়া

যাইত, অনান অর্জনতাপী পূর্বেও প্রাতঃকালে ঘরে ঘরে, ভাগবত গৌর, উপাসনার সুরল মর আত্মিক হইত, পূজা হোম, নিত্য কণ্ঠের শ্রুতলা ছিল। দীয়ে দীয়ে ঈশ্বরে বিশ্বাস—আর অস্বচ্ছিত-লজ্ঞ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠ নয়, উহা স্বীকার স্বীকার তুল্য কথা বোঝে, অনেকেই মনে করেন,—ঈশ্বর বিশ্বাসের অভাবে, ঈশ্বরজ্ঞান জ্ঞাতির জীবনে ক্রমেই মান হইয়া পড়িতেছে।

ব্যক্তিগত জীবনে বা কোন কোন গৃহস্থের মধ্যেই নিষ্ঠাবর্তী বিদ্যা অথবা কোন কোন ভক্ত উপাসনার অভ্যাস নানাস্থরে রক্ষা করিতেছেন। মানের দ্বাটে, মন্দিরে, চণ্ডীমণ্ডপে বিশ্বস্তাঙ্ক, ভাগীরথীর গুব, চণ্ডীপাঠ প্রভৃতি ভক্তিসাধনার ভণ্ডীগুলি এমনও লক্ষ্যে পড়ে; কিন্তু জাতিগত জীবনে, ঈশ্বরের উপাসনা ব্যাপক আকারে বিস্তৃত না হইলে, জাতিহিসাবে ঈশ্বরপরায়ণ হওয়া ঘটনা উঠিবে না। ভারতের প্রাণ ধর্ম, জাতির প্রাণে ধর্মের অধিকৃও জাগিতে না পারিলে আমাদের মুক্তি নাই।

ভারত কোন দিন জাতির সমতা ভাবে নাই। দেশের প্রতি সমতা—যেমন গৃহস্থের বাস্তবতার প্রতি—স্বাভাবিক টান। ইহা দ্বারা আমরা রক্ষা পাই নাই। ভারতের প্রাণে জাতীয়তার প্রভাব, ধর্ম হইতে সমাজ, শিক্ষা, আচার ব্যবহার, সর্ব কর্মে বাহাতে সঞ্চারিত হয়, জাগরণযোগের কণীদের সেই চেষ্টা করিতে হইবে।

আমি শুধু ঈশ্বরপরায়ণ হইলে জাতির কোন লাভ

নাই, জাতিকে শ্রেষ্ঠ বৃহৎ করিতে হইলে, জাতির ইষ্টানিষ্টের কথা অস্তর দিয়া ভাষা চাই, ভারতের অতীত বৃত্তি গৌরবযয় হইক, তাহা জাতীয়বোধ হইতে বিচ্ছিন্ন বলিয়া, জাতির উন্নতি উহা বাধা সাধিত হইবে না। যে জাতির অতীত আছে তাহার ভবিষ্যৎও আছে, এইরূপ একটা কথা অনেকই বলেন, কিন্তু তাহাদের স্বরূপ রাগা দরকার যে যখন জাতিই ছিল না, তখন আবার জাতির অতীত কি? দেশ ছিল, দেশ আরও আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে। রোমের অতীত ছিল, সে রোমকে দানি নাই। পৃথিবীতে ভারতবর্ষ বলিয়া একটা দেশ থাকিবে, কিন্তু তাহারে বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র্য লইয়া একটা জাতি যদি না আসে, তাহা হইলে আমাদের অস্তিত্বই লুপ্ত হইবে। আত্মিকার এই জাতিত্বের নাড়ার, ফোড়ির কথা ভারতের ধর্মপ্রাণতার অটল ভিত্তি প্রতিষ্ঠার আয়োজন চাই, নতুবা বাসুদেব উপর গৃহনির্মাণ—সব পণ্ড হইবে।

দ্বুপধর্ম—জাতিনির্মাণ। ভারতের মাতা—ইহার অঙ্কুল, বিশেষ বাংলায়। বাঙ্গালী জতি সমাজে জাতিরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা হইতে পারে। জাতীয় ভাব সহজ ভাব নয়। ব্যক্তিগত হুঁষ সাচ্ছন্দ্যের আদর্শের আমূল উচ্ছেদ না করিলে জাতিগঠনের অসূত্রান আরম্ভ হয় না—অতীতের সমাজ, ধর্ম, গার্হস্থ্য জীবনের নীতি পণ্যস্ত পরিবর্তন করিতে হইবে, কেননা প্রাচীন যুগে যাগ ছিল তাহা ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতি ও পুষ্টি-বিধানের উপযোগী, জাতিকে সমৃদ্ধ করিতে হইলে জাতীয় উৎকর্ষ সাধনের রীতি প্রবর্তন করিতে হইবে।

এই কথ গীতার-মাহত্বই করিতে পারে। কথ-ফল তাগ করার সামর্থ্য যাহার সাধ্যে নাই, সর্বধর্ম পরিভ্রমের ভরসা তাহার আশিবে কেনম

করিয়া? সে কৃপমণ্ডকের কণ্ঠে জাতির কথা বড় কর্শন—বিজয়হংসক। ঈশ্বরশ্রাঘণ্য ভক্ত সাধক, নিরুদ্যম কর্মযোগীর অভ্যুত্থানের উপরেই ইহা নির্ভর করে। আমাদের ধর্ম জাতিগঠনের আদৌ অঙ্কুল নয়, পরম প্রতিকূল, যাঁহী জীবনের পরিণামক। ইহার সম্যক পরিবর্তন চাই। কে এ সাহস করিবে, কার কণ্ঠে মুঞ্জুরীর বিধান বাজিয়াছে, বকে শ্রামার মৃত্যু হইয়াছে, ধর্মক্ষেত্রগুলি পুরাতনের আবর্জনাযুক্ত করিয়া, মূল হইতে জাতি গঠনের উপযোগী করিয়া গড়িবে? জাতি না থাকিলে দেশের মর্যাদা থাকে না, সনাতন ধর্ম রক্ষা করা যায় না সনাতন ধর্মের দেউল বিধাতা স্বয়ং নির্মাণ করিয়াছেন, সে দেশ এই ভারতবর্ষ, আর তার প্রাণকেন্দ্র এই বাংলা—জাতির জন্য জাতি নয়, ধর্মের জন্য, ঈশ্বরের জন্য, সনাতনকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আমাদের উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে।

কাল বড় কঠিন। জাতিনির্মাণের পথ সুব-ধার, একার সাধা নয় ইহা নিশ্চয় করে। কোন বিশেষ মণ্ডলীর উদ্বুদ্ধতার ইহা সিদ্ধ হইবে না, কোন নেতার সঙ্কল্পও যথেষ্ট নয়, জাতিকে জাগিতে হইবে। এখানে সেখানে, বিশেষ ব্যক্তি বা মণ্ডলীর বিচ্ছিন্ন শ্রেষ্ঠতা, হুস্ত হিংস্রক অঙ্কুর জাগ্রত করার যে বিপদের সম্ভাবনা, এতদ্বারা তাহাই হইবে। শক্তির অপব্যয়, আর ইষ্টনির্দিষ্ট কাল অনর্থক পিছাইয়া যাইবে। চাই তলে তলে দেশের তরুণ শক্তির প্রাণে বিভ্রান্ত সঞ্চয় করা ও মিলনের দরদে প্রাণকে আকুল করিয়া তোলা। ব্যক্তি-প্রাধান্য সংরক্ষণে বা সমষ্টির গৌরববাহিত মানসে, জাতির কাঁচা জীবনে যেখানে অনৈক্যের আগুন, সেখানে নির্বুদ্ধিতাই বেগা, আশ্বাতা হওয়ায় অন্ধতা স্থান পাইয়াছে। অধুৱ ভবিষ্যতে

বাংলার যে কার আরম্ভ হইবে, তাহা কোন বিশেষ নেতৃত্বের আশ্রয়-তাও নয়, অথবা সুপ্রতিষ্ঠ সমষ্টির প্রভাবের নয়। এমন একটা হাওয়ার স্থিতি হইবে, সর্বত্র একই উদ্বেগে একযোগে একই কর্ম সাধিত হইবে। ইহার অন্যরূপ ব্যবস্থা বিধা বিধান নয়, উহা অহং-প্রহৃত, স্বাধীনিক নীতি। ভোর করিয়া জাতির কর্ম যদি কোন শক্তিশালী ব্যক্তি বা সমষ্টির অধীনে নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়াস হয়, তবে উহার উদার উদ্দাম চিহ্নগতি কুপ্তিত সন্ধানী হইয়া পড়িবে। জাতীয় শক্তি স্বাভা-বান্ধব বেগে আগনি ঢালিত হইয়া মুগ্ধি গ্রহণে তৎপর, ব্যক্তি বা সমষ্টির অহং প্রহৃত কর্মপ্রয়াস আজ কেবল জাতীয় শক্তিকে পরিচ্ছন্ন মূর্তিতে প্রকাশ হইতে বাধা দিবে।

বাংলায় ধর্মসাধনার বহুক্ষেত্র দীর্ঘে দীর্ঘে গড়িয়া উঠিতেছে, সাধারণ লোকসমাজের সহিত এইগুলির সাযোগ্য হ্রদ বেশ অটুট হইয়া উঠিতেছে না, ইহার কারণ এই যে ধর্মমণ্ডলী সমাজের বৃক ছিঁড়িয়া নূতনকে আত্মান করিতে কিছু আগাইয়া পড়িয়াছে। বাংলার তীর্থ দেবমন্দির, সমাজের সহিত পরিচয় রাখিয়া সে, সমাজ জীবন এই সকল ক্ষেত্রে অকূট, কিন্তু হৃৎপের বিষয়-প্রাণে আগুন আগার মত উত্তাপ এই সকল স্থানে মিলে না। সাধারণ জীবন মগ্ন করিয়া বাংলার যে সমুদয় আশ্রম গড়িয়া উঠিয়াছে, ঐগুলি যদি দেশের সমগ্র জীবন বানিক উপরে উঠাইয়া ধরিতে না পারে, আপনাত উত্তাপে আপনাদেরই পুড়িতে হইবে, উত্তাপ বিতরণ করিয়া, বাঙ্গালী জাতিকে আর উদ্বুদ্ধ করা যাইয়া উঠিবে না।

সমাজে যে দিন সম্মানসম্মানবোধের অভ্যুত্থান ঘটিল, সে দিনও, সাধারণ জীবনে একটা চাক্ষুষ উপস্থিত হইয়াছিল, ক্রমে সর্বসাধারণী সম্মানসম্মান তপ-

প্রভাবই লোকসমাজ ধর্মের আশ্রম পাইয়া স্বত্বাধী হয়। সে ছিল ব্যক্তি সাধনার যুগ, আজ এই সম্মতিসাধনার লক্ষণ স্বরূপ, সমাজের বৃক এক একটা আশ্রমের উদ্ভব ভবিষ্যতে যেরূপ বিধান করিবে, যদি তাহাদের লক্ষ্য থাকে লোকোন্নতি। আজ তীর্থ ও মন্দির প্রাণহীন, যে শক্তি সমাজ জীবনে নূতন আদর্শের প্রভাব বিস্তার করিতে আশ্রম প্রতিষ্ঠার উদ্বুগ, সেই শক্তি বাংলার তীর্থমন্দিরে তপশক্তি সফলারে নিয়োজিত হইলে, জাতির প্রাণে ক্ষিপ্তপ্রতিভে ধর্মভাব জাগ্রত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। আশ্রম অভিনব বস্ত্র—লোকের মনে ইহার প্রয়োজনীয়তা বোধ হইতে বিঘ্ন হইবে। বহু সংগ্রামের পর সংসার, সমাজ সম্মানসম্মানকে নিজের মধ্যে স্থান দিয়াছিল, সম্মানসম্মান চরণে আবালাবুদ্ধবিনতির যে আজ সহজেই মাথা নত হয়, ইহা সম্মান জীবনের পূর্ণ সাধনার ফল। আশ্রম ধর্মের মহিমা সর্বসাধারণের মধ্যে বিস্তার লাভ করা, আশ্রমের পবিত্রতা ও আশ্রমযোগীগণের অসাধারণ তাগ তৎপরই উপর নির্ভর করে।

বাহীজী নূতন ধরণের সম্মানসম্মান সমাজের বৃক প্রতিষ্ঠা করিতে কি বেগ পাইয়াছিলেন, তাহা খুব কম হোকই জানে। ইহার উপর অধুনা স্থানে স্থানে যেকোন আদর্শে আশ্রম গড়া হইতেছে, তাহার বার্থ মূল নির্ধারণ সহজসাধ্য নয়। সম্মানসম্মান জীবনের মর্যাদা বুঝা যায়, আশ্রম জীবনে সংসারগঠনের প্রয়াস সত্যই ঘুর্কাণা। এই অসূত্রানের মূলগত আদর্শ, দিব্যরূপে পরিষ্কৃত না হইলে, সমাজের উপেক্ষা ও ওলাসিত্য সহজে দূর হইবে না। ধর্মপ্রচার না হইয়া সংঘর্ষের সাহায্য বৃদ্ধি হইবে, হইতেছেও তাই।

এই অবস্থা সাধারণ লক্ষণ, আভ্যন্তরীণ কারণ নহে। সাধারণ সমাজজীবনের ক্রীড়া মাজিনা, কিন্তু

আশ্রমস্বীবনের আদর্শ লইয়া বাঁধারা নতুনকে বরণ
করিতে উদ্যত, তাঁহাদের তিল অপরাধ অমার্জ্জনীয়।
এই হেতু বাংলার আশ্রমগঠনে উজ্জ্বল নারী পুরুষকে
কত বড় দায়িত্ব বোধ রাখিয়া এই পথে অগ্রসর
হইতে হইবে, তাহা বলাই বাস্তব।

আশ্রমই হউক, সম্মানস্বরূপ মঠই হউক, তীর্থ,
মন্দির, দেবালয় হউক, সর্বত্র 'আশ্রম' চাই। যথেষ্ট
যৌবকও প্রজ্জ্বলিত বাথার ব্যবস্থা। সম্মান
ক্ষেত্রে, স্বার্থ ও ভোগ প্রবৃত্তির আয়োজন অস্বাভাবিক
নহে, কিন্তু বর্ণধোক্তজগৎ যে সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠান
গড়িরাছে, সেগুলি নিরন্তর যেন দেশময় ঈশ্বরভাব
প্রচারে উদ্যত থাকে। সম্ভারবদ্ধ জীব যেন এই
সকল ক্ষেত্রে শিখা শান্তি ও আলোর সন্ধান পায়।
আশ্রম যেন স্বার্থপরতার কোলাহলময় না হয়।
মঠ, মন্দির, তীর্থ, দেবালয় যেন জীবনের স্তম্ভপ
হরণ করার দ্বিধাভেদ রূপেই বিরাগ করে।

আমাদের দেশে পল্লীতে পল্লীতে কোন না কোন দেবালয়, শিব মন্দির বা হিন্দু ভা আছে। সেইগুলি বাহাতে প্রাণবন্ত হয়, তাঁর আরোহণ করা হউক। আশ্রম, প্রসিদ্ধ তীর্থ, সম্রাসীন নঠ, সূর্য্য লোক সমাজের সমিতি নহ, কিন্তু প্রাচীন ক্রিষ্টিয় মন্দিরাদি সকল গ্রামে, সকল পল্লীতে এখনও বিদ্যমান থাকিবা লোকের মনে ভক্তির উল্লেখ হয়। যেখানে স্থপতিত মন্দির নাই, সেখানে দম্ভারাজ, শীতলা, বনমা সভাপতির পাঠকুণি, পবিত্র অশ্বখ বট বৃক্ষগণে কোন না কোন ভক্তির নিদর্শন।

বিনা শ্রমে অর্থ সঞ্চয় হয় না, ক্ষুধা নিবৃত্তির
জগৎ শ্রম প্রয়োজন, ঈশ্বরলাভের পথেও যে শ্রম
চাই, একথা বলাই বাহুল্য। ভাগবত জীবন লাভের
লক্ষণ, বিশেষ সমষ্টি ও বিশিষ্ট ব্যক্তির উপরেই
নির্ভর করিয়া থাকায়, আমাদের ব্যাপক জীবন

ক্রমেই বোধিমান পশু হইয়া পড়িতেছে। আহার নিদ্রা বৈপ্লবের স্বভাব অত্যাশে সিদ্ধ করিতে ঘন, স্বভাব বিকাশ পায়, কিন্তু ঈশ্বরের অহরণ আশ্রয় অত্যাশেযোগে জাতির জীবনে সঞ্চারিত করার আয়োজন করিতে হইবে। দেশের তরুণদের প্রতি তাই নিবেদন, জাতির কশাণের জন্য গ্রামে নগরে সর্বত্র, ধর্মদান্যার অত্যাশে সহজে জনা একটা উদ্বেগভার প্রবাহ হইয়া থাকে। গ্রামবাসীদের মধ্যে ঈশ্বরবোধের আকর্ষণ স্বপ্নে আবার উপায় গ্রামের তরুণেরাই করিতে পারেন, ইহা বর্ষণা নয়, ধর্মপ্রাণ জাতি আশ্রয় কত ঘুমাইবে।

ঠাণুর বন্ধিয়াছিলেন, সাধনা করিতে হয় কোথা,
বনে আর মনে, সে ব্যক্তিগত সাধনার স্থাপো
দিনে রাত আমরা যথেষ্টই পাই, প্রতিদিন রাশ-
মুহুর্তে ভূই চারিজনে মিলিয়া গল্পী মুখরিত করিয়া
ঈশ্বরের কর্ত্তন ও গল্পীতে যে স্থান ধর্মক্ষেত্র বিদ্যা
নিষ্ঠিত, সেখানে গিয়া স্থান উপাসনা তেজাবি
পাঠের ব্যবস্থা করিতে পারিলে, আমরা আন্তরিক
লাভ করিব। আশ্চর্য, মাঠে এই আত্মোদ-
আছে, কিন্তু সাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে
ভগবানের ভজন কর্ত্তন, নিয়মিতভাবে প্রচলিত
না করিলে, যাড়ে চারকোটি ভাইবোনের মনে
ধর্মভাব জাগাইয়া তোলা সম্ভব হইবে না। তাই
পূর্বেরই বিষয়টি, কোন আশ্রমের বা ব্যক্তি
মুখাপেক্ষী না হয়, সর্বত্র উৎসাহী তরুণেরা এই
কাজ আরম্ভ করুন, জাতি ধর্মবলে উদ্ধৃত হউক, ক্ষত-
স্রোতের বহু ধর্ম জাতি জীবনে ছড়াইয়া পড়ুক। হোয়া
শোক, দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা—পাপের ছন্দা, ঈশ্বরের মহাশ্রম
মুহুর্তে অঙ্গপারিত হয়। চাই আশ্রমের আর না, সা-
চাহিত্যই প্রয়াগ—তরুণগণ! বাঙ্গালী তোমরা কি
ইহার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া উদ্ধৃত হইবে না ?



বঙ্গসাহিত্যে সমাজতত্ত্বীয় অনুসন্ধান ।

[লেখক—ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, এম,এ, পি এইচ ডি]

পূর্ণ প্রবন্ধে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, শারীরিক নৃতত্ত্ব হিসাবে ভারতের সর্বত্র যে biotype বিশেষভাবে বর্তমান, বঙ্গপ্রদেশে তাহার বাহ্যিকত্ব হয় নাই, তন্মাত্র আত্ম যে সব racial elements বঙ্গে আছে, ভারতের অন্তর্ভুক্ত বঙ্গীয় তাহা বর্তমান। অর্থাৎ নৃতত্ত্ব হিসাবে বঙ্গ নিখিলভারতের অঙ্গীভূত। এখানে কথা হইতেছে যে, এই সব বিভিন্ন racial elementsএর সমঞ্জস গুলি কোন সময়ে বঙ্গপ্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তৎকালে তাহারা homo-geneous elementsরূপে বঙ্গে আসিয়াছিল কিনা, কিংবা নানা প্রকারের racial elements মিশ্রিত হইয়া একটা peopleএ পরিণত হইয়া বঙ্গে আসিয়াছিল এবং তাহাদের জাতি (race) যে ভাবেই সংগঠিত হউক না কেন, তাহাদের কী ভাষা ছিল, তাহাদের জাতিতত্ত্ব (ethnology) হিসাবে কী চর্চা অর্থবা কী বেশভূষা, আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, ধর্ম

বিলাস, জীবিকা উপার্জনের উপায়মূহ, সামাজিক অঙ্গঠানাদি (institutions) লইয়া তাহারা বহু পার্শ্বপন করিয়াছিল? এ প্রশ্নের মৌমাষা কে করিবে? বর্তমানে ভারতীয় নৃতত্ত্বজ্ঞানের প্রথমাবস্থা, এবং সে অবস্থারও অতি শোচনীয় দশা! অন্ততঃ তাহা এ প্রশ্নের মৌমাষা এখন কে রূপে পাবিবে না, আর আমাদের বঙ্গসাহিত্যে মৌমাষা কিরূপে লুপ্ত কোন data দেখি না, তবে ভাষাতত্ত্ববিদ্যায় বঙ্গভাষার বিশ্লেষণ করিয়া কতকটা এবিষয়ের সংবাদ দিতে পারেন। কিন্তু যতদিন তাহারা এবিষয়ে একটা পাকা বৈজ্ঞানিক ধর না দেন, ভাষাতত্ত্বের বিক দিয়া ততদিন এপ্রশ্নটিকে subjudice রাখিতে হইবে। সাহিত্যের দিক দিয়া দেখি যে, বাঙ্গলা-ভাষার ইতিহাসে এই বিভিন্ন জাতিদের (racial elements বা peoples) বিধেয় স্মৃতিচিহ্ন নাই। এবিষয়ে, নৃতত্ত্ব ও জাতি-তত্ত্ব হিসাবে নিখিলভারত ও তদন্তরত্ত বঙ্গদেশে কোন প্রভেদ নাই। কারণ

আশ্রয় দ্বারা বিগত সহস্র বৎসরের ইতিহাসের migration এর নক্সার উপমা দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে হইবে। বঙ্গের ইতিহাসে ও জনশ্রুতিতে বলে যে তথায় এক সহস্র বৎসরের পূর্বে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ ধর্ম সংস্থাপনের জন্ম তথাকথিক রাজ্য আদিব্রহ্ম ত্রাঙ্গণ ও কাছাড়দের কাপাকুল হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন। অন্যান্য অনেক বর্ণেও, যথা বনিজ, রত্নপুত্র, মেদিনীপুরের কৈবর্ত * ইত্যাদিও এই প্রকারের প্রাচীন tradition আছে, যে তাহাদের পূর্ন পুরুষেরা পশ্চিম হইতে আগত হইয়াছিলেন।

ইহাতে ইহাই বোধগম্য হয়, যে অতি প্রাচীন কাল হইতে পশ্চিম হইতে ঔপনিবেশিকেরা নষ্টে নষ্টে: উল্লঙ্গ বসে আগমন করিয়া এপ্রদেশকে আধীন্য করিয়াছিলেন। পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও কাছাড় বংশীয় কাপাকুলের মহাপুরুষদের যুগের সহিত আদিব্রহ্মের সভায় যজ্ঞের জ্ঞান আগমনের অর্থ সাধা বাংলায় ইহাই বুঝায়, যে তাহা "লোচকখলধারী পুরভাইয়াদের" বাংলায় মধ্যযুগে উপনিবেশ স্থাপনের এক নক্সার মাত্র। যে প্রকারে বর্তমান বাংলায় হিন্দী ও হিন্দুস্থানী ভাষীরা সর্বত্র বিস্তারিত হইতেছেন, সেই প্রকারে অতি প্রাচীন কাল হইতেই

লোচকখলধারী পুরভাইয়ারা পৌড়বাংলার পদার্পণ করিয়াছেন ও সংস্কৃতভাষা ও আদিমভাষা তথায় রিস্তার করিয়াছেন। তবে, তৎকালে গমনো-গমনের অস্থবিধাবশতঃ এবং তাহারা উপনিবেশিক বলিয়া বাংলায় বসবাস করিয়াছেন। সমগ্র বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, যে immigration follows the line of least resistance অর্থাৎ উপনিবেশের বন্যা বৈদিকে অপ্রতিহত বেগে ধাবিত হইতে পারে, সেই দিকেই যায়; পুরাকাল হইতে "মধ্যদেশ" চারিদিকে adventurous ঔপনিবেশি-কের দল পাঠাইতেছে। মকুমর রাজশূন্যতা, মুসলমানের তাড়া খাইয়া, বাংলা হইয়া হিন্দিভাষীরা মুসলমান যুগে ঔপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল; কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলেও পূর্বে বহুকাল হইতেই উপনিবেশ স্থাপিত হইতেছিল। বর্ষ উল্লঙ্গ ও গমনাগমনের সুবিধা বলিয়া ঔপনিবেশিকদের বন্যা বোধগম্য এখানে বিশেষ হইয়াছিল এবং বিশেষতঃ এখানকার আদিম আদিবাসীরা ঔপনিবেশিকদের বাংলা দিকে পারে নাই বলিয়া উপনিবেশিকদের বন্যার তেজোভব বোধী হইয়াছিল, যে বাংলা সম্পূর্ণভাবে অতি প্রাচীন কাল হইতে আধীন্য হইয়া গিয়াছিল।

ক্রমশঃ

* আমি "তমলুক ইতিহাস" নামক পুস্তকে পাঠ করিয়াছিলাম বলিয়া মনে হয়, যে বৈবর্তরা বলেন, তাহাদের পূর্ন পুরুষেরা অযোধ্যা হইতে আসিয়াছেন। কিন্তু tradition এর নৃতাত্ত্বিক ভিত্তি আছে কি না দেখা প্রয়োজন।

জীবন-বেদ

(উপভাস)

—:—:

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অনুপমা আজ বড় বাস্তব হইয়া পড়িল। নীরব বাবুর পর পাঠিয়া তাহার দেবর তাহাকে লইতে আসিয়াছে। অনুপমা অল্প দিনের মধ্যেই বিধবা হইলেও, স্বামীর সহিত তাহার পরিচয় হইয়াছিল, সে যে কয়দিন শস্তরবাড়ী ছিল, সেই কয়দিনের স্মৃতি তাহার মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল, পোচনীয় ইতিহাস হইলেও স্বরূপে স্মৃতিস্তায় সে আনন্দ পাইত, হরিষে বিবাদের মাথামাথি প্রথম যৌবনের স্বপ্নটুকু ফেণাইয়া ফেণাইয়া সে বড় করিত, স্বামীর প্রথম পরণ ভাবিতে ভাবিতে তন্দ্রা হইয়া হইত, আগরণের চেয়ে স্মৃষ্টি তার ভাল ছিল, স্বপ্নের নেণার সে বিভোর থাকিত।

দেবরকে দেখিয়া স্নান ঘেন জীবন লইয়া বেগা ছুটিয়া দিল। প্রথম শস্তরবাড়ী বাইবার সময় এইরূপ আত্ম একজন আসিয়াছিল, তার সে কমনীয় স্মৃতিখানি প্রায় তুল্যরূপ, তার বর্ণ ইহাপেকা কিছু উজ্জ্বল ছিল। চক্ষের তারা ছুটি ঘেন আরও ব্রিদ্ধ জ্যোতির্ময়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আয়তন সুবিশাল, মুখের হাসি আরও মিষ্ট—মাণ্ডুগম্য ছিল, আড়াল হইতে অনুপমা তাহার দেবরের মুখের দিকে এক-দৃষ্টে চাহিয়া অন্তরের সম্পূর্ণ ছবিখানিকে ছুটাইয়া তুলিল—পতি নারীর সম্পদ, হারাইয়াও হারায় না, অনুপমা নিশ্চয়—অনিমিত্ত নরনে ক্ষুধার পিছায় ছুটিতেছে।

অপঘণের ঘরে আজ ঝাঁট পড়ে নাই, টেবিলের বইগুলি কেহ গুছাইয়া দেয় নাই, ছাড়া কাপড়খানি পর্যন্ত ঘরের কোণে জড় করা আছে; কেহ মল-

কাচা করিয়া বাহিরের তাগে শুকাইতে দেয় নাই,— একবার সে ঝাঁট লইয়া নিজেই ঝাঁট আরম্ভ করিল, দুই ছাই ভাল লাগে না, কাশ্মি চেয়ার-খানিতে বসিয়া পুস্তকগুলি গুছাইবার ইচ্ছা হইল, হাত চলিল না, ঘরখানিতে ছুই একবার পদচারণা করিয়া, উপরের সিঁড়ি হইতে নিচে উকি মারিয়া দেখিল, কাহারও সাড়া নাই! ভিতরে ভিতরে রাগের সহিত অভিমান বৃক্কের মধ্যে বড় নিঃশ্বাস আঁচড় দিতেছিল, সে অস্থির চিত্তে কি সে করিবে পুঁজিয়া পাইল না, অবশেষে ছাড়া কাপড়-খানি লইয়া নিচে নামিয়া আসিল, অপ্রশস্ত উঠানের ধারে, বাহিরে ঘরের দরজার কাছে অনুপমাকে সে স্পন্দনহীন স্মৃতিতে ধাক্কাইয়া থাকিতে দেখিল, কি উদ্ভ্রাবী আকুল দুষ্টি—অপঘণের বৃক্ক কে যেন সজোরে ঘুসি মারিল! কলের কাছে গিয়া বিরক্তির সহিত বলিল—“বৌদি কাপড়খানা সেই সকাশ থেকে পড়ে, কলেক থেকে এসে পরবো কি।”

লক্ষী রাগিতেছিল, বাহিরে হইয়া বলিল—“ধাক্কা, আমি কেচে দেব, তুমি আমার কষ্ট কর কেন?” অপঘণে তুলিল না, বলিল—“নিজের কাজ কার মত চেয়ে ফেলে রাখা ভাল নয়, আজ থেকে আমার সব কাজ নিজেই সেয়ে দেব” এই বলিয়া এক টব জলে কাপড়খানি ডুবাইয়া নিজেই কাটা হুক করিল, একবার পশ্চাৎ দিকে চাহিয়া দেখিল, অনুপমার হাঁস নাই। অপঘণের বৃক্ক আরও ভাবিল।

অনুপমার জীবনের যৌক অপঘণে ডিম্ভ জন্ম

দিকে পড়িতে পারে, এ চিন্তা তার ছিল না, তার মাথা অহ—বানীগৃহে কোনমতে ঘাইতে চাহিবে না। অপরেরে কাজ ফেলিয়া সে কোথায় বাইবে! আর এত গল্প, এত কথা। সে কোথায় গিয়া কহিবে, তার লগতে আর বিজ্ঞার সঙ্গী কে আছে? কিন্তু আজ এই সামান্য ঘটনার অশ্রুপানার অবহাতির দেখিয়া, অপরেরে এই প্রথম মনে হইল, নারীকে বিবাহ নাই, বর্ধন জন্মের মত, পাতাভেদে তাদের রূপান্তর ঘটে, অশ্রুপানার উপর তার বুনা হইল।

সহসা অশ্রুপান মূগ রক্তপূর্ণ করিয়া, পেছু ফিরিয়া, কৃত কলহের সমুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। অপরেরে প্রথম ভাবিয়াছিল, সাড়া পাইয়া অহ লোড়িয়া আসিতেছে, তাহার হাত হইতে কাগড় লইয়া, প্রহসনময় হাসিমুখে অপসারণ করি চাহিবে, কিন্তু অশ্রুপান আঙ্গ একেবারেই নৃতন মাধব—সে ঘরের দরজা হইতে দূরে সরিয়া, অস্তর: আশ হাতেরও বেশী মাথার খোঁটা টানিয়া সমস্ত মন স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, কলহের দিকে একবার ফিরিয়াও তাকাইল না। নীরম বাবু সঙ্গে অশ্রুপানার দেবর নিকটে আসিয়া বলিল—“বোধি! ভাল আছে ন?” সঙ্গে সঙ্গে ভূমিষ্ঠ প্রণাম—অশ্রুপানার অস্তর এইরূপ মর্দ্যাবার পরশ গরিমাময় হইয়া উঠিল। এক মুহূর্তে গাভীও সন্মানের চাপে ভিতরের পরিবর্তন হইল, আঘাতকা মুখখানি বিমর্ষ হইলেও সন্মুখে পূর্ণ, দৃষ্টি স্থির প্রায়, আগন্তকের চক্ষু অশ্রুপান, অশ্রুপানার অশ্রুবেগ সঞ্চার হইল না, টুং টুং করিয়া কয়েক ছোট্ট চক্কের বল ভূমি সিক্ত করিল। অশ্রুপানার দেবর পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া ঢকে দিল, নীরমবাবু আশেবদনে দাঁড়াইয়া রহিল, এক মুহূর্তে বাজীখানি নীরম শোকাবেগে বিঘ্ন মূর্তি পরিগ্রহ করিল। অশ্রুপান হতভম্ব—শোক বাধাময়, কিন্তু

বড় পবিত্র—শ্রদ্ধা যেখানে অশ্রু-অর্ঘ্য হন্তে থায়া আসিয়া উপস্থিত হয়।

অটম পরিচ্ছেদ

অশ্রুপান চলিয়া গেল। যাইবার সময় বাজীতে কামার স্বর চাপা রহিল না। নীরমের অনন্য আর্তনাদ করিয়া উঠিল। অশ্রুপানার কণ্ঠে অহঙ্ক যোগদনের ধ্বনি উঠিল, অশ্রুপ্রবাহ বহিল।

একদিন যে দ্বন্দ্ব লইয়া অশ্রুপান শতরবাড়ী বাত্মা করিয়াছিল, যে আশা ও উৎসাহের লালিমায় তার মূগ চোখ রাজা হইয়া উঠিয়াছিল, আজ সে দ্বন্দ্বও নাই, সে আশা উৎসাহের প্রদীপও ভিঁয়াছে; উৎকর্ষ ও আতঙ্কের শিহরণে তার চিত্ত অশ্রু হইয়া পড়িতেছিল, মুখখানি দেখিলে মনে হয় সে যেন নিজেকে কোন এক অনির্দিষ্ট পথে সম্পূর্ণ অপরিচিতের হাতে ছাড়িয়া প্রতি পদে সপথিত হইয়া পড়িতেছে, নিতান্ত অসুগম। যন্ত্রণাভাবিকার মত—দেবরের সহিত গাড়িতে গিয়া উঠিল।

অনন্য, তাড়াতায় ও গোষ্ঠ সংঘর্ষের চরমগুলি মাথায় দিয়া—একবার অশ্রু অবগুষ্ঠনের মধ্য হইতে ইতস্তত: চাহিল, কি যেন পুঁজিল, কিন্তু অশ্রু তখন—শৌধ যেমন চুপ্‌চুপে আকর্ণণে ছুটে, সেইরূপ দেবরের অশ্রুসঞ্চার করিল। গাড়ী ছুটিল, সময় সেখানে দাঁড়াইয়া নীরম সপরিবারে অশ্রুপূর্ণ নয়নে, যতলগ্ন সেবা-বাধ—গাড়ীখানির দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর সব তত্ত্ব, কিংবদন্তি কেহ কাহারও সহিত বা কাগালগ্ন করিল না।

অশ্রুপান কাপ্প চেয়েই থেমে দিয়া, একবারি বই হাতে, ক্রটি মুহূর্তে অশ্রুপানার বিদায় লইতে আসার প্রতীক্ষা করিতেছিল—সারা সকাল হইতে

এই অশ্রুপান কাল পর্যান্ত অহ একবারও অপরেরে খোঁজ লয় নাই। অপরেরে নিজের দ্বন্দ্ব লইয়া এতই কাতর, অশ্রুপানার অস্তরে যে কি তুমুল স্বড় বহিল, তার কোনই স্থান রাখিল না, সে এইই আশা করিয়াছিল, যে অহ যখন বাইবেই, তখন অন্তত: বিদায়ের সময় একবার আসিবেই, তাহাও হইল না—কাল বাড়ী করিয়া ভলিল, গাড়ীতে উঠার শব্দ, চোঁচোয়ানের ছিপটা, গাড়ীর দৌড়ান শব্দ, বাস, সব তত্ত্ব, বাড়ী যেন মরুভূমি—দুপুরে শত বৃন্দিক দংশন করিল, উঃ সে কি অস্তির যন্ত্রণা!

সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বলিল—অশ্রুপানের ঘর অন্ধকার, আজ আর কেহ মুহূর্ত হাতে ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল না, প্রদীপের আলোর ঘরখানি উজ্জ্বল হইল না, অস্তরে বাহিরে অন্ধকার, অশ্রুপান উপুড় হইয়া কাঁদিল—আজ সে বৃদ্ধিল, অহঙ্কে সে কত ভালবাসে, আজ সে বৃদ্ধিল, অহ তাহাকে কি প্রতারণা করিয়াছে—বুক তার ছিঁড়িয়া বাইতেছিল।

ঘরে কে প্রবেশ করিল—অশ্রুপানের বুক ছুঁক ছুঁক করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, হরতো গাড়ী ফেল হইয়াছে,—বহু? কি হি করিয়া নীরমের আট বছরের মেয়ে সের্গালি হাসিয়া উঠিল—ঘরে সে আলো দিতে আসিয়াছিল।

আবার শুদ্ধতা। রাত্রি তার কাপকাপ মেলিয়া হু হু করিয়া বহিয়া যায়, ছয়খণ্ডা হইল অহ বাড়ী ছাড়া, এতক্ষণ সে শতরবাড়ী গিয়া পৌঁছিয়াছে, সে কি করিতেছে! ছোট্টা বকিয়া একটা লোক যে তাহার ক্রম মগ্ন যরণায় অস্তির, এই বাথার আঘাত তার দ্বন্দ্বের কি বাজিতেছে! না সেই অনামুখে তার দেবরটা—বার দিকে সে আজ সারানির অশ্রুপান দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল, তার সঙ্গে আলগ্ন পরিচয়ে হ্রসবে আছে! কে সে লোকটা? তার সঙ্গে অহঙ্ক কি শব্দ? দেবর কি ছোট্টো

চেয়ে বেশী আপনান? সে কি অহঙ্ক—জীবন-ভোর স্বপ্ন ভ্রমণের বোঝা মাথায় বহিবে? অহঙ্ক নির্লজ্জিতার বড় নির্লজ্জ, একদিন সে ইহার ফলভোগ করিবে! কিন্তু তাহাতে অপরেরে কি? মাথার মাকড়সার জাল বুনা হইতেছিল।

আবার ঘরে পদশব্দ—দর্শনের তার শব্দও আপনান জন চিনে, এ পায়েই সাজায় অপরেরে মন বিরক্ত হইয়া উঠিল, বসন্তাভ্রুপানি কহিল—“ঠাকুরপো, রাত অনেক হ’লো, পাবে এস।” অশ্রুপান নিজের বিরক্তি ভাব সংবর্ত করিয়া কহিল—“বোধি, বড় মাথা ধরতে, আজ আর পাবে না।” লক্ষী গোলাপজল আঁতে ছুটিল, নীরম বাবু আসিয়া বলিল—“অশ্রুপান!” নীরম বাবুর প্রতি অপরেরে বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল, নীরম বাবু দেখিল—অপরেরে চেয়ে দিরা মুক্তকলের তার অহঙ্ক রহিতেছে। নীরম অপরেরে কাছে গিয়া বসিল, লক্ষী গোলাপ জল লইয়া অশ্রুপানের মাথার ছিঁটাইয়া দিল, অশ্রুপান বাজকের তার বোদন করিতে লাগিল। নীরম ও লক্ষী উভয়েই বৃদ্ধিল, অশ্রুপানার শতরবাড়ী মাগুয়াই অপরেরে ব্যথার কারণ, লক্ষী বলিল—“ভূমি মায়ের পেটের ভাই, কিন্তু অপরেরে টান তোমার চেয়ে বেশী।” অশ্রুপান অস্তর: বাজী-খানির মানমুষ্টি নীরম বাবুকে পীড়িত করিয়াছিল, কিন্তু অপরেরে কাতরতা দেখিয়া সে আরও ক্রুদ্ধ হইল বলিল—“অশ্রুপান, চলু বহিবারে অহঙ্কে নিয়ে আসি, আজ আমার চা বাগুয়া হয় নি, পাখীটা ছাড়ু পায় নি, খোকারা না খেয়েই ঘুমিয়েছে, অহু না হ’লে আমার দিন চলবে না।” এত শীঘ্র অহঙ্ক কি করিয়া আসা সম্ভব হইবে! আজ বুধবার, আর তিন দিন পরে অহ যদি ফিরে—বিচ্ছেদের দ্বন্দ্ব নিরাময় হইবে।

অপদেশ প্রকৃতিস্থ হইয়া নীরদের সহিত আলগা হুড়িয়া দিল, সব কথাই অস্বপ্ন লইয়া। অস্বপ্ন ভাল এইখানে থাকিয়াই হইবে, বিদ্যা যদি আপন ভাষের দূরে হুণী না হয়, পরের বাড়ীতে স্বপ্নের আশা কি? অপদেশ ও নীরদ নিজেদের দ্বন্দ্ব লইয়াই আলগা করিল, অস্বপ্ন অন্তর কি চাহে, সে বিষয়ে উভয়েই অন্ধ। হৃদয়ী খাবারের থালা উপরে আনিয়া দিল। অপদেশ তখন কিছু মাখন শাইয়াছে। মোহ যখন ঘিরিয়া ধরে, তখন আশার আলো নিভিয়া যায়, যাঁহা ঘটে তাহাই শেষ বয়স।

গ্রামের ছবি

৪

আমরা পলাশবাটীর অধিবাসী—পলাশবাটীর সরকার গোষ্ঠীর একটি মুন্সাদেয় ছিল। কেহ ঠাণ্ডাদিগকে কোন গ্রামের অধিবাসী জিজ্ঞাসা করিলেই তাঁহারা বলিয়া বসিতেন, আমাদের বাড়ী পলাশবাটী-মধ্যপাড়া। পলাশবাটী আয়তন ক্ষুদ্র, অত্যন্ত সরকারদের মুখে পলাশবাটীর মধ্যে মধ্যপাড়ায় কাহারও বাস শুনিতেই পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকে হাসিয়া উঠিতেন। উপহাসের ছলে বলিতেন, গাঁ বড়, তা মাসের পাড়া—যাই হ'ক সরকার গোষ্ঠী পলাশবাটীকে যত না ভালবাসে, মাসের পাড়ার প্রতি তাঁহাদের এক অকৃত্রিম আকর্ষণ ছিল। এই মাসের পাড়ার জন্ম তাঁহারা মধ্যে মধ্যে গ্রামে ভুলমূলকভাবে বাড়াইয়া দিতেন,

মনে হয়, অস্বপ্ন বিবহ অপদেশের মনে অস্বপ্নের বিবহের আগুন জ্বলিয়াছিল, এখন তাহার মনে হইল, গীতাবাক্যে সে যেমন গোনাগুলো ছইয়া কাটাঁয়া মানে, অস্বপ্ননাও পদধিন না হয় স্বপ্নরবাড়ী থিয়াছে, জাবার ফিরিবে,—কিন্তু অস্বপ্ন কেন ঘাইবার সময় তাহার নিকট একবার আসিল না! যথা তার এইখানেই বসে হইয়া উঠিল, বুকে তাপ দিতে লাগিল, আহা! অস্বপ্নে সারায়নি অস্বপ্নে বদলি, যুগ আর হইল না!

ক্রমশঃ

এখন তাঁহারা সকলেই উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত এবং চাকরী উপলক্ষে বিবিধস্থানে বাসস্থান নির্ধারণ করিয়াছেন; ভ্রম্যগনে কয়েকটা এখনও গ্রামে স্থতি ভ্রাগত রাখিয়াছেন। বৃদ্ধ অক্ষয়চন্দ্র গ্রামেই থাকিতেন। ছই বৎসর হইল তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন।

সন ১৩০৫ সাল। মধ্যম কণ্ঠা অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় এবার বারওয়ারীর কর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছেন—পলাশবাটীর বারওয়ারীর অর্থে রাজিতে প্রীত্বীকাকালীর পূজা, তাহাতে মাত্র তিনটা ছাগ বলি হইয়া থাকে, একটি বারওয়ারীর, আর ছইটা সরকারদিগের বাৎসরিক। এ-গ্রামে “মানসিক” করিয়া কেহ ছাগ বলি দেন না। ছই কোশ দূরে মঙ্গলচাকীর মানসিক করিয়া থাকেন। অতএব

ছাগ-বলির সংখ্যা খুব কম। এ হিসাবে পলাশবাটীর স্থান নিম্নস্তরে। বারওয়ারীর উপলক্ষে পলাশবাটীতে কখন যাত্রা গান হয় না, ইহাতেও ইহাকে অত্র গ্রামের লোকে অগ্রাহ্য করিয়া থাকে। এই সব কারণে বারওয়ারীর কর্ত্তা অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রস্তাব করিলেন, এবার রক্ষাকালীর পূজার পরদিনেই গ্রামে অষ্টপ্রহর সংকীর্ণ করিতে হইবে। গ্রামে যখন যাত্রা গানের চাঁদা উঠে না, বিবাহও যখন বারওয়ারীর জন্ম টাকা উঠে কি না উঠে, তখন যাত্রা দিয়ার চেষ্টা করিয়া কাজ নাই। কিন্তু সংকীর্ণনের নাম গ্রামকে মাতাইয়া তুলিতে হইবে। মাসের পাড়ার সংকীর্ণন নিশ্চয় সমানে পাইতে পারিবে, পশ্চিম পাড়ার দায়েরের দল ভাল নয়, পূর্ব পাড়ার বাপদীরা ত গাইতেই জানে না, অতএব ছইটা ভাল দল আনা হউক। অক্ষয়চন্দ্র জানাইলেন, তাঁহার মাতাঠাকুরানী একটি দলের সর্বপ্রকার ব্যয়ভার বহন করিবেন। কেবল একটি দলের খরচ গ্রামবাসীকে যোগাইতে হইবে। পরে সকলের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, গ্রামবাসীর ইচ্ছা হইলে তিনি নূতন করিয়া একটি চাঁদার বর্ধ প্রস্তুত করিতে পারেন।

“সকলেই ‘হা-হা’ বলিয়া উঠিলেন উপেক্ষনাথ ঐ তখন সভাস্থলে ছিলেন না।

২

কর্দে মধ্যম পাড়ার অধিবাসীদিগের চাঁদা বেশ কম পড়িয়াছে। মধ্যম পাড়ায় কাষশ, কুমার ও কয়েক ঘর ময়রার বাস। কাষশরা সকল সময়েই চাঁদা কিছু বেশী দিয়া থাকেন। এবারে তাঁহাদের চাঁদা পশ্চিম পাড়ার উগ্রক্সিয়দিগের চাঁদার প্রায় সমতুল্য। দক্ষিণ পাড়ায় কখনও বারওয়ারীর চাঁদা গ্রহণ করা হইত না। তথায় ভ্রাক্ষণ ও নাপিতদিগের বাস। এবার এক ঘর নাপিত ভিন্ন

সকলেরই কিছু কিছু চাঁদা দিয়া হইয়াছে—সকল অপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, মাখনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নামে চারি আনা চাঁদা ফেলিয়া দিয়াছেন—চাঁদা আদায়কারী সকলেই মধ্যপাড়ার যুবক, পূজা হইতেছে বৈশাখ মাসে, মধ্যপাড়ার কাষশদিগের ছেলেরা গ্রামের ছটটিতে বাটী আশিয়াছেন। তাঁহারা ও কামারদিগের ছেলেরা মিলিয়া এবার বারওয়ারীর সকল প্রকার ভার মাথায় তুলিয়া লইয়াছেন। তাঁহাদিগের পদভরে গ্রাম টলমল করিতেছে। সকল পাড়ার ছোট ছোট ছেলেরা ইহাদের সঙ্গ লইয়াছে, তাহারা এখন হইতেই নিজদিগের মধ্যে হরিনাম জুড়িয়া দিয়াছে। গ্রামটাতে আনন্দের তাল আশ্রয় হইয়াছে।

এ-দিকে সংবাদ আসিল, উপেক্ষনাথ ঐ এ বৎসর হইতে প্রতি বৎসর ৩০০ টাকা পূজায় একটি করিয়া ছাগ উৎসর্গ করিবেন। ইহাতে সকলেই আনন্দিত হইল। অতঃপর মধ্যম পাড়ার যুবকেরা দায়েরের নিকট হইতে চাঁদা পাইল না। তাঁহারা বলিয়াছেন, পূজার পরদিন তাঁহারা চাঁদা দিবেন। এ কথা শুনিয়া অক্ষয়চন্দ্র সরকার বেশ চট্টা উঠিলেন, সংযোগ ও উগ্রক্সিয়দিগকে আগুণ বলিয়া সন্ধান করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—“নাপিতরা চাঁদা দিয়াছে?”—“না, তাহারা বলে, ‘আমরা দ্বিগুণ কাল গ্রামে দেবতার কাজ করিয়া থাকি, আমরা চাঁদা দিব কি। সরকার কর্ত্তার কি ভীমরূপী হইয়াছে।’” সরকার কর্ত্তা কিঞ্চিৎ নিরুত্তরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মাখন চাটুয়ে?”—“বাবা! মাখন ঠাকুরের মা ত কাটা লইয়া তাড়া করিলেন।” সরকার কর্ত্তা মাথা ঝাঝিয়া রহিলেন—ছেলেরা কিংখণ্ড নিত্য গ্রামে বারওয়ারীর তলায় চট্টা পেল। তথাহ বাগদী ও ময়রাদের ছেলেরা অষ্টপ্রহরের আসর

করিতেছে। সংগোপ ও উগ্রক্সিত্রি যুবকেরা দল বাধিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা কোন কার্য করে নাই। বারগুয়ারী কর্তা মহাশয় ইহাদ্বয়কে বিরক্তকর্মে বলিলেন, “বাবু! গায়ে হুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছেন, সব দায় মাথের পাড়ার!” ছেলেরা কোন কথা কহিল না, পরস্পরের মূখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া একটু দূরে গিয়া দাঁড়াইল। সেই সময় মুচুরা ঢাকে ঢোলে বাগওয়ানী তলা ফাটাইয়া নিতে আরম্ভ করিল, পর ঢাকের তালে অনেক যুবক নাচিয়া লইল, পশ্চিম পাড়ার ছেলেরা ইহাতে যোগ দিল না, কিন্তু সন্তুষ্ট নয়নে চাহিয়া রহিল।

৩

রাত্রি তৃতীয় প্রহর ছাগ-বলি আরম্ভ হইয়াছে। অধিকাংশের শশধর শোভাকর মহাশয় কারণ-সলিলে উপবাস-স্তম্ভ কর্তৃক কিঞ্চিত স্নাতক করিয়াছেন। কর্তৃ হইতে গাঢ় গাঢ় ধরে মাড়ানায় নিমগ্ন হইতেছে। চক্ষু রক্তবর্ণ, কর্ণধারকে সম্বোধন করিয়া তিনি তাহার ঝুঞ্জা নিজ হস্তে তুলিয়া লইলেন, মায়ের সম্মুখে দুলাইয়া দুলাইয়া পরে তিনি তাহা কর্ণধারকে অর্পণ করিলেন। কর্ণধার ভক্তিরে বর্ণা গ্রহণ করিয়া হাড়িকাটের নিকট উপস্থিত হইলেই, ছাগের ক্রন্দনের সহিত ধন দান মাড়নায় উচ্চারিত হইতে লাগিল; একটা ছাগ-বলির পরেই ঢল্লানিনাদে দিওমণ্ডল পূর্ণ হইয়া উঠিল, সরকারদের বাৎসরিক একটা ছাগ-বলির পরেই যখন দ্বিতীয় ছাগ আনীত হইবে, তখন উপেন্দ্রনাথ দাঁ বলিয়া উঠিলেন, “শোভাকর মহাশয়, গ্রামবাসী ভদ্র অভদ্র সকলকে আমি জানাইতেছি, সরকারদের দুইটা ছাগই পর পর পড়িবে কেন, আমার বাৎসরিক ছাগ-বলিটা সরকারদের প্রথম ছাগটা বলি হইবার পরেই বলি হইবার ব্যবস্থা করা হউক।” অক্ষয়চন্দ্র সরকার চাঁৎকার

করিয়া উঠিলেন, তাহার মাতাঠাকুরাণীও স্নায়মণ্ডল হইতে উঠিয়া আসিয়া গলায় কাপড় দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পুরুষ-পুরুষের বাৎসরিক জোড়া পাঠা বলি না হইয়া যদি মাঝে বিষ হয় তাহা হইলে তাহাদের বংশের হানি হইবে। এই কথাই উপরে কেহ কথা কহিলেন না—উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, “তবে আমার পাঠা মানসিক হিসাবে বলি হউক, এখানে আমি বাৎসরিক করিব না।” সকলেই ইহার অর্থ না বুঝুন, পশ্চিম পাড়ার সকলেই ইহার অর্থ স্বয়ংক্রিয় করিলেন, অত্যাচ্ছন্ন সকলেই কিছু না কিছু অশুভি অশুভব করিতে লাগিলেন। ইহার পরে চাগ-বলি প্রভৃতি কাজ যথারীতি সম্ভব হইয়া গেল।

৪

জ্যৈষ্ঠমাসে, উপেন্দ্রনাথ দাঁর মধ্যমা কস্তার বিবাহে, উপেন্দ্রনাথ পশ্চিম পাড়ার সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এবার তিনি কায়স্থদিগকে কস্তার বিবাহে নিমন্ত্রণ করিবেন কিনা—অনেকেই নিমন্ত্রণ করিবার পক্ষে মত দিলেন। উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, “আপনাদের মনে আছে কি, আমার প্রথম কস্তার বিবাহে সরকারদের ফুলের ছেলেরা মোটা লুচি দেখিয়া উপহাস করিয়া বলিয়াছিল, “কোম্বালে লুচি আনিতেছে।” আমরা চাখ করি বলিয়া যদি কায়স্থরা আমাদিগকে খুঁচা করে, তাহা হইলে আমরা তাহাদের সহিত কোনরূপ সংগ্রহ রাখিব কেন?” হাজিরার পো বলিলেন, “গ্রামের একটা নিয়ম-কথ আছে ত—গ্রামের ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাস ও কুটুম্বকে প্রত্যেক কার্যে নিমন্ত্রণ করিতে হয়।” উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, “সরকারের কি ব্রাহ্মণ-ভোজনে যশিন চাটুখোকে ডাকে? মাখন ঠাকুর পণ দিতে পারে না বলিয়া দূর দেশের একটা সন্ন্যাসী এংগ করিয়াছে। কেহ বলে সে রামাচন্দ্র বৈষ্ণবের

মেয়ে, কেহ বলে সে অগ্রদানির মেয়ে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তা প্রমাণ হয় নি। ভিন্ন গ্রামের ব্রাহ্মণগণ কাণাখুবা করিতেছেন—নিমন্ত্রণে তাকে ডাকেন না, আমাদের গ্রামের ব্রাহ্মণেরা তাঁর অন্ন গ্রহণ করেন না, কিন্তু এখনও তিনি ঠাকুরের মাথায় জল দিতেছেন; এমন অনেক গ্রামে ত মেয়ে লইয়া ব্রাহ্মণদিগকে একঘরে হইতে হইতেছে, এমনকি এইরূপ একটা জাতিই হইয়া যাইতেছে—কিন্তু যতদিন তারা ঠাকুরের মাথায় জল দিতেছে, পৈতা ধারণ করিতেছে, ততদিন তাঁরিকে ত মানিতে হইবে! অক্ষয় সরকারের কোনরূপ বিবেচনা নাই, বারগুয়ারীর সময় মাখন ঠাকুরের চাদা লইতে গিয়াছিল।”

“হা সেটা অজ্ঞান বটে।”

৫

কায়স্থরা দাঁ বাবুতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, কিন্তু পকার গ্রহণ করেন নাই। মাখন লাল চাটুখে তাহাদিগকে পরিবেশন করিতে আসায় তাহারা তৎক্ষণেই উঠিয়া পড়েন, অক্ষয় চন্দ্র সরকার বলিয়া উঠে, “ইহা নিমন্ত্রণ নয়, ইহা অপমান, ইহা জাতি-নষ্টের আয়োজন।

প্রযুক্তরে তাহাকে অনেক কথাই শুনিতে হয়।—অপমান শব্দের উত্তরে, তাহাকে বলা হয়, ময়রা বাবুর নিমন্ত্রণে যখন কায়স্থগণ দাগওয়া বসেন ও সংগোপ-আদ্রিা উঠান বসে, তখন সংগোপ ও উগ্রক্সিত্রিরা যখন বলিয়াছিলেন, সরকারকে দাগওয়া বসিতে রেওয়া হউক এবং যাবদা না থাকে সকলেই উঠান বহুক—তখন ময়রাগণ যখন বলে—না বরাবর গ্যা’ হইতেছে ইহা—তখন সেটা কি ময়রাগণকে দিয়া সংগোপ প্রভৃতির অপমান করান হয় নাই। আর জাতি-নষ্টের কথা, যে কাহা হইয়া ব্রাহ্মণের জাতি-নষ্টে

উল্লভ, সে আবার নিজের জাতির বড়াই করে কেন! এরূপ উত্তর-প্রত্যুত্তরে যে কায়স্থদের সে দিন আহার হয় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য।

৬

আজ কায়স্থদিগের দ্বন্দ্ব বিলম্বিত হইয়াছে—প্রায় পচিশ দিন হইল নাপিতেরা তাহাদের কৌর্যকাণ্ড করে নাই। ধায়েদের বাবুর নিমন্ত্রণে দিবসের পরে কায়স্থগণ নববাপ প্রভৃতির সহিত এক হকার তামাক সেবন বন্ধ করিয়াছেন, তাহারা নিম্নদিগের হকার মসীজীবীর লক্ষণরূপ কলম কুলাইয়া হকার নিম্নদিগের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিতেছেন। ব্রাহ্মণেরা বলিতেছেন, “আমাদের হকার ছিল কড়ি, কায়স্থদের হকার কলম, এবার চাষীদের বোধ হয় হ’বে লাল, আর নাপিতের ক্ষুর! কলিকালে কতই না হবে!” কায়স্থগণ একথা শুনিয়া মূগ্ধ ভাবি করিয়া থাকেন, তাহারা নাপিত, সংগোপ, উগ্রক্সিত্রি, কর্ণধার, মোরক কাহাও হকার তামাক সেবন করিতেছেন না এবং কাহাকেও নিম্নদিগের হকার দেন না—ইহাতে নাপিতেরা কায়স্থদিগের কৌর্যকাণ্ড বন্ধ করিয়াছেন! কায়স্থদের এখন বিষয় বিপদ! অক্ষয় চন্দ্র সরকারের মাথায় ছ হ করিয়া চুল পাকিয়া যাইতে লাগিল।

এইরূপে আরও দুই সপ্তাহ যাইতে না যাইতে কায়স্থ, উগ্রক্সিত্রি, নববাপ প্রভৃতি প্রত্যেক জাতির মধ্যে এক আতঙ্ক সঞ্চারিত হইল—সংবাস আসিল গ্রামের বাপী-কৃষাণেরা ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতির অন্ন গ্রহণ করিবে না। তাহারা বলিতেছে—তাহারা যেমন ঠাকুরের মাথায় ফুল জল দিতে পারে না অত্যাচ্ছন্ন কায়স্থ প্রভৃতি জাতও তেমনই ঠাকুরের পূজা করিতে সক্ষম নয়, অত্যাচ্ছন্ন তাহাদের অন্ন গ্রহণ করিয়া তাহারা

নিরুপিত জাতিরূপে গণ্য হইতে রাজী নহে—
তাহারা স্থির করিয়াছে, কৃষাণী করিবে বটে, কিন্তু
তাহারা ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্ত কোন জাতের হাঁড়ির ভাত
খাইবে না, আর নিমন্ত্রণক্ষেত্রে তাহারা পাকা (মুচি)
বা দই কাঁচা চিঁড়া ফলা'র খাইবে, কখনও ভাত
খাইবে না।

এই কথা শুনিয়া সকলেই মূৰ চাওয়া-অণুঘি
করিতে লাগিল—এ আবার কি বাগ্মণীকীৰ্ত্তন এই
কথা সকলেই বলিতে লাগিল। বাগ্মণী না হইলে
কোন জাতেরই, বিশেষতঃ কায়স্থদের, চাম হয় না,
তাহারা মাথায় হাত দিয়া বসিলেন, হাঁড়ির
ভাতে যা' ধরচ মাণিয়া ধান দিলে যে তাহার
অপেক্ষা অনেক বেশী ধরচ তাহা প্রান্তেকেই
বুঝিয়া লইয়া চামের হিসাব কষিতে লাগিলেন।
অক্ষয় চন্দ্র সরকার একবার তাহাদিগকে বুঝাইবার
চেষ্টা করিলেন, কায়স্থগণ নবশাখ হইতে উচ্চ,

কিন্তু তা' বলিলে কি হয় তাহারা ত ঠাকুরের
মাথায় জল দিতে পারে না, আর কাল পুষ্যস্ত
তাহারা নবশাখের হ'কায তামাকু খাইয়াছে!

এইরূপে পলাশবাটী গ্রামে প্রায় এক বৎসর
পুষ্যস্ত "জাতের লড়াই" চলিতে থাকে। ১৯৩০-৬
শালে আর সকল জাতি মিলিয়া বারোয়ারী পূজা
হয় নাই—বাগ্মণীরা স্বতন্ত্র বারোয়ারী পূজা করে,
তাহাতে বাগ্মণীরা ব্রাহ্মণ দেবতার পূজা করেন।
পশ্চিম পাড়ার সংযোগ ও উগ্রকত্রিয়গণ স্বতন্ত্র
বারোয়ারী পূজার আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু
শোভাকর মহাশয়ের মধ্যস্থতায় তাহা কার্যে পরিণত
হয় নাই—কিন্তু পশ্চিম পাড়ায় ও মধ্য পাড়ায়
এখনও মন-কষাকষি চলিতেছে। যদিও সরকার
পোষী গৃহত্যাগী, তথাপি মধ্যপাড়া এখনও সরকার
পোষীর কথা স্মরণ করিয়া গ্রামের মধ্যে মধ্যপাড়ার
শ্রেষ্ঠাঙ্গন নির্দিষ্ট করিতে চান। হায়রে শ্রেষ্ঠাঙ্গন!

যৌবন

[লেখক—ঈশাপাণীমোহন সেনগুপ্ত।]

—:—

প্রাণময় শক্তিময় ক্ষুদ্রিময়, যে মোর যৌবন,
বকে মোর চক্রে মোর আজি দিলে একি জাগরণ!
একি আশা, ব্যাকুলতা, একি দীপ্তি, উদ্যাদন-রস,
একি বদ্ধহারা গতি, একি শক্তি, উন্নত হৃদয়!
একি প্রাণ সীমাহীন নৃত্যো-মাতা সমুদ্র সমান,
একি ইরশ্বদ বেগ, একি ব্যাপ্তি বিরাট বিমান।
একি শক্তি, জয়োল্লাস, একি মহাশূন্তের ক্ষুদ্র,
একি প্রেম, একি তৃষ্ণা, একি যথা উন্নত মনুর!
একি দিলে ভালবাসা,—স্বপ্ননে স্বপ্নে ছাপি যায়,
বিশ্বের মানকসে যে শত বাহু মেলি আঁকড়ায়,—
আঁকড়িছে সূর্য্যে চক্রে, আঁকড়িছে অদৃশ ভুবন,
আঁকড়িছে জল-স্থল-মহাশূন্য, সকল গোপন।
যে শক্তি দিয়াছ মোরে তারে আশি করি অতুহন,—
বুঝি এবে সেই শক্তি, চন্দ্র হর্য্য ভাঙ্গা বায়ু সব।
বৃক্ষ তৃণ পশু পক্ষী নিত্য যার ভাবন বিকাশ—
সেই শক্তি অস্বহীন সমাতন—তুলেছে উজ্জ্বল।
যৌবনে এ প্রাণে মোর, সান্ত প্রাণে অস্ত্র কেড়ে আজ,
বুঝেছে অনন্ত যোগ কোথা তার ভুবনের মার!
সৃষ্টি নহে অর্থহীন এ যৌবন আমারে জানায়,
এক শক্তি অপেক্ষ লক্ষরূপে ছুটিছে লীলায়।
এই আমি বার্থ নই,—গড়ি ভাঙি যাহা ফেলি ধরি,
সকল গতির বেগে বিশ্ব-বেগে নিত্য আমি ভরি।
উদ্যম অবাধ প্রাণ আজিকার যৌবনের দান—
অজ্ঞতা মুঢ়তা ভ্রমি ভেঙে দিতে চায় গান ধান।
অজানা অচেনা গুপ্ত সর্বোপরি কেলিয়া আলোক,
হৃদয়স্থ দ্রব প্রাণ মশালের সত আলি চোখ,

অন্ধকার আবরণ হেঁদিশা টুটিকা আনিবার,
মুক্ত করে' চিনি লয় অজনা বা,—সে আজি দুর্দশা।
এ প্রাণ সবিতা হেন হানিয়া রশ্মির রক্ত বাণ,
গোপনে অসাড় করি জয় আধারের করিছে সন্ধান।
মুক্ত-প্রাণ দীপ্ত-প্রাণ দৃষ্ট-প্রাণ দিগ্ধ-প্রাণ আমি,
কি দুর্দশ মহিমায় পাঁচাইয়া যোবনের বানী!
হে যোবন দুর্দশ, হে আমার সর্বশেষ স্মার্ট,
জুস আমি একি উচ্চ, সাস আমি একি এ বিরাট।
আজি আমি স্বপ্ন দেখি—যোবনের উজাগ স্বপ্ন,
এই এক চিন্তামাষে লাগে আজ বিচিত্র স্পন্দন,—
আমি পারি দিতে প্রেম বিশ্ব-পাশ ঘাড়ে পূরে' যাবে,
আমি পারি দিতে মধু রূপতর বিচিত্র অতাবে।
আমি পারি তাজি' স্থপ নিতে ব্রত কঠোর সন্ন্যাস,
আমি বুদ্ধ হ'তে পারি দিতে ক্রম ত্যাগিয়া বিলাস।
লক্ষ্যহারা বদ্ধ জনে দিতে পারি মুক্তির বাণী,
বেদনায় তিক্ত প্রাণে আমি পারি দিতে শ্রুতি আনি।
আমি দীর পুত্র রুদ্রী অত্যায়ে দলিয়া দূত প্রায়,
জায়ের পতাকা পুঁকি, হীন শত্রু চরণে লুটায়।
প্রবলের হস্ত হতে কেড়ে আনি দুর্দশের গ্রাণ,
আমার জিহ্বা আমি অত্যাচার মুক্ত হানে জাম।
আমার জন্ত চিত্ত চড়তায় লাগায় দমন,
আমার নির্ভর বেগ মিথ্যা বৃকে হামিছে মরণ।
জগতে যেখানে বত প্রেমচিহ্ন বাধাতরা শ্রুতি,
আমি সেথা দিই মোর অস্তহীন-প্রেম-সিদ্ধি-সুখ।
তরুণের অবজায় তরুণীর যেথা আঁখিজল,
মোর প্রেমধূপগন্ধ বহে সেথা সৌরভ নির্মল।
যোবন দিয়েছে মোরে প্রাণ, প্রেম অনন্ত বজ্রাশ,
বন্ধের ছায়ার গুলি তাহারা বশিছে—আর আর,
আর বে দুর্দশ, গিষ্ট, সর্বহারা, দ্বিষ্ট, বাধাতর,
অজস্র বিলাতে পারি, অজস্র সস্তারে কর দূর,
মকল রিক্ততা, দৈত্য, সব বাধা, মকল বিবাদ,
যোবনের দানে আমি পূরাহব সকলের সাধ।
হে মোর সাধন ধন, বশতরা উজ্জল যোবন,
আমার মাথারে আমি পূর্ণ আজি, ধন্য একোবন
বজ্র মোর আশা এই গুলিময় ধরার বেলায়,—
আমি যে আঁধার-জয়ী দীপ্ত হৃদয় রক্তিম সীমায়।



মত ও পথ

—১০—

লাজিতার পরিণাম

পশু-প্রকৃতি মানবের হস্তে রমণীনিগের লাজিতা ও উৎসাহিত এখন নিত্য ঘটন—রমণীগণ লাজিতা হইয়া মরমে মরিয়া যান, সঙ্গে সঙ্গে অপমানের শলাকা পুরুষদিগের ক্রয় ও বিক্রি করিয়া থাকে। ভগবান কখন এইরূপ পুরুষের সংখ্যা বাংলায় বাড়িয়া যাউক। আজ নির্বাসিতা রমণীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া রঙ্গপুরে যেকয়টি পুরুষ কার্য করিতেছেন, তাহাদের উদ্দেশ্য জয়মুক্ত হউক। তাহারা সমাজ সেবার এই নূতন দিক অবলম্বন পূর্ণক বাঙালীর ঘৃণিত পুরুষ জাতির শক্তি জাগ্রত করুন।

কিন্তু এই সমাজ সেবার পথ একান্তই বিয়-সম্মেলন—হিন্দুরমণীগণই লাজিতা হন অধিক সংখ্যায়, আর হিন্দুদিগের সামাজিক বন্ধন ওরূপ যে ভাষা লাজিতা রমণীর স্থান নাই, বলিলেই হয়। সমাজিত নিতেছি, প্রাশস্তিত্যে রমণীগণ সমাজে গৃহীত হইতে

পারেন, কিন্তু ইহা পশুতদিগের পাত, হিন্দুসমাজ অর্থাৎ কাহারও জাত-তাই সহজে এবিধের সম্মত হইবেন একটা আশা মঙ্গলবা। আর তাহাই যদি হইবে, তাহাও ত একরূপ মনুষ্য ও মনুষ্যতার পরিচায়ক, তাহা হইলে এত যন যন রমণীগণ এই হিন্দুসমাজ হইতে অপমত্ততা ও পরে লাজিতা হইবেন কেন?

যাইহোক আজকাল অধিক সংখ্যায় হিন্দুরমণীর নিবাসিত-কারিণী প্রাণ করিয়া হিন্দুদিগের মধ্যে একান্ত মর্মে বাধার সন্ধার প্রকাশ পাইয়াছে—কোথাও আন্তর্দ্বন্দ্ব এবং কোথাও আত্ম-সম্মানের ভাষার হিন্দুগণ জাগ্রত হইতেছেন, এখন পৃথক এই জাগরণ "স্রপাগাভার" আকারেই পর্যাবসিত, তথাপি ইহাতে কিছু কিছু কার্য হইতেছে।

বঙ্গদেশ-গণে পূর্ণ ও উত্তর বঙ্গে মূলগমনগণ যখন উত্তেজিত হইয়া কোন কোন স্থানে হিন্দু-রমণীর উপর একান্তে অত্যাচার করিয়াছিল, তখন

মনে হইরাছিল, এইসকল রমনীর সামাজিক ভাগ্য বোধহয় পরিবর্তিত হইবে না—কিন্তু অতি দ্রুতের সহিত পরে অবগত হই, ইহাদের মধ্যে অনেককে প্রধানমিশনে প্রবেশ করিয়া রমণীজাতির সত্যিকার মৰ্যাদা কোনরূপে অজ্ঞুর রাখিতে হয়। কেননা এইরূপ ক্ষেত্রে রমণীগণ বাধ্য হইয়া অধিকাংশ স্থলে পাপ-পথই গ্রহণ করিয়া থাকেন।

অবশ্য লাক্ষিত্য রমণীগণ যে হিন্দুসমাজে স্থান পায় না, তাহা পাশ্চাত্য অবগত আছে; তজ্জগৎ হিন্দু রমণীগণের উপরেই অত্যাচার করিবার প্রবলোত্তম এত অধিক—আর তজ্জগৎই এখানে অপমান শব্দাকার বিদ্ধ হিন্দুগণ এইরূপ রমণীর আশ্রয়ানবহু জগৎ ব্যবহার মনোযোগ দিয়াছেন, কিন্তু হিন্দুদিগের কর্তৃপক্ষিত ইহাকে কৃত্তী সফলতা-মণ্ডিত করিবে, তাহা ভবিষ্যতই জানে।

কিন্তু শ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে, যদি বিধবা বা বিবাহিতা ধর্মিতা রমণীগণ প্রায়শ্চিত্তে নিজে গৃহে স্থান পায়, এবং অনুচ্চ যদি কখনও লাক্ষিত্য হয় তাহার বিবাহের পথ প্রশস্ত থাকে। কিন্তু বলা বাচ্য হিন্দুসমাজে এরূপ হওয়া হুসমায়া বলিয়াই অসম্ভব হয়।

তজ্জগৎ যেদিন তনুলাম রত্নপুয়ের নিগাহিতা হুহাসিনী তাহার স্বামী কর্তৃক গৃহীতা হইয়াছে, সেইদিন সত্যই বড় আনন্দ হয়—আর হুহাসিনী ব্রাহ্মবংশীয়, তাহার পিতার আচরণ যেন কিরূপ কৃহেলিকাজ, অথচ তাহার স্বতন্ত্র স্বামীই এক নিকট স্বামী বৃদ্ধ পুত্রগণ ব্রাহ্ম হুহাসিনীর স্বামী নারায়ণ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অহরহে বধন সেই হুহাসিনীকে গৃহে স্থান দেয়, তখন আমরা বিস্মিত হই, মনে করি বোধহয় কালের স্রোত কিছু পরিবর্তিত।

কিন্তু তাহা নহে, হুহাসিনীকে স্থান দেওয়ার বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পৌরহিত্য নষ্ট হইয়াছে এবং তিনি

এখন তাহার সমাজ-কর্তৃক পরিত্যক্ত। বৃদ্ধের বাস মুক্তগাছা, মহমসিংহ জেলার মুক্তগাছার জমিদার বংশ হিন্দুসমাজে অবশ্য প্রধান স্থান অধিকার করেন। হিন্দুসমাজ কোন ক্ষেত্রে লাক্ষিত্য বা পতিতাকে তুলিয়া লইয়া নিজেদের মন্বন্তর প্রকাশ করেন না, হুহাসিনীর ক্ষেত্রে যে করে না, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। কিন্তু হুহাসিনী মানসিক জালায় জলিয়া গুড়িয়া এখন যখন মুচ্ছিতা হইতেছেন, কোন কোন সময়ে আট হইতে বার ঘণ্টা তাহাকে অজান হইয়া থাকিতে হয়। বোধ হয় মুতাই তাহার পক্ষে পরম সুখের বিষয়— তাহাই বলি, হিন্দুপুরুষদিগের কাপুরুষত্ব ও হিন্দু সমাজের অশুভরতায় আজ যে-ব হিন্দুসমাজে অপহৃত ও লাক্ষিত্য, তাহাদের পরিণাম—অবশ্য সম্মানজনক পরিণাম—মৃত্যু, তাহাও পাপ-পথ, অথবা পাণ্ডিত্য-দিগেই অঙ্গীকার হইয়া পূর্ণসমাজের প্রতি তাহা দিগকে চিরকাল দিকার পোষণ করিতে হয়। এইরূপ কত হাজার ও কত লক্ষ দিকারে শুধু হিন্দুসমাজ-আত্মা প্রপীড়িত।

হে সমাজ! আর হুহাসিনীর জায় একটি ক্ষেত্রে ভূমি কি তোমার প্রায়শ্চিত্ত করিতে পার না— হে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণ জমিদারগণ! আপনাদের এক ব্রাহ্মণ বুড়ার এই দুর্ভাগ্য আপনাদের কর্তব্য কি তাহা একবার নির্ধারণ করুন। আর নবশক্তির আদার রত্নপুয়ের নবীন কল্পিতদিগকে আর কি বলিব, আপনাদের আদর্শে মুক্তগাছার বৃদ্ধগণ কি স্বামী সমাজের জট ও অশুভরতায় ব্যস্ত করিয়া সমাজকে সংসারী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রতি সদয়তা-সম্পন্ন করিতে পারেন না! বাই হ'ক এ বিষয়ের প্রতিকার না—ইউক, প্রাপ্যগণ্ডা কার্যের বিশেষ আবশ্যক আছে—হিন্দুসমাজ মুক্তগাছার পদাধি করিতে পারেন না কি।

লাক্ছিত্য পরিণামের জায় হিন্দুসমাজের যে কি ভাবিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়—ভগবান স্বতী দিয়া ওয়না পরিণাম ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত তাহা হিন্দুসমাজকে রক্ষা করুন।

সঙ্কলন

—:—

মহাত্মা গান্ধীর অভিমত

(ট্রেট সম্মানের প্রস্তাবের)

এংলো-ইণ্ডিয়ান সম্ভারের মুখপত্র “ট্রেটস-ম্যানের” শুভে মহাত্মার ইন্দ্রবর সম্ভারের প্রতি প্রদত্ত বক্তৃতা উক্ত বিশেষকৈ কটাক্ষ করিয়া যে সম্ভারদায়ী সমালোচনা প্রকাশ হইয়াছিল, তাহারই প্রস্তাবের মহাত্মাজী নিম্নলিখিত অভিমত স্পষ্ট কর্তে ব্যক্ত করেন :—

৩১শে জুলাই
“অদ্যকার “ট্রেটস-ম্যান” পরে “মিউজি-ডিসেমিভিডিয়ান” (নিরন্তর সংগ্রাম) শীর্ষক যে মূল প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়, তাহাই প্রত্যুত্তর স্বরূপ এই লেখাটা আপনার পত্রশ্রেণী হান দান করিয়া আশা করি কৃতার্থ করিবেন। আপনি আমার নিরন্তর সংগ্রাম দেওয়ার উপযোগী আবহাওয়া সৃষ্টির বাসনার সঙ্গে, ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশনে আমি যে সহযোগিতার জগৎ মুক্ত-পন আশা করিতেছি বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহার অসঙ্গতি দেখে দৃষ্টি করিয়াছেন। ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশনে আমি ২৪শে জুলাই তারিখে বক্তৃতা দিয়াছিলাম। “ইয়ং ইণ্ডিয়া” পত্রের বৃহৎশক্তিবাদের সংখ্যার জগৎ আমি লেখা পাঠাই। অত্যাশয়ের বিরুদ্ধে সভ্যনাট্যে সংগ্রাম আমার শনিবারে। যে সংখ্যার “ইয়ং ইণ্ডিয়া” হইতে

আপনি “নিরন্তর সংগ্রাম” বিদ্যক আমার কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার তারিখ ২০শে জুলাই। কাজেই সেই প্রবন্ধটি আমার লিখিতে হইয়াছিল তৎপূর্ণ শনিবারে, অর্থাৎ ২০শে জুলাই তারিখে। আমি এই তারিখগুলির উল্লেখ করিলাম, কেন না আমি দেখাইতে চাই, যে “নিরন্তর সংগ্রামের” জগৎ প্রতীতির কর্তব্য ইউরোপীয়ান এসোসিয়েশনে আমার বক্তৃতা দেওয়ার পরে কল্পিত হয় নাই।

আমার এই নিরন্তর সংগ্রামের সঙ্কল্পের সহিত আমার সহযোগিতার স্পৃহা কোনই অসঙ্গতি দেখি না। আপনার স্বরণ আছে, যে ইউরোপীয় এসোসিয়েশনে আমার উক্তিত একটি পুরাতন ঘটনার পুনরুজ্জ্বলিত বর্ণিত হইয়াছিল। অসহযোগগণের মধ্যস্থ লীলা যখন তুর্শিশ্বরে উদ্ভিয়াছে, তখন জনৈক ইংরাজ আমায় ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন, যে আমি অসহযোগবাদী হইয়াও, সহযোগিতার জগৎ মরণাঙ্ক কামনা পোষণ করি—আমি সেইদিন জোর করিয়াই তাহাকে বলিয়াছিলাম, “হা সত্যই তাই, আমি সহযোগিতার জগৎই মুখুর জায় প্রতীক্য করিতেছি।” আমি বলিতে চাই—স্বাধীনতা ও আমার অবশ্য ঠিক তাহাই। অত্যাশয়ের বিরুদ্ধে সভ্যনাট্যে সংগ্রাম আমার মুখে মৃতন নহে, কাজেও আমার পক্ষে

উহা নূতন করিয়া অভাস করিতে হইবে না। এই বিশ্বাস আমি আজীবন পোষণ করিয়া আসিতেছি, ইহার অমুঠানেও আমি সারা জীবন ব্যয় করিয়াছি। নিরস্ত্র সংগ্রামের জন্ত দেশকে প্রস্তুত করার অর্থই অহিংসার জন্ত দেশকে প্রস্তুত করা। অহিংসার জন্ত দেশকে প্রস্তুত করার নামে নিশাণ যজ্ঞের জন্ত তাহাকে গড়া—আর এই গড়া বলিতে যাঁহা ও চরকা দুইই আমার কাছে একই জিনিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আপনি একরকম ভাবিয়া ঠিক করিয়াই লইয়াছেন, যে আমি আমার অসহযোগের দরুণ কিম্বা নিরস্ত্র সংগ্রাম সম্বন্ধে অমুতপ্ত হইয়াছি। না, এদিকে কখনও আমি অমুতপ্ত নই। আমি এখনও সেই দৃঢ়মত অসহযোগরতী। শিক্ষিতা-ভিমানী ভারতকে আমার সঙ্গে যদি পাই, আজও সম্পূর্ণরূপে অসহযোগ পুনর্দেখাই করি। কাজের মাছ বন্দিয়াই আমি আমার নাকের ডগার উপস্থিত বাস্তব সমস্যাগুলিকে উড়াইয়া দিতে পারি না। আমি আমার কয়েকজন অতি প্রকাঙ্ক সহচরীকেও একথা বুঝাইতে পারি নাই, যে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে যে বিশেষ প্রকারের অসহযোগ অভিযানে লিপ্ত হইয়াছিলেন, বর্তমানে তাহাতে দেশের কল্যাণ হইতে পারে। তাই অসহযোগ এখন মূলত্ববী রাখিতে হইয়াছে। কিন্তু একথা আপনার নিকট হইতে আমি গোপন করিতে চাই না, যে যদি সহকর্মীদের আমার মতে পুনর্দীক্ষিত করিতে পারি, তাহা হইলে কয়েকসকল আবার আমি সংগ্রাম আরম্ভ করিতেই বলিব।

ব্যক্তিগত ভাবে আমার আপনো ইচ্ছা নয়, যে গবর্ণমেন্টের সহিত আমাদের দুর্বল মুহূর্তে সহযোগিতা করি। সে সহযোগিতা ত দ্বারের সহযোগিতা। আমি আমার দৌর্বল্য স্বীকার

করি, কাজেই আমি সহযোগিতার ইচ্ছাটুকুই ধরিয়া থাকিতে বাধ্য; আর শুধু প্রাণপণ চেষ্টায় শক্তি সঞ্চয় করিয়া সেই ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করিতেই চাই। আমি যদি হিংসানীতিতে বিশ্বাসী হইতাম, তাহা ত আমি গোপন করিতাম না, তাহার সকল কল্যাণ আমি বরণ করিয়া লইতাম। কিন্তু আমি দেশকে প্রকাশ্যে, দ্বিধাশূন্য ভাষায় জানাইতে চাই, যে আমার দেশবাসীর মুক্তি নাই এবং গবর্ণমেন্টের সহিত সম্মানজনক সহযোগিতারও অবসর নাই, যতক্ষণ না উক্ত নীতি অমুঠানে ইংরাজের অসির সঙ্গে ভারতের অসি সমুদ্র সংগ্রামে লড়বার সামর্থ্য পায়। আমার কথা, আমি তরবারি-তরো প্রত্যয় স্থাপন করি না। আরও আমার বিশ্বাস, সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যক্রমে, উহা ভারতে কখনও কার্য্যকরী হইবে না। তবে তাহার পরিবর্তে আর কোনও উপায় নির্ধারণ করা চাই—সে উপায় নিরস্ত্র সংগ্রাম।

আপনার মতামতমতে, এই নিরস্ত্র সংগ্রাম-নীতি হিংসানীতির মতই বিপদজনক; আর ইহাই যদি গবর্ণমেন্টেরও অভিমত হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের আমার দাবিতে হইবে—কারণ আমার কার্য্যমুক্তির পর, আমি প্রতি মুহূর্তে নিরস্ত্র-ভাবে এই এক উদ্যমেই লাগিয়া আছি; যাহাতে আমি বা আমার দেশ নিরস্ত্র সংগ্রামের জন্ত প্রস্তুত হয়। একথাও বিনয়পূর্ব্বক আমি জানাইতেছি, যে যদি আজ আমার বিপ্লব-পন্থী বন্ধুদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা পাই, তাঁরা তাঁদের কার্য্য একেবারে বন্ধ করেন, আর আমি যদি সাধারণ অহিংসাতাবাক্ক একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করি। তুলিতে পারি, আমি আজই সমষ্টিগত নিরস্ত্রসংগ্রাম ঘোষণা করিয়া দিই ও তবেই

সম্মানজনক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়। আমি স্বীকার করিতেছি, যে ১৯২১ সালে আমি ইহা নিষ্কৃত করিতে পারি নাই, আর যখন দেখিলাম, চৌরীচৌরার, আমার বিশ্বাসভঙ্গ করা হইয়াছে, আমি নিরস্ত্র সংগ্রাম ঘোষণার চরম খণ্ডার মধ্যেই উহা বন্ধ করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হই নাই—তাহার ফলে দেশব্যাপী যে নৈরাশ্র দেখা দিল, অনিবার্য্য ক্রমে তাহাও সেদিন বরণ করিয়া লইয়াছিলাম।

আর আমি যে হিন্দুমুসলমানে মিলন, চরকা ও বন্ধুদের উপর এতদখনি জোর দেওয়ার কেবলই দাবী করিতেছি, সে শুধু নিরস্ত্র সংগ্রামোপযোগী অহিংসাতাবক অবস্থা সৃষ্টির জন্যই। নিষ্কৃত মুখেই স্বীকার করি, অদূর ভবিষ্যতে হিন্দু-মুসলমানে মিলনের আশা আমি নিরাশ হইয়াছি। অস্পৃহিতা ধীরে ধীরে, কিন্তু অনিবার্য্য ক্রমে চলিয়া যাইতেছে; চরকাও ধীরে ধীরে, কিন্তু অব্যর্থ গতি-সফারে আমাদের স্থান করিয়া লইতেছে। ইতোমধ্যে দেশে নিষ্ঠুর শোষণ-নীতি অব্যাহতক্রমে অগ্রসর হইয়াছে। তাই আমি ব্যক্তিগত ভাবে কোন প্রকার নিরস্ত্র সংগ্রাম চালান যায় কি না, তদ্বিম্বক মাথা মতলব আঁটিতেছি—তাহাতে এই দুর্ভাগ্য দেশের অবস্থা-নিরাময় যদি নাও হয়, অন্ততঃ অহিংসাপন্থী বাহারা, তাঁহাদের চিত্তে এইটুকু সাক্ষ্য মিলিবে, যে তাঁহারা যে পরাধীনতার বন্ধনদশা দ্বারা জড়িতাকে স্রীষ, নির্দোষী করিয়া ফেলিতেছে, তাহা হইতে উদ্ধারের জন্য কোনও ভুল চেষ্টারই ক্ষতি রাখেন নাই।

আমি আবার মূল্যায়ন বলি, যে আমি এখনও কোনও মতলব ছকিয়া উঠিতে পারি নাই—কারণ তাহা যদি ঠিক করিতাম, তাহা হইলে কখনও আপনার বা দেশের কাছ হইতে

উহা গোপন রাখিতাম না। কিন্তু আমি আমার মনের সমস্ত চিন্তাপ্রাণলীকিত মূল্যায়ন ধরিলাম। আমি মিথ্যার কুহকজালে ইংরাজদিগের শুভেচ্ছা কিনিতে বা বজায় রাখিতে চাহি না। গবর্ণমেন্টও যখন ভারতীয় রাষ্ট্রনেতৃদের কাছে কোনও চুক্তি-সম্মত উপাধান করেন, তখন যেমন সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় অস্তিত্ব ও দৃঢ়ভিত্তি সম্বন্ধে সর্ব্ববিধ সতর্কতা অবলম্বনে বা আয়োজন উদ্যমে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য প্রকাশ করেন না, তেমন আমিও চাই, যে আমার দেশ এমন একটা দিব্যাবস্থা সম্বিত হইয়া উঠুক, যাহার উপর নির্ভর করিয়া গবর্ণমেন্ট তাহার ইচ্ছাপূরণের উপযুক্ত সাড়া দিতে কুণ্ঠিত হইলে, সে তাহার প্রতিকার করার উপায় করিতে পারে।

আপনি বোধহয় জানেন, (কারণ সে কথা প্রকাশিত হইয়াছে) যে দেশবন্ধু জাকার বেসান্তের রচিত বিলের কলনপত্রে স্বাক্ষর করিতে স্বীকৃত হন নাই, তার একটা হেতু এই, যে সে বিল প্রত্যাখ্যাত হইলে, উহার পক্ষেও প্রতিকারহুঁলে কোনও আদায়-শক্তির ব্যবস্থা ত্যাগিত ছিল না।

সেই আদায়-শক্তি—নিরস্ত্র সংগ্রামনীতি বা সিভিল ডিসোবিডিয়ান্স। আপনি কি চাহেন, দেশের মহাযা বান্দিয়া গুড়িয়া, একেবারে পক্ষাত্যাগ হইয়া মাউক, দেশপ্রাণ হিংস হউক, অহিংস হউক, যে কোনও প্রতিকারে সম্পূর্ণ অক্ষম, নির্দোষী হউক, তবেই ইংরাজ গবর্ণমেন্ট চুক্তি-সম্মত দিবার কথা ভাবিবেন, অথবা স্বরাষ্ট্রালয় কিম্বা অন্য যে কোনও দলকর্তৃক উপাধিত সঙ্ঘবর্গ বিবেচনা করিতে প্রস্তুত হইবেন? এইরূপ হইলে, আমি হুনিহিত আপনাকে জানাইয়া রাখিতেছি, কোনও আত্মমর্য্যাবান

ভারতসম্বন্ধে একপ্রহর হীনকর সত্ত্বেও অংশগ্রহণ করিবেন না।

মোঃ কঃ গাজী

১৪৮ নং রসায়োড, কলিকাতা।

নাম

নাম যখন বাহিরে অভিব্যক্ত হইল, তখন হইতেই আমার মাঝে সৃষ্টির আনন্দবেগ অল্পভব করিতে লাগিলাম; এই নামকে আশ্রয় করিয়াই শ্রোতৃজনের কাণে বিচিত্র, অক্ষরন্ত ও অনির্লক্ষণীয় সোহাগ ঢালিয়া দিতে লাগিলাম। ইহা নামের বিলাস—এখানে আমার অন্তরঙ্গ শক্তির আনন্দময় ক্ষরণ। কিন্তু বলিয়াছি, ইহার পূর্বেরও কথা রহিয়াছে। ভাবুক যদি নামের পূর্ণ নিদান খুঁজিতে যান, তাহা হইলে কোথায়ও তাহার সম্ভান পাইবেন না। এইটুকু নামের অনির্লক্ষণীয় রহস্ত। ভাব গাঢ় হইলে নামের আকারে ক্ষুটিয়া উঠে। ভাব বৃদ্ধির হিমায়ে বেড়িয়া পাইবার বস্ত্র নয়। তাই নামেরও আদি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যাহা অতক্তিত ভাবে আশ্রয় উপস্থিত হয়, প্রাকৃত জগতে তাহা একটা বিপ্লব বাধাইয়া দেয়, ইহা আমরা সচরাচর দেখিতে পাই। তাই অতক্তিতের আবির্ভাবকে আমরা মনে প্রাণে গ্রহণ করিতে পারি না। কিন্তু ভাবুক ত প্রপঞ্চীর মত হিসাব করিয়া পথ চলেন না। সাধারণ বুদ্ধিতে যাহা অতক্তিত, তাহাই তাঁহার কাছে স্থপষ্ট। অজ্ঞান অচেনাকে ইয়াই তাঁহার কারবার। এইজন্ত তাঁহার আনন্দের মাঝে এমন একটা তীব্রতা আছে, যাহার আভাস মাঝে বিষয়ী সন্ধ্যাতে সরিয়া যায়—বলে লোকটা পাগল। অজ্ঞানার স্পর্শ পাইলে পাগল হইতেই হয় বটে। এই পাগলারী ছিট

ভাবকের থাকে বলিয়াই নামে তিনি আত্মহারা হইতে পারেন। নামের মূল প্রভাব যদি অক্ষর ও অগম না হইত, তাহা হইলে সম্ভারবুদ্ধি গৃহাওয়া ভাবকের তাহা আত্মহারা করিতে পারিত না। ভাবের সঙ্গে অদ্বিত যে নাম, তাহার প্রধান লক্ষণই এই হইবে যে, উহা স্বতঃস্ফূর্ত। যেমন স্বর্গা মেঘে ঢাকা পড়ে, তেমনই বিষয়কলুষে নামও ঢাকা পড়ে। তখন নামে কৃতি আনিতে হইলে নিষ্ঠার অক্লুশাখাতের প্রয়োজন হয়। ইহাতে আনন্দ না পাওয়ারই কথা; সাধক তখন ভাবুকতা হইতে শত যোজন দূরে। কিন্তু অভ্যাসের ফলে অভাব দূর হইয়া স্বভাবে যখন প্রতিষ্ঠা লাভ হইবে, তখন নামরস আপনা হইতে উছলিয়া উঠিবে। তখন—

নামে তুল্যেচ্ছ যাবে,

সে কি ছেড়েই রইতে পারে—

নামরসে যে মজেছে, সে বুঝেছে কি আশ্রাম।” এই যে নামের স্বতঃস্ফূর্ত, ইহা কেবল নিষ্ঠা-সহকারে নাম অভ্যাসেরই ফল, এইমাত্র বলিলেই কিন্তু তৃপ্তি হয় না। ইহাতে মনে হইতে পারে, নাম নিতা সত্তা নহে, অভ্যাসের বসে উহা আয়ত্ত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু আমরা বলি, ভাব যদি মূলে সত্তা হয়, এই জগৎ যদি ভাবেরই অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছু না হয়, তাহা হইলে নামও সত্তা—নির্লিপ্ত ও নিরঞ্জন সত্তা। নাম একটা অস্পষ্ট সজ্ঞা নয় বা বর্গসমষ্টি নয়। যিনি যে পথের সাধনাই করুন না কেন, ভাবব্যুৎ সকলকেই হইতে হইবে এবং সকলের ভিতরেই তখন নাম ক্ষুটিয়া উঠিবে। বেদের প্রবচন, তত্ত্বের মর ইত্যাদি সৈমন্তই নাম। ভাবের আবরণে উহা ক্ষুটিয়া বাহির হইয়াছে বলিয়াই উহাকে আমরা অগোপকময় বলি। অগোপকময় বলিতেই নিতা

সত্তা বুদ্ধি। আজ যাহা বর্ণের আকারে ধনি-রূপে পাইতেছি, তাহাকে আবার আর একদিন ভাবের ভিতর দিয়া পাইতে হইবে। আত্মিকার পাওয়া অচেনতভাবে পাওয়া—তাই উহা “প্রোক্ত-বর্ণান্ত কেবলা”।—তাই বর্ণবুদ্ধি দূর হইতে চাহে না। কিন্তু একদিন এই নামই হৃদয় দিয়া ভিতর হইতে চৈতন্তশিখায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিবে, সেই দিন প্রমাণ হইবে নাম সত্তা কিনা।

একটা উদাহরণ দিই। বালিকাবয়সে যাহার বিবাহ হইয়া গেল, সে বিবাহ সপক্ষে কিছুই জানিল না—বিবাহ তাহার কাছে একটা অর্থহীন শব্দ মাত্র। তবুও এই শব্দের একটা সংখার তাহার লাগিয়া গেল। কিন্তু সেই সংখার সত্তা অহুত্বিতে পরিণত হইল কখন?—যৌবনে যে দিন সে স্বামী সোহাগ পাইল, নিজের হৃদয়ের অপরিণীম ভালবাসা দিয়া বৃষ্টি, স্বামী কি বস্ত্র। এখানে যাহা বৃপ্ত ছিল, তাহাই জাগিয়া উঠিল; সংখারের পাওয়া অহুত্বিতর পাওয়াতে রূপান্তরিত হইয়া সার্থক হইল।

ভিতরে ভিতরে নাম সর্বদাই হইতেছে। বাসের সঙ্গে নাম গাথা। বিশ্বরূপ দর্শনের ভ্রম যেমন অজ্ঞানের দ্বিচ্ছত্র প্রয়োজন হইয়াছিল, তেমন এই বিশ্বনাম জনিবার জন্ত দ্বিচ্ছত্র, উজ্জারণ করিবার জন্ত দ্বিচ্ছত্র রসনার প্রয়োজন। দ্বিচ্ছত্র অজ্ঞানের চক্ৰ আর একটা বাদে নাই—বর্ণনে ভাবান্তর ঘটাইয়াছিল, চোখে ভাবের অন্ধন লাগিয়া সমস্তই অমৃতময় হইয়া গিয়াছিল। দ্বিচ্ছত্র ক্রীতি ও দ্বিচ্ছত্র রসনা এমনই ভাবান্তর বটে; বরণ ক্রীতি আরও স্থপষ্ট। চকল চিত্তে দেখা যায় না, শোনা যায় না, জপা যায় না। চিত্ত স্থির কর—নামরূপের শ্রবণ দর্শন সর্গর হইবে, সহজভাবে হইবে—কিছুতকিমাকার কিছু হইবে

না। এই ইচ্ছারই শক্তি ভাবের স্পর্শে কি করিয়া উদীপ্ত হইয়া উঠে, তাহা অল্পভব করা ছাড়া কথা ঘরা বুঝাইবার উপায় নাই।

“নামগানে সনাকতিঃ”—এই লক্ষণটিকে একটু বুঝিয়া দেখিতে চাই। ইহার মাঝে চারিটা কথা—নাম, গান, সদা ও কৃতি। নাম অপর তিনটির আশ্রয়, ইহার কথা সামান্য আলোচনা করিয়াছি। বাকী তিনটি নামেরই বিভাব। ভাবের প্রেরণায় নাম যখন অভিব্যক্ত হইবে, তখন উঠাতে তিনটি ধর্ম ক্ষুটিয়া উঠিবে—গেয়ত্ব, সনাক্তিত্ব ও কৃতিত্ব।

শব্দের সঙ্গে ছন্দ ও স্বর যুক্ত হইলে তাহা হয় গান। ছন্দ কথাটা ব্যবহার করিবার একটু তাৎপর্য আছে। বেদকে ছন্দ; বলে; বেদ হইতেই সৃষ্টি, এমন কথাও আছে; আবার ছন্দ অর্থ ইচ্ছা; আবার ছন্দ ইচ্ছা তাল—“ধৃগাধর্ম-কল্পত” এই বৈদিক মন্ত্রে যাহার ইঙ্গিত রহিয়াছে, ছন্দের এই লক্ষণগুলি মিলাইয়া ‘তাহার অর্থ ধারণা করিতে হইবে। সংক্ষেপে বলিতে পারি—বেদই নাম—নামই বেদ;—সৃষ্টির কল্পলতিকা বাসনার আদিম্পন্দন, লীলার অন্তরীণ আবর্তন। ইহার সঙ্গে স্বর যোগ হইলে নাম গান হইবে। স্বর অনির্লক্ষণীয়—সমীমে অসীম, আনন্দের দ্বিচ্ছত্র রসায়ন। শব্দের সঙ্গে যখন স্বর যুক্ত হইবে, তখনই সৃষ্টির, মূলে ভাবের যোগ পাইবে। এই কথার ইঙ্গিত করিয়া শ্রীমাদ্ভার নামগান প্রসঙ্গে গোবিন্দী প্রভুপাদ শ্রীমাদ্ভার সার্থক বিশেষণ দিতেছেন, “মধুরবরকল্পী।” নামগানে স্বর মধুর হওয়া একটা দৈব সংযোগ নয়। ভাবের যোগে স্বর স্বর হইবেই, মধুর হইবেই—ইহা বিধান। এমন কি তথ্যক জাতিতেও আমরা এই বিধানের ব্যতিক্রম দেখিতে পাই না—মাংসের তোক খাই

নাই। নামের মোহিনীশক্তির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া মহাজনেরা উহাকে গানের সঙ্গে যুক্ত করিলেন। মোহিনীশক্তির প্রভাবে মনোমোহনেরও মন তোলে। এখানে প্রেমের গুণাতীত স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয়—শ্রীমদ্ভাগবত ইহা বলিয়াছেন। নামগানের শক্তির কথা এইটুকু মাত্র ইঙ্গিত করিয়াই আমরা ক্ষান্ত হইলাম।

তারপর নামগানের সদাসত্য। শাস্ত্রপ্রবাস সর্গদ্বয়ই ফেলিতেছি, অজ্ঞাতসারেই ফেলিতেছি—দুইচারি বার যে তুল হইয়া যাইবে, এমন সম্ভাবনা নাই। যদি কখনও বাদ পড়িবার আশঙ্কা ঘটে, তাহা হইলে একেবারে মঞ্চস্থানে টান পড়ে—আত্মনি-বিফুলির আর অস্ত থাকে না। নাম সহজে অভিব্যক্ত হইলেও এই দশা হয়। তখন “জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো”—অথচ ছাড়িবার উপায় নাই। আর ছাড়িবেই বা কি করিয়া? প্রাণীর প্রাণটুকু বা, ভাবকের কাছে নামটুকু তা। ক্রমে স্থখ হইতে স্থখতার হইয়া উহা অন্তরাখার সঙ্গে জড়াইয়া রহিয়াছে—ছাড়িবার কথাই যে করনায় আসে না। বাসের সঙ্গে নাম যখন গাথিয়া যায়, তখন স্বপ্ন জাগরণে সমভাবে মন চলিতে থাকে। প্রতি বাদে নাম একটা বীর্ঘশালী, তেজস্কর রসায়নের মত সমস্ত সত্তা উদ্ভাবিত করিয়া তোলে। শাস গ্রহণে একটা আরাগ্ন আছে—যা নিরন্তর অভ্যাসের দরুণ আমাদের কাছে অলক্ষিত; একবার শাসরোধের কারণ উপস্থিত হইলে পর আবার যখন শাস নিবারণ সময় আসে, তখন বৃত্তিতে পারি প্রাণকে কি শব্দি, কি আরাগ্ন। কিন্তু নিরন্তর নামজপের তৃপ্তি এর চেয়েও গভীর; কেননা নাম ফোটে সচেতন ভাবে—অজ্ঞাতসারে নয়; অথচ জন্মের স্থাশার বলিয়া তাহার তৃপ্তিরও অন্ত নাই।

অবিরাম নাম এইজন্ত ভাবকের কাছে প্রাণন অপেক্ষাও বীর্ঘশালী পরমানন্দের বিলাস। শেখ কথা কহি। কচির হেতু নাই—এইটুকু প্রাধিকান করিতে হইবে। যখন ভাল লাগে, অথচ কেন ভাল লাগে, তাহা বুঝিয়া বলিতে পারি না—তখনই বলি, এ আমার কচি। এই জন্ত কচি বৃদ্ধ—মানে, আমার মাঝে যে “কবি মনীরী” রহিয়াছেন, তার আপনার ছন্দ। কোথাও বাধা নাই, অথচ হেতুশাস্ত্রাধ্যায়ও বেড়িয়া পাওয়া যায় না—তাই কথায় বলে, “ভিন্নকচিহি লোকঃ।” এই প্রবচনে যে নিরপেক্ষ বৃদ্ধ অনন্দের ইঙ্গিত রহিয়াছে, নামে কচি বলিতে তাহাই বুঝিব। কচির মূলই হেতুবাদ নাই বলিয়া বৃদ্ধির বলাই নাই, বিষয়-পরিপূর্ণও নাই; কেননা বিভিন্ন বিষয়ের পরিপূর্ণতা বৃদ্ধির যে বিভিন্ন বিভ্রম উপস্থিত হয়, তাহাদের মাঝে বিরোধ মিটাইবার জন্তই না হেতুবাদের প্রয়োজন হয়। নাম অন্তরঙ্গ, স্তবরাং বহিবিষয় নিরপেক্ষ। ভাবকের কাছে নাম নামী অস্তর; স্তবরাং নাম নিত্যসত্তা। অবিষয় নিত্যসত্তা কোনও বৃত্তির অপেক্ষা রাখে না। তবে উহা যতক্ষণ পর্যন্ত জন্মের স্বারসিকী অহৃত্বের গোচর না হইতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বৃত্তি আছে বটে। কিন্তু ভাব তেও শুদ্ধতরকর ফল নয়—উহা স্বতঃপ্ৰসূত অহৃত্বের রসায়ন। স্তবরাং উহা অহৃত্বক, অযৌক্তিক এবং ঠিক এই জন্তই আনন্দময়। যাহা হেতুপ্রসূত নহে, তাহা নিত্য, অন্তরঙ্গ ও স্বরূপাশ, অতএব আনন্দময়—কেননা উহা স্বভাবেরই অভিব্যক্তি। আর আমাদের স্বভাব যে আনন্দে প্রতিষ্ঠিত, দুঃখপরিহারের চেষ্টাই প্রমাণ। নিত্যআনন্দময় বলিয়াই নামে কচি হয়—ভাবক ইহার রসবেত্তা।

রূপ দেখিবার আগে নাম শুনিলেন, নাম

শুনিয়াই শ্রীমতী বিদ্বল হইয়া পড়িলেন,—তখন স্পর্শের লালসা জাগিল, তারপর জাগিল রূপের পিপাসা;—যে মহাজন বহুদয়ের রসাহুকৃতি এমন কোমলস্বভাবের প্রকাশ করিলেন, তাঁহার মত তত্ত্ববেত্তা রসিক যোগীরাও আর দেখি না। এই ধারা প্রাকৃত বীতির ঠিক বিপরীত, তাই বাসনা কামনাবর্জিত না করিলে ইহার মর্ম গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।—

শ্রীমতী বলিতেছেন—

সই, কেবা শুনাই শ্রাম নাম।

কাণের ভিতর দিয়া। মরমে পশিল গো

আকুল করিল মোর প্রাণ।

না জানি কতক মধু শ্রাম নামে আছে গো

বদন ছাড়িতে নাহি পারে।

জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো—

কেমনে পাইব সই তারে।

নাম পরতাপে যার এছন্দ করিল গো

অঙ্গের পরশে কিবা হয়।

যেখানে বসতি তার, নয়ানে দেখিয়া গো

যুবতী ধরম কৈছে রয়।

পাসরিতে করি মনে, পাসরা না যায় গো,

কি করিব, কি হবে উপায়?

আর একজন রসিক মহাজনের বর্ণনা—

সন্ধান, মরণ মানিয়ে বহু ভাগি।

কুলবতি ভিন পুরুষে ভেল আরতি

জীবন কিয়ে সুখ লাগি।

পহিলে শুনিবুঁ হাম শ্রাম ছই আশ্রয়,

তখনে মন চুরী কৈল।

না জানিয়ে কো জৈছে মুকলি আলাপই

চমকই শ্রুতি হরি নেল।

না জানিয়ে কো জৈছে পটে মদরশায়ি

নব জলধব জিনি কাতি।

চকিত হইয়া হাম সাহা যাহ। খাইয়ে তাহ। তাহ। বোধয়ে মাতি।

—এখানে চিত্ত বিজয়ের ছায়া আছে, কিন্তু তবু সেই একই।

আবার শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

গণি, বাধা নাম কহিলে।

শুনি কান মন জুড়াইলে।

কত নাম আছেয়ে গোহুলে।

হেন হিয়া না করে আকুলে।

ওই নামে আছে কি মাধুরী।

শ্রবণে রহল স্থখ ভরি।

চিত্তে নিতি মুরতি বিকাশ।

অমিয়া সায়েন বেন বাস।

অখিণ্ডে দেখিতে করে সাধ।

পুনঃ—

যাধানাম কি কহিলে আগে।

শুনইতে মনমগ্ন জাগে।

গণি, কাহে কহলি উহ নান।

মন মাহা নাহি লাগে আন।

কহ তজ্জ অহুপম স্বরূপ।

বৃন্দাম অমিয়া স্বরূপ।

হেইহিতে অখি করে আশ।

এ শুধু কবিকল্পনা নয়—সাধকচিত্তের রসোদ্যায় কে যেন বলিয়াছিল, নামে কি আসে যায়? কিন্তু নামে আসে যায় বই কি! ভাবকৃষ্ণের তাহার সাক্ষী। নামে চিত্তের স্পন্দন, স্পর্শকাজ্যায় চিত্তের ব্যাপ্তি, রূপে বহিঃকাজ্য—ইহা তৎসাহকুল শ্রুতিসম্মত সাধনা; নিজে নামরূপবন্ধিত না হইলে ইহার রসোদ্যায়ন করা যায় না। তাই বাসনাশীন বৈরাগীকে এই শপে আশ্বিত্য আরতি করি।

(আধার্পণ)

স মালোচনা

বাংলার বীরবাণী—শ্রীবিজয়লাল চট্টো-
পাধ্যায় ও শ্রীবিবসন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। মূল্য
ছয় আনা। বাংলার নয়ন-মণি দেশবন্ধুর বাণী
ও লেখা লইয়া এই বইখানি সংকলিত। ইহা দেশ-
বন্ধুরই বাণীর অম্ববাদ বা অমূল্যলিপি—কাজেই ইহার
অন্ত পরিচয় অনাবশ্যক। বইখানি সমগ্রোপযোগী ও
সরুপাঠ্য।

আর্য্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ—মার্গাঙ্গ দীপনী-
নামী ব্যাখ্যাসহ। ডাক্তার শ্রীবীরেন্দ্রলাল বড়ুয়া
কর্তৃক সম্পাদিত ও ব্যাখ্যাত। মূল্য ১২ মাত্র।
বৌদ্ধগ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে বড় অপ্রচুর, জানিবার
সাহ আদৌ মিটে না। বড়ুয়া মহাশয়ের বইখানি
সেই অভাব কিছু পূরণ করিবে। শাস্ত্রচর্চা
বভাবতই একটু প্রচুর, তজাপি সরলভাবে গ্রন্থকার
বুদ্ধ-নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক মার্গ বর্ণাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।
ভাষা-ভঙ্গী আরও একটু মিষ্ট ও হুল্লিহিত হইলে ভাল
হইত—যাহা হউক বইখানি মূল্যবান, শাস্ত্রদর্শী ও
বুদ্ধাভ্যাসী পাঠকবর্গের খুবই প্রয়োজনীয় ও
উপাদেয় লাগিবে।

জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি—মহর্ষি দেবেন্দ্র
নাথ ঠাকুরের উপদেশ। শ্রীকৃষ্ণভট্টাচার্য ঠাকুর
সংকলিত। মূল্য ৬০ আনা। মহর্ষির আলোক-পূর্ণ
চিত্তা-প্রকাশী ইহাতে হব্যাক্ত। বৈজ্ঞানিক ও
ঐতিহাসিক তত্ত্বের উপর ঈশ্বরের মঙ্গলচ্ছায়
অবস্থান করার সূত্র ইহাতে মিলিবে। বইখানি

বালক বৃদ্ধ সকলেরই হৃদয়গ্রাহী ও উপকারী
হইয়াছে। মলাট, বাঁধাই বড় চমৎকার।

প্রভাতী—শ্রীকৃষ্ণভট্টাচার্য ঠাকুর প্রণীত।
মূল্য ৬০ আনা। গল্প-পুথো কয়েকটি ভাব-সমগ্ধ।
লেখক প্রভাতের চিত্তা-প্রেরণার তরঙ্গগুলি ধরিয়া হার
বাখিয়াছেন। সমভাবী অনেকেই ভাল লাগিবে।

অশ্ব-প্রতিকার—এবং হোমিওপ্যাথিক মতে
চিকিৎসা। মূল্য ১/০ আনা। ডাক্তার অভয়দেব
মোহন এইচ, এম, বি এ প্রীত। কুস্তভোগীর প্রত্যক্ষ
অভিজ্ঞত-পূর্ণ বইখানি চিকিৎসক ও হোমী মাত্রেয়
গণ উপকারে লাগিবে। ইহার বহুল প্রচার
আবশ্যক।

ম্যালেরিয়া ও বঙ্গদেশ-স্থলভ অমৃত্যু
জরে ও তৎকার সমস্তার পতিবল্লভ—
শ্রীপীরীন্দ্রনাথ মিত্র এম-বি প্রণীত। বাংলার একমাত্র
কাজ যে পল্লীগঠন—তার একটা প্রধান দিক স্বাস্থ্য
সমজ্ঞা। বাঙ্গালীর পল্লীস্বীকৃতি লোক-স্বাস্থ্য কেমনে
বিস্তারিত হইবে, সে বিষয়ে কার্যকরী প্রস্তাব লেখক
উত্থাপন করিয়াছেন। দেশ ও গবর্ণমেন্টের আশ্রয়-
দৃষ্টি ভরসা করি, তাহার বন্ধনা কার্যে পরিণত
করিতে সহায়তা করিবে। এ বিষয়ে আমাদের আর
কি কথা আছে? তবে প্রস্তাবগুলি কাজে দাঁড়
করান, সজ্ঞ-শক্তি ও অর্থবলের উপর যে নির্ভর
করে, সে কথা বলা বাহুল্য।

প্রাপ্তি স্বীকার

Prison House—অরুণাচল মিশন।



ভারতের উত্তম রহস্য

[লেখক—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত]

“যা নাই ভারতে, তা নাই ভূগতে।”
মতাই তা—কারণ, ভারত ক্ষুদ্রতর ভূলোক, আর
ভূলোক বৃহত্তর ভারত। ভারতের নামেই পৃথিবীর
নাম করণ, সমগ্র পৃথিবীর প্রতীক হইতেছে
আমাদের এই ভারতবর্ষ। ভূমণ্ডলের যেখানে যাহা
কিছু আছে, মানুষ যেখানে যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছে,
তাহার গোড়ার প্রতিরূপ ভারতবর্ষেও আছে;
আর ভারতে যে জিনিষের মূল নাই, ভারতের দৃষ্টি
যে ধরণের জিনিষ করনাতোও দেখিতে পারে নাই,
ভূমণ্ডলের অজ্ঞাত কোথাও তাহা মিলিবে না।

ভারতের প্রাকৃতিক রূপই কথার প্রমাণ দিতেছে।
একদিকে অল্পভেদী চিরতুষারমণ্ডিত শিরিরাজ অচল-
প্রতিষ্ঠ, আর একদিকে অশীম বিস্তৃত মহাসাগর
চিরচঞ্চল। ভারতের বৃক্ক রহিয়াছে গহন গভীর
বিরাট অরণ্যাবলী, আবার উত্তর পূর্ব ধ্রুপ মরুভূমী।
পর্বে তাহার স্বর্ণ ও অদার মাথামাখি হইয়া আছে।

একদিকে দাগণ হিম, শীতলতা, তুষার, কুয়াটিকা;
অপর দিকে তেমনি তীব্র গরম, উত্তাপ, গরম রৌদ্র,
বা-বা দিগন্তর। প্রাবৃটের পূজ্যকৃত তমোয়ন
মেঘগম্ভীর, আকাশ ভাসিয়া ভূমল বরাহ অবতরণ,
তার পরেই শরতের স্নিগ্ধ স্থলীল নির্মল আকাশ।
কলকল, কীটপতঙ্গ, জীবজন্তু আকারে ও প্রকারে
যে কত বিভিন্ন তাহার ইয়ত্তা নাই—বর্ণ-গন্ধ-রস
ছন্দ-রূপ-গুণ ভারত সৃষ্টি করিয়াছে অজস্র অকুরন্ত।

ভারতের মানুষই বা কত রকমারি—চেহারা
হিসাবে, জাতি হিসাবে, ধাতু হিসাবে, শিকারীকণ
হিসাবে। মনীষীকণ পারিয়া হইতে কবিতাকান
কাম্বোজী, শালগ্রাম কবচাটক্য পাঞ্জাবী
হইতে জীব শীর্ণ গোড়বাসী যথেষ্ট মিলিবে
ভারতে। বাঙালী হইতেছে কবি শিল্পী, মহারাজ
কুটুম্বজীতিজ্ঞ, মাদ্রাজ স্বপ্নতাত্ত্বিক, পঞ্চদশ যোদ্ধা
পৃথিবীর যাবতীয় ভাষারও প্রায় প্রতিরূপ রহিয়াছে

• কথাটির যে আসল অর্থ তাহার পরিবর্তে একটা প্রচলিত যে অর্থ তাহাই অহমরণ করিয়াছি।
অন্ততঃ অনাকারের খাতিরে আমরা এ ব্যাখ্যা মার্জনীয়—লেখক।

ভারতে। তাই ত বলা হয়, বাংলা হইতেছে ভারতের ফরাসী, তেলেগু হইতেছে ভারতের ইতালী, তামিল ভারতের জর্মন ভাষা। গ্রীকের সৌন্দর্য, লাতিনের সামর্থ্য মিশাইয়া সংস্কৃত। আর্য অনাৰ্য নিজে মঙ্গোলীয় সকল রকম জাতির ভাষা, সকল রকম জাতির রক্ত ভারতে বহিয়াছে বীজরূপে। ভারতেই ধরে ধরে সংজ্ঞিত আছে আদিম অসভ্যদের ধর্ম কর্ম হইতে আর্য সভ্যতার পরাকাষ্ঠা।

ভারতের সমাজগঠনের ধারাও কত বহুবিচিত্র। বলা হয়, জাতিভেদেই ভারতীয় সমাজের বিশেষত্ব। খৃষ্টান মুসলমানের কথা ছাড়াইয়া সিদ্ধান্ত—বনিও তাহারিগকে ভারত আপনায় অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছে; হিন্দু সমাজের মধ্যেও এমন সম্ভ্রমাদয়ের অভাব নাই যেখানে বর্ণগত বৈষম্য কোপ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। “আর্য সমাজ” “ব্রাহ্ম সমাজ” “বৈষ্ণব সমাজ” ইউরোপীয় সমাজের অপেক্ষা কম সাম্য দেখাইতেছে না। গোড়া হিন্দুগণ সময়ে বর্ণ বৈষম্য একবারে বিসর্জন দিতে দৃঢ়পাত করে নাই—কিন্তু সর্ব একাকার। সমাজের কর্তা সাম্প্রদায়িক: পুরুষ; কিন্তু সমাজের কর্তা অর্থাৎ কর্তা বে নারী, এ বাবস্থাপ্ত ভারতে আছে।—পিতৃতন্ত্র (Patriarchy) ও মাতৃতন্ত্র (Matriarchy), এই দুই রকম সমাজই ভারতে আছে—প্রমাণ কেবল প্রদেয়। এমন কি আধুনিক “কমিউনিজম” (Communism) বা সম্মতাবাদ ভারতে একান্ত অপরিচিত নয়।

রাষ্ট্রনীতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখি—ঐতিহাসিকেরা একবার প্রমাণ দিলেন যে, একদিকে ভারত যেমন স্থাপন করিয়াছে রাজতন্ত্র, অত্রদিকে যেমন পণ্ডিতগণ তাহার মধ্যে স্থান পাইয়াছে। সাম্রাজ্য বা রাজতন্ত্রবলীই সে একদিকে প্রতিষ্ঠা

করিয়াছে, অত্রদিকে আবার জনসাধারণের কর্তৃত্বও অটুট রাখিয়াছে। রাজা “নরদেবতা”, আবার রাজা “লগনশ্য”, এই দুই কথাই ভারত একমুখে বলিয়াছে, একদিকে মোঘলদের, গুপ্তদের “এম্পায়ার” (Empire) আর একদিকে শাকা, মল্ল, লিঙ্গবী প্রভৃতির “রিপাবলিক” (Republic)—রাষ্ট্রগণসমের সকল রকম বাবস্থাই ভারত যেন পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে।

ধর্মের, আদর্শের দিকে দেখ। কত সম্ভ্রমাদয়, কত সাধনপথ, কত সিদ্ধান্ত ভারত গড়িয়া তুলিয়াছে। বাহির হইতে যাহা আসিয়াছে—আপাততঃ দেখিতে তাহা বতই হিন্দু ও বিজাতীয় বোধ হউক না কেন, সবথেকে কত সহজেই ভারত আপনায় করিয়া লইতে পারিয়াছে—কারণ, ভারতের নিজের ভিতরেই ছিল এই উদার বৈচিত্র্য। এক দিকে সে যেমন কোর করিয়া বলিয়াছে বাহা কিছু আছে সব বুটী, কিছুই নাই, সব শূন্য, হুতরাং কোনোদিকঃ বলু-ভাগ্যবস্ত্র; অত্রদিকে তেমনি অকুণ্ঠচিত্তে যোগদান করিয়াছে বাহা আছে তাহাই আছে, স্থল চকুতে বাহা বেবিবেছে তাহাই সব—হুতরাং, লগন কল্যা হুত পিবেৎ। এই ভারতই ক্ষত্রিয়বলক দিকার দিয়া বলিয়াছে “বলং বলং ব্রহ্মবলং”, ব্রহ্মণ-ভেদী-অহিংসা প্রচার করিয়া বলিয়াছে শত্রুকে কখন শত্রুতা বদি জয় করা যায় না—ন হি রেবে যেরাশি সমস্তীক কবাসি; আবার এই ভারতই শিক্ষা দিয়াছে “শ্রেষ্ঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ”, ‘ভক্তো যুদ্ধায় যুদ্ধান্ত পরশ্রম’। ভারতের শত্রুরকেই এক দিকে বলিতে দেখি, আমি অধম আমি অক্ষম, আমি দীনদীন পানী; আবার ভারতই দেখি শাখক বলিতেছে, আমি শুদ্ধ অশ্বপারিত, ‘সম্ভাদাননরূপাশি শিবোহং’, “স্বং কংভেদিত্ব-ভিক্তবামি”।

• অজানা দেশেও এই রকম বিভিন্ন বিবোধী মতবাদ যে একান্ত দেখা যায় না, তাহা নয়। কিন্তু এক রকম মতবাদকে জীবনে চরম করিয়া ফলাফলী আগ্রহ করিয়া গ্রহণের প্রয়াস দেখিতে পাই।

ভারত সারা পৃথিবীর বাবতীয় ধর্মকর্মই যেন আপনায় মধ্যে টানিয়া লইয়াছে। তাই তাই নয়, ভারতই আপনায় ভিতর হইতে বাহ্য সৃষ্টি করিয়া ছড়াইয়া দিয়াছে, সারা পৃথিবী তাহাই গ্রহণ করিয়া বাচিয়া বর্তিয়া উঠিয়াছে। ভারত কি ভাবে ভূমণ্ডলের শিক্ষাদীকারে প্রভাববিত্ত করিয়াছে তাহার প্রমাণ ইতিহাসেই দিতেছে—সে প্রমাণের নিতানুতন রূপ আজও আবিস্কৃত হইতেছে। ইউরোপ আজ শিক্ষায় সভ্যতার জগতের রাজা বলিয়া পরিকল্পিত। এই ইউরোপের পিছনে রহিয়াছে যেরোম গ্রীকের প্রতিভা, গ্রীকের পিছনে ক্রীটের নিশের প্রতিভা, নিশের পিছনে শাক্য-ভাবে এবং হুমের, আকাদ, বাবিলন, আনিরিয়, প্রাচীন পারস্যের পিছনে অসাক্যতে পাড়াইয়া আছে ভারত। হ্রদ্বয় অতীতে ভারত যে পশ্চিম দিকেই

পূর্বেও অপার জলপি পার হইয়া আমেরিকায় পঁচাত্তর তারার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। আমেরিকায়, মেরিকোকেলো পাওয়া গিয়াছে হিন্দুর বেবদেবী মূর্তি, বুদ্ধমূর্তি। এই বৌদ্ধগুণে—এবং তাহার বহুপূর্বেও যে না হইতে পারে এমন নয়, প্রমাণ আমরা পাইয়াছি কেবল বৌদ্ধগুণের—আর এক ডেউ ভারত হইতে উঠিয়া পৃথিবীর উপর ছড়াইয়া গড়িয়াছিল—মধ্যএশিয়া, চীন জাপান, শ্রাম, ক্যাম্বো, চম্পা (আনাম), যবদ্বীপ শিক্ষাদীকার ভারতের উপনিবেশ হইয়াছিল বলিতে অত্যাশ্চর্য হয় না। তারপর যে পুণ্ডরীক ইউরোপকে এত-বানি গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে কতখানি হিন্দুর ভারতের প্রতিভা সে রহস্য আজও সম্যক তলাইয়া দেখা হয় নাই। আজও ইউরোপে মধ্যযুগের শেষে যে একটা জ্ঞান বিজ্ঞানের বিশালা চক্স দেখা বিয়াছিল তাহারও যোগ্য

প্রেরণা মূললাননের লইয়া গিয়াছিল ভারতের শিক্ষাদীকার হইতেই। তারপর আবার এই ভারতকেই আবিষ্কার করিবার জ্ঞান কল্যদু-ভাষোড়িগামা বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন—কেন? ভারতের সম্পদের লোভে? আসল গুপ্ত কারণ, হুম জগতের কারণ, ইউরোপের চেতনার সাড়া দিয়াছিল একটা আকাখা ভারতের কল্যাণলক্ষ্য পাইতে, ইউরোপেরও আপনায় কে শাণের প্রাণ তাহার সন্ধান লইতে, তাহার সহিত শাক্য শাস্ত্রীয় সম্বন্ধ স্থাপন করিতে। সমাজে না বৃষ্টিলেও, অন্তরাশ্রায় একটা আধ্যাত্মিক অভাব বা ব্যাকুলতার মধ্যেই ইউরোপ তখন ভারতের অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছিল।

কিন্তু এত অতীতেই বা বাইতে হইবে কেন? গ্রীক শিক্ষাদীকার পুনরাবিষ্কারের ফলে বলা হয় ইউরোপের হইয়াছিল একটা পুনঃজন্ম—রেনেসান্স। কিন্তু ইউরোপের সভ্যতার গভীরতর পুনঃজন্ম হইয়াছে ইউরোপ যেদিন আবিষ্কার করিল সংস্কৃত সাহিত্য—বেব উপনিষদ। আর ইহাও সেদিনের কথা, যেদিন ভারতের সম্রাটগণ বৌদ্ধধর্মের বার্তা লইয়া সিংহগর্জনে পাশ্চাত্যের বুকের উপর বাইয়া পড়িলেন। বিজ্ঞানবান ভারতের যে দীর্ঘ-প্রতিভা ইউরোপের জীবনের সম্মুখে আশাইয়া তুলিয়াছেন তাহার কাঁধা ভারও সমাপ্ত হয় নাই।

ভারত তবে কি? ভারত ভূগোল-বিশেষ শুধু নহে, অজ্ঞাত দেশ সকলের মধ্যে একটা দেশমাত্র নহে। অধরের যুক্তভবন দিক দিয়া দেখিলে, আমরা বলিতে চাই, ভারত হইতেছে ভূভারতের মানবজাতির “কারণ পুরুষ”। তবে কারণ-জগতের কথা বলিয়াছে, উপনিষদে তাহাকেই নাম দিয়াছে বিজ্ঞানলোকে, পুরাণ অল্পপানে তাহাই অংশলোকে। ভারত জগৎ হইতেছে যেখানে সৃষ্টির আশ্রয়, আশ্রয়

বস্তুর প্রথম বীজ। তুলে যাঁহা কিছু প্রকাশ পাইবে বা প্রকাশ পাইতে পারে, তাহাদের সাধারণ মূলতত্ত্বগুলি যেখানে চিন্তামুখিতে আবির্ভূত তাহাই বিজ্ঞানলোক। ইহাকেই মহলোক বলে, এই জ্ঞত এখানকার তত্ত্ববস্তুগুলি অহরের প্রকাশ, এখানকার রূপায়ন বিশিষ্ট হইলেও খণ্ড ও সীমাবদ্ধ নহে, তাহাতে লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছে ব্রহ্মতত্ত্বের স্বভাব ও স্বরূপ। অন্তরের অসীমের অনিবেশের মধ্যে যখন সৃষ্টির প্রচারণার মাধ্যমে প্রথম চক্রম হইয়া উঠে, তখন দেখানো দেখা দেখা যেন কতকগুলি দৃশ্যপাকের কেন্দ্র, তত্ত্বতত্ত্বের উৎস—স্বাভাব্যমো-গোচর, বাহ্য তথা কতকগুলি মূল ভাবকে আশ্রয় করিয়া গোচর হইতে থাকে, সৃষ্টিয়া উঠিতে থাকে। এই সকল মূলভাব আগার বহুবিচিত্র নানাবিধ সম্ভাবনার ধারা বিকশিত করিয়া হস্তব্রহ্মতত্ত্বের সৃষ্টি করে। এবং পরে এই সম্ভাবনার ধারার কতকগুলি আরও স্পষ্ট, আরও মূর্ত, আরও জমাট হইতে হইতে পরিণত হয় এই বৃহৎ দুঃসমন ভগতে। ভগবানের অন্তরে সৃষ্টির যে মূল স্রষ্টাংশ, যে প্রথম কাঠামো বা নক্সা তাহাই হইতেই কারণ ব্রহ্ম, সোমানেই ব্রহ্ম ব্রহ্মণ্ড ও স্বর্গ, কারণ ভগতে ব্রহ্ম এই ব্রহ্মণ্ড ও স্বর্গকেই পেরে (plato) নাম দিয়াছেন “আইডিয়া” (Idea)।

এই “আইডিয়া” রাজী লইয়া যে দিব্যলোক তাহার প্রতীক হইতেছে ভারত। ভারত যেন ভগবানের কর্ণধারা—এখানেই তিনি পরীক্ষা করিতেছেন, পড়িয়া তুলিতেছেন যে সব মূলভাব, বীজশক্তি, পরে ভগবতের উপর ছড়াইয়া পড়িবে, মানবজাতির সকল সৃষ্টির কারণ হইবে। ভারতই যেন বেবধান—এখানেই সৃষ্টির নিয়ন্তা, বাস্তবের আধিপত্য। যে সব অস্বপ্নময় তাহারো জমাগ্রন্থ করিতেছেন, স্বপ্নাঙ্গ হইতে প্রথম প্রকাশের মধ্যে

নানিয়া মানিয়াছেন—এইখান হইতেই উগারা একে একে পরে জাগ্রত রূপ ধরিয়া গৃহিবীর এক এক দিকের অধিপতি হইয়া চলিয়াছেন। সৃষ্টিচক্রের যে নাতি তাহাই ভারত।

ভারত মহলোকস্থ চিন্তায় ভাবাবলীর বিগ্রহ। ভারতের সকল প্রকাশের মধ্যে তাই রহিয়াছে দেখি অনন্তের অসীমের চেতনা। ভারত বাহ্য কিছু সৃষ্টি করিয়াছে তাহারই মধ্যে আছে কেনন একটি বিশাল পরাকাষ্ঠা। মায় পরে কোন কিনিবক সে ছাড়িয়া দেয় নাই। কোন কিনিবক খাট করিয়া ক্ষুদ্র আকার দিয়া গড়ে নাই—প্রত্যেক কিনিবকের চূড়ান্ত ব্রহ্মত সে পৌছিতে চাহিয়াছে। গ্রীক খুঁজিয়াছে পরিমাপ—golden mean—কিন্তু অসীমের বোধ ভারতকে চালাইয়া লইয়াছে সকল সীমার বাহিরে—অগন্তের, অতাবিক্রের দিকে—শেষে পৌছিয়াও ভারত জিজ্ঞাসা করিয়াছে, ততাকিম? আর এই বিরাট বিপুলতার বোধ এত জাগ্রত ছিল বলিয়াই ভারত কোন এমটি মস্তার ধারাকে একান্ত করিয়া জড়াইয়া ধরিতে পারে নাই। সত্য মূলতঃ এক হইলেও তাহার প্রকাশ বহু—ভাই ত সে বলিয়াছে, বহুধা বসিয়া। ভারতের প্রতিষ্ঠানে তাই একটি স্রষ্টা বাজ বহু—বহুধা বৈচিত্র্য তাহার মধ্যে স্বচুত করিয়া তুলিয়াছে একটি বৃহৎ সত্য। কারণ পৃথক এই রকমেই অনন্তের বোধকে জুটু রাখিয়া তাহারই মধ্যে ফুটাইয়া ধরিয়াছে সান্তের লীলা। মহলোকে সৃষ্টির যে বীজলীলা তাগতে অনন্তের ও সান্তের মন্ত্রণার ও রূপের পূর্ণ নিয়ন ও সামঞ্জস্য। বৃহৎ জড় প্রতিষ্ঠানে যখন সৃষ্টির বেগ বাধা পড়িয়াছে তখনই যেখানে অনন্তের বোধ লোপ পাইরাছে। বস্তু সেখানে আপন স্পষ্ট নিরৈক্য বাক্তিময় রূপের মধ্যে নিবেশ ধরা দিয়াছে। ভারত বাস্তব অসত্য দেশের সৃষ্টিতে

পাই নাকি এই রকম একটি সীমার বাধন, রূপের বাধনা,—বৃহৎ সত্য, বাস্তব প্রতিষ্ঠানের পিছনে আঘতের একটি পরিণামের সমাপ্তির পতা? পরন্তু তাহার দৃষ্টিতে অধিকতর জাগ্রত তাত্ত্বিক বস্তু, আদিক ভারতের সকল দেহ-চেষ্টার মধ্যে রহিয়াছে বিদ্যেবের সম্ভা।

সুরেন্দ্রনাথ

—:—

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট। বদভক্ত নীতির প্রতিবাদ করে বিরাট সভার আয়োজন হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ সেই সভায় বিপুল শোভাযাত্রার অগ্রে অগ্রে ময়ূরপদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সহস্র সহস্র কণ্ঠ আকাশ বিদীর্ণ করিয়া ধ্বনি উঠিল—“বন্দে মাতরম্।”

বাংলার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা—সুরেন্দ্রনাথের আশ্রানে শ্রবণে ও শ্রদ্ধাতে সেবায সেদিন উদ্ভূত হইয়াছিল। দেশ-পীড়িতের গন্ধোজী সুরেন্দ্রনাথ মাধ্যম বহিয়া অন্তরে অন্তরে তুলান তুলিয়াছিলেন। বাংলার মরা গায়ে ছোয়ার আনিলেন সুরেন্দ্রনাথ। বাস্তবী ধর্ম হইল, সুরেন্দ্রনাথের আশীর্বাদে। সেই সুরেন্দ্রনাথের চরণে শ্রদ্ধাঙ্গা অর্পণে, কোটি কোটি ভূমি আজ উজ্জ্বল উজ্জ্বলিত হউক। সুরেন্দ্রনাথের শাসন, আমাদের জাতীয় জীবনে কত উজ্জ্বল তাহা আজ নির্ণয় করা দুঃস্বপ্ন। জাতি যদি থাকে, জাতির উপাসনামন্দিরে সুরেন্দ্রনাথের চরণে প্রথম পুষ্পাঞ্জলি সমর্পিত হইবে।

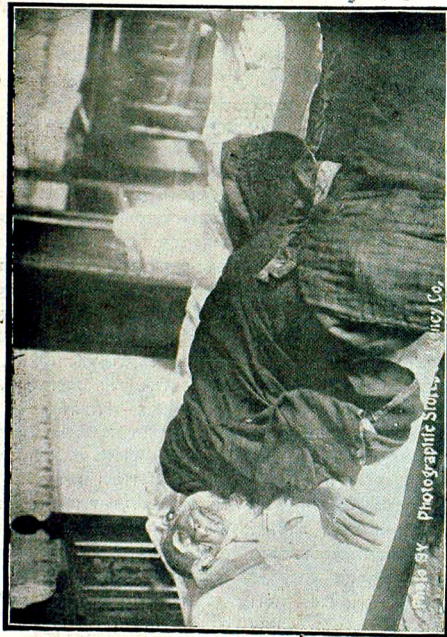
১৮৮০ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। জাতিপন্থনের মূল ভিত্তি—শিক্ষা, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত তাঁহাকে শিক্ষা দানের রত্নে দীক্ষা দেন। তখন লোকচক্ষে ইহা দুঃস্বপ্ন বলিয়া গণ্য হইয়াছিল।

সরকার বাহাদুরের আশ্রয়চ্যুত হইয়া, পতিত ঈশ্বর চক্রের অগ্রগণ্যে ২০০০ টাকার মানিয়ান কলেজের অধ্যাপক পদ, ভবিষ্যৎ জাতির নেতৃপুঙ্খ হওয়ার যে আশা হুচনা, তখন একথা কে ভাবিয়াছিল? এই অর্দ্ধ শতাব্দী মধ্যে দীর্ঘের দীর্ঘে সুরেন্দ্রনাথের ভাষ্যচক্র ক্রমোচ্চ উন্নীত হইয়াছে। বাধ্য তাঁর জীবন পতি বিবর্তিত হইয়াছে। কি দুঃস্বপ্ন শক্তি অলঙ্কার তাঁহাকে জয়ের পর জয় ছাড়া উড়াইয়া, গণনেতার উজ্জ্বলনে আনিয়া বসাইল, তাহা অস্বপ্নময় করিলে, বিশ্বাস্য হইতে হয়।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে—কলিকাতায় বিএ পাশ করিয়া বিবাহে মিডিল সাধারণ পরীক্ষা দিবার জন্ত তিনি গমন করেন। বয়সাম্বিকা হওয়া তাঁহাকে মিডিল সাধারণের কমিশনারগণ গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না, বিষয়মূল সুরেন্দ্রনাথের জীবন এই প্রথম বাধ্য সম্মুখীন হইল। তিনি নিঃসঙ্গ হইবার পাত্র নহেন, স্বীয় অদম্য উৎসাহবলে ইহাতে রুতকার্য্য হইয়াছিলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই প্রাণের আগুন তাঁহাতে সযত্ন উজ্জ্বল দেখা গিয়াছে। মরণের বিজীমিকা তাঁহাকে নিরাশ করিতে পারে নাই। মহাত্মাকে তিনি এক পক্ষ কাল পূর্বে বলিয়াছিলেন, আমি ২১ বৎসর

পর্ধ্যস্ত বাঁচিব—কাল-ব্যাপি উপেক্ষা করিয়া স্বজন পরিবারবর্গকে তাঁর পীড়ার সংবাদ প্রচার করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। দুইদিন আগে মঙ্গলবার পর্ধ্যস্ত

বলিয়া সাহসনা দিয়াছেন। মৃত্যু যেন তাঁর অনাহত জীবনযোতকে জ্বল করিতে পারে নাই। এমন দুর্জয় প্রাণশক্তি যুব অল্প বাদ্যালীর মধ্যেই পরিদৃষ্ট হয়।



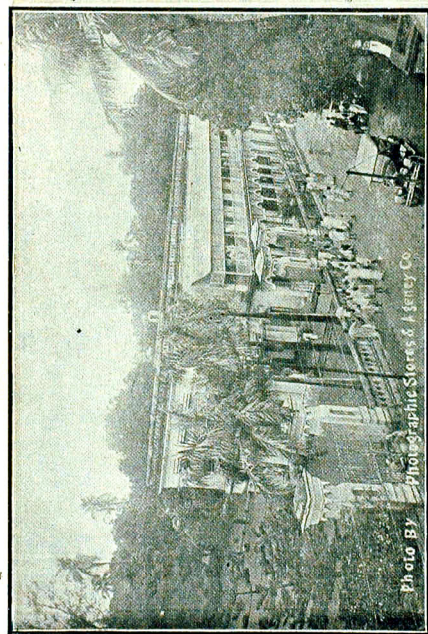
অস্তিত্ববায় হরেন্দ্রনাথ।

সংবাদ পরে সম্পাদকীয় মন্তব্য দিয়াছেন, মরণের কয়েক ঘণ্টা পূর্বে আত্মীয়-স্বজনের আতঙ্ক অকারণ

সিভিল সার্জিস প্রবীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি সিলেটে সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হন।

বিধাতার বিধান ছিল অক্ষরূপ, তাই তাঁর মত সত্যক হয় নাই। পরে তিনি আইন ব্যবসায়ী হওয়ার চেষ্টা পুরুষ সিংহ দারুণ অভিশাপে অভিযুক্ত হইয়া কষ্ট-ত্যাগে বাধা হন, পুরুষদ বজায় রাখার প্রাণবশ প্রয়াস

করেন, পুত্র অভিযোগের উপলক্ষ করিয়া সে হযোগে লাভও তিনি বঞ্চিত হন। পরিশেষে,



হরেন্দ্রনাথের বাটী (বারাকপুর)

অট্টম স্বল্পমূল্য প্রাণের জীবন্ত পরিচয়। কিন্তু ভাষ্যদায়ী বিন্দু থাকায়, তাঁর মে উদ্ভেদ দিক

শিক্ষক জীবন গ্রহণ করিয়া, বীরে বীরে হরেন্দ্রনাথ অধিতার রাষ্ট্রগুরু এমন কি জনগণসেবিত, ভারতের

মুক্তিহীন রাজসম্মান পথান্ত লাভ করিয়াছিলেন। অহরোহে ফ্রি চার্চের ইংরাজী অধ্যাপক পদে যোগদান আজ অকস্মাৎ তিনি দিব্যদামে গমন করিলেন, করেন। স্বাধীনচিত্ত হুরেন্দ্রনাথ ১৮৮২ খ্রষ্টাব্দে ১০০ মরণকালে তাঁর বয়স ৭৭ বৎসর হইয়াছিল। শতজন ছাত্র পূর্ণ, একটা ক্ষুদ্র বিজ্ঞানভবনের ভার লইয়া



শ্রীমতী-পুণ্ডরিক

তিনি ১৮৭৯ খ্রষ্টাব্দে শিক্কর জীবন গ্রহণ করেন, জন্মে ইহাকে বিপণ্য কলমে পরিণত করেন। এবং ১৮৮১ খ্রষ্টাব্দে, প্রধান অধ্যাপক অগ্রদূতের এই কথের তাঁর শ্রবণ ও অব্যাবাহারের অন্ত ছিল না,

সকল রকম বাধার মাধ্যমে পা দিয়াই তিনি ইহা হুরেন্দ্রনাথ তদ্রূপ বাধার পর বাধা বিদলিত করিয়া কাম্বোজীবন প্রকাশ করিয়া, অলস শুরু হুম্পন্ন করেন।

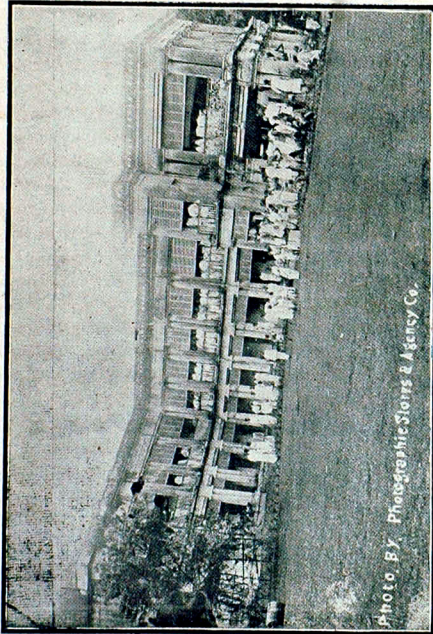
ঘরে আগুন লাগিলে, অহঙ্ক পবনে, ইহা বাংলার প্রাণকে কণ্ঠচাকলো নৃত্যময় করিয়া



শ্রীমতী

যেমন লক্ষ দিয়া, ঘরের পর ঘর দড় করে, বিবৃত ভুলিলেন। ১৮৭৯ খ্রষ্টাব্দে পরলোকগত আনন্দ অরিনিধা আকাশ চুপনে উর্দ্ধ উরফন বের, যোহন বোধ প্রভৃতি বাংলার কয়েকজন কৃতী

সন্তান মিলিয়া “ভারত সভা” স্থাপন করেন। এই হয় নাই। এই ভারত সভা উপলক্ষ্য করিয়া সভার উদ্বোধন দিনও স্থগিত দিন নয়। এই গবর্ণমেন্টের প্রতি কর্ণের তীব্র সমালোচনা দিনেই তাঁর একমাত্র পুত্র মৃত্যুশয্যে পতিত হয়, স্বরেন্দ্রনাথ এমন নিপুণভাবে করিতে আরও করিলেন।



স্বরেন্দ্রনাথের মহাপ্রাণে তাঁর বাটতে সমবেত জনগণ।

তিনি ইহা ক্রক্কেপ না আনিয়া যথারীতি পৌরহিত্য বৎ বংশানুক্রম করিলেন। তখন কংগ্রেসের বঙ্গ সঙ্কল সংবাদ পত্র, “বেঙ্গলী” তখনও সাম্প্রদায়িক ছিল।

স্বরেন্দ্রনাথই ইহাকে দৈনিক পরিণত করেন, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইলবার্ট বিল লইয়া মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের প্রাথমিক স্রোতের ইহাই সূচনা। এই সময়েই জটিল নরিশের নিকট, কোন এক সম্ভাষ পরিবারের মধ্যে আত্ম-কলঙ্কের মোকদ্দমা চলিতেছিল। তিনি দেব বিগ্রহ আদালতে উপস্থিত করার আদেশ জারি করেন। হিন্দু-জাতি এই আদেশ প্রত্যাহারের আন্দোলন উপস্থিত করে, এই সম্পর্কে স্বরেন্দ্রনাথ ‘বেঙ্গলী’তে তীব্র প্রতিবাদ বাহির করেন। ইহাতে আদালতের অপমান করিয়াছেন, এই অপরাধ সম্প্রাণ হওয়ায় তিনি ছুইমাসে বিনাশ্রমে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। দেশের কাজে ত্যাগের দৃষ্টান্ত একেবারে ছিল না বলিলেই হয়। স্বরেন্দ্রনাথের কারাবরণে উৎসাহের আগুন জ্বলিল, আদালতস্থল লোকে লোকারণ্য হইল, স্বরেন্দ্রনাথের নাম লইয়া ঘরে ঘরে জয়ধ্বনি উঠিল। এই ঘটনা হইতেই জনসাধারণ তাহাকে নেতৃত্বদে বরণ করিয়া লইল।

রাষ্ট্র-চর্চা তিনি নৈতিক জীবনের প্রধান অঙ্গ রূপেই দেখিতেন, এতদসমক্ষে তিনি বলিয়া গিয়াছেন :-

“Bear this in mind that in the great work of the political regeneration of our country, upon which we are all engaged, the foundation must be based broad and deep upon the eternal principles of morality. We ask you to incur self-sacrifice, we ask you to give up your personal interests, we ask you to abandon your comforts and personal conveniences at the altar of your

country's political deliverance. The keynote of politics is self-sacrifice and the abandonment of personal interests, personal considerations and motives of personal convenience

এই পরম নীতির অঙ্গসংগ করিয়াই, স্বরেন্দ্রনাথ দেশভক্তির আদর্শ অধিকার করিয়াছিলেন, দেশের প্রাণ হইয়াছিলেন। লর্ড কর্জনের বঙ্গভঙ্গ রূপ settled factকে ভাঙ্গিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন জীবন-পণ বাধ্যন্যকৈ মৃত্যু পণ হইতে দিরাইয়াছে। ইমামদীন সাহেবের নিকট লাঞ্চিত হইয়া স্বরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে যেদিন নগরকে উচ্ছারিত হইল—“বন্দে-মাতরম্” তরুণ প্রাণে সেদিন কি বিজ্ঞান প্রবাহ বহিয়াছিল, সে অস্বকৃতি আমরা ভুলি নাই। বঙ্গ ভঙ্গের পর, আর একটা বড় আন্দোলন স্রোত বহিল, ত্যাগ ও শ্রমের ইয়ত্তা নাই, তবুও আমাদের দাবীকে এক বিমুদ্রিত করিতে পারি নাই। কিন্তু বালায় স্বরেন্দ্রনাথ যে জিদ ধরিয়াছিলেন, দেশের সঙ্কল ঘটনা অস্বকৃলে পরিচালিত করিয়া—সে জিদ রক্ষা করিয়াছেন। মিটে-মালি ও মটে-ও-চেস্-ফোর্ডের শাসন সংস্কার আদায় করিয়া, বিজয়ী বীরের মত তিনি ঘরে ফিরিয়াছিলেন।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দ হইতে তাঁর আজীবন শ্রমের সাক্ষ্য বিকাশ দেখা গিয়াছিল। মর্টেও সাহেবের ভারত ভ্রমণ কালেই, স্বরেন্দ্রনাথ তাঁর সহিত আলাপে বৃক্ষিয়ারাজিলেন, এ জীবনে যাহা পাইবেন, তার অধিক আশা ছাড়া, তাই, জাতির অগ্রস্থান ছাড়িয়া তিনি কিছু ইচ্ছা করেন। নূতন শাসন সংস্কারের তাজ মাথায় পড়িয়া, বাংলার মস্তিষ্কের গভীর অধিকার করিলেন। জয় লক্ষীর এই শেষদান তাঁর বড় প্রিয় ছিল, তিনি এই সম্পদটুকু রক্ষা করিয়া

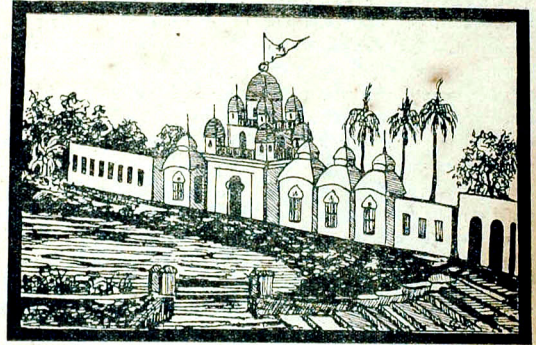
বাহালীকে ধন করার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, বাহালীকে ইহাতে পরিতুষ্ট না দেখিয়া তিনি বড় বিচলিত হইতেন। তাঁর চিন্ত বড় বিক্ষুব্ধ হইত। ১২২০ খৃষ্টাব্দ হইতে, তাঁর শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার উপরে আর একটা অদমনীয় শক্তি শ্রোতের আবির্ভাবে তিনি স্নান হইয়া পড়িতেছিলেন। ১২২৩ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে পুনঃ-নির্বাচনে পরাস্ত হইয়া তাঁর ক্ষোভ সমস্ত বাহালীকে ব্যথিত করিয়াছিল। হুরেঙ্গনাথের প্রতি জাতির অকৃত্রিম শ্রদ্ধা সমাকরিত হয় নাই। কর্তব্য চিরদিন কঠোর মূর্তিতেই দেখা দেয়, যে স্থান ও গৌরব তাঁর স্থায়া প্রাপ্য, শেষ বয়সে হুরেঙ্গনাথ তাহা পান নাই। প্রতি পক্ষেই তাই তিনি কটী দেখিতেন, জাতির অগ্রগতিটার উপর তিনি প্রত্যহীন হইয়াছিলেন।

মৃত্যু-দেবতার আগমন সংবাদ অন্তরাষ্ট্রায় পৌছিলে, তাঁর আত্মপ্রত্যয়ভাৱ জাতিসাদনার

নীতি দেশপ্রাণে বাহাতে পুনঃ সঞ্চারিত হয়, তাহার জন্য উদ্ভুদ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি কণ্ঠক্ষেত্রে সিংহদৰ্পে আগাইয়াছিলেন। কিন্তু ভগবানের বিধান—মাহুয়ের দুর্কোধ্য, অপ্রত্যাশিত মৃত্যুবাণ হুরেঙ্গনাথকে কণ্ঠক্ষেত্রে হইতে অপসারিত করিল, বাহালীর মাথার তাজ ক্রমি চূষন করিল, পাহাড়ের চূড়া খসিল, ইঙ্গপাতের ন্যায় অকস্মাৎ এই দুর্ঘটনায় বাহালী জাতি আজ কিংকর্তব্যবিমূঢ়, দেশবন্ধুর তিরোধানের পর, হুরেঙ্গনাথের প্রস্থান, রাষ্ট্রক্ষেত্রে মহা পরিবর্তনের ঘটনা—কে জানে, বাহালীর ঘন যটচ্ছন্ন ভাগ্য গগনে চক্ষু স্বলসিয়া যে বিজ্ঞান চমক তাহা আসন্ন বজ্রপাতের লক্ষণ কি না? তবে বাংলার যে আজ স্বদিন নহে, ইহা অবধারিত—এ দুর্দিন যে শীঘ্র দূর হইবে না, ইহাও সত্য কথা, ভগবান রক্ষাকর্তা—এই তরঙ্গা—অনন্ত ধাম হইতে হুরেঙ্গনাথ আমাদের আশীর্বাদ করুন এই প্রার্থনা।

ও শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

Shri. Shree
18 June



১ম বর্ষ,
৫ম সংখ্যা }

প্রবর্তক

{ ভাদ্র,
১৩৩২

ভবিষ্যৎ

—৪:—

কলিকাতা ৬৬ নং বাণিকতলা স্ট্রিট, প্রকাশ পেস হইতে শ্রীকীরোরচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২২৪ খৃষ্টাব্দ বাঁবার বড় ভূবৎসর। শরতের শিকিত তরুণমঃলে রাষ্ট্র আন্দোলনের যে আকাশ ঘোরশূন্য নিখল, গমত দাঁড়িরা প্রাকলের বহিঃক্ষেপে পূর্ব হয় নাই, গচ্ছিববৎসের নানা স্থান হইতে ইহার মধ্যেই ছুঁড়িবনার দাঁড়িনিঃখাণ্ড মাড়া ভুলিয়াছে, ববীর অগাব বাংলার চতুর্দিকেই। ব্যাদিগণিত ছুঁড়িয়া জাতি অরাভাবের চিত্তার বিশ্বতামর; আদ্য ও উৎসাহের প্রাদ্যনিঃখাণ্ড আদিতেছে।

শিকিত তরুণমঃলে রাষ্ট্র আন্দোলনের যে আকাশ ঘোরশূন্য নিখল, গমত দাঁড়িরা প্রাকলের বহিঃক্ষেপে পূর্ব হয় নাই, গচ্ছিববৎসের নানা স্থান হইতে ইহার মধ্যেই ছুঁড়িবনার দাঁড়িনিঃখাণ্ড মাড়া ভুলিয়াছে, ববীর অগাব বাংলার চতুর্দিকেই। ব্যাদিগণিত ছুঁড়িয়া জাতি অরাভাবের চিত্তার বিশ্বতামর; আদ্য ও উৎসাহের প্রাদ্যনিঃখাণ্ড আদিতেছে।

অঙ্ক উত্তেজনা বিপক্ষে জীবন ছুটায়, জ্বল

ধন ধরা পড়ে, জানি তখন যায় যায়, ফিরিয়া
সুখ ধরা সাধো ফুগায় না, এমন করিয়া সকল
কাজেই শক্তির অপব্যয় হইতেছে, আমরা সেইলিয়া
হইলাম, বাস্তবিতা বাধাই রহিল, উত্তরান হইল
না, জন্মের দায়ে নিলামে চড়িল মায়া কারা!
—তোমার অন্ধ হৃদয়ে বন্ধ বিপদী হইত।

বাতালী ভাবপ্রবণ মায়ার মাহুষ, বিনাইয়া
বিনাইয়া আপনাকে ঘিরিয়াই ঘর বাঁধে, স্বভেদ
বেগ সামলাইতে পারে না, পল্কা স্ত্রী উন্টাইয়া
পড়ে। রাষ্ট্রগঠন, সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম সকল
প্রতিষ্ঠানের মূলই যুগ-ধরা—হিম্মতির মত
সুপ্রতিষ্ঠিত নয়।

কাক দোষ নয়, আমরা “পরাধ মণিলেই”
ফুঁরিয়া মরি। কৰ্মক্ষেত্রের আব্বাওয়াই এই।
অবস্থার উপরে উঠিয়া দাঁড়াইবার পথ নাই।
সমালোচক অনেক, কিন্তু কেহ কৰ্মপট্টা
দেখাইয়া পথের নির্দেশ দেয় না। গোটা ঘাঁড়ি
জন্মের মত, আব্বাবনের পর আব্বাবন জাতিকে
নিঃশেষ করিল, লাফলোর স্বর্ণ ক্রীড়ি মাথায়
পরিয়া, পুষ্পাখ্য আর হয় না—কি ঘোর কাল
মহানিশা!

চিত্তরঞ্জনের চিতা—জাতির শ্মশানপট্ট।
সংস্কারের আয়োজন করিলেন দেশের সর্বপ্রধান
প্রয়োহিত, মহাত্মা গান্ধী। কৰ্মজীবনের পরিণাম
কোথায় আশিয়া শৌছিলাম, তাহা বুদ্ধিতে আর
বাকী নাই। কিন্তু না বুঝাই ভাল, বুঝিলে বুক
ফাটে, চক্ষু অশ্রুধর হয়। দেশকে মা বশিয়া যে
ভালবাসে, বিপদ তার পদে পদে, পৃথিবীতে তার
স্থান নাই, হয় মুঠা না হয় নির্দোষ। দোষ
কাক নয়, আবার বলি, আমরা “পরাধ মণিলেই”
ফুঁরিয়া মরি।

কিন্তু দেশের প্রতি প্রেম যে মুঠে ঈশ্বরসাদনার

সর্বপ্রধান অঙ্গ! যুগধর্ম কঠোর জরথার। জাতি
নাভায়া। মৃৎ, ইতর, দরিদ্র দেশের কোটি কোটি
ভাই বোনের সেবা, নারায়ণের পূজা, ইহা ভারতের
ধর্ম, এই সাধনার পথ আজ বিরম্ভুল, আমরা
আজ রাষ্ট্র চাই না, সাম্রাজ্য চাই না, সম্পদ
চাই না, স্বাধীন চাই না, চাই এই সেবার্ধ,
ইহাতে জীবনের যদি উদ্যম ভগ্ন হয়, তবে এই
আহার-নিদ্রা-মৈথুননিবৃত্ত পত্তজীবনের ভার
বহিয়া লাভ কি? কে বুঝিবে এই মর্ধবাপার
বাখা!

দেশসবা বণিতে—পান্ডিত্য শিক্ষাপ্রতির
অস্বকরণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ন্যূন পত্তন নয়,
আধুনিক অন্তঃসারশূন্য সংস্কার জলুয়ে জলুয়ে
জাতির ভ্রমবেশ সেবার অঙ্গ নয়, দ্বিধের ছাং-
বিসোচনে দানছত্র খুলিয়া বসাত সেবার্ধ নয়,
সেবার ইচ্ছনে জাতির আত্মাকে উদ্ধৃত্ত করিতে
হইবে। মন্দিরে মন্দিরে সাধক যেমন করিয়া
দেবসেবার দ্বারা জড় বিগ্রহে চেতনার স্ফার
করিত, তেমনি করিয়া এই ত্রিশকোটি আত্মবিশ্বত
নরকফলে মুক্তশ্রীবনী ছিটাইয়া দিতে হইবে।
জাতির আত্মা যদি জাগে, তবেই তার পশু
বৃত্তিবে, ব্যাধির সহিত সে নিজেই সংগ্রাম করিবে,
সবল হুহ শরীর নাড়ের স্রুজিক বিহার দলে
দলে পরামর্শদাতার অভিযানের প্রয়োজন হইবে না।
দারিদ্র্যের কষাঘাত—মহাশয়ের অপমান বোঝেই,
জাতি উচ্চশিরে উঠিয়া দাঁড়াইবে। এই বিশাল
জাতির কানে কানে যুক্তি প্রদান দিয়া ইহাকে
জাগাইয়া তোলায় ব্যবস্থা—একপ্রকার হুজুগ,
কাল না থাকিলে ঐ ভাজার মত নিরর্থক—
ইহাতেও আমরা সেইলিয়া হইক, শক্তি ও শ্রমের
অপচয় করিব। আজ এটা সেটা করিয়া সেবার
মত অবকাশ আর নাই, প্রাণ আশিয়া টোঁটের

উগায় বাসা বাঁধিয়াছে, যে কোন মুহুর্তে মুঠা-
আশা আশুলক নয়। আমরা মরিব না, মরিতে
পারি না, এসব ভাবপ্রবণ মাহুষের অসার
কল্পনা, ধরাপট্ট হইতে কত দেশ, কত জাতি
নিশ্চিহ্ন হইয়াছে, তাহার ইচ্ছা নাই, আমাদের
জীবনগতির মততা বিচলিততার সহিত লক্ষ্য কর,
দেখিবে শটন: শটন: মরণের দিকেই আমরা
যাত্রা করিয়াছি—ঈশ্বরের দোহাই দিয়া টিকিয়া
থাকার আশা ছুঁরাণা, বগদীখরের নিকট জীবন মুঠা
ভুল, আমাদের মত অসংখ্য জাতি তিনি এক
নিমিষে স্বধন করেন, কামনার কৃতজ্ঞগণ—পত্তন
বৃত্তি, করণার ভিগারী যে তার মত ভীক জীবন
সংগ্রামে কোনদিন জয়ী হয় না, ইহা অব্যাহিত
জানিও।

বাঁচিতে চাপ, বাঁচার মত প্রাণ লইয়া
দাঁড়াও, ক্ষুদ্র প্রাণ, মুঠার আব্বতে চুঁচান বাইয়া
এক মুহুর্তেই শেষ হইবে, মহাপ্রাণ উদ্ধৃত্ত কর,
প্রাণে প্রাণে মিলাইয়া সমষ্টি-প্রাণের আশ্রয়
হউক, সমষ্টিতে সমষ্টিতে জাতির প্রাণ আশিয়া
উঠুক। বাঁচিতে হয়, তোমার আমার জীবনরক্ষার
উজ্জ্বলি ছাড়িয়া দাও, একটা জাতি বাহাতে
বাঁচে—সেই আয়োজন কর, জীবনের ধর্ম রক্ষায়
অক্ষম যে, তার ঈশ্বরহুকৃতি বিচারগত রোগীও
যেথায় বলিয়া জানিও। মরণের পূর্বে—মৃতিক-
বৃত্তি এমন বহুধি অসার কল্পনায় মজিয়া য়ে।
সবল হুহ মৃত্তিক আর আমাদের নাই। শোণিত-
হীন শুক কঙ্কাল নিজের মাথা নিজেই বাঁধিয়াছে,
কংস্কদের মত উদ্বেজহীন নৃত্য,—এই বীভৎশ শ্মশান-
দৃশ্য বড় মর্মান্বিত—উৎসরের লক্ষণ।

জীবনের মোড় ফিরাও—ভগবানের প্রতীকার
আত্মস্বার্থী হইও না। সেদিন যেমন ভূনিগাম,
কোন এক দেবমন্দিরে, বাতুল সাধক দ্বিধাভাগ্য

বিগ্রহহুকৃতির চরণে ছিন্ন করিয়া হত্যা নিরাজে,
দেবতা দ্বিধার পুন: সংযোজন না করিলে,
ভূনিগামা সে ছাড়িবে না। ঈশ্বর জগৎ রচনা
করিয়াছেন, ম্যাক্সিক দেখাইবার জ্ঞান নয়। তাঁর
নিবলস স্বকল্পশক্তি এক মুহুর্তে কোথাও ব্যর্থ
নয়। তিনি নির্মম, ছন্দহীন আব্বদার তাঁর কর্ণে
পৌছায় না। তাঁকে শ্রবণ কর, তাঁর উপাসনা
কর, সে শুধু ঈশ্বরসাদিহা লাভের উপায় নাকি,
এই বুঝিয়া ভগবানের অতিথি অহুকৃতিগ্রাহ্য হইলে,
তোমার ক্ষুদ্র বৃত্তিবে, অনন্ত শক্তির আধার
হইবে। জীবনরক্ষার ইহা মূল যুক্তি, কিন্তু তাঁর
পরিচয় নামের অপব্যহার করিয়া, অলসতার
অক্ষমতাকে প্রশ্রয় দিও না। হোমার ক্ষুদ্রশক্তিকে
উদাত্ত কর, তোমার প্রাণ মন হৃদয় সমুদয় বৃত্তি
বিস্তৃত করিয়া ধর, নিজেকে বাড়িয়া দাও।
ঈশ্বরের দান সর্ব জীবের কলাপে সমানভাবে
অবস্থিত—তোমার আমার তার এমন কোন
বৈশিষ্ট্য নাই—তিনি কোথায় ধরা দেন না।
তামস নির্ভীতার ঈশ্বরের বরণ লাভ কোন যুগে
হয় নাই, আশ্রয় হইবে না, চাই শ্রম, চাই উৎসাহ,
চাই উদ্যত জীবন।

তোমার ঐ কৃষিক্ষেত্র—তোমার সম্পদ, যখন
ভূমি উহা অধিকারের জন্ত প্রাণপণে হস্ত প্রসারিত
কর—তখনই। নতুবা ঈশ্বরের সৃষ্টি যোগ্যজনের
হস্ত সমর্পিত হইবে, সবাই তাঁর সম্মান, ইন্দোয়ী
জীবনেই জগতের সম্রাট অধিক অধিকার অর্পণ
করেন, আজ নিজ বাতুলপে পরবাসী হইয়া আজ,
এই বোধ তোমার অতীতের স্মৃতিমাত্র, বর্তমানে
উহার কোনই স্মৃতা নাই, একদিন ছিল আজ
আম নাই, এখন ভূমি পরবাসী। যদি দেশ চাপ,
জাতি চাপ, ধন চাপ, ঐর্ষ্যা চাপ, সাম্রাজ্য
চাপ, তবে দাও দাও দাও দাও দাও দাও

বাড়ান যেমন হাঙ্গামা, ভগবানের নিকট বাক্তরীণও তেমনি লজ্জার কথা—তুমি ভ্রাতা আত্ম-বিস্তৃত বলিয়া এই লম্বুহায ক্ষুদ্রতার তোমার মাথা নত হয় না, ভিক্ষুক ধনীর দ্বারের গাছনা সহিয়াও হাত পাতে। হীনতার যে ঢাকা পড়িয়াছে, স্বর্গবশে মাতৃ পতংগ আচরণ করে।

এ জাতির সূচনা-বিষয় এই বিস্তৃতি। জাতিকে নিরাময় করার একমাত্র উপায়, এ বিস্তৃতির মূল উপভাষিয়া দেওয়া। জাতি যে মূর্খ, জাতি যে পীড়িত মূর্খ, জাতিকে অনশনে ক্রিষ্ট, তাহার গৌণ দৃশ্য হইয়াই চিকিৎসার ব্যবস্থা হইবে; নিদান দিয়া প্রতীকার না হইলে পরিণাম নাই।

এই প্রতীকার করিতে উদ্যোগী বাঙালী তাহারও আর উপায়হীন হইতেছে। গৌণ ব্যবস্থার অপচয়, কিন্তু বাধ্য যে পথ রুদ্ধ হয় না। অপঘর না করিয়া, মধ্য লক্ষ্যে পৌছিতে গিয়াই আমরা ঘেঁষিতেছি—অকারণ বাধার সৃষ্টি। নিকপায় বলিয়া তবুও বসিয়া পড়াই হইবে না। প্রাণবলি দিয়াও আগাইতে হইবে। কিন্তু তাহাও তো কষ্ট! অনেকের মতে, এ ক্ষয় জয়ের সূচনা, কিন্তু ক্ষয়ে জীবন যে অবসর হয়, ইহা অস্বীকার করার উপায় নাই।

একটা বিপুল জাতির উৎসর্গের পথ যোগ্য করিয়া দয়ার অভিজ্ঞতা অর্জনের দ্বার, একদল কর্মীকে জাতির সর্ববিধ কর্মের মূলতত্ত্ব অবধান করিতে হয়। তাই বাঙালী জাতীয় জীবন-প্রবাহের মূলে মূলে আত্মদান করিয়া, ইহার সর্বধানিকে অর্পণ করিয়া তেজস্বী কোনদিন ক্লমপত্নী করে নাই। আজ বিপদ তাই তাহাদের বিহিয়া দরিদ্রাচ্ছে—অতীতের সংস্কার শেষ করিয়া, নব নির্মাণের অগ্রদূত উড়াইয়া, এই যে সে দিন, তরুণ বাংলা আশার উৎসর্গে কর্মক্ষেত্রে আত্মদান হইল, কোন্ অতিসম্প্রতি আবার তাহাদের মেরুদণ্ড ডাঙ্গিল, কর্মক্ষেত্রে রক্ত হইল। অতীতের মোহ কি তাহারা নিঃশেষে পরিত্যাগ করিয়া এই শোভাযাত্রায় যোগ দান করে নাই? কে জানে! এই যৌবনের বিপদের দিনে চতুর্দিকে যে রক্তকার ঘনাইয়াছে, তাহার মধ্যে কোন আলোই দেখা যায় না, কাজেই এক্ষণে আমাদের নীরবই থাকিতে হয়।

পা কিন্তু চলা বন্ধ করিবে না, বাধা যতই গুরুতর হউক, ভিতরের স্পন্দিতা লইয়া আমাদের অগ্রগতির হইতে হইবে।

আজ কাজ, বিকল্পতার মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া সংস্কারের আবর্ত দেশে উত্তেজনার আওতা জালি নয়। কাজ, জাতির সেবা। দরিদ্রের সেবা, —দারিদ্র্যাজর্জরিত বঙ্গপুত্রের উৎসাহের হোম-কুণ্ড জালিয়া দেওয়া; অশুভ জাতির সেবা, সমাজের সর্বস্তরের তাহাদের আদিদান দেওয়ার ব্যবস্থা করা; আত্মবিস্তৃত জাতির স্বর্ণ চেনতার দিগ্‌ময় যদি স্বাক্ষর তুলিতে পার, তবে সত্যই বাংলায় শাশ্বতপূর্ণ অনাহত কর্মক্ষেত্রের বজা বহিতে পারে, কিন্তু করিবে কে?

বাংলার হাজার চিত্তরঞ্জন চাই। নেতার আদান অলঙ্ঘ্য করিবার চক্র নয়, বাংলায় নেতৃত্বের আর প্রয়োজন নাই। চাই মৈত্রী আর ভ্রাতৃত্বের অমর বন্ধন। চিত্তরঞ্জনের মত কিন্তু দেশকর্মীকে সর্বভাগীয়া মর্যাদা হইতে হইবে। বাংলা কংগ্রেস চাচ্ছে না, কনফারেন্স চাচ্ছে না, বিপদ চাচ্ছে না। বাংলা চাচ্ছে, জাতির স্বাধিকার সংরক্ষণ করিতে, বাঙালী চাচ্ছে স্বৈরচেতনার উদ্ধৃত্ত হইতে, বাংলা চাচ্ছে নৈতিক নয়, সামাজিক নয়, রাষ্ট্রীয় নয়, বৈদ্যুতিক মধ্যপ্রবাহের প্রাধান্য, কে এই স্রবধনী-তরঙ্গ মাথায় বহিয়া, বাংলার পল্লীতে পল্লীতে তুদান তুলিবে? শতচিত্তবহনের সমীক্ষিত। সমগ্র

দেশ, আর্থবল্লিত চিড়ে গৃহিনী শৃগালের মত, লইয়া দলদলি নাই, স্বার্থের আকর্ষণে অটনক্য পুরাতনের শব্দে ছিঁড়িয়া বাইবার দ্বার কোলাহল করিতে থাকুক, নবোদিত বাল্যকণরঞ্জিত নব জগদ্ব্যবহারী প্রতিমা বিহীন, এক হাজার চিত্তরঞ্জন একতার পূর্ণপত্র বিগ্রহ স্বজন জাতির মুখা লক্ষ্যে—আমার অমর বন্ধনী হৃদয় করিয়া, সমুদ্র কর্তে মাতৃবন্দনা আরম্ভ করুক। সাড়ে চারেকটা আত্মবিস্তৃত ভাইবোনের দ্বন্দ্ব নবাবরণে এই হাজার মাতৃভক্ত সন্তানের কর্তৃক্সনিতে গুলিয়া উঠিবে। শক্তি সংঘত কর, বিপুলতার মোহ বিদূষিত করিয়া সংক্ষিপ্ত হও, বঙ্গপুত্র জীবনদমীর প্রিয়ার বর্ণে জাতির তম: বিদূষিত হইবে। এ বাংলা নিশা প্রভাতের প্রতীক্ষায় যদি তোমরা বৃণা কোলাহলে ব্যাপ্ত থাক, রাত্রি প্রভাত হইবে, কিন্তু দিবসের আলোর তোমাদের অন্তিম আর পুঞ্জি পাওয়া যাইবে না, দেখিবে অন্ধকারে অন্ধকারেই তোমরা নিশ্চিহ্ন হইয়াছ।

ভারত আমাদের ভগবান, ধর্ম আমাদের প্রাণ, জাতির জীবন এই সাধনার উপরই নির্ভর করে। অস্বাভাবিক দৃষ্টি, হিংসাবিষমবর্জিত দ্বন্দ্ব সেরায় উদ্বুদ্ধ কর, বিশ্ব হিমালয়ের মত বিপুলকায় হইলেও মাথা নত করিবে সন্মুখে, পথ দিবে সাগরে, ভারতের সিঁদে এই মহাতপস্তার উপরেই নির্ভর করে।

এখানে মতবিরোধ নাই, নেতৃত্বের আদান

নইয়া দলদলি নাই, স্বার্থের আকর্ষণে অটনক্য নাই, হাজার প্রাণ একস্রোত বাধার নূতন দলের আত্মদান স্বার্থক ব্যর্থ হইতে কি ইচ্ছা হইবে না? একতার পূর্ণপত্র বিগ্রহ স্বজন জাতির মুখা লক্ষ্যে হউক, জাতি সেই এক্যমুখির উপাসনা করিয়া সিঁদে হইবে।

ইহার দ্বন্দ্ব যে সাধনা, তাহা দার্শনিক ওজর রহস্যময় নয়, বিস্তৃত জীবন ক্ষেত্রে বাহা সহজেই ধরা যায়, সেই রূপ ব্যবস্থাই শিরোধার্য। নিঃস্বার্থ ভোগবতপ্রাণ জীবন গঠনের দ্বন্দ্ব, আমরা বিশ্বের উৎকর্ষ সাধন হেতু ধ্যানের, ক্ষয়তত্ত্বের জন্য নামের, প্রাণলোভনের জন্য সংস্কার, আর কাশ্যসিঁদে জন্য নিদ্রার কর্মের ব্যবস্থাই প্রশস্ত মনে করি।

প্রত্যেক পুরুষ অথবা নারী, সকলে সক্ষম প্রতিদিন আহাতির মত প্রয়োজন বোধে যদি ধ্যান করিত, ভগবানের নাম করে, প্রাণকে প্রাকৃত ভোগের ক্ষেত্রে হইতে উঠাইয়া রাখে, আর নিঃস্বার্থ কর্মে জীবন ঢালিয়া দেয়, তবে অচিরে আমরা বাংলায় একটা নূতন ভাগবত জাতির আত্মদান অবস্থানী দেখিব। এই সহজ কাজেও যদি আমরা একবৎসর ব্রতধারীর মত আত্মনিয়োগ না করি, তবে চকলপ্রকৃতি পতঙ্গপুত্ৰপরাধ আমরা—আমাদের হৃদ্যপার আর অবধি থাকিবে না।

সৃষ্টি-সাধনা

—:—:—

বড় দুর্দিন আজ আমাদের। কাল-রূপী ধ্বংস-শক্তি চাপে বাংলার বুকের ধন আজ ছরছাড়া, মর্থ হিঁড়িয়া অক্ষ নির্গত হইতেছে, মায়ের সেহ-দ্রাণেয়া অস্ত্রহানে অস্বহিত, প্রাসবিত অথবা অবরুদ্ধ, দেশের জীবন-মণি জ্যোতি-প্রদীপগুলি দেবতার শাণে অব-সান হইয়া যাইতেছে, 'একে একে নিঃশিচ্ছে দেউটা'—এ দক্ষিণ চরবন্ধার আজ আশার গান কে গায়ে রে! কে গাহিতে পারে? অস্ত্রকারে পথছাড়া জাতিকে কে পথ দেখায়? কে দেখাতে পারে? দ্বন্দ্বের আবরণে বতই উত্তরনার ঢেউ জাতি-দ্বন্দ্বয়ে চাক্কোর দোতান ফুলক, ভবিষ্যৎ উজ্জল আশার হলেও, বর্তমানের নিবিড় তিমির-রাশি ভেদ করিয়া তাহার বন্ধ, হৃৎপিণ্ড, সত্য রূপ এখনও বিচ্ছিন্ন দেখা যায় না, সহ্যই নৈরাশ্রময়, তলাইয়াও তল খুঁজিয়া পাওয়া বৃষ্টি হ্রাসাধা। তবুও ক্রাণ ধাকিতে ত আশা ও ইচ্ছা ছাড়া চলে না, কাঠার কুঙ্কুমাধা তপস্তার সহায়েই জাতিকে আজ আত্মতুর্পী রক্ষায় সত্য উজ্জত হইয়া থাকিতে হইবে, সাময়িক পরাজয়ে বর্ষভার বারষার অভিজুত হইলেও, নৈরাশ্রে স্কন্ধ, কর্ণে নিঃসঙ্গাধ ও নিরুদ্ভব হইলে চমকিবে না—দুর্গম পথেই আজ জাতীয়তার অভিযান, এ সময়ে পুর দীর্ঘ, সত্যক জ্ঞানে, চিরজাগৃত, স্থির ও অপগলক দৃষ্টির প্রহরা বসাইয়া, দৃঢ় ও অক্ষপিত পদে অগ্র-সর হইতে হইবে। চক্ষুর তারকা যেন অকালে আলোকে না ঘুসায়, ক্ষেত্র আঙন যেন প্রবলতম বাহাত্তেও স্রিমদাণ গিমিত হইয়া না পড়ে, বিশ্বাস যেন অমান অটল থাকে, তরবারের কাছে

মুক্তিকামী জাতির আজ এই প্রার্থনা।

ভরসা—জাতির আশা জাগিতেছে। এইমাত্র আশা, এইটুকুই সখল। আশা যদি ভাণে, জীবন অবধারিত উদ্ধৃষ্ণ হইবেই, আজ বা কাল অনন্ত বাধাপূর্ণ হৈলি। সরল মুক্তিপথ খুঁজিয়া লইবেই। ইচ্ছার অসোব বীর্ণ প্রবলতম বাধাশক্তি বিকাশেও স্কন্ধ বা কড় করা যায় না, প্রাণের গর্জমান আঙন চির দিন চাপা থাকে না, আবরণ ছুঁড়িয়া সহসা আত্ম-প্রকাশ করিবেই। এই আত্মার প্রবুদ্ধমান মহা-সকল যেখানে ফুটে, যে ব্যক্তি বা সমষ্টির মধ্যে, সেই জাতির চিহ্নিত শক্তি-বেঙ্গ, আদর্শ ও শ্রেয়শার উৎস, পদনির্দেশের প্রতীকাত্ম, তাহাকে মধ্যবিন্দুরূপে গিরিয়াই জাতির প্রাণময় ও মানসময় সত্তা আশা ও বিশ্বাসের বিগ্রহ রচনা করে, নিরাস্ত্র দ্বন্দ্বয়ে আলো পায়, বল পায়, মুক্তির উল্লাসে সাধনমত প্রাণের উৎসর্গ-জালি ছুড়াইয়া আনিয়া পূজার বেকীপরে সঁপিয়া দেয়। এইরূপ অগ্রনীতি ধরিয়াই জাতি এ পর্যন্ত আগাইয়া আসিয়াছে, মুক্তির সিংহদ্বার এখনও হয়ত বহুদূরে, কিন্তু জাতির মুক্তিকাত্মা সেই যে আরম্ভ হইয়াছে, আন্ত ও চলিয়াছে, বরাবর চলিবে, বত দিন না লক্ষ্য গন্তব্য স্থলে গিয়া পৌঁছায়। একটা মহা জাতির জাগরণ বড় অল্প তপঃ-সাধা ব্যাপার নহে, কালও বড় কম লাগিবে না, কিন্তু তাহাতেও কিছু আসে যায় না, যদি আত্মার দৃষ্টি ও লক্ষ্য স্পষ্ট স্থির থাকে, জীবনের গতি যদি বন্ধ হইয়া না যায়। জীবনের ধর্ম যদি গতি হয়, এই অশ্রুত, অনিচ্ছ গতির

ভাষ্টি, ১৩৩২]

সৃষ্টি সাধনা

২৬৩

স্বোভেই আমাদের মুক্তি-জাগরণ একদিন সফল হইবে।

আত্মার বিকাশ জীবনে। এই জ্ঞাত জীবনের ভিত্তির উপরেই আমরা জাতীয়তার সত্য, নির্মল, মুক্ত আত্মপ্রকাশ সিদ্ধ করিয়া তুলিতে চাই। এই জাতীয়তার দারুণ ভারতে নূতন। বীজ এখানেই ছিল। এসেশের সত্তা, এসেশের মাটি বৃকে ধরিয়া এই অসুতময় সম্ভাবনাকেই দিনে দিনে বিপুল যত্নে ও অপারিবি বেহের গোবরে পরিপুষ্ট করিয়া আসি যাচ্ছে। ভারতের ইতিহাস ইহাকেই ঘটনার তুলিকা হুটাইতে চাহিয়াছে। ভারতের সাধনার যে অবৈত মহাপাণি, ধর্মের পরতে পরতে চিরদিন টেউ খেলাই-তেছে—অজ্ঞাত রূপে তার পরম লক্ষ্য বাহাই থাকুক, এ যুগে তার পরম লক্ষ্য যে জাতিমূলক, শুধু ব্যক্তিগত নয়, সমষ্টিগত, তাহা আর অস্বীকার করবার উপায় নাই। আবার অজ্ঞাত যুগের বিপরীতে, এ যুগের সাধনার বিশেষ শুধু যে তার সমষ্টিতে তাহা নহে—ইহার অস্ত্র বৈশিষ্ট্য তার জীবন-ধর্মে। অর্থাৎ এ যুগের ভারত, তার সমষ্টিগত অর্থও জীবন লইয়া, জাগৃত শক্তিমুষ্টি রূপেই প্রকাশ হইতে চায়, সে বিশ্বের অগ্রগোপন জীবন হইয়া নয়, বহুবিধা উন্নত সমাদান, বিশ্বজিতির সাধকরূপে আত্মমুষ্টি ও স্বাভাৱ্য অর্জন করিতে চায়, এ যুগের জাগরণ ধর্মে, কর্ণে, শিলে, সাহিত্যে, রাষ্ট্রকর্মে, বোমদর জীবনের তপস্তাই লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছে, পরজীবনবর্জিত মোক্ষ লাভ করা তার একান্ত পরম পুরুষার্ণব আর নহে।

লক্ষ্য জীবন—কিন্তু সাধনা তার ভাগ ও উৎসর্গে। এ ভাগ অর্থে কুরু তার, উদ্বেগবিশেষের জ্ঞে যে দৃঢ়, অবজমুখী, লক্ষ্যকান্ধা হুটরা উঠে, তাহাই।

জীবনের সর্ব বৃত্তি জীবনেরই সর্বাধিকারিত জ্ঞে বিনিয়োগ, জাতিগঠনের জ্ঞে আত্মোৎসর্গ। তাহার কেন্দ্রীভূত, সম্মিলিত প্রায়োগই জাতীয়ত। তবেই, এই কেন্দ্রভাব ও সম্মিলনশক্তিই যে জাতীয়তার প্রাণ, তাহা আমাদের বিশ্বত হইল না। জাতির মধ্যে এই কেন্দ্রগত ও সর্বসমবয়মূলক মিলন-শক্তির বিকাশ আজও বাটরূপে দেখা যায় নাই। তাই জাতি-সাধনার অজাবদি সত্য প্রাণ-প্রতিষ্ঠাও হয় নাই। এই দেশ যে তীর্থ, তার মাটি পূণ্যধে, সেই তীর্থে যে জাগৃত দেববিগ্রহ, তার দর্শন, অত্ম-ভব, পরশ ও আরাধন যে না পাইয়াছে, সে কি আশ্রমে জাতি-সাধনার যথার্থ মর্থ বুঝবে, না তার কেন্দ্র-স্পর্শ অপূর্ণ মিলন-তত্ত্ব তার মিনাইয়া আপনার সবধানি অসুত ও উৎসর্গে চালিয়া দিতে পারিবে—একটা সমষ্টিভাবাপ্রতি মহানির্মাণেরই জ্ঞে? জাতির সাধনা এইখানেই লুকচোঁর গ্রাশী-মূলক না করিলে চলিবে না—সে গ্রাশী অর্থ-ভাবের। তাই চাই আত্মদর্শন। উহাই জাতিসৃষ্টির মর্থ-ময়।

আত্মদর্শনেই কেন্দ্র-গঠন হয়। কেন্দ্রকে ঘেরিয়া মিলন-চক্র। এক্ষণ চক্র বা সমষ্টিমেই জাতির আবাহন সার্থক হয়। কেন্দ্র পতি স্বয়ং ভগ-বান—কেন্দ্র-রূপে তিনিই আত্মদর্শনের মহামন্ত্রে দীক্ষা দেন; যোগশক্তির তিনি সৃষ্ট আশ্রয়-স্বরূপ। এই স্বরূপে আরোপ সাধিয়া, যে শোধান বিধি, উহাই আত্মদর্শন যোগতত্ত্বের প্রথম সাধন। মন্ত্রওকে আশ্রয় করিয়া প্রবর্তনহে সাধক ভাবসাধনার স্বয়-পার, মহামন্ত্রের সর্গতোভাবে গোষ্ঠান্তর সিদ্ধ হয়, কামনা ক্ষয়ে ভাবান্তর হওয়ার সঙ্গে ভাবনহে স্বভা-বেও রূপান্তর ঘটে, ইহাই নবজন্ম, তখন অর্থ-অতি-রিক্ত একটা বৈবশক্তির সহিত মিশ্রণে সাধক সাধিকা দিবা জীবনের কেন্দ্রে আপনাকে উঠাইয়া ধ্বজ-হয়,

দেশানে মিলন। এমনি মিলনের রসায়নে যে সম্বন্ধ তাহাই জাতি-নির্ধারনের সিদ্ধ ভিত্তি। সে জাতি—দেবজাতি, সাধনার বলেই তাহার সৃষ্টি। বাংলার তত্ত্ব-বৈজ্ঞানিক ও সংজ্ঞা সাধনায় এই আত্মসমর্পণ যোগ অধিগত সিদ্ধ সম্পদ, এক্ষণে এই অনির্লস্ফের যোগ-তত্ত্ব বিজ্ঞানের কোটার উঠাইয়া, জাতিনির্ধারনে প্রয়োগ করিতে পারিলেই, দেবতাব্যবহার আরতন নব ভারতের অত্মায় সার্থক হয়।

শাশ্বত এই দেবজীবন ও দেবজাতি। জীবন বেগানে ভাগবত, সম্বন্ধের সত্যও সেখানে বর্তা হইতে অমর ভাগবত পথ্যারে আপনাকে তুলিয়া ধরে। আমাদের দর্শন সম্বন্ধের মধ্য দিয়াই তখন সকল রসের বসি ইতিবাসনকেই পাই ও পরশ করি; সেই নিখিলরসমুত্তের সঙ্গে অমর বন্ধনে বন্ধ হইয়া বিচিত্র ভাষাতে বানবতাকেই নরহৃদয়ে নাগরঙ্গী লীলার শক্তি, মমি ও বিকৃতি প্রকাশের আনন্দ-গোকে পরিণত করিয়া তুলি।

সম্বন্ধের যোগ-সুত্রে গোষ্ঠী বা পরিবার। ভারতের তীর্থে তীর্থে, আশ্রমে আশ্রমে, সম্বন্ধপ্রদের উপর

ভিত্তি করিয়া, একুণ অধ্যাত্ম গোষ্ঠী বা পরিবার সৃষ্টি হইলে, তাহার ক্রমপ্রকাশে সম্বন্ধসমষ্টি বা দেবজাতির উদ্ভব অনন্তব নহে। চাই অগ্রে আত্মোৎসর্গীকৃত জীবনের সম্মিলনে, গোষ্ঠীভূত নরনারীর সাধনতীর্থ—নব গোষ্ঠী বা পরিবার, ঈশ্বরপ্রণমেই তাহাদের মিলন, যোগই তাহাদের অহুসীলন তত্ত্ব, পরিণামে সিদ্ধ একাধ্যাত্মভূতির উপরেই সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা। আত্মসমর্পণ-যোগ, একাধ্যাত্মভূতি বিজ্ঞানময়ের সিদ্ধতত্ত্ব প্রকাশ, তাহারই আশ্রয়ে দিবা সম্বন্ধ বা জাতি-চক্র। তাহারই ক্রমগুলি পরম্পরাশ্রিত, সাধনার টানে একটি অপর-টাকে ফুটন্ত করিয়া তুলে, পরন্তু সবগুলিই নিত্যতত্ত্ব—যোগ, বিজ্ঞান, সম্বন্ধ ও দেবজাতি, ভারতের নব নির্ধারনের এই চতুর্ধিক পথ্যার বা অভিব্যক্তি। আর আশ্রমে আশ্রমে গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করিয়া, যোগ ও বিজ্ঞানের সাধনার অর্থগাহন করিবার দিন আসিয়াছে, ফলে সম্বন্ধজীবন যেমন যেমন সিদ্ধ হইবে, অচিরে মহা-বজ্রা যেমন খণ্ড খণ্ড বান, ডোণা, জলাশয় সব ভূবিদ্যা একাকার হইয়া বায়ুমহামিলনের প্রাচীন সঙ্গ সম্বন্ধ এক হইয়া, একটি মহাজাতির অত্মায় ঘটাটাই, উগাই নব ভারতশক্তি—ভগবান এই সৃষ্টিপথনা সার্থক করুন।

হিন্দু-সমাজের সংস্কার

—:—

হিন্দুসমাজের সংস্কারের কথা তুলিলে হিন্দুসমাজ অর্থে আমি কি বুঝি তাগ প্রকাশ করিবার আবশ্যক হয়—অন্ততঃ কিছুদিন পূর্বে হিন্দু কে ও হিন্দুসমাজ কিরূপ তাগ নির্ধারণ করিতে আবদুসম্মারীর কর্তা-দিগকে যেরূপ পরিশ্রম করিতে হয়, তাগ পাঠ করিলে মনে হয় হিন্দুর সংজ্ঞা নিতিতঃ গুহায়াম, তজ্জন হিন্দু সমাজের সংজ্ঞাও অতি সচল নিমিত্ত হয় না; তজ্জনই বলিতেছি হিন্দুসমাজ বলিতে যিনি যাগ করেন তাগ স্পষ্ট করিয়া বলিয়া তবে হিন্দু-সমাজের কথা কহিলেই ভাল হয়।

অথচ হিন্দুসমাজ যে এতটা বে-ওয়ারিশ সম্পত্তি তাগ কোন হিন্দুই স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহার হিন্দু কে ও হিন্দুসমাজ কিরূপ তাগ গুহায়াম না বলিতে পারেন, তথাপি নিজেকে ও নিজের একাধ পরিচিত সমাজকে কেন্দ্র করিয়া হিন্দু ও হিন্দু-সমাজ সম্বন্ধে তাঁহার যে অহুভূতি পোষণ করেন, তাহার বলেই তাঁহার হিন্দুসমাজকে এক অখণ্ড সমাজরূপে মানিয়া লন—মূল্যমান সমাজ ও জীহ্ব সমাজ সম্বন্ধে থাকিলেও হিন্দুসমাজের বৈশিষ্ট্য ও একত্ব তাঁহার প্রাণে-প্রাণে অহুভব করেন। মূল্যমান সমাজের নিকট পাড়াইলে হিন্দু সমাজের মধ্যে যে কোনো প্রকারের একত্ব আছে তাগ বুঝি দিয়া নির্ধারণ করা যায় না, তথাপি জাতি-ভেদে বিভক্ত ও অসংলগ্ন স্বতন্ত্র হিন্দুজাতি মাগার প্রত্যেকেই তাঁহার হিন্দু ও তাঁহার মূল্যমান এই অহুভূতির উপর দাঁড়াইয়া যেন জমট-ভাবের বাহ রচনা করেন—যে হিন্দু এই বাহ ভেদ করিয়া হিন্দু যেনিক ভেদ-

ভিত্তিকেই নাড়া দিতে সক্ষম, এই আলোচনার সেই হিন্দুকেই হিন্দুসমাজের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছি।

এই ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আমরা যে সংস্কারের কথা কহিব—তাহাতে বর্তমান হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে কোন অগ্রিম সত্য প্রকাশিত হইলে, আমরা জানি, হিন্দুসমাজ বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন হইবেন। কিন্তু সত্য শাসিত তরবারবিশেষ, তাহাকে উন্মোচন করিলেই অসত্যের প্রাণে জীতির সন্ধান চাইবে, ইহার ক্ষমতাশ্রমীর ইতিমত্তঃ করিবার কিছুই নাই—কিন্তু আমরা বর্তমান হিন্দুসমাজকে সেইরূপ অসত্যপূর্ণ ভাষিতে পারি কি? তাগ হইলে মূল্যমান ও যুগ্মীন হইতে আমাদের পার্থক্য কোথায়?

পূর্বোক্ত ঔক্যতর প্রশ্ন উত্থাপন করিবার আবশ্যক নাই—যিনি ধর্মোপাসনায় প্রকৃত্তে জাতি-বৈষম্য দূর করিতে কৃতসকল হইয়াছিলেন, তাঁহার অন্তঃকরণ ত তাঁহার কাণ্ডের মধ্যেই লুপ্ত আছে, ইহাকে যদি একবার বিশ্লেষণ করিয়া দেখেন তাগ হইলেই এই ধর্মপ্রচারক মহাত্মা রামায়াম মোহন রায়কে আপনাতঃ কি প্রকারে অ-“হিন্দু” বলিবেন! তিনি ধর্মোপাসনায় প্রচলিত জাতি-বৈষম্য স্বীকার করেন নাই, তিনি তৎকালে প্রচলিত বহু ধর্মোপাসনের তীর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি তাঁহার উপলক্ষ হিন্দুত্বকেই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন—এই হিন্দুত্ব প্রচলিত সমাজে অসুদৃশ্যে আত্মপ্রকাশে সমর্থ হয় নাই, তজ্জনই তাঁহার ভাবনার অগ্রদূত করিয়া নতুন সমাজের পথ

হইয়াছে—এই সমাজ প্রচলিত হিন্দু সমাজের ভেদ-ভিত্তি গ্রহণ করেন না, নিজমিলের বৈশিষ্ট্য অংশীত করিতে এখনও তাঁহারা নিজমিলকে “হিন্দু” নই” বলিতেও কৃষ্ণা প্রকাশ করেন না, তথাপি তাহাদিগকে কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তিই অহিন্দু বলিতে পারেন না—অতএব হিন্দুধর্মের অস্বীকার্য্যতা ধরিয়া আমি যেখানেই আত্ম-প্রকাশ করি না কেন, তাহাকে মূলমত বা ঋষ্ঠানের মত ভাবিবার কোন কথাই উঠিতে পারে না।

তবে আত্মপ্রকাশের ভাষা লইয়া অনেক সময় কথা উঠিয়া থাকে। বাহারা প্রতিমা-পূজাকে ঈশ্বরস্বভূতির বিষয় মনে করেন, তাহারা প্রতিমা পূজা-নিষেধা করিয়া থাকেন, বাহারা জাতি-বৈষম্যে মহত্যাগ তথা জীবরূপী ভগবানে পীড়িত দেখিয়া, সকল মানবকে নিজ স্বভাবের পীড়ন ধারায় সিক্ত করিতে অগ্রসর হন, তাহারা জাতি-ভেদের সমর্থক কোন কথাই বলিতে পারেন না—অতএব প্রচলিত হিন্দু প্রতিমা-পূজার ঈশ্বরের অস্বীকার্য্যতা লাভ করিয়া থাকেন, প্রচলিত জাতিভেদের মধ্যে তাহারা হিন্দু সভ্যতার বা জাতি-মানব ও বিশ্বমানবের জ্ঞানবিকাশে কোন বিষয় নিরীক্ষণ করেন না, তজ্জন্ত প্রচলিত সমাজকে যদি ভ্রষ্টাঙ্গপাশক ও খণ্ড ধর্মী বলিয়া নিন্দা করি—তাহা হইলে প্রচলিত সমাজ ত ক্ষুর হইবেই, অধিকন্তু তাহারা বৈধর্ম্যশীলনপূর্ব্বক কোন কথা না কহিলেও তাহাদের অন্তরমধ্যস্থ সত্য এই নবীন সভ্য-প্রচারকের কণ্ঠ হৃদয় করিবে,—তজ্জন্তই আমরা দেখি, অনেক সমাজের দ্বন্দ্বের উদান অতি শীঘ্র পতনেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। দ্বন্দ্বের ঘোরতা ও দ্বন্দ্বের সাধনা লইয়া যে সব সমাজপ্রতিষ্ঠা ও সমাজসংস্কার সংগঠিত তাহাই ভাণ্ডা যখন এইরূপ পশিমায়ে পরিণত, তাহা হইলে কেবল সমাজ-কল্যাণের ভাব লইয়া যে সকল সংস্কারপ্রচেষ্টা হইতেছে, তাহা-বে কিরূপ সফল হইবে তাহা সহজেই অসম্ভব।

অতএব আমরা এইরূপ ধর্মসংস্কার ও সমাজ-সংস্কারের সমর্থকরূপে কথা কহিতে অগ্রসর হইতেছি—ইহা আমাদের অস্বীকার্য্য ও ইহাই আমাদের জীবন সাধনা এইরূপ ঘোষণা করিয়া অভ্যন্তরভিত্তিক মূলক ধর্ম ও সমাজ সমর্থন করা যায়, “মা ফলশু কদাচন” এই নীতি অগ্রসরন পূর্ব্বক আমরা এইদিক অগ্রসর হইতে পারি, কিন্তু ইহা সহজ বস্তুসমূহের বিপুল প্রচেষ্টার কল্যাণার্থী সমুদ্রে দেখিয়া আমরা কোন্ সাহসে এই কার্য্যে অগ্রসর হইতেছি তাহাও দেখিতে হইবে। আমরা যদি দেবী পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রচেষ্টাসমূহের মধ্যে এমন কিছু দৃষ্টিগোচর না হইল, যদ্বারা সংস্কারকালে সমগ্র-হিন্দুত্বকে জীবনে বরণ করিয়া না লইয়া, ভেদ ও ভেদনের মধ্যে সমস্ত স্থাপনের চেষ্টা না করিয়া, আপনাদের সম্পূর্ণ একত্বমূলক অস্বীকার্য্যতাকেই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাহইলে হয় ত কথ-কিং আশ্রয় হওয়া যায়—সত্যই হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরমূলক প্রচেষ্টা সমূহের মধ্যে এইরূপ একটা গলম বর্তমান থাকার উত্তা সামাজিক ও ধর্মোপাসনার রীতি ও নীতি পরিবর্তনে তেমন সক্ষম হয় নাই।

প্রচলিত ধর্ম ও সমাজের প্রাচীন-প্রতিমা ও বস্তুতার মধ্যেও যে বিপুলতা ও একতার আসন বিছাইয়া আছে, ধর্ম ও সমাজ সংস্কারকণণ তাহা ভাল করিয়া দেখেন নাই, তজ্জন্ত তাহারা তাহাদের আসন বা কেন্দ্র বস্তু হানোই প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। বেদ-বৃত্তি-পুরাণোক্ত ধর্মের নির্যাস ধর্ম-জীবনে বিশেষভাবে সূচ্য না উঠিলে, ভগবানের বিভিন্ন শক্তির প্রকাশস্বরূপ বিভিন্ন প্রতিমাদির পূজক, ব্রাহ্মণ শাসিত, লোকচারান্বিত হিন্দুজাতি-মালায় মধ্যেও এক হিন্দুধর্মের বাজনা সমাজ জীবনে গুলনিয়া না উঠিলে, ধর্ম ও সমাজ-সমাজরূপে একত্বের প্রতিষ্ঠা হইবে না—আর এই একত্বই বিরাট, ইহাই মহত্ব—হিন্দু জীবনে মহৎ ও বিরাটের

প্রতিষ্ঠার দ্বারা বাহা চলিয়া আসিয়াছে, তাহার উপর এই ছন্দ্রের আবিষ্কার না হইলে হিন্দু সমাজের সংস্কারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব হইবে।

অতএব একরূপ অসম্ভব হইলেও হিন্দুর বিরাট-রূপটি আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া চিনিতে হইবে—বাহাকে আমরা হৃদয় বলিতে পারি, বাহিরে যে সমাজ নত বৈষম্য ও অস্পষ্টতা লইয়া বিশিষ্ট ভেদ-কণ্ঠকিত-রূপে আজ বিশ্বের সমক্ষে দাঁড়াইয়া আছে, তাহাকেও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিয়া লইতে হইবে,—বিরাট হিন্দু-সমাজের যে ইহাও একটা অঙ্গ ইহা মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া করিয়া তৎসংগে সমগ্র হিন্দু-সংসারভূতি ও হিন্দু-অস্বীকার্য্যতায় ভগবানের বাণী যখন মুক্টিয়া উঠিবে তখনই আমরা বলিতে পারিব—আমাদের ধর্ম যে সর্বাঙ্গীত, যে বিশ্বাণ্য আশ্রয় করিয়া ধর্ম-জীবন পশু করিতেছে, তাহা নিরাময় করিবার জন্ত আমরা সনাতন ধর্মের প্রচার ও পালন করিব; সনাতন ধর্ম অর্থে সেই বিপুলতাকেই প্রচার করি যাহা সর্বধর্মকে, সর্বধর্মগণালীকে আশ্রয় দিয়া

২ময় সাধনে তৎপর, বাহা সর্বভূতে একাত্মভূতির ভিতর দিয়া ভারতে ও সর্বজাতির মধ্যে জাতীয়ের অমর বন্ধন দৃঢ় করে।

এই ধর্মাত্মভূতির উপরই সমাজ জীবনের ধর্মাত্মতা, জাতিবৈষম্য ও অস্পষ্টতা গ্রিসন করিয়া বিশাল একাত্মক অনিচ্ছিত নবসমাজ গড়িয়া উঠিতে পারে—এই সমাজে ধর্ম ও যশোমূল্য প্রভাব অপেক্ষা সাধনা ও গুণকর্মবশে ভারতে নবধর্ম ও বর্ণাশ্রম পুনর্গঠিত হইতে পারে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব অভ্যন্তরমূলক সংস্কার সমূহের মধ্যে এই ভাবটি নিহিত ছিল—তাহাকেই ভিত্তি করিয়া প্রচলিত হিন্দুসমাজের বিপুলায়তন সমাজ পর্যালোচনা পূর্ব্বক উগাকে আমূল আন্দোলিত করিবার শক্তি-সাধনায় আজ সকলকে নিযুক্ত হইতে হইবে। ইহাই হিন্দু সমাজ সংস্কারের প্রকৃষ্ট পন্থা। আমরা এবারে ভাবটাকেই অগ্রসরণে করিলাম। পূর্ব্ব কর্ম-সমূহের বিশেষণে ও নবপন্থার স্পষ্ট নির্দেশ ভাবটাকেই কর্মক্ষেত্রে প্রতিফলিত করা হয় নাই। বাস্তবের ইহাও চেষ্টা করিব

ধর্মগুরুমণ্ডল

(৪)

সিদ্ধার্থ ২০ বৎসর বয়সে পঞ্চম রাজভোগে জীবন অভিব্যাহন করেন। ১০ বৎসর বয়সে কোল-কলা যশোধারার সহিত তাঁর পরিণয় হয়, এই অশেষ ভোগের মধ্যে তাঁর চিত্ত একদিনের জ্ঞাপ্ত অভিকৃত হয় নাই, তিনি ভাবিতেন, সংসার—এবাস, একপ্রকার কারাগার, মিয়াদ ফুরাইলে নিজস্বায়ে প্রস্থান করিবেন। এইরূপ মনোভাব থাকায় তিনি সর্বকার্যে উলাসীন থাকিতেন, রাজা শুদ্ধন পুত্রের এই উদাসীন দূর করার জ্ঞান নানারূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি আবদ্ধ হইলেন না। আশাচ মাসের পূর্ণিমা রাত্রিতে সিদ্ধার্থ পৃথত্যাগ করিলেন। প্রাবৃটের রান জ্যোত্স্না ধরাকে ঘিরিয়া সেদিন অল্প অল্প বর্ণন করিয়াছিল।

দ্বার অবতার তগবান বুদ্ধ মানবের রেশ অপমোদের জ্ঞপ্ত কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। যৌবনে জীবের প্রতি যে অকৃত্রিম মমতায় কাতর হইয়া বাণবিক হৃৎসকে বৃকে তুলিয়া ইহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রাণী-মাত্রেয় জীবনযন্ত্রণায় কাতর হইয়া, বুদ্ধ নিত্য কালের জ্ঞপ্ত ধরায় বাঁধা পড়িলেন। তপঃসিদ্ধ হইয়া মহানির্লিপ্ত লাভের সন্ধিক্ষণে মর্ত্যের আর্তনাদ তাঁর কর্ণে গিয়া পৌছিলে, তিনি দেহদুর্ভুক্ত **জিজ্ঞাসা** করিলেন—“এ কিসের কোলাহল!” তিনি উত্তর দিলেন, “বুদ্ধ আজ মুক্তি পাইয়াছে, কিন্তু বিশ্বের চক্ষে ব্যাধ অশ্রুই এখনও ঝরিতেছে, ইহা বাধিতের আর্তনাদ।” বুদ্ধ ফিবিবলেন, শপথ

করিলেন, কীট পতঙ্গের মুক্তি না হইলে—আমি নির্লিপ্ত চাহিব না। কি নির্লিপ্তকারী, কি মায়া-বাণী, ভারতের ভাগবৈরাগ্যাদ্রষ্টাশ্রম অশ্রমমুগ্ধি সকল সিদ্ধ মহাপুরুষ জীবের ভ্রূপে, আশ্রমমুগ্ধির আকাঙ্ক্ষা ছাড়িয়া, বিশ্বের সেবায় আশ্রমদান করিয়াছেন, তাই পৃথিবী আজ এত মহীয়সী!

বুদ্ধ দেখিয়াছিলেন, বালা নিত্য নয়, যৌবন নিত্য নয়, এই দেহ স্থাবর, জড়বৎ, বান্ধকের কন্ধ্যাযতে ক্রান্ত বিপরীত হয়, পরিবর্তনশীল দেহের অং-ত্যাগেই, এই দায় হইতে মুক্তি। তিনি দেখিয়াছিলেন—মৌবনেও জ্ঞার আক্রমণ, শরীরে ব্যাধির আধিপত্য, অবস্থার পীড়ন। মায়াবজ্জ ছেদন, ইহা হইতে পরিত্রাণের উপায়। আর তিনি দেখিয়াছিলেন, রাজা, ঐশ্বর্য, মান, ধন, স্ত্রী, আধিপত্য নিত্য নয়, মরণ নিবারণ করা যায় না, সে যখন যুগী আসিয়া, মাহুদের সোণার স্বপ্নান চূর্ণ করিয়া দিবে। বৈরাগ্যের আশ্রম বৃকে জলিল, ভিক্ষু সম্যাসীরা সৌম্য পবিত্রমুগ্ধি দেখিয়া ভাবিলেন, মুক্তির এই পথ, ম্যানে বসিয়া ইহাই স্থির করিলেন, সঙ্কল্প অটুট করিয়া যেমনি আসন হইতে উঠিবেন, শুনিবেন, পুত্রদন রাজলের জ্ঞপ্ত-সংবাদ। কে যেন বক্ষে বজ্র নিক্ষেপ করিল। গভীর রাত্রে অশ্রুপূরে শুবশ করিলেন, দীপাধারে তখনও স্তব্ধ তৈল নিঃশেষ হয় নাই—যিকি তখনও অশ্রুগা আলােকমালায় রাজপুত্রী উজ্জল উৎসবময়, বিক্ষিপ্ত হ্রস্বত ক্রুলের গুচ্ছ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, নষ্টকীকুলের তজ্রাতুর কণ্ঠে প্রেমের

ভাস, ১০৩২)

ধর্মগুরুমণ্ডল

রাগিনী শিরিয়া শিরিয়া গুণন তুলিতেছে, ঘরে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন, রাজা শুদ্ধন উকি মারিয়া দেখিলেন, ঘর আলো করিয়া, পুত্রের এইরূপ আচরণে ব্যথিত হইয়া ক্ষুণ্ড আসিয়া যশোধারার স্বর্ণাঞ্চলে বাঁশের ছল্লাল নিকষিত হেমমুগ্ধি, আর যশোধারা—অভিন্নহৃদয়ের শতদল, ক্রান্ত মলিনবদন, শান্তিমোরে বিন্দিত আঁখি, ক্র-যুগলে অমরার শ্রেণী, একটা শেষ চুখনের আকুলতায় জীবনের ভিত্তি পঞ্চাশ তুলিয়া উঠে, কিন্তু না, অশ্রুগামীর বজ্রকণ্ঠ নিষেধ করিল, নিষেধে তুলিয়া যাওয়া চাই, এই প্রেম—বিশ্বের মুক্তি দিতে আজ বিরাত বেষে দেখা দিয়াছে, যুগাও অহঙ্করেই একবার মাত্র ফুটিয়া উঠিল, বৃক যেন ছিঁড়িয়া যায়, কিন্তু নিকৃপায় সিদ্ধার্থ। আঘাতের আকাশ মোঘচ্ছন্ন—গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে, পূর্ণিমার চাঁদ জ্যোতিহীন, বুদ্ধ প্রিয় অথ কণ্ঠকের পৃষ্ঠে উঠিয়া বসিলেন, হৃদয়ক আসিয়া বলিল—“প্রভু!” বুদ্ধ ঘোড়া হাকাইয়া দিলেন, হৃদয়ক তাঁহার পশ্চাদহবতী হইল।

তারপর যাহা হইল, পূর্ণপরিজ্ঞে বলা হইয়াছে। হৃদয়ক অল্পপথে বুদ্ধের আদেশে বেষ পরিবর্তন করিয়া, রাজবাটী প্রত্যাগমন করিল, অস্ত্রপুত্র-বাসীর কণ্ঠে ক্রন্দনের রোল উঠিল, মাধের গোপা সন্তানের মুখ চাহিয়া অশ্রু বর্ণন করিল, কপিলাবস্তুর পশুপক্ষী কাঁদিয়া আকুল হইল।

বুদ্ধদেব সিদ্ধ হইয়া ৪৫ বৎসর পঞ্চ প্রচার করেন। প্রথম বছরেই তিনি ৬০ জনকে নিজ মতে দীক্ষা দেন। রাজপুত্রে রাজা বিধিসার বুদ্ধের শিষ্য হন—তিনি বেণুবন নামক এক উদ্যানভূমি বুদ্ধদেবকে গুরুদক্ষিণাশ্রুপ প্রদান করেন, ইহা বোধসমাজের পরম ঐর্ধ্য, সিদ্ধার্থ এখানে বহু বৎসর বাস করিয়াছিলেন।

এক সময়ে তিনি কপিলাবস্তুরে গিয়া, ঘারে

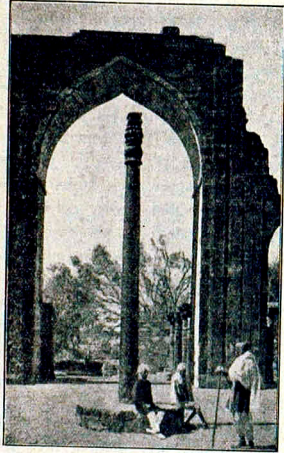
পুত্রের এইরূপ আচরণে ব্যথিত হইয়া ক্ষুণ্ড আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মুখে আর বাণী সরিল না, কৃষ্টিত-কৃষ্ণ-কেশভার, হৃৎসংগ-মুখমণ্ডল, গৌরকান্তি রাজপুত্র সিদ্ধার্থের আর সে মুগ্ধি নাই, নঃপ্রায় তাম্রকান্তি উরতদেহ মুগ্ধিত কেশ, হস্তে ভিক্ষাপাত্ৰ, বক্ গায় চক্ষু অশ্রুবিগলিত, চরণে সঙ্কট মল্ল নরনারীর মাখন ত হইতেছে। শুদ্ধন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন; বহু কণ্ঠে প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন,—“বৎস, একি করিতেছ; ইহা কি শাক্যকুল-প্রাণীপ যুবরাজের উচিত কার্য!” সিদ্ধার্থ যুগ্মযুগ্ম গভীর কণ্ঠে কহিলেন—“কি মহারাজ!” সে প্রশান্ত উজ্জল দৃষ্টির সমুখে, রাজার চক্ষু নত হইল, তবুও বলিলেন—“বৎস! ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, এই ভিক্ষাবৃত্তি, ইহা যে বংশের, কুলের অমর্যাদা!”

শাক্যসিংহ উত্তর দিলেন—“আমার কুল নাই, বংশ নাই, আমি পূর্ববর্তী বুদ্ধদের অমর্যাদা—চিরন্তন প্রণায় আমি ভিলা—মহারাজ ভিক্ষা দিন।” শুদ্ধন অপ্রতিভ হইলেন, বুদ্ধ অন্তরেই বুদ্ধের হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্ৰ গ্রহণ করিয়া, পুত্রকে রাজপুত্রীতে লইয়া আসিলেন।

বুদ্ধ আজ আর শাক্যবংশের কুলপ্রাণী নয়, বুদ্ধ আজ আর রাজা শুদ্ধনের গুরুসম্মত সন্তান নয়, বুদ্ধ সম্পূর্ণ গোত্রান্তরিত হইয়া নবজন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, নিম্ম কণ্ঠে সমাগত রাজপুরুষগণকে লক্ষ্য করিয়া তিনি উপদেশ দিলেন—বৌদ্ধধর্মের মূল-তত্ত্ব চতুর্বাধ্যসত্য, অষ্টাঙ্গমার্গ, আশ্রমযন্ত্র, বৈরাগ্য, অহিংসা, অহঙ্কম্পা, মৈত্রী, শ্রাবস্তাশ্রিতপণী নির্লিপ্ত-মুক্তি। অনর্গল অমৃতবতী বাণী তাঁর কণ্ঠে নির্গত হইল, শুদ্ধন আকুল হইয়া বুদ্ধকে আলিঙ্গন দিলেন, কপিলাবস্তুর অশ্রুগা নরনারী বুদ্ধের শরণাগত হইল।

বুদ্ধের রাজশ্রাসদে প্রবেশ করিলে, রাজ-পরিবারস্থ সকল নারীগুরুদেই তাঁহাকে অভ্যর্থনার জন্য আগমন করিল, কিন্তু যশোধারাকে তিনি দেখিলেন না, অনিলেন তিনি আসিবেন না। বুদ্ধের দ্বন্দ্বের কল্পনার বাণ ডাকিল, তিনি

উৎস উৎখলিয়া উঠিল, বুদ্ধ দেখিলেন আলুলায়িত-কুন্তলা যশোধারার ধ্যানমুগ্ধি, তিনি মধুরমুখে আহ্বান করিলেন, “যশোধারা, গোপা!” সে চিরপরিচিত কণ্ঠ! যশোধারা উন্মাদিনীর মত বুদ্ধের চরণে জড়াইয়া ধরিলেন, বুদ্ধ বুদ্ধিলেন পতি-



দিগ্বীতে অশোকের আদি লৌহস্তম্ভ *

অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, যে কক্ষে যশোধারা ছিলেন, সে কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহাকে যশোধারার পূর্ব জন্ম বৃত্তান্ত পতিপরাধবা সতীর বন্ধ বিদীর্ণ করিয়া অশ-

বলিয়া সাক্ষ্য দিলেন। যশোধারা বৌদ্ধ ভিক্ষুণী

হইলেন, ইনি বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীর মধ্যে প্রধান। বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। পুত্র রাহুলও ভিক্ষুরত অবলম্বন করিল—রাজ্য শুদ্ধদন হতবুদ্ধি হইলেন। বুদ্ধের পুনরায় ধর্মপ্রচারে বাহির হইলেন, রাজ-পরিবারের তিনজন তাঁর অশ্বখাবী হইয়াছিলেন, রাজন্যপতি উপালীও বুদ্ধের মত ছাড়িল না, বুদ্ধ-দেবের বৈমাত্রেয় ভাতা আনন্দ তাঁর জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত সঙ্গে ছিলেন, স্বীয় শালক দেবদত্ত বুদ্ধধর্ম গ্রহণ করিলেও, তিনি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী রূপেই শেষ পর্য্যন্ত বিপক্ষতা করেন, কিন্তু কৃতকাব্য হইতে না পারিয়া মনঃকোড়ে গয়ানদী তাঁরে নিঃস্বিহারে তাঁর ডবলীলা গাধ হয়।

বৌদ্ধধর্ম—কঠোর বৈরাগ্যামূলক। আনন্দ, বৌদ্ধ বিহারে নারী গ্রহণের প্রত্যাব উত্থাপন করায়, বুদ্ধ বলিয়াছিলেন, নারী-সমর্পণে তপস্রা হীনপ্রভ হইবে, আমার মৃত্যুর পরও এইভাবে যদি তোমরা চল, তাহা হইলে এক হাজার বৎসর আমার ধর্মপ্রভাব সমান ভাবেই থাকিবে, কিন্তু নারী বিহারে প্রবেশ করিলে ইহা অধিক দিন টিকিবে না—কিন্তু তিনি বিহারে নারীগ্রহণ নিবারণ করিতে পারেন নাই। প্রথমেই স্বীয় খাত্রী মহাপ্রজাপতিকে লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, বেজা অথপালী বুদ্ধের অগ্রগ্রহ পাইয়া ভিক্ষুণী হইয়াছিলেন, বিশাখা, বহুব্রাতা প্রভৃতি বহু বৌদ্ধ ভিক্ষুণী বৌদ্ধ বিহারের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন।

বিহারে ভিক্ষুণীর স্থান দিয়া, তিনি কঠোর নিয়ম প্রবর্তন করিলেন। পরনারী সম্ভোগ ইচ্ছার অপেক্ষা তপ্ত লৌহ শরীরে বিদ্ধ করা ভাল, এইরূপ উপদেশ দিতেন, ভিক্ষুদিগকে ভিক্ষুণীরা যাহাতে শ্রদ্ধা ভক্তি চক্ষু দেখে তাহার ব্যবস্থা করিতেন, বধাকালে ভিক্ষুণী দেশে ভিক্ষুদিগের বাস করিতে হইত, ভিক্ষু সম্বন্ধে অশ্রুতি বাতীত

ভিক্ষুণীরা উপবাস বা কোনরূপ ধর্মাহুতান করিতে পারিত না।

ভিক্ষুদের প্রতি তাঁর কঠোর আদেশ ছিল :—

- ১। অকালে স্নেহজন করিবে না।
- ২। নাট্যাঙ্গি দর্শন করিবে না।
- ৩। উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করিবে না।
- ৪। প্রশস্ত শয্যা শয়ন করিবে না।
- ৫। মালা পঙ্ক ধারণ ও লেশন করিবে না।
- ৬। ভূষণ ধারণ করিবে না।
- ৭। রৌপ্যাঙ্গি স্পর্শ করিবে না।

শশানের ছিন্ন বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ, ভিক্ষুরে জীবন ধারণ, অথবা আশ্রমে, বৃক্ষতলে আশ্রয় করিয়া ভিক্ষুদের আশ্রয়ধন্য রত থাকিতে হইত। ব্যাধি হইলে গোমুত্র বাতীত অজ্ঞ ওষধ সেবনের অশ্রুতি ছিল না—শিষ্যদের প্রতি চারিটি অশ্রুতান ছিল :—

- ১। ব্যাধিচার করিবে না।
- ২। চুরি করিবে না।
- ৩। হত্যা করিবে না।
- ৪। দৈব শক্তির আশ্রয় লইবে না।

আশ্রমধর্মের কঠোর কঠুসাধা দুর্গম পথে, বৃহত্তর আশ্রমে ভারতের কোটি কোটি নর নারী, বৃহত্তর চীরমুখে কটিভট আবৃত করিয়া, ত্যাগের মহিমা প্রচার করিয়াছিল, তিনি বলিতেন,—শিষ্যেরা যতদিন শুদ্ধাচারী সংপথে চলিবে, ততদিন আমার ধর্ম মধ্যাহ্ন ভাঙ্করের মত জ্যোতি বিকীরণ করিবে, পাঁচ হাজার বৎসর পরে, এই সত্য যখন সংশয়াচ্ছন্ন হইয়া বৌদ্ধপ্রভাব ক্ষয় করিবে, তখন তিনি মৈত্রেয় নামে নব বুদ্ধ মূর্তিতে জগতে অবতরণ করিবেন। এই আড়াই হাজার বৎসর, কল্পনার অবতার বুদ্ধদের খরিত্রীর কোলছাড়া, মানবজাতির নিরঙ্কর শুভ—পৃথিবী আর মঙ্গলভূমি—বুদ্ধের পুনরাগমন প্রতীক্ষায় এই দীর্ঘ দিন আমরা টিকি কি ?

কপিলাবধু হইতে হুড়ি ফোশ দূরে, পাৰা
 গ্রামে বুদ্ধ এক আশ্রমেন যখন বিশ্রাম করিতে-
 ছিলেন, তখন তীয় শিষ্য কুম্ভ কণ্ঠস্বার বরাহ-
 মাংস রন্ধন করিয়া, বুদ্ধের সম্মুখে উপহার দিল,
 আনন্স বিরক্ত হইলো, বুদ্ধ বলিলেন, স্বজাতার
 অঙ্গে জীবনের নূতন প্রভাত, কুম্ভের পঙ্কজ অতি
 আদরের সহিত আশ্রমে ভোজন করিতে এই বার।
 আনন্স আর আপত্তি তুলিলেন না, হই তাঁর
 শেষ আহার, পাৰা বাস হইতে কুশীনগরের
 হিরণ্যবতী নদীতীরে, স্থবিরত্ব শালবনে তিনি
 অস্থত্ব হইলেন—আনন্স বিলাপ করিতে লাগিলেন,
 বুদ্ধ ভায়েকে সাধনা দিয়া বলিলেন,—“শোক
 করিও না, বার জন্ম, তার পর, তেমনা সত্য
 ধৰ্ম্ম পালন কর।” এইখানেই ভারতের স্বৰ্ণ
 অগ্নিভিত্ত হইল, আলো নিভিল, বোদ্ধ বিহারে
 বাঘিষ্ঠার অগ্নি হইল সপ্ৰাণতার মধ্যে বিরাট
 বিচ্ছেদের স্রষ্ট হইল, বুদ্ধের মৃত্যু তিনি দিন

হইয়া, আজ ভারত বৌদ্ধধর্মের চিহ্ন পর্থাৎ
মুহিয়ারছে। রাজা অশোকের অভ্যুত্থানে, বৌদ্ধ
মহিমা মাঝে তুলিয়াছিল। দে নিৰ্মল, দে গৌৰব-
বুগের ইতিহাস ভারতময় বাপ্ত হইয়া আছে,
ইঙ্গব্রহ্মের ঐ বিশাল লোহস্তম্ভ—ঐশ্বর্য ও
চিহ্নের জয়ন্তরূপে আজও বর্তমান। বুদ্ধ নাবি,
কিন্তু তাঁর কীর্তি আছে, তাগে বরাগের প্রভাব
আছে; আদ্যের অনাদ্যের ধানী নুকের প্রশান্ত
মৃতি আবালবৃদ্ধবিতার পরিচিত দেবতা—
বৌদ্ধ ধর্ম নাবি, কিন্তু নুকের শ্রতিমৃতি ভারতের জুদয়ে
চির জাগরক রহিয়াছে। এম নু, ভারতের পুণ্য ভূমি
ভোমার পদচিহ্ন বকে ঐকিয়া ঐম্বয়ের আগমন
প্রতীকায় উৎকীর্ণ—দ্যায় ভার ধ্বং করিতে—আবা
অবর্তর্হ ব, আবার কদাচ কদে ধ্বং উঠুক—

“ବୁଦ୍ଧଃ ଶରଣଂ ଗଞ୍ଛାମି,

धर्म्यं शरणं गच्छामि.

मञ्जरुः शत्रुघ्नः प्रच्छादयि ।”



বঙ্গসাহিত্যে সমাজতত্ত্বীয় অনুসন্ধান ।

[লেখক—ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, এম,এ, পি এইচ ডি]

আর্থীক ভাভা সর্বমুখি এক প্রকার ছিল।
তত্পরে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের প্রভাবের সর্ব প্রদেশেই
হিন্দু এক আচার ব্যবহার ছুঁছাং অহুষ্ঠানাদি প্রচ-
লিত হইয়াছে। এই **জ্ঞান**ই মগারাজীঘ-ভাষায় অনেক
কিছুদিন বাস করিয়া উভয় জাতির অনেক
সাংস্কৃতিক কথা দেখিতে পান, এবং বাস্তবী
পাঞ্জাবে বসবাস করিলে, তথায় সেই এক পৌরাণিক
আচারপ্রথত অহুষ্ঠানাদির সাদৃশ্য অবলোকন
করিলেন। তত্পরে জাতি-তত্ত্বের অন্তর্গত বিষয়-
গুলি এক এক করিয়া পুথ্যাহুপ্তরূপে নিরীকণ
করিলে দেখি, যে পুরাকালে বাস্তব জাতি গোযাক
পরিচ্ছদ চাচলন পশ্চিমেরই মত ছিল। কিন্তু
প্রাচীন কালের অবশ্যর নজির বদভ্যভাষা না।

পাল বংশের রাজত্বের সময়ে কি প্রকার ছিল, তাহাও আজ পর্যন্ত প্রত্নতত্ত্ববিদেরা আবিষ্কার করেন নাই। এই জন্তই এখানে আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিউস লিখিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, যে ভারতের রাজত্বের ধৃতি ও চাঁদর পরিমাণ করিতে, যোদ্ধা-বৃন্দ একটা গলা হইতে পা পর্যন্ত লম্বা জামা বা কোট পরিধান করিতেন, মকলেই দীর্ঘ কেশ ধারণ করিতেন; ও লম্বা দাড়ি ও গৌণ রাখিতেন। ইহাই তিনি পাটলিপুত্রে বসিয়া সামান্য ভারতবাসীর বাহ্যিক পরিচ্ছদের লক্ষণ নির্ধারণ করিয়াছিলেন। পাটলিপুত্রে গম্বা রাজ্যের মধ্যে কায়্যা বাহা পর্যন্ত বেশকি পরিচ্ছদের, তাহা তৎকালের প্রভাবশালী গৌড়

ও বোধে নিশ্চয়ই প্রযুক্ত হইত। আর আক্ষর্যের বিষয় যে, এই বর্ণনার আজ পর্যন্ত বিশেষ ব্যতিক্রম হয় নাই। দৃতি চারের সর্বত্র সার্বজনীন, পাগড়ি বাঙ্গলা, উড়িষ্যা ও আসামচাড়া। আর মেগাস্থিনি লুথাকে ক্ষত্রিয়দের আপাদমস্তক পরিব্রাজ্যে গাজাবরণ বলিয়াছেন, তাহাই আজকালকার বাঙ্গালীদের “চাপকান,” যদিচ ইহা বিজাতীয় নামে পরিচিত। এই গাজাবরণই পশ্চিমে মেরজাই, আশরাখা নামে অভিহিত। এই গাজাবরণই ভারতের প্রাচীন পরিচ্ছদ, ইহা বিজাতীয় মুসলমানের দ্বারা আনীত নহে, বরং তাহারা ইহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অতএব অতি প্রাচীনকালে বাঙ্গলায় পাজারাজারা সেনরাজার ও তাহাদের সামন্ত রাজত্বগণ দৃতি ও প্রাচীন ধরনের আশরাখা বা চাপকান ও পাগড়ী পরিধান করিতেন বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

৩। রাজেন্দ্রলাল মিত্র যে তাঁহার “Indo-aryans” নামক পুস্তকে বলিয়াছেন, যে আজকালকার পার্শ্বদেশের পরিচ্ছদের মতন পোষাক অর্থাৎ লম্বা কোট, ইজার ও জুতা, ইহাই প্রাচীন ভারতবাসীদের দরকারী পোষাক ছিল, ইহা আমার বোধ হয় সত্যনিষ্ঠ নহে। আমার যতদূর মনে হয়, তিনি বলিয়াছেন, যে বোধায়ের পার্শ্বী এই পোষাক হিন্দুদের কাছ হইতেই গ্রহণ করে। তিনি আরও দেখাইয়াছেন, যে প্রাচীন ভারতে high-boots প্রচলিত ছিল। কিন্তু আমার বোধ হয়, লম্বা কোট ও বৃটজুতা বৌদ্ধগণের বহু পরে বিদেশীদের কাছ হইতে অধিকরণ করিয়া গ্রহণ করা হইয়াছিল। Ajanta-frescoতে অঙ্কিত ভারতীয় রাজার এ পোষাক নাই, তৎস্থানীয় লোকের গায়ে মিরজাই বা পিরানিই অঙ্কিত আছে, আর সেই সঙ্গে লম্বা বৃট গাম্ভীর্যের (বর্তমান আফগানিস্থান) পাহাড়ীদের পদে শোভিত দেখা যায়। তৎপরে আমার

যতদূর জ্ঞান আছে, ভারতীয় ভাষাসমূহে trousers-এর প্রতিশব্দ নাই; “ইজার” পার্শ্বী শব্দ, মুসলমানেরাই ভারতে তাহা আনয়ন করিয়াছিলেন। হইতে পারে মধ্যএসিয়ার শব্দ ও ইউট্রিয়া ইজার, লম্বাকোট ও লম্বাবুট ভারতে প্রচলিত করিয়াছিলেন; এ প্রকারের পরিচ্ছদ শীতপ্রধান দেশেরই উপযুক্ত। বোধ হয় আকেমিনিদের (achaemenides) রাজত্বকালে পারস্তেও ইজারের প্রচলন ছিল না, কারণ Behistun basreliefsএ দারায়ুসের ও তাহার সৈন্যদের ইজার-পরা প্রতিমূর্তি নাই।

যাহাই হউক, প্রাচীন বস্ত্রের পরিচ্ছদের পরিচয় মেগাস্থিনিদের বর্ণনার উপর নির্ভর করিতে হইবে। আর সেই পোষাক যেটামুটি আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। মধ্যযুগেও বঙ্গসাহিত্যে তাহাই বর্ণিত হইতে দেখা যায়; যথা, ১২শ শতাব্দীর শতাব্দীতে কবি বিজয় গুপ্ত বর্ণনা করিতেছেন, “একখানি কাছিয়া পিছে, একখানি মাথায় রাখে, আর একখানি দিল সর্বপাশে।”

আর কালের পরিবর্তনে বাঙ্গলায় লম্বা দাড়ি-গোপ ও চুল এবং পাগড়ির ব্যবহার অন্তর্ধান করে। কিন্তু মধ্যযুগে লম্বাচুল রাখার প্রচলন ছিল, যথা বিজয়গুপ্ত বলিতেছেন,

“পরম হৃদয় লম্বাই দীর্ঘ মাথার চুল”

এবং কৃত্তিবাস রামায়ণেও বানর সৈন্যের ও লম্বা চুলের বর্ণনা আছে। পুরুষদের লম্বাচুল রাখা আজ পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত আছে। এককালে পৃথিবীর অনেক সভ্যজাতির মধ্যেই ইহার প্রচলন ছিল। পরে যোগলম্বে বাঙ্গলায় বাবরি-কাটা চুলের প্রচলন হয়; ইহা রাজা রামমোহন রায়েব সময় পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। তৎপরে ইউরোপীয়ান চালের আসলে রামমোহন-বড় পেছনে-ছোট চুল কাটার প্রচলন হয়। আর

প্রাচীন ধরনের ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের যেরূপ কামান রীতি তাহা ব্রাহ্মণ দেশের প্রভাবে বাঙ্গলায় প্রচলিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

ইহা সেন রাজবংশের সময় হইতে বর্ণে হয়ত প্রচলিত হইয়াছে, কারণ আজকালকার ঐতিহাসিকেরা বলেন, যে সেন রাজবংশ কর্ণাটক দেশাগত অ-বাঙ্গালী ছিল। আর মিরজাই বা মেগাস্থিনির বর্ণিত গাজাবরণ আজকাল বাঙ্গালী বাবুদের চাপকানে পরিণত হইয়াছে এবং চোগাটা মধ্য এসিয়াগত মোগল ভূক্কদের নিকট হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইজার তৎপক্ষেই ভারতীয় জাতীয়ত্ব লাভ করিয়াছিল।

আর পাছুকার কি ব্যবস্থা ছিল? বঙ্গসাহিত্যে পাছুকা শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং আজ পর্যন্ত দুই প্রকারের পাছুকা, চর্মের ও কাঠের ব্যবহারের প্রচলন আছে। কিন্তু বাঙ্গলায় কোন প্রাচীন প্রস্তরের বা ইটের স্থপতি কার্যের চিহ্ন নাই বলিয়া এবং বিবরণের নিবারণ করা দুঃস্থ। মেগাস্থিনি পাজুরার উল্লেখ করিয়াছেন, উড়িষ্যার প্রস্তরের স্থপতি কার্যে বৃটজুতার ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়, আর হিতোপদেশে এই বৃটজুতাই “উপানন-গুচপাদ” বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব কল্পনা করা যায়, যে প্রাচীনকালে কোন কোন দোড়ীয়েব পদে বৃটজুতা শোভা পাইত এবং চর্ম-পাজুরা অনেকেরই ব্যবহার করিতেন। প্রাচীন ভারতের কি প্রকারের চর্মপাজুরা ছিল তাহা বর্ণনা করা শক্ত। হুঁড়ওয়লা নাগরাজ্য মুসলমানী আমদানি বলিয়া বোধ হয়। প্রাচীন কালের গ্রীক, রোমান, ইহুদি ও অজ্ঞাত জাতীয়েরা Sandal পরিধান করিতেন। ইহা আফগান সৌমানাতেও দেখা যায়। কিন্তু অতি প্রাচীন হেতিত জাতি, (hettites) যাহারা এশিয়া মাইনরে বাস করিত,

তাহাদের প্রতিমূর্তির পদে এই নাগরা শোভিত হইতে দেখা যায়, কারণ sandal অপেক্ষা এই জুতার বরফের উপর চলা সুবিধা। যত মুসলমান যুগের অগ্রে ভারতে নাগরার কাছাকাছি এক প্রকারের চর্মপাজুরা ব্যবহৃত হইত, তৎপরে পশ্চিম এসিয়ার নকলে হুঁড়ওয়লা নাগরার চলন আরম্ভ হয়।

আর বাঙ্গলার স্ত্রীলোকদের কি প্রকারের পরিচ্ছদ ছিল? প্রাচীন কালে ভারতের সর্বত্রই একপ্রকার ব্যবহার ছিল, কারণ মধ্য সভ্যতা সর্বত্রই এক কামানই প্রচলিত করিয়াছিল। ভারতের সর্বত্রই স্ত্রীলোকেরা সাড়ী পরিধান করেন। কিন্তু রাষ্ট্রপুতনার যাবার প্রচলন আছে। আমি যতদূর জ্ঞান, যাহারা বা বৃন্দাবন ইত্যাদি স্থানে স্ত্রীলোকেরা কাজ কর্ণে যাবার পরিধান করেন। পাজারে হিন্দু মহিলা মুসলমানী চালে পায়জামা পরিধান করেন। কিন্তু বাঙ্গলার সাড়ীই আজ কাল সর্বত্রই ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন ও মধ্য যুগে বোধ হয় কাজ কর্ণের সময়ে যাবার ব্যবহৃত হইত। শ্রীমন্ত নীলেন চন্দ্র সেন মহাশয় “Bengali language and literature” নামক পুস্তকে যে যোড়শশতাব্দীর Panels from book-lovers এবং ষষ্ঠীর শ্রদ্ধাশ্রম শতাব্দীর lacquer-workএর চিত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, যে তৎকালের বঙ্গনারীরা যাবার ব্যবহার করিতেন। এবং কর্ণোপলক্ষে যাবার ব্যবহারের চলন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় পর্যন্ত ছিল। “কিত্তীশ বংশাবলী চরিত,” নামক পুস্তকের ৩৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত আছে যে, “রাজী ও রাজবধু এবং রাজকন্যারা কাপশী বা কোশের শাটী পরিভেদ। কিন্তু প্রায় সমস্ত স্ত্রী কর্ণোপলক্ষে পশ্চিমোত্তর দেশীয় সন্ন্যাস মহিলাগণের দ্বায় কাঁচুলি, যাবার ও ওড়না

পরিভেদ। বর্তমানে ঘাঘরা ও কাঁচুলি বন্ধ হইতে অস্বস্তান করিয়াছে। কাঁচুলি প্রাচীন কাল হইতে ভারতে প্রচলিত আছে। ইহার রূপান্তর ইরট্রাপেও প্রচলিত আছে। কাঁচুলি প্রচলন বন্ধেও বহুদিন বাঘ ছিল, বন্ধ সাহিত্যে তাহার ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়; পুর্বেই এক দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইয়াছে, এবং রামেশ্বরের “শিবায়ন” গ্রন্থেও তাহার উল্লেখ আছে—“খদিল কাঁচুলি এলায়ে পেল কেশ।” তৎপরে জীলোকদের “নিবিরদ্ধ” নামক কোমরে ব্যবহার করিবার কথাও বিজ্ঞাপিত হইয়া উল্লিখিত আছে, যথা, “উদাসয়ল নিবিরদ্ধ”।

তৎপরে আসে ঘোমটার কথা। প্রাচীন ভারতের জীলোকেরা কি পরদানশীন অথবা নিজেদের পর-পুরুষের সমুখে মুখাচ্ছাদন করিতেন? ইহা ভারতের ইতিহাসের একটি জটিল সমস্যা। আজকালকার শিক্ষিত হিন্দুদের বিশ্বাস, যে প্রাচীন ভারতে জীলোকের অবরোধ প্রথা ছিল না; তাঁহারা দক্ষিণ ভারতের দৃষ্টান্ত দেখান যে, তথায় আজ পর্যন্ত হিন্দু রমণীর অবরোধ প্রথা নাই; উত্তর ভারতে মুসলমান প্রভাবে অবরোধ প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, বোধ হয় কতকটা জীলোকদের দ্বারা জন্ম ও হয়ত কতকটা জেতুবর্গের ফাদানদের অচর্য্যবর্ণের ফলে। কিন্তু এ প্রবন্ধে সঠিক ঐতিহাসিক নির্দ্বিধা এখনও হয় নাই। প্রাচীন সঙ্কৃত পুস্তকে যে প্রকারে বর্ণিত আছে, যে যখন রাজা রাণীর সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেছেন, তথায় বিদ্রব্যক বসিয়া এবং রাজকর্ষোপলক্ষে প্রধানমাতাও আসিয়া উপস্থিত! এবং রামায়ণ ও মহাভারতে অবরোধ প্রথার উল্লেখ নাই বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু সঙ্কৃত নাটকসমূহে আবার রাজপ্রাসাদে জীমলকে “অবরোধ” বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, এবং এই অবরোধ “ককু কি” দ্বারা

রক্ষিত হইত! এই “অবরোধ ও ককু কি”র অচ্ছাদন মুসলমান সমাজে “হারেম ও খোজার” পরিণত হয়। তৎপরে “চকনামা” (chack-nama) উল্লিখিত আছে যে রাজা রাণীর সহিত বাক্যালাপ করিবার কালে মন্ত্রী চক আসিয়া হাজির; তাহাতে রাণী তৎস্থান হইতে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে, রাজা বলিলেন, যে মন্ত্রী ত্রাশ্রম, তাহার সমুখে বাহির হইলে দোষ হয় না। “চকনামা” ভারতের সর্বপ্রথম মুসলমান আক্রমণের (মহম্মদবিন-কাসেম) সময় সিদ্ধ দেশের রাজা দাহিরের কাণ্ড ও তাহার পিতা রাজসিংহাসন-usurper মন্ত্রী চতরের ইতিহাস। ইহাতে এইটুকু দৃষ্টা যায়, যে অস্বস্ত: সিদ্ধ দেশে জীলোক পরপুরুষের সমুখে বাহির হইতেন না। হয়ত এই প্রথা পারস্ত দেশ হইতে সিদ্ধ রাজপরিবারে প্রচলিত হইয়াছিল। কারণ আজকালকার অনেক মুসলমান পণ্ডিতেরা বলেন, যে ইসলামের অচ্ছাদনের যুগে আরবদের মধ্যে অবরোধ প্রথা প্রচলিত ছিল না এবং কোরাণেও তাহার অচ্ছাদন নাই, আরবেরা পারস্ত বিজয়ের পর তাহাদের দেশ হইতে এই প্রথা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতেই বোধগম্য হয় যে এ প্রবন্ধে নীমাংসা এক জটিল ঐতিহাসিক সমস্যা, পুরাতত্ত্ব-বিদ ঐতিহাসিকেরাই তাহার সমাধান করিবেন। আমরা নিজের বিশ্বাস, পুরাকালে পূর্ব ভারতে অবরোধ প্রথা ছিল না। হয়ত রত্নপটীক রাজা বা সম্রাটের একটা অস্ত্রপুর ছিল, হয়ত রত্নপটীক যথেষ্টাচারী রাজার ঈর্ষার ফলে কালে জীমলের দ্বারদেশে ককু কি দরওয়ানরূপে দণ্ডায়মান হইয়া অস্ত্রপুরকে “অবরোধে” পরিণত করিয়াছিল। কিন্তু জীলোকদের ঘোমটা দিয়া মুখাচ্ছাদন করার প্রথা প্রাচীন ভারতের কুশ্রাণি কোন সাহিত্যে বর্ণিত নাই। “কোকিল দূতে” লক্ষণ সেনের

প্রাসাদের এক অংশ রাণীদের বাসস্থল বলিয়া উল্লিখিত আছে, কিন্তু প্রাচীনকালে কোথাও ভারতীয় রমণীর ঘোমটা বা বুরকা বা পরপুরুষের সামনে মুখাচ্ছাদনের কথা বর্ণিত নাই। তৎপরে আজ পর্যন্ত উত্তর ভারতে “পরদার” কড়া কড়ি সমাজের ধনী ও উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই বিশেষ প্রবল। এই সব কারণে বোধ হয়, প্রাচীন বন্ধে ঘোমটা বা বুরকার প্রচলন ছিল না। কিন্তু ঘোমটা বা জীলোকের পরদানশীন হওয়ার ব্যবস্থা বন্ধের মধ্য যুগের সাহিত্যে উল্লিখিত হইতে দেখা যায়; যথা, রামায়ণে রাবণ বন্ধের পর সীতার আচ্ছাদিত ভুলিতে রামের সমুখে আসমানের কথা বর্ণিত আছে। তৎপরে রামায়ণ ও মহাভারতে “অপূর্ণাঙ্গতা” জীলোক, “চন্দ্রসূর্য্যে” বাহারে দেখিতে নাহি পারে” ইত্যাদির বর্ণনা আছে। নিত্যানন্দ যোগেশ্বর মহাভারতে গান্ধারী বিলাপ করিয়া বলিতেছেন—

“দেখ কৃষ্ণ বৃন্দব উভয়ঃ পরে কাঁদে।

দেখিতে না পারে যারে সূর্য্য আর চাঁদে ॥”

আর দীপেন্দ্র নন্দ মহাপ্রবন্ধের পৃষ্ঠকে বংশীবাদনের একটি উক্ত্যুতপরে ঘোমটা মুখাচ্ছাদনের উল্লেখ আছে; যথা,—

“নৌ ওড়নার মাঝে মূখ শোভা করে,

পাইলে ছাড়িবে নাহি দারুণ অমরে ॥”

এবং পুর্বেই “দিক্তী বংশাবলী চরিত” ওড়না ব্যবহারের নজির দেখান হইয়াছে। ইহাতে বোধ

হয়, যে মধ্যযুগে মুসলমান প্রভাবেই হউক বা অজ্ঞ কারণেই হউক, বন্ধে ওড়না বা ঘোমটা এবং পরদানশীন হওয়া সম্ভ্রান্ত বংশে একটা ফ্যাশন হইয়াছিল আজকালকার বাংলায় ওড়নার ব্যবহার নাই—যদিচ মাদারী এক অংশ মুখাচ্ছাদনের কার্য্য নিষ্পাদন করা হয়। আর বিজ্ঞাপিত বর্ণিত “নিবিরদ্ধ” আজকাল অজ্ঞাত।

বন্ধে জীলোকদের পাড়কা ব্যবহারের প্রচলন কোনকালে কি ছিল? রাজপুতানা, উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে হিন্দু মহিলাদের চটিজুতা ব্যবহারের চলন আজ পর্যন্ত আছে। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যে জীলোকের জুতা ব্যবহারের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। তৎপরে গহনাগাঠির ফাদান কম বেশী ভারতের সর্বত্রই বোধ হয় একপ্রকার, কিন্তু আমার বোধ বোধ হয়, বাঙ্গলায় ইহার বেশী বাড়াবাড়ি, কারণ এককালে বাঙ্গলা ধনীপ্রদেশ ছিল।

ইহা হইল মোটামুটি বন্ধের জাতি-ভেদের এক অংশ। ইহাতে আমরা দেখি, যে প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে বন্ধ প্রদেশ পরিচ্ছাদন বিষয়ে ভারতের অগ্রাঙ্ক প্রবেশদৃষ্টির সহিত, বিশেষতঃ পশ্চিম অংশের সহিত এক ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়াই গমন করিয়াছে। অর্থাৎ সমাজতত্ত্বের দিক দিয়া দেখি, যে বন্ধে ও তাহার বাহিরের ভারতের অংশ এক সভ্যতার প্রভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

গ্রামের ছবি +

৫

বাস্তাব্যের ছেলের নিকট মামার বাড়ী সর্বপেক্ষা প্রিয়—ইহার কারণ কি? 'প' শব্দটাকেই জানেন—ছেলেগন মনে করে, দ্বীপের সব নবনী, মাছ ধরি, খাজা, গুলা, লাড়ু মিঠাই প্রভৃতি সর্বপ্রকার প্রিয় দ্রব্যের একত্র সমাবেশ বোধহয় মামার বাড়ীতেই হইয়া থাকে। বাড়ীতে মাসে একদিন দ্বীপের হয়, হয়ত মাসে দুইদিন খাজা বা গুজার সন্ধান মিলে। মিঠাই হয়ত কেবল দ্বীপের বাড়ী হইতেই আসে, কিন্তু বখনই ছেলেরা মামার বাড়ী যায়, তখনই যত প্রকার মিষ্ট ও শোভনীয় দ্রব্য সকলই একত্র হইয়া তাহাকে ডাকাডাকি করিতে থাকে—তখন তার কটি অঙ্গরীতে যে মধু সঞ্চিত হয় তাহা বোধ হয় জীবনের শেষ পর্যন্তও ফুগায় না। আমি ত আজ পর্যন্ত এই দ্রব্যের সন্ধানের মাতুল বাড়ীর নিছনি লইয়া কোনরূপে জীবন কাটাইয়া দিতেছি।

কিন্তু শুধু কি মিঠাইএর গোভেই ছেলের মামার বাড়ীর জন্ত পাগল করিয়া তুলে?—এপ্রশ্নের উত্তর আছে কি? যাহা অস্বত্ব করি বলিতেছি। বাস্তাব্যের মা খন্তর বাড়ীতে চিরদিন অস্বত্বভিত্তি বহুতরপেই বাস করেন, অনেক ছেলেও মাকে 'বউ' বসিয়াই ডাকিয়া থাকে—মায়ের অপার্থিব বৈষ্ণব-সঙ্গীতের ধোঁয়ার কটি দেহখানি বখনই বুকভরা রস-মুক্তো মায়ের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়ে, মা তার দীপ্ত মুখখানি নিয়া থোকর মুখে চুমু দেয়—তার সিদ্ধ হাসিটুকু অবগুণ্ঠনের মধ্যেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া থোকাকে হাসির বাজন করিতে থাকে—মায়ের বক চার অতি প্রশস্ত হয়, থোকায়

বুকের মধ্যে জুগাইয়া নেয়, কিন্তু খন্তর বাড়ীর আশ্রয়েই সন্ধ্যা-সন্ধ্য-ভাব-যেহায়া তার বুকটিকে জুড় করিয়া রাখে, থোকা তার বুক-খোড়া মানিক হইয়া মানিকের সকল দাবী আদায় করে। কিন্তু মা তার নিকট যেমন বৈষ্ণবী তেমনি বৈষ্ণবী—বহুতরপে কোয়াসা ঘিরিয়া ঘিরিয়া মাকে যেন বেশ কুটাইয়া তোলে না—কিন্তু এই মা বখন মামার বাড়ী যায়, তাঁর ঝলমল মাতৃহৃদয়ের বিপুল প্রকাশে সন্ধ্যা মাতুল বাড়ীতে যেন আলো ফুটিয়া উঠে, মায়ের পায়ের কোয়াসার আঁচল তখন একেবারে বসিয়া পড়ে—মা আমার তখন বৈষ্ণবী বিদ্রোহী! তিনি যখন খোয়ায় অস্বত্বভিত্তি নন, তাঁর উজল প্রকাশে সন্তানের বুক পুঙ্কর বান ডাকিয়া যায়। এই পুঙ্কর ডাক আমি কেবল মামার বাড়ীতেই শুনিতে পাই। বাস্তাব্যের ছেলে মামার বাড়ী ভিন্ন এ-ডাক আর কোথায় শুনিবে!—ইহার জন্তই তাহার নিকট মামার বাড়ী সর্বপেক্ষা প্রিয়।

ছেলেবেলায় এই প্রিয়ভূমির সকল বস্তুই মধু-বর্ণন করে, মামাদের কথননা লাঙ্গল তাহা লইয়া কত বুক ফুলাইয়াই না কথা কহিয়াছি—মনে আছে, কাকা-আমার বলিতেন,—“মামাদের চার বানা লাঙ্গল তোর তাতে কি?” একবার প্রকৃত অর্থ আজ পর্যন্ত আমি অস্বীকার করিয়া থাকি, উত্তরাধিকারী না হইলেও মামার বাড়ী ও মামার বিষয় যে আমার একান্ত আপনতা, তাহা আমি কখনও ভুলিতে পারিব না।

ভাঙ্গ, ১৩৩২]

২

গ্রামের ছবি

২৩৩

আমার নিবট মাতুল বাড়ীর সমস্ত গ্রামটাই আমার মামার বাড়ী—এখানে কলু নাই, ধোপা নাই, কায়েত নাই, বামন নাই, সকল জাতের ঘরেই আমার মাতৃ-চক্রটি জল জল নেড়ে চাটিয়া আছেন—এমন স্পষ্ট ও স্থির চাহনি আমি আমার ঘরে দেখিতে পাই না—তবায় মায়ের চোখের আলো কেমন খোঁসার আটকাইয়া যায়। একবার আমি বাপী মামার বাড়ীতে গিয়া মাতৃ-চক্রটির এক অস্বত্ব দৃষ্ট অবলোকন করি—বাপী মামীর জলভাড়া চোখের চকল অস্বত্ব কোঁতুলপূর্ণ স্থির আঁখান-চাহনি আমি ইতিপূর্বে আর কখনও দেখি নাই। কিংকিৎ বিস্মিত হইয়া মনে মনে ভাবিতেছি, বাপার কি! আমি সে বার অনেক দিন পরে মামার বাড়ী গিয়াছি।

বাপীমামা বলিলেন,—“বাবা এসেছ, তুমি এলে বরাবরই হাঁস দেখে যাও—তোমার মামাদের হাঁস আমি পালতুষ, সর্বদেশেরা জোর করে হাঁস গুলো তোমার মামাদের ফিরিয়ে দিলে—বলে, না হ'লে একঘরে করবো, তোমার বাপীমামা কিন্তু হুঁ হুঁ টা করে নি।” ইহার পরে গলাটি ছোট করিয়া বলিলেন,—“তোমার মামী কি পাঠিচ্ছে? আজ ভোরে গিয়ে ধান ভেনে দোবো!” এই সময়ে তিনি এদিক-ওদিক দেখিয়া লইলেন, এই সময়েই তাঁহার চোখের চাক্ষুষ ফুটিয়া উঠিল, কোঁতুলভরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“ভূমি এখনই বাবে কি? যাও বাবা! সর্বদেশেরা আবার কি ভাবে, আমি নিশ্চর যাবো, আহা কলকাতার মেয়ে পায়ে কি, গাঁয়ের মধ্যে এমন মেয়ে আর হবে না!”—এই বলিয়া আমার মূর্তীর দিকে চাহিয়া রহিলেন; তিনি মুখে বলিলেন বাইরে, কিন্তু তাঁহার চোখটা আমাকে বসাইবার জন্ত যেন

বার বার হাত ধরিতেছিল। আমিও তাঁহার কথা শুনিয়া তাঁহার দাওয়ায় বসিয়া পড়িলাম, উঠানে পৌঁপে গাছে ছুটী পৌঁপের রক্ত ধরিয়াছিল, তাহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলাম—“কোথায়, স্নেহাত (সাবী) কোথায়? তার না বিয়ে হয়েছে!”—“হাঁ, বাবা, ঐ বো বউ গোয়াল ঘরে—কলু আজ জমিদারের ধান বইতে গেছে।” স্নেহাত-ঘিন্নী একবার আমার দেহিবার চেষ্টা করিলেন, মামী বলিলেন,—“এই গো ঘিন্নীদের ভাগনে, আমার কল্লের স্নেহাত, ছেলেবেলায় দুহনের কি ভাব, এক মুছে মুছে খেত, এখন বড় হয়েছে আর মামীদিকে মনে থাকবে কেন—মার বাবা! এমন আণায় পড়েছি, তোকে যে একটা পৌঁপে দোবো, তাতেও পোকের চোব টাটোবে!”

এই সময় বাপীমামা উপস্থিত হইলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “কিগো মামাদের ওখানে তোমাকে দেখলাম না যে”—তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন—আবু বাবা; ইহার পরেই তিনি বাহা বলিলেন, তাহাতে মামা ও মামী উভয়ের চাপা ছদ্মহাসি মর্ম্ম আমি বুঝিতে পারিলাম। ব্যাপার এই, গ্রামের সংগোপ আগুির প্রভৃতি বহু কলকলিগের সহিত সম্ভ্রুতি বাপীদিগের এক বিষম কলহ বাধিয়া গিয়াছে, এই কলহে মামা মাতুলেরা ভক্তকলকলিগের পক্ষ অবলম্বন করায় বাপীরাও তাহাদিগের বিরুদ্ধে “ননু-কো অপারেশন” আরম্ভ করিয়াছে—মামার বাপীদিগের সাহায্যে চাষ করিতেন, বাপীরাও লোকেরা তাঁহাদের ধান শিখ, বাসনমাঝা, ধানতানা প্রভৃতি কাজ করিয়া দিত, এখন তাহারা সেই সব কাজ বন্ধ করিয়াছে। বাপীমামা ছিলেন মামাদের প্রধান কৃষাণ এবং বাপীমামা বাড়ীর অস্বত্ব কাজ করিতেন, এখন সমগ্র বাপীজাতির বয়স্কদের ফলে বাপীমামাকে

৩

একথরে হইবার ভয়ে মামাদের কাজ ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছাছে, বাণীমামীও কাজ করিতে পারেন না, কিন্তু তিনি তোর হাতিতে লুকাইয়া গিয়া ধানভানা বা ধানসিদ্ধ কাজ করিয়া দিবেছেন—আমার মামী বালাকালে বলিকাভার থাকিতেন, এই ছুইটা কাজ কখনও করেন নাই, বৃহৎ সাঙ্গার এই ছুইটা কাজ বড় কমন নয়, তাই তাঁহার বটে একান্ত ব্যতিত ইচ্ছা বাণীমামী ছক ছক বকে একথরে হইবার আশাধা নিহিত বহন করিয়া শেষধায়ে মাতুলগণে দিয়া এই ছুইটা কাজ করিয়া দিয়া থাকেন না। ইত্যাদের হাবভাবে অল্প বাণীয়া বেশ সন্তুষ্ট নহেন, তাই বিশেষকিছু না দেখিয়া আমাদের মামার যে সকল হাঁস বাণীমামী পালন করিতেন, সেই সব হাঁস তাঁহার ফিরাইয়া দিবার স্বকৃত করেন—বাণীমামী অপেক্ষাকৃত নিরীহ প্রকৃতির, তাই তিনি বাণীদিগের এইরূপ হাঁস ফিরাইয়া দিবার সন্ধী প্রস্তাবও মানিয়া লইয়াছেন।

কথাগুলি যখন শুনিয়া গেলাম, তাহার গুরুত্ব আমি ঠিক ধরায়ম করি নাই এবং মামামায়ীর জন্মের পরিমাপও আমি ঠিক করিতে পারি নাই। আমার দৃষ্টি কিছু উচ্ছৃঙ্খল হইল—বুঝি এইবার মামার বাড়ীর সোপার যখন ভাঙ্গিয়া যায়! যখন উট্রিয়া পাড়াইয়াছি—বাণীমামীর দৃষ্টি আমার চক্ষের উপর ভাসিয়া উট্রিল, ইহার কথাই পূর্বে বলিয়াছি—প্রথমে চাকলা, তৎপরে মিঠে কৌতুহল—পূর্ণ ভাব ধীরে ধীরে ভুবিয়া দিয়া শেষের সেই অশেষ ‘এস বাবা’ দৃষ্টি ফেলিয়া তিনি আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, আমার পা আর সরে না।—থরের চালের দিকে দৃষ্টি দিয়া দেগলাম, চালের বাকারী বাহির হইয়া গড়িয়াছে; একটু কষ্ট হইল, ভাবিলাম ইহাদের কি অথবা ব্যাপ্য হইয়াছে!

অন্তমনত্বাবে পথদ্বিা চলিয়া আনিতেছি—একটা শোষণ পুচ্ছ নাচাইয়া এডাল ওডাল করিতেছে, একটা কিশকাকাশের গায়ে নাচিতেছে কিরিতেছে, অপনের শিখাটির মত একটা ক্ষুদ্র বন্ধন বন্ধিম অঙ্কনে এদিক ওদিক করিতেছে, এই পাখীটিই আমাকে প্রকৃতিস্থ করিল।

একটু দূরে অর্ধবয়সী একটা বিধবা যেন আমার দিকে চাহিয়া আছেন—কাছে বাইতেই চিনিতে পারিলাম, তিনি বন্দিয়া উঠিলেন, “তোরা মামীর মুখে শুনিছিস বাবা, তুই এগেলিছ, আর সে গা আছে কি, তোর মামী যে তোকে ক’খাওয়াবে তাই ভাবছে—সবার বেশী ভাবনা, আজ আবার গোমস্তা প্রেমদত্ত ও তোর মাথাকে আলোড়ন ডেকেছে।”

“মাদী, ব্যাপার কি বল দেখি—গাঁটা যেন আড়ল, শশবাস্ত—কাতে জাতে এত অমিল কেন বলত।”

“সবই ত জানিস, তুই তখন ছিলি—যখন পাঁচ বছর আগে কাছারীর মাট পানসী বন্ধের মকদ্দমায় গাঁয়ের লোক জিতল, তখন তাদের আনন্দ দেখে কে, তখন সব গাঁ যেন একটা ত্রাণ। সরকারদের মেজখুঁড়ে তখন গাঁয়ের মতবজ্র মাতবব, সে বৈশিষ্ট্য বারওয়ারী পুজো নিয়ে বাণীদিগের সঙ্গে সংগোপনের সঙ্গে যে কি ঝগড়া বাগল তা’ আর কিছুতেই মেটে না—এইবার গোমস্তা বোপ বুকে বোপ দিয়েছে।”

“আভাবে সবই বুঝছি”—এখন ত তবু একটু ঠাণ্ডার সময়, গোমস্তা যখন বাণীদিকে হাত কক্লে তখন সবার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল, বুঝি আবার খটখাট বেছে মকদ্দম কক্লে হয়। আল হযত একটা রফা হবে, ছ’ একটাক পানসীর জাজে গাঁটা বাবা উচ্ছন্ন গেল।”

“বাই সব পাড়া একবার ঘুরে বাই”—“আর বাবা! গোমস্তা কি কক্লে এই ভেবে-ভেবেই পুরুষরা গেল আমরা ত কোন কুলবিনারাই পাই না।”

এই সময়ের দেখি এক দল লোক পাঠি হাতে চলিয়া গেল, কিছুক্ষণ পরে দেখি এক দল লোক গামছা কাঁধে হনু হনু করিয়া চলিয়া বাইতেছেন, ইহাদিগকে চিনিতে পারিলাম, ইহার সকলেই মামাদিগের গ্রামের অধিবাসী—কারস্থ ও নবশাখ। একজন লোক বলিতেছেন, “তুচ্ছি, ভিন গাঁয়ের কতকগুলো সেলে বৃষ্টি কাছারিতে এল”—কাছারির সমুখ দিয়া যখন বাই, তখন দেখি গাড়ী হাতে গোমস্তা মহাশয় বাহিরে আদিয়াছেন, আমাকে দেখিয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছেন। তাঁহার দৃষ্টিতে দৃষ্টি পতিত হইলেই তিনি হাত-ছানি দিয়া আমাকে ডাকিয়া লইলেন।

ঠাং গভীর ঘরে বলিলেন, “বাবু, এ গ্রাম হ’তে এখনি চলে চাও, থবরের কাগজে এসব কথা ওঠে না, উঠলে ভিটার খুব চরে, জান—তোমার মামাদের লাগল বড় হ’য়ে গেছে।”

“না”—“হী হয়েছ—তঁরা সব গাছে আদার দেবেন না বলে ধর্মঘট করেছিলেন, এবার বাহাখনরা টের পেয়েছেন”—তিনি আর বেশী কথা না কহিয়া কাছারীতে প্রবেশ করিলেন, কাছা হাতে একজন রোজান বাহির হইতেছিল, সে পুনরায় কাছারীতে প্রবেশ করিল, মনে হইল যেন লোকটাকে বেশ চিনি।

৪

এইবার আমার রক্ত গরম হইয়া উঠিল, আমি বোকা নহি—সব বৃত্তিতে পারিলাম, মামার বাড়ীর শব্দ শব্দ সন্ধ্যার দূর করিয়া কাছারিতে প্রবেশ করিলাম, প্রথমেই একজন রোজান আমার বাখা

দিতে আসিল। বুঝিলাম, সে কক্ষ-সেপাত—তাঁহাকে আমান্ড করিয়া অগ্রসর হইতেছি, যে বলিল “সেপাত বেণীনা, বারওয়ারী তলায় দেখ গো।”

আমি ক্ষতপথে বারওয়ারী তলায় উপস্থিত হইলাম, দেখি লোকে ‘লোকাংগা’—একজন চাঁৎকার করিয়া বলিতেছে, “জমিদার কি কখনও বাজে আদার করতে পারত, আমাদের গ্রামে এক-কাঠা হয়ে যখন ধর্মঘট করে তখন কে জানত, আমাদের এত অপমান সহ্য করতে হবে—গোমস্তা ক’বেটা বাণীকে বোঝালে যে ‘কাঁয়েত সংযোগ আঙরিদের কাছ থেকে ভমি কেড়ে নিয়ে তেদিকের দোবো, তোরা আর ওদের চমিতে কাজ করিসনি, ওদের সকল রকম কাণ তোরা বন্ধ কর’—ওরা তাই বুকে নিলে।”

আর একজন বলিয়া উঠিলেন,—এদিকে দেখি এক মিরিয়া ছাড়া আর সব কায়েত আমাদের হকার তামাক খাওয়া বন্ধ করেছে। তাঁরা হকারে ককির কলম মুকিয়েছেন, গুঁরা লাগল ককা ছাড়া চাষের সব কাজই নিজে হাতে করেন, পেটে বোকা দিলে একটা অক্ষর বেহোরা কিনা সম্ভবে, এদিকে মসীজীবী হিসেবে হকার কলম মুকিয়েছেন, কিন্তু ওদের বাগার কিছে!

৫

ঠাং দেখি, ছইজন হিমুখানী দরওয়ান ও পটিশজন বাণী লাঠিয়াল লইয়া গোমস্তা বারওয়ারী তলায় উপস্থিত হইলেন—তিনি আসন পরিগ্রহণ না করিয়াই বলিলেন, “আমি তোমাদিকে জমিদারের নামে বারওয়ারী তলায় ডাকাইয়াছি, তোমরা বাজনা আদায়-দেওয়া ছাড়া অত্রকাছে কাছারী বাইতে অস্বীকার করায় বারওয়ারী তলাতেই তোমাদিগকে ডাকান হইয়াছে—অন্ত কোন কথা নয়, ব্রাহ্মণ বৈষম্য ও কারস্থ ভিন্ন সকল ভাওরে

চাষীকে কাশ এক একটা থক ভিড়িয়া 'কাপা' লইয়া কাছারী বাড়ীতে উপস্থিত হইতে হইবে, কাছারী হইতে কাশ বিচালি জমিদারের সদর কাছারীতে চালান দেওয়া হইবে। আমি কাথারও হী থা না ভনিব না, বাহার গরু খুঁটা উঠিবার পূর্বে হাজির না হইবে আমার এই দায়োয়ানেরা তাহার গরু গোয়াল হইতে খুঁটিয়া আনিবে। তোমরা সকলে ইহাখিগকে চিনিয়া লও।"

গ্রামবাসী সকলেই চাহিয়া দেখিল, ইহারা ভিন্ন গ্রামের লাঠিয়াল নয়, সকলেই এই গ্রামেরই বাঙ্গালী আদিবাসী। প্রেমচাঁদ দত্ত গোমস্তা মহাশয়ের নিকট গিয়া কিঞ্চিৎ আলাপ করিবার চেষ্টা করিলেন, গোমস্তা বলিলেন, "হাঁ, আপনাদের ছকার কলম দেখিতেছি, চাষীদের সহিত কার্যত্বদের যে পার্থক্য আছে তাহা যদি আপনারা বুঝা না করেন, আপনাদের গলাকেও বেকারের জন্ত শেষে গরু এবং জন (মজুর) দিতে হইবে।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রেমচাঁদেরও মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

কিঞ্চিৎ পরে গোমস্তা চলিয়া গেলেন, সকলেই বুঝিলেন, ইহা অপমান মাত্র—অনিচ্ছা সত্ত্বে বাড়ী হইতে গরু লইয়া বাইবার ক্ষমতা কোন জমিদারেরই নাই। অগতঃ এই কথা বলিয়া সমবেত ভ্রমশূলী কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন, সকলের কিন্তু এক কুক্ষিত হইয়া উঠিল।

৬

আমি রাজির আহার শেষ করিয়া বাঙ্গালী-সেবাকতের বাড়ী উপস্থিত হইলাম; তাহাদের বাড়ীতে দুইটা ঘর, একটার দাওয়ার সামান্য-মাত্রী বসিয়া আছেন, অপরটার দাওয়ার সেপাত ভাত পাইতেছে। আমাকে দেখিয়াই মামী বলিলেন, "কেগা?"—সে সময় সেপাত বসিতেছে, "অখল নেই ব্রহ্মি,

কেবল শূই চকড়ি, ছুটো গুলগীও জুলিস নি, আর মিঠিদের বাড়ীতে যাওয়া আসা আছে কি।..." এমন সময় সকলেই বুঝিল, মিঠিদের ভাগ্যনা আসিয়াছে। মামী বলিলেন, "কি বাবা! আবার যে" সেপাত বলিল, "বোস... চটাই দেও"। বহুটা আড়ন্ত হইয়া একটা খেজুরের চটাই বসিতে গিয়া উঠাই মধ্য একবার আমাকে দেখিবার চেষ্টা করিল।

আমি তখন অমিয়ুখী—বলিলাম, "সেপাত, ব্যাপার কি?" সে বলিল, "কিছু না, কান্দি আমি তরঙ্গা গাইতে চলে যাচ্ছি। এ রকমে আর বাস করা চলল না। কোথায় পাড়ুই খুঁড়ার মাথায় ঢুকলো, মাথোঁ দিব না পারলোঁ দিব না এ দিব না ও দিব না—তোরা বাবু জমিদারের সঙ্গে পারিস কি? কিন্তু জমিদার দেখছি বাড়ীবাড়ি করলে, আজ গোমস্তার কথা শুনে আমার মাথা হেঁট হয়ে গেছে, কোন বাঙ্গালী কাশ ব্যবসাস, সত্যি ভাই, আমরা আগে বেশ ছিলুম—এখনই আমরা কোন জাতের ভাত খাই না, কোন জাতের কাছ করি না, মোট বই না, কিন্তু ঢালে বাগ কাগ বগ ঢুকছে"।

আমাকে আর কোন কথা বলিতে হইল না—মামী বলিলেন, "বাবা খেয়েছ", আমি বলিলাম "হ্যাঁ"। সেপাত বলিল "সেপাত, তুমি নাকি খুব বকুতা দাও, একটা বকুতা বারগুয়ারী তলার দাও না—আমরা তরঙ্গা করি, কাথার জোরে অনেক হয় দাম। কিন্তু এ ওর মাথায় কাঁটালা ভেদে-ভেদেই পেট ভরাচ্ছে"।

আমি বলিলাম, "তোমার কাথার চেয়ে সারবান কোন কথাই নাই, কিন্তু তোমরা গা-টাকে কচকি? পরের কাথার বাঙ্গালী চাষীদের উপর লাগছ, চাষীরা কাথারতদের উপর লাগছে, প্রজা লাগছে

জমিদারের উপর, জমিদার লাগছে প্রজাদের উপর, ব্যাপার কি? এর পরিণাম কি জান?"

"তা ভাই জানি না।"

"এই পরিণাম জান না বলে মাতুলদুগা পল্লী জননীকে তোমরা বধ করছ—সত্যি মাতুলদুগার নামে পল্লীর গাঢ় ছদ্ম-ছানো যে মধুর কল্লনা আজ আমায় পাগল করেছে, সে কল্লনকে তোমরা আজ ব্রহ্মপে বধ করছ, মনে হচ্ছে মা-মামী-আর আমার মামীর কথা শুনিয়া সেই রাজিটা তাঁর দাওয়ার এই বাঙ্গালী মামী সকলেই একই সঙ্গে আজ চিতায় পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছেন।"

"কি বলছ সেপাত!"

বাঙ্গালী মামী বলিলেন, "হাঁ বাবা চিতায় গেলেই বাঁচি, এই দাওয়ার শোনা বাবা—তোরা বেলায় তোরই সঙ্গে কারেতে দিদির বাড়ী যাব, তোর মা—বাবা! মরে যেচেছে"।

আমি অশ্রু-পূর্ণ বসিলাম, "আমরা কেন প্রত্যেকেই পল্লীমাতা আজ মরেছেন" কিন্তু বাঙ্গালী মামীর কথা শুনিয়া সেই রাজিটা তাঁর দাওয়ার কাটিয়া নিলাম। তরঙ্গাওলায় সেপাতও সে দিন নীরবে আমার পাশেই শুইয়া রহিল।

বঙ্গভঙ্গ

১৯০৫

(শ্রীমতী প্রমুখময়ী দেবী)

বাঙালীর বকসম বসছেব করি,
কি শুভ সাধিবে জানি নগণনিদান।
আপো তা বুঝিনি, তাই শুকনেজ ভরি
আসিয়াছে নীরধাণা কাঁপারে পরাণ।
হল ধরি বিদারিয়া বক বাঙ্গালীর
যোগিবে কি ভগবন্! জাতীয় জীবন?
হোক তার বারি সম বুকের কথির,
কর প্রহ্ন। মরুভূমি শিলিল মগন।
ঢাকি রবি শশী যথা নীরদ নবীন
ঢালে বরিষায় বারি অনিবার ধারে,
চল হোক ইচ্ছা তব, আশ্রক সে দিন,
জ্ঞানক জাতীয় শক্তি তীর অত্যাচারে!
কে নীকা লাভিবে এসো অধমগীকার,
স্বর্থ যথা পরীক্ষিত আপন প্রভায়।

জীবন-বেদ

(উপভাস)

নবম পরিচ্ছেদ

বীণাপাণির জীবনরক্ষা হইল। এই ঘটনা হইতে বীণাপাণির মাতার সহিত হরিনাথের ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া উঠিল। স্বভাবতঃ হরিনাথের স্তম্ভ এই ক্ষুদ্র অনাথা পরিবারটির উপর সহানুভূতিপূর্ণ হইল। বীণাপাণি হুঃ হইয়া জীবনদাতা হরিনাথের উপর বিশেষ শ্রদ্ধা দেখাইল, অগ্রজের জায় পে তাহাকে মাত্র করিত। হরিনাথ একপ্রকার ইহাদের অভিভাবক হইয়া পড়িল।

রামতারণ চাটুয্যে ইহাতে হাড় হাড়ে চটিল। প্রথম সে ভাবিয়াছিল, বীণাপাণির মাকে ছুটা ধমক দিয়া, হরিনাথের সহিত তাঁর এইরূপ মাঝামাঝি ব্যাপার বোধ করিবে, কিন্তু হরিনাথের সম্পর্কে আসিয়া বীণাপাণির মাতার ভরসা বাড়িয়া গিয়াছিল, হরিনাথের বয়স অল্প হইলেও, কলিকাতার থাকিয়া সেখানকার শিক্ষার, গ্রামের রামতারণ চাটুয্যের অপেক্ষা হরিনাথের অনেক বিষয়ে যে অধিক জ্ঞান, এই ধারণা তাঁর মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল, বিশেষ চৌকীদারী টেন্স তিরদিনিই তিনটাকা সাড়ে পাঁচ আনার দ্বানে হরিনাথ বসন একটাকা তিন আনার মিটাইয়া আদিল, তখন বীণাপাণির মাতা বুদ্ধিগেন, ইহার মধ্যে হাত-কের চলিতেছিল—এইরূপে বহুবিষয়ে বিধবাকে মোচড় দিয়া, রামতারণের বহু উপকার স্বার্থ-রূপে

ধরা পড়িল। রামতারণ ইহাতে অপ্রতিভ হইল না, বরং চোপ রাঙাইয়া বলিল,—“চাটুয্যে গিদি বুড়ো বয়সে একটা ছোড়ার পালায় পড়ে জাত কুল খোয়াবে দেখছি!”

হরিনাথ কলিকাতায় গ্রন্থান করিল বিধবার উপর অত্যাচার বাড়িল। সঘর বাড়ুয্যে একদিন প্রাতঃকালে, দুইটা তবলদার ডাকিয়া, বীণাপাণি-দের দিয়ায় দুইটা প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছ কাটাইয়া লইল। পাঁচ মণলকে ডাকিয়া বীণাপাণির মা ইহার ব্যবস্থা করিতে বলিল, রামতারণের ব্রহ্মপা-ভয়ে-সে বিশেষ কিছু করিতে পারিল না, ধানিকটা ডাক হাঁক করিয়া বিধায় লইল। যৌব পুঙ্খের একদিন টানা জাল ফেলিয়া সঘর বাড়ুয্যে মাছ ধরাইল, বীণাপাণির মা ভাগ্য পাইল না,—এমনই খুঁচীনাটা ব্যাপার লইয়া, সে অস্থির হইয়া পড়িল।

বীণাপাণি গ্রামের পাঠশালায় আড় আড় শেখ করিয়া শিশুযোথেকের দাতা কর্ণের পাতা পর্যন্ত পড়িয়াছিল, গুছাইয়া মনের কথাগুলি সে শিখিতে শিখিয়াছিল, ইহা বাতীত হরিনাথ কলিকাতায় যাইবার সময়ে মাতা, মাঝিরা, রেছলা, প্রভৃতি করে-খানি পুতুল দিয়া গিয়াছিল, সেইগুলি সে পাঠ করিয়া গ্রামের মধ্যে খোঁষাপড়া জ্ঞান মেয়েদের মধ্যে গণ্য হইয়াছিল,—অতিদৈর্ঘ্য অত্যাচার বাড়িতেছে দেখিয়া, সে মাকে জানাইয়া, হরিনাথকে একখানি পর

ভাত্র, ১৩৩২]

জীবন-বেদ

২৮৫

শিখিল। তাহাতে কোন কথাই বাদ রহিল না, বীণাপাণির মাতা পত্রখানি ডাক হরকরার হাতে দিয়া, ষ্টাম্পের জন্ম দুইটা পরমা ও তাহাকে খুশী করার জন্ম আরও দুইটা পরমা দিল—গ্রামের পিওন—যেন শব্দবলিকের করাত, আসিতে বাইতেই কাটে!

হরিনাথ কলিকাতায় বীণাপাণির পত্রখানি পাইয়া সকল বুঝিল। দ্বিগুন ও হরিনাথ এক বাসায় থাকিত, হরিনাথের মুখে ছিল সবকথাই উন্মিষাছিল, হরিনাথ বলিল,—“গ্রামের এই সব মোড়লগুলোকে জন্ম না করলে উন্নতির আশা নেই—খানার গিয়ে, গাছ কাটার অভিযোগে নাশিল করলে হয় না।”

‘বির বলিল—“মামলা মকদ্দমার কাজ নেই, সময় ও অর্থ নষ্ট, বরং গিয়ে যাতে মিটমাট হয় তার ব্যবস্থা কর।”

হরিনাথ পত্রোত্তরে লিখিয়া দিল—“সেহের বীণা! তোমার পত্র বখাসময়ে হকত হয়েছে, সামনে করেকদিন ছুটি—গিয়ে ব্যবস্থা হবে, নিশ্চিত থেকে, আশীর্বাদ জেনো, মাকে প্রণাম জানিও,

ইতি তোমার হরিদাস।”

দশম পরিচ্ছেদ

বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, তিনদিন ঘড়ির কাঁটা যেন চলিতে চলিতে ধামিয়া যায়। ভোর হইয়াছে কি এখন? কলেক্টে খাওয়ার সময় আর হয় না! মধ্যাহ্ন অপরাহ্নের মধ্যে যে কত দীর্ঘ বাবধান, অপরের এই তিনদিন তাহা বুঝিল, সর্বাঙ্গপেক্ষা নিষ্ঠুর রাজকাল, লগনের পর কত ঘুম, কত স্বপ্ন, কিন্তু এগারটার পর বারটা, বারটার পর একটা, এমনই করিয়া ভোর পাঁচটা পর্যন্ত সবগুলোই তার কাছে পৌঁছিল, সে বধন ঘুমায়, বাড়িও কি ঘুমাইয়া পড়ে।

যাহাউক—শনিবারের রাত্রি নিসাইনি অবস্থায় কাটিল, রবিবার সকালের গাড়ীতেই নীরদের সহিত অপরের অহুকে আনিতে ছুটিল।

ট্রেনের পর ট্রেন, বৃহৎ বাঠফলকে লেখা—“ইচ্ছাপুর”, অপরের বলিল—“এইবার কুন্নি জামনগর!” নীরব বলিল—“হাঁ, অহু আমাদের দেখে অবাক হবে!” অপরের পর বন্ধপল্লর দরিয়া কে যেন টান দিল!

গাড়ী জামনগরে আসিয়া পৌঁছিল, নীরব ও অপরের দ্ব্যতক অধঃযুক্ত একখানি শকট ভাড়া করিল। পাকা রাস্তা পার হইয়া, মেটে রাস্তার গাড়ি আর চলে না, নীরব বলিল—

“দাদা, চলুন হেঁটে বাই।” নীরব বলিল—“আর একটু দেখি।” ছিপটীর পর ছিপটী, গাড়োয়ানের পা ধমার কর্কশ শব্দ কোমল স্নায়ুপেশী গীড়িত করিয়া তুলে, অপরের নামিয়া পড়িল। সে দেখিল—

গাড়ীর গতি হাঁটার অপেক্ষা দ্রুত, নীরব হাসিয়া বলিল—“ভাড়া দিতে হবে যে।” অপরের প্রাণের বেগ গাড়ীর সঙ্গে খাপ বাইতেছিল না, সে বলিল—“তা হোক, আশুন হেঁটে বাই।” নীরব নামিয়া গাড়োয়ানকে ভাড়া দিল, সে বলিল—“দাঁড়ান না বাবু, এই মোড়টা পেরিয়ে বাই, তখন দেখবেন, আত্মবালের দিকে বোড়া দৌড়বে।” নীরব হো

হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—গাড়োয়ান বোড়া ছুটাকে নির্দিষ্ট চাবুক লাগাইতেছে, বোধ হয় সে অগ্রসৃত হইয়াছিল।

দুই দিকে বাগান, মাঝে মাঝে শাক্ষতীকর ক্ষেত, অঘরে অল্পপননের বাগান ভীষণ অরণ্যে পরিণত হইয়াছে—কটক গুচ্ছে অরণ্যে মাঝে মাঝে তৃণজাতিতে কুটীর, দারিদ্র্য ও নির্ভীকতার চিহ্ন। দুই একটা শ্রীহীন বালক আশের উপর পাড়াইয়া আছে, কয় বৃদ্ধ কঁকায় তামাক খাইতেছে, দীর্ঘ

গাভী লম্বিত দড়ি দিয়া বাঁধা, তুণ চর্পণ করিতেছে। কোথাও প্রাণের সাড়া নাই, ঘন বুবুর গভীর হুমকী আরও ঔদাসীন্য বাড়ায়, এক লোকাক্ষয়! পল্লীজীবন—আর বৃষ্টি ঘিরে না, মরণ ঘিরিয়া ধরিয়াছে।

দূরে ঘন বনগারী ভেদ করিয়া, প্রাচীন দোখ-পুর উভয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। নীরদ বলিল—“ঐ অহুর খন্তরবাড়ী—মণ্ডল জমিদার, কিন্তু ক্রমেই অবস্থা খারাপ হয়ে আসছে, সব মরে ছেজে গেল।”

অপরের জ্বরের বেগে দ্রুত পরিক্ষেপ আরম্ভ করিল। অশ্বখ বটুক পরিবেষ্টিত সমুখে এক প্রকাণ্ড দৌলিকা বহুদিন সংস্কার হয় নাই, শৈবালে খাচ্ছ, ইটকনিবিত ঘাট বেমাঝামাঝে ভগ্নপ্রায়, জলজ হুহুসে পূর্ণ, চারি কোণে চারিটা শিখমন্দির। স্থানটি নির্জন, পল্লীর প্রাণ থাকিলে ইহা তীর্থস্থানে দ্বায় পুজিত হইত।

আরও অগ্রসর হইয়া, উভয়ে এক স্থবিস্তৃত প্রাঙ্গণে গিয়া পৌঁছিল, দুইপার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ ইটক-নির্মিত কক্ষ, পূর্ণ ঐক্যের নিদর্শন স্বরূপ শোভা পাইতেছে। অধিকাংশ ঘরই শূন্য, চামড়িকা বাহুরের আবাস হইয়াছে, সম্মুখে প্রকাণ্ড সিংহদ্বার, দুই পার্শ্বে দুইটা প্রশং কক্ষ, একদিকে কণ্ঠচ্যায়বৃন্দ বসিয়া শোষণপড়া করিতেছে, অন্য দিকের ঘরে দ্রব পাণ্ডা, দুই চারিজন যুবক বসিয়া আলাপ করিতেছে। নীরদ বাবুকে দেখিয়া তাহার সাদর অভ্যর্থনা জানাইল, নীরদের সহিত অপরের গৃহমধ্যে উপবেশন করিল।

এতক্ষণ অপরের মনে যে আশা ও উৎসাহের প্রদীপ জ্বলিতেছিল, এইখানে আসিয়া তাহা যেন কে হৃৎকায় দিয়া নিভাইয়া দিল—এই প্রকাণ্ড ঐক্যবিকার মধ্যে, এই জমিদারী আশ্রয়

ভিতরে অহুকে ভেদন করিয়া পাওয়া কি সম্ভব হইবে? জ্বরের ব্যাধিই নিবেদন করার সুরসং কি মিলিবে? ঘটনার পর ঘটনায় সে আশ্রয় নিরাশ হইয়া পড়িল। অহুর দেবর আসিয়া নীরদ বাবুকে লইয়া গেল, অপরের বনিয়াদ রহিল। নীরদ যখন ফিরিল, তখন সে বাড়ীর কর্তার সঙ্গে কথাবার্তা করিতেই ব্যস্ত, অপরের নিজেই অবজ্ঞাত মনে করিল। বিশেষ সে তো নীরদ বাবুর সঙ্গীতের আসে নাই, সে যে আসিয়াছে অহুকে দেখিতে, অহুর হাত ধরিয়া মর্মবেদনা জানাইতে, তাহার সুযোগ এখানে কোথা!

ভ্রমতার গতিরই সে বৈঠকখানায় বসিয়া নীরদের সহিত জলযোগ করিল, চায়ের বাটী লইয়া, জলখাবারের থালা লইয়া অহুপমা আসিল না, আসিল বাড়ার ভৃত্য—বৈঠকখানায় বসিয়াই সে তৈল মাখিল, রান করিয়া আসিল। মধ্যাহ্ন ভোজনের ডাক পড়ায়, সে ভাবিয়াছিল এইবার অহুর সহিত তাহার একবার সাক্ষাৎ হইবে। সে আশাও নির্মূল হইল, যখন সে দেখিল প্রকাণ্ড এক দালানের উপর তাহার ও নীরদের আসন করা হইয়াছে, এবং সেখানে বাড়ীর কর্তা ছোট একখানি টুলে বসিয়া আলবোলায় তামাক সেবন করিতেছেন—অশোভনে অপরের নীরদের সহিত আবারে বসিল। কর্তা স্থমিষ্ট বচনে আপ্যায়িত করিলেন, অপরের গায়ে যেন বিষ ছড়াইয়া, বহু কষ্টে অপরের চক্ষের জল স্তব্ধ করিল, এই জন্যই কি সে এখানে আসিয়াছে, হার আশা।

অপুরাছে নীরদ বিদ্যায়—অপরেরকে লইয়া গবে বাহির হইল। অপরের বলিল—“দাদা গাভী চাই, আমি আর চলতে পারি না।” নীরদ একখানা গোগাড়ী ভাড়া করিল, অপরের

মৃত্যবং তাহার উপর হুইয়া পড়িল। কি নিদারুণ কলিকাতায় ফিরিল। নীরদ কত গল্প করিল, অহুপমার ব্যাখ্যা তার মর্ম তখন ছিঁড়িয়া পড়িতেছিল, কথা বলিল, অপরের কানে কিছুই পৌঁছিল না, তাহা কে বুঝিবে! বিচারগ্রস্ত রোগীর মতই সে বুক তার ভাবিয়া গিঠাছে, আর জোড়া শাণিবে না।

বাকী ও শিবাজী

(স্থান—পানিহালা)

সমুখে রজন গিরিনন্দা।

[দেখিকা—শ্রীমতী প্রহ্লাদমায়ী দেবী।]

শিবাজী—সমুখেতে সঙ্গী রজন গিরিনন্দা, পশ্চাতে মোগল দেন সিদ্ধ উদ্বিগ্নবৎ আশামুখ্য অভ্যাসিনী যে মোর স্বদেশ, বরনর স্বপ্নবদ মাগো, আজ শেষ—পানিহালা গিরিধর্মে অসংখ্য যবন গিরিয়াছে কাড়িবারে স্বাধীনতা ঘন, এতদিন একে একে দীর্ঘ চারিমাগ বহু কষ্টে দুর্গমায়ে করিয়াছি বাস, অনাহারে মরে সেখা সাহসী মারাঠী সাধনে পরাগে, ভেবেছিছ জাল কান্টি, নিশির আঁধারে জুবি ঘাইব পলায়ে, শেষ আশা, স্নেহ আসে পশ্চাতে তাড়িয়ে, এত দিনে শেষ সব, ছুখ নাহি তায়, হুখ শুধু বন্দিনী গো সুরিয়া তোমায়।

বাকী। কোন চিত্তান্ত শির, আজি মহারাজ, চিন্তার সমুদ্র নাহি, করিবে যে কাজ, বৃদ্ধিতে পেরেছে বুঝি অগতঃ যবন, বাও প্রভু দুর্গাঙ্করে সহ সৈন্যগণ। পঞ্চাশৎ শৈল সনে রজনীর দার

আগিয়া রবে দাস, দাও তারে তার চরণে যথেষ্ট গজিবে যখন কামান, বুঝিও এ ক্ষুদ্র দাস দিয়াছে পরাণ। শিবাজী। ধন্য তুমি বীর, ধন্য মনে পুত্রধনে ধনী হেই মাতা পিতা, ধন্য এরতনে সজ্জিতা সে দেশমাতা, ধন্য সখা, তব, সখা সখাধনে আমি মারাঠা গৌরব! কিন্তু অহুগোধে মম স্তাস্ত হও বীর, একদল দেব সবে নশর শরীর, মারাঠা গৌরববির আজি একবারে চির অন্ত্যস্তনে যাবে কহিছ তোমারে, দিবা দ্যামে এক সঙ্গে পরিব গলায় জ্ঞান মন্দার মালা—

বাকী।

এক শোভা পায়

বদ্ধ সখে, মহারাজ, তোমার আননে, দেশ তব চেয়ে আছে উৎসুক নয়নে প্রতি পরিক্ষেপ তব গলে শকাতের, তুমি দবে প্রাণ ক্ষুদ্র বহুধের তরে? একি শিবাজীর ভাষা, না—না—থাক স্নেহ

তোমার অন্তর পুরে ; এ নখর বেহ
দেশস্বাভাতে যবে করিয়াছি দান,
যাব আজি সেই ত্রতে, দিও বিন্দুস্থান
এই গুণমুগ্ধ তব, তব উপাসকে,
তোমার মহান কাণে অভাগা সেবকে !
শেষ আলিঙ্গন দাও, বল 'হর' 'হর'
জানাইও পশিরাছ হুর্গ অভাস্তর,
অহনি দেখিবে চাহি যবন সেনানী,
ঘরমুখে ছিল ক্ষুদ্র পকাশ্যে প্রাণী !
যাও, আর, দাঁড়ায়ে না চাহিও না, যুগ,
বাধিত কাতর দুষ্টি—

শিবাজী।

সখে, এত সূখ

বাঁজী।

কহিব জগৎজনে বন্ধু বিনিময়
গ রুক্ষীত প্রাণে ক'ব উৎফুল্ল জ্বর,
আমার প্রাণের সখা সঁপিয়াছে প্রাণ
দেশ মহারাষ্ট্রে তরে উদার মহান,
তার মত বুদ্ধি আর নাহি-মরাঠায়
কি ক'ব তোমায়ে বাক্য নাহি রসনার।
বন্ধু, শেষ আলিঙ্গন দিব এত ঘরা,
আগেতে ভাবিনি বড়, অজ্ঞান আমরা !
এস সখে, দাবদহু এ অন্তরে আঁজি,
ছুরবে বসয়ে নিত্য পুজিবে শিবাজী !
তাই চাহি, নিত্য বেন বশেষ আমার,
নাহি অভিশপ্ত করে বলে "কুলদ্বার"।



মত ও পথ

সমাজের অবনতি

বাস্তবতার সমাজ সংস্কারসমিতি (সোসেল
রিফর্মস্ লীগ) এক বৎসরের কার্যবিবরণী প্রকাশ
করিয়াছেন—তাঁহারা হুগপ্রকাশ করিয়া বলিয়া
ছেন, বাস্তব সমাজসংস্কারের আগ্রহ নাই।
এক বৎসরের চেষ্টায় তাঁহারা একটি বিধবারও
বিবাহদানে সক্ষম হন নাই, তবে, একটি অসবর্ণ
বিবাহ তাঁহাদের চেষ্টায় স্থাপন হইয়াছে।
বলা বাহুল্য, প্রবর্তক সমাজের পরিণয়টিকে লক্ষ্য
করিয়াই তাহারা অসবর্ণ বিবাহের কথা কহিয়া-
ছেন। তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণী পাঠে বুঝা
যায়, বাঙ্গালী বেন সমাজ সংস্কারে উদাসীন ; কিন্তু
আমাদের মতে, বাঙ্গালী আজ অবসাদগ্রস্ত, তাই
তাহারা কি দখ ও কি সমাজ, এমন কি রাজনীতি ও
অর্থনীতি ক্ষেত্রে অতিকণ্টে নিজেদের আড়ষ্ট
জীবনটী বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

অবশ্য, সমাজসংস্কার বিষয়ে বাঙ্গালী বিশেষ-

ভাবে জড়ভাবাপন্ন ; কয়েকটা অসবর্ণ বিবাহ
ও বিবাহ বিবাহ হইলেই যে বাঙ্গালীর জীবন-
লক্ষণ প্রকাশ পাইত, তাহা বলা একান্ত অস্বাভাবিক
হইবে। বঙ্গীয় 'সমাজ সংস্কার সমিতি' বিধবা-
বিবাহ দানে সক্ষম না হইলেও মেদিনীপুর বিধবা-
বিবাহসমিতি ও অস্বাভাবিক গণ্য মাত্র ব্যক্তির
চেষ্টায় মেদিনীপুর জেলায় ও অস্বাভাবিক কয়েকটি
বিধবাবিবাহ হইয়াছে—তাহা হইলেও আশ্চর্য্যকে
বলিতে হইবে, বঙ্গীয় জীবন সমাজবিষয়ে যেন
কুহেলিকার আচ্ছন্ন। এতদ্বির ঘে-সকল নতুন দিকে
বঙ্গীয় হিন্দু সমাজ-সংস্কার-প্রতিভা প্রকাশ
করিতেছেন, তাহাতে বলিতে হয় আমাদের
উদ্ধৃদয়ী প্রতিভা অবশ্যের বাধা চৈলিয়া আর
বিপুলতাকে আশ্রয় করিতে পারিতেছে না, বিপুলতা
ভাগ্য করিয়া এখন-দে সঙ্গীতের উপরই মাথা
ঠুঁকিয়া তাহার সংস্কারের আগ্রহ কম করিতেছে।

আমরা বিভিন্ন জাতির পৈতা গ্রহণ ও বৈশ্বশক্তিবিষয় প্রদীপনদের চেষ্টা ও জাতি সঞ্চিনীকরণ কার্যসমূহ লক্ষ্য করিয়া পূর্বোক্ত মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি।

“মত ও পন্থা,” ভিতরে এইরূপ গুরুতর বিষয়ের সকল দিক দেখাইবার আশা বিড়ম্বনা—‘প্রবন্ধকের’ পক্ষে পক্ষে ইহার মূল স্বত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে। একথা সত্য, রাজনৈতিক সংস্কারে মাহুত যেমন সহজে মাতিয়া যায়, প্রাণের দায়ে ক্ষুরিবারণের চেষ্টায় মাহুত বতটা আগ্রহে অর্থনৈতিক সাধারণ আত্মনিয়োগ করে, সমাজসংস্কার বিষয়ে সে তত সহজে আত্মনিয়োগ করিতে পারে না। যদি ভুলনা করা চলে, রাজনীতি ও অর্থনৈতিক আমরা প্রাণের সহিত ভুলনা করিতে পারি, সে ক্ষেত্রে সমাজ হইবে তাহার অন্তঃকরণ, ধর্ম আত্মা। অন্তঃকরণের স্বতন্ত্ররূপে বিরাজ করে হৃদয়, তাহাতে কৃত-কৃত সংস্কার বালুচাপে চাপে বসিয়া হৃদয়কে কণি ঘোড়িতে বহাইতে থাকে—এই হৃদয়কে ক্ষীত না করিলে ঘোড়িনী কুলে কুলে ভরিয়া উঠে না। আমাদের বক্তব্য হইতেছে এই, স্বাধীন দিক দিয়া স্তব্ধতার দিক দিয়া, অগ্নির দিক দিয়া ও অর ভাগের দিক দিয়া রাজনীতি-ও-অর্থনীতির বেশ চর্চ্চা করা যায়, ইহার সহিত অজ্ঞানতা নিশাইয়া পূর্বোক্ত প্রকার সর্গীয় সমাজ সংস্কারের আন্দোলনেও বেশ মজল থাকি যায়, কিন্তু যেখানে বিপুল প্রাণের প্রতিষ্ঠার আবশ্যক, যেখানে বিরাট হৃদয়ের বেলায় আত্মা সহজেই ঢল হইয়া উঠে, সেইরূপ গভীর নিঃস্বার্থ আত্মান্বোলনের সত বিস্তৃত প্রাণ ও মুক্ত অন্তঃকরণ না হইলে সমাজ-সংস্কার রহি না।

বাল্গার ধর্মসংস্কার করিতে পারিয়াছিলেন রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ, সমাজসংস্কার করিতে

পারিয়াছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র ও কেশব, ধর্ম সমন্বয় করিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, সমাজ-আত্মা প্রতিষ্ঠা করিবেন বাঙ্গলার নব তাত্ত্বিক নবীন সমাজ। ইহাদের প্রাণ-মন-আত্মা স্নাত হইয়া না উঠিলে জাতির অবসাদ কাটিবে না, এবং তাহা না হইলে ধর্ম ও সমাজেও কোন উদ্বোধনের সাজ নাচিবে না।

যাহারা সমাজসংস্কারের কথা তুলেন, তাঁহাদের কর্ণকূহরে এই বাণী যেন প্রতিনিয়ত স্বকৃত হইতে থাকে—সারা বাঙ্গলায় ইহার স্বকার্য নাই বলিয়া সে অবসাদে ঘুমাইয়া আছে, শুধু প্রেমপুত উদার সমাজ-সংস্কার কেন, ইহার জন্ত, সে তাগ ও তপস্যার রাজনীতি ও অর্থনীতির মৃগিও ভাল-রূপে ফুটাইতে পারিতেছে না।

কিন্তু নিঃস্বার্থ বাঙ্গালী চায় কিছু—সকল দিক দিয়াই সে কিছু-কিছু চায়! সমাজসংস্কারেও সে চায় বিরাট প্রাণ ও বিশাল হৃদয়ের দ্যোতান্বরণ মিলনাত্মক সংস্কার এবং ইহাও চায় যথায় তার স্ব প্রাণ আচার ও নিষেধের নির্দোষ অত্যাচারে এইবার মুখ হইবে তথায় সংস্কারের বারি ঝিকনে কিছুদিনের জন্ত যেন বাঁচিয়া যায়। মেদিনীপুর জেলায় ও সম্প্রতি পাবনায় যে কয়টি বিধবা বিবাহ হইয়াছে তাহাতে আমরা বুঝিতেছি, যে-সব জাতির মধ্যে কষ্টাপন্থের জন্ত প্রৌঢ়কেও বালিকা বধুর পাণিগ্রহণ করিতে হয় সেই সব জাতির মধ্যে বিধবাবিবাহের প্রচলন হইতেছে—বাঙ্গালী কতদিনে এইরূপে সকল দিক দিয়া ঘর গুছাইয়া লইবে।

কিন্তু নিম্নশ্রেণীরা ভুলোকেকিণের দেখা-দেখি ভয় ইহার জন্তই একদিন বিধবাবিবাহ পরিত্যাগ করিয়াছে। আজ আত্মত্যাগ, ভিত্তরকনের জায় বিশিষ্ট দেশনায়কগণ দেশপ্রণেতার এক হিন্দুপ্রাণভর

অঙ্গরূপে বিধবা বিবাহ ও অসমর্থ বিবাহে নিজ নিজ সমাজকর্তব্য পালন পূর্ণক যদি উচ্চশ্রেণীর মধ্যে কল্যাণ-রূপ ও উচ্চাভিলাষের প্রতিষ্ঠা করিয়া ‘বিধবা বিবাহ, অসমর্থ বিবাহ ও সামাজিক একতা আনয়ন করিতে না পারেন, তাহা হইলে পূর্বোক্ত সংস্কারমূলক কার্যসমূহও নীচ নিম্প্রভ হইয়া পড়িবে।

ইহার জন্ত যাহা আবশ্যক তাহা পূর্বোই বলিয়াছি। অবসাদ ভেদ করিয়া বাঙ্গালীকে কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

পল্লীর দুর্দশা

পল্লীর দুর্দশা বাঙ্গলা দেশে যতই অবসাদগ্রস্ত হউক, তাহার কণি প্রাণ একান্ত আশ্চর্যকরতার সহিত এবার পল্লীর কথা ভাবিতে বসিয়াছে—শুধু ভাবা নহে, এখন সে কার্যে অগ্রসর হইতে চায়।

একটু পূর্বের কথা কহিয়া লই—বাঙ্গালী সাহিত্য-দোলায়, স্বরে, বাণীর স্বরকারে পল্লীর মধুর প্রবেশ করিতে চাহিয়াছিল, তাহা প্রায় পশ্চিম বংসর পূর্বের কথা; তৎপরে স্বদেশীর উজ্জ্বল প্রকী-পঙ্কাজে গঠন, চরকা প্রচলন প্রভৃতি বিবিধ গল্প-বল্পে সে স্বপ্ন-মনে ডরাইয়া দেয়, কিন্তু কার্যে বিশেষ-কিছু ফুটিয়া উঠে নাই—একটা ফল আমরা পাইয়াছি! পল্লী প্রতিষ্ঠান যে একেবারে গুঁড়হইয়া পিয়াছে, তাহা আমরা হাতে-হাতে বুঝিয়া লইয়াছি।

এই যে বাঙ্গালার গাঁ, এরূপে নষ্ট হইল কেন? তপ্তত বড় বড় অর্থশালী জাতির দেশেও পল্লী গ্রামের ক্ষয় এক সময় লক্ষিত হইয়াছিল। কল-কারখানা যখন হু হু করিয়া বাড়িয়া যায়, লোক দলে দলে পল্লীগ্রাম পরিত্যাগ করে, —রূপকের একবাহ রমি, অজ বাহ কুটির শির, কিন্তু অন্ধের রূপক যেমন পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া দৈত্যপুত্রীর উচ্চ দেওয়ালের যেয়ার মাথা গুঁড়িয়া বাস করিতে আরম্ভ করে, তেমনই

রূপকের অজবাহ কুটির শির পদু হইয়া পড়ে—সদে সদে পল্লীগ্রামের স্বাবলম্বন, তাহার সমাজ, তাহার নৈতিক জীবন একেবারে ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে। এই ওলট-পালটের মুখে ইউরোপীয় বড় বড় জাতি বিভিন্ন উপায়ে সহরের অর্থব্যয় কল-কারখানার হস্ত হইতে গ্রামকে মাথা তুলিয়া ঠাঁড়াই-বার জন্ত বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে—তাঁহাদের প্রচেষ্টায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতদারের সমবায়ে রূপককুল স্বাবলম্বী হইতে শিখিতেছে—অনেক স্থানে কুটির শিল্পীদিগের সমবায়েও তাহাদিগের দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তচালিত কল-কারখানার গ্রহণের ফলে তাহারাও গ্রামে থাকিতে পাইতেছে, ইহাতে যে তথায় নৈতিক জীবন ও গ্রাম্য প্রতিষ্ঠান স্বরক্ষিত-প্রায়, তাহা না বলিলেও চলে।

আমরা নিজেরা কল-কারখানা সম্যক গ্রহণ না করিলেও, ছনিয়ার সর্বত্র কল-কারখানার আশা প্রচলন না হইলেও এখন ছনিয়ার সর্বত্র বিশেষতঃ ভারতবর্ষের গ্রাম হইতে কুটির শিল্প উপিয়া পিয়াছে ছুই পাচটা জাতির মজুরেরা জোর হাতে কল ঘুরাইলেই সারা ছনিয়ার শিল্পের অভাব মিটিয়া যাইতে পারে, ইহা যাচ্ছেও তাই, অজ ভাতের কথা ছাড়িয়া দিই, ভারত এখন ইহার জন্ত কুটির শিল্প হারায়া বসিয়াছে। অথচ ছনিয়ার তুলনায় অতি অল্প সংখ্যক কলের মজুরী পাইয়া তাদের অতি অল্প সংখ্যক লোক সম-স্থান করিতেছে—ইহা হইলে ভারতে হা-অন্ন হা-অন্ন হইবে না কেন? আর সর্লোপেপা পল্লী গ্রামেই তাহা হইলে অজবাহ মূর্ত হইয়া উঠিবে!

এ-পল্লীতে তাই লোক টিকিতে পারিতেছে না—যা ছুই একটা কল ভারতে হইয়াছে তাহাতে কল লইয়া, অথবা শাসন-যন্ত্রের কেন্দ্র-স্বরূপ যেমন পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া দৈত্যপুত্রীর উচ্চ দেওয়ালের যেয়ার মাথা গুঁড়িয়া বাস করিতে আরম্ভ করে, তেমনই

ও ভ্রম সকল শ্রেণীর পঞ্জীবাসী গ্রাম হইতে চলিয়া আসিতেছে—গ্রামে গ্রামে কার্খার পরিচালনার মত উদারচেতা ভ্রলোক (Gentleman) মিলে না, আর সত্যি গ্রামে তেমন লোক নাই যিনি গ্রামের প্রত্যেক পুরুষ দ্বী ও বালক বালিকাকে চিনেন, যিনি প্রত্যেকের স্বার্থ অধিকার করেন, যিনি কাহারও একতিল অস্বাধ হইলে তাহার প্রতি রোষকটাক্ষ তাহাকে স্তম্ভ করিয়া তুলেন। যাহা হউক ভারতের তথ্য বাস্তবায়ন পঞ্জীগ্রাম সমূহের এই অতি চুপের দৈর্ঘ্য ও কদমল মুহুর্তি কিন্তু সকলে বেশ অস্বস্তি করিয়া লইয়াছেন, পণ্ডিত বঙ্গবাসীর হাত-তাল্পের এই কল-নিরবধি প্রতিভাত হইলেও একান্ত নিরবধি নয়।

প্রতিকার

এখন ইহার প্রতিকারের আগ্রহ তাই অধিক—সকলেরই ধারণা, গ্রামের সমাজ নষ্ট হইয়াছে, কুটার শিল্প নাই, কৃষি ও কৃষকের অবস্থা ভ্রষ্ট, গ্রামের ভ্রলোকদিগের হাতে গ্রামপরিচালনার কোন ক্ষমতাই বর্তমান নাই। এখন গ্রিক গ্রামের এই অবস্থাটাই নাই, বিশ বঙ্গবাসী পূর্বে ইহা একান্ত নয়-মুণ্ডিতে বিরাগ করিত।

গভর্নমেন্ট কর্তৃক গ্রামা ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠার দ্বারা গলদ থাকুক, ইহার দ্বারা এমনকি তৎপূর্ব চৌকিদারী ইউনিয়ন দ্বারাও গ্রামে গ্রামে যেন একটা নাগরিক জীবন এবং গ্রামবাসী-দিগেরই দ্বারা পরিচালিত নাগরিক জীবনের আভাস অবগত হওয়া যায়। লোকাল বোর্ড ও জেলা-বোর্ডের পাতলা প্রভাবও গ্রামের বায়ুকে একটা নতুন চেতনার দিকে টানিতে থাকে—কিন্তু ইহাতে জীবনের সাদা নাই, পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটের অন্তর্লিহেনই হইতে নাগরিক জীবন ফুটিত

পায় নাই। এইরূপে কো-অপারেটিভ সোসাইটার কাধাসমূহও যেন জড়তামূলক।

স্বদেশী যুগে ও নন-কো-অপারেশন যুগে বিশেষতঃ নন-কো-অপারেশন যুগে অনেক গ্রামে কংগ্রেস কমিটি, গ্রামা সমিতি প্রভৃতি স্থাপিত হয়, ইহাদের অনেকগুলি উন্নতি গিয়াছে। কিন্তু ইহাদের দ্বারা নাগরিক জীবনের উন্মেষ ও চরকা প্রভৃতির প্রচলনের একটা ইঙ্গিত পরিলক্ষিত হইতেছে—এইবার স্বরাজ্য দলের গ্রামা সংগঠন প্রচেষ্টায় গ্রামে গ্রামে স্বাধীনীতি ও নাগরিক জীবনগঠনের শৃঙ্খলা জাগ্রত। খুঁই সম্মাননা পূর্বোক্ত কাধা সম্পাদনে বোম্বেল রায়দিত লীগ, পঞ্জীশ্রী-সং প্রভৃতি রাষ্ট্রনীতির সহিত সম্বন্ধ না রাখিয়া বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছেন। কিন্তু গ্রাম যে নাই, গ্রামে ভ্রলোক এমন কি কৃষক-ও চাষ বা কুটার শিল্পের দ্বারা দিন গুজরাণ করিতে পারিতেছে না, গ্রামের মালেকেরা যে ছাড়ে না, কম খাইয়া খাইয়া তারা জরাহরক তাড়াইবে কি করিয়া!

তজ্জ্ঞ গ্রামে কুটার শিল্পের প্রচলন, ম্যালেরিয়া নিবারণ, দেশ দেবোত্তর গ্রহণ পুরুষ কৃষি ও সামান্য কুটার শিল্পে নির্ভর করিয়া যুবকদিগের ব্যবসায় কৃষক ও সাধারণ লোকদের সহিত বসবাস করা, আবশ্যক হইয়াছে। সরকারী, বেসরকারী সকল উপদেশেই ইহার ইঙ্গিত বহিয়াছে।

চরকা ও কুটারশিল্প

মহাত্মা গান্ধী ত গ্রামবাসীদের জ্ঞান পাগল তিনি ধরিয়া লইয়াছেন, কৃষির দ্বারা কৃষকের পেট ভরিবে নী, কৃষির সহিত ঘরে বসিয়া তাহাকে একটা কাজ করিবার সুবিধা করিয়া দিতে হইবে; চরকাই অস্বাভাবিক সর্বজনীন হইয়া কৃষকের

অগ্র-কর্তা নিবারণ করিতে পারে, তাই তিনি চরকার জ্ঞানই প্রাণ দিয়াছেন—তাঁহার মন্বীর্ণিত অসংখ্য-যোগীণ্য বাস্তবায়ন কয়েকটা উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান করিয়াছেন।

এতদ্বিন্ন সরকারী বিবরণী পাঠে বুঝা যায়, বাস্তবায়ন অস্বাভাবিক কুটার শিল্প নাই বলিলেই হয়—বাহা! আজ তাহাতে কৃষকদিগের কোন লাভে আশিবে না, কৃষকদিগকে যদি বাঁচিতে হয়, সোজা-স্বাভাবিক বুঝা যায়, তাহাকে কৃষকের সংখ্যা বাড়াইতে হইবে। পুরুষপেট পাট হইয়া কৃষকদিগের অবস্থা কিরিয়াকে, পশ্চিমবঙ্গে চীনা-বাদাম তুলা প্রভৃতির প্রচলন হইলে ও অস্বাভাবিক লাভজনক কৃষির প্রবর্তন হইলে তবে কৃষকের অবস্থা কিরিতে পারে।

জমির উপর অধিকার

তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে এই কুটার শিল্পের সঙ্গে কৃষির দিকে ও নজর দিতে হইবে; কিন্তু কৃষকের আয় যদি পাঁচভূতে খাইয়া লয়, সে-চেচারা মতই খাটুক তাহার পেটের ক্ষুধা দূর হইবে না, আর ইহার জ্ঞান কম খাইয়া সে ম্যালেরিয়ায় ভুগিবে এবং তাহার শ্রমের শক্তিও কমিয়া যাইবে। তজ্জ্ঞ সকল দিক বজায় রাখিয়া রায়তদিগের যেমন জমির উপর অধিকার দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তেমনই বাহাতে ঠিকা প্রজ্ঞা, কোম্পানী প্রজ্ঞা এবং আদিয়ার ও বর্গাদারদেরও অধিকার কিছু পাকা হইয়া যায়, তাহাও করিতে হইবে। সর্বোপরি করিতে হইবে

সেবা

যোগে সেবা, স্বগড়ায় মন্যমত্তা করিয়া সেবা, সামাজিক ও কো-অপারেটিভ জীবনগঠনের জ্ঞান সন্তুপদেশ ও শিক্ষা দানে সেবা—এইরূপ বড় বিচিত্র দিক দিয়া আজ গ্রামের সেবার যুবক-দিগকে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। আমরা বুঝিয়াছিলাম, সরল জীবন যাপন করিয়া গ্রামে গ্রামবাসীদের চায় (প্রচারক নয়) যদি বাস করিবার যৈশা ও সাধনবল অর্জন করা যায়, তাহা হইলে গ্রামোন্নতির সত্য বীজ নিহিত হইতে পারে; আমরা এইদিকেই অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। তথাপি সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন প্রকার আয়োজনের সাড়ায় আমরা নতুন জীবনের লগ্ন দেখিতেছি—এই জীবনকে জাগ্রত করিয়া পঞ্জী-গ্রামের জুড়শা দূর করিবার প্ররুধ কন্ধ্যা কে তাহা ভগবানই জানেন। পঞ্জীগ্রামের উন্নতির জ্ঞান বিপুল কণ্ঠতালিকা দেখিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। সকল কণ্ঠেরই স্বর নির্ধিত হয় দেশ-পীড়িত কন্ঠ-ধারায়, এই কন্ঠকে বকে ধারণ করিয়া দেশবাসী গ্রামের দিকে ধাবিত হও—গ্রামই তোমার স্বাধীনতা, তথায় তুমি আত্মজ্ঞান হইতে তোমার স্থান হইবে না—তাই বলি, দেশ জ্ঞাত ও ভগবানকে জাগ্রত করিতে আজ বাস্তবালীকে গ্রামের জুড়শা আত্মহুতি দিতে হইবে। এখন আর ফাঁকা কথা কাক নয়—হে ভগবান! আমাদেব সকল ফাঁক বুঝাইয়া দাও।



তরুণ রিফ জাতির পক্ষ হইতে আমি উদার
মার্কিন জাতিকে অভিবাদন জানাইতেছি। রিফ
আজ যুদ্ধবৃত্ত-মুক্তিরই জয়, যুদ্ধজনিত-সকল
দুঃখপাক আজ তাহাকে ভোগ করিতে হইতেছে।
তাহাদের আশা-একদিন আপনাদেরই মত
তাহারা অবস্থাপ্রাপ্ত হইবে-যে অবস্থা বহু চেষ্টা

ও প্রাণপাত আত্মত্যাগের ফলে অধিকার করিবার জন্ত রিফোর্মেরই মত আপনাদেরও যৌবন প্রাপ্তির দিনে, আপনারা আশাহরুপ যোগসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

আমার জাতি, আপনাদেরই মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া, আজ চারি বৎসর যাবৎ তাহাদের মুক্তির জন্ত তপস্বী করিতেছে—তাহারা যে কোনও প্রকার ত্যাগের জন্ত চির প্রস্তুত, আর তাহাদের

বিশ্বাস, ভ্রান্তপথে—যে কেহ দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে আত্মদান করিতে পারে, সেই অবধারিত সভ্যলক্ষ্যে পৌঁছিবেন।

আজ আমি আপনাদেরই একজন সম্ভাবনপূর্ণ সৈবীর (তিনি বড় উদারচিত্ত ও অমায়িকহৃদয় মাহারী) প্রদত্ত স্বেগে লইয়া আপনাদিগকে সজ্ঞাঘা প্রেরণ করিতেছি—নমস্কার গ্রহণ করুন।

ইতি

শাঃ—মহম্মদবিন আবদুল করিম

লাতিন আমেরিকার প্রতি

আবদুল করিমের বাণী

প্রিয় ভ্রাতৃগণ,

বিউনো এয়ারের (Buenos Aires) পুণো রেনোভেসিয় (Grupo Renovacion) কর্তৃক সাধর আশ্রয়শ্রম উত্তরসরুপ আমি মানন জনয়ে নিখিল লাতিন আমেরিকার ভ্রাতৃবৃন্দকে, তাহাদের পরাধীনতা হইতে মুক্তির এই বিজয়োগ্যস দিনে, এই গৌরবময় মুহূর্ত্তে আমাদের অভিনন্দন জানাইতেছি।

প্রত্যেক জাতি আপনাকে আপনি শাসন করিবে, আপন প্রকৃতি ও প্রেরণাহুয়ারী শাসনতন্ত্র গঠন করিয়া লইবে, ইহার চেয়ে পুণ্যতর, অপরিসীম অধিকারনীতি আরনাই। আয়াকুচোর (Ayacucho) শত বাৎসরিক উৎসবাহুটানের বিজয়ধ্বনি মুক্তি-সমগ্রামতর প্রত্যেক জাতির অন্তরে আজ মহাহুত্বতির স্বরার ভুলিতেছে; এবং ঐতরুপলক্ষে আমি বিক্ষ-গণতন্ত্রের অস্বাধী প্রতিভুরূপে, ত্রায়া উৎসাহের সহিত আপনাদের আশা ও আনন্দের অংশ গ্রহণ করিতেছি।

মরক্কোর বীরজাতি আজ সেই আদর্শের জন্তই সংগ্রাম করিতেছে, বাহার জন্ত নিরাম্মা, মরেনো, বলিভার ও সান মার্টিন জীবন তালিয়া গিয়াছেন। আপনাদের এই জাতীয় বীরগণকে চিরদিন আমি ভালবাসিয়াছি ও পূজা করিয়াছি, এই সে-দিনও আমিও এবং মার্টিন গৌরবময় বীরকীর্ষি শ্রবণে আমাদের জনবহুলকে কটকিত হইয়া উঠিয়াছিল। আমাদের জাতীয় সাধনায়, ধর্ম্মাহুত্বিত ও শিক্ষাচর্চায় এমন গুণাবলীর অধিকারী করিয়াছে, যে কোনও ইউরোপীয় জাতির অধীনতা বহন করা আমরা কিছুতেই সক্ষ করিতে পারিব না। শতাব্দী পূর্বে আপনারা যেক্ষ জাতীয় মুক্তির সমুদ্রার করিতে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, আজ আমরাও সেইরূপ জাতীয় স্বাধীনতার পূজা-বেদিকায় আমাদের জীবন-সোভাগ্য তালি দিতেছি।

মহাদেবে বিকৃত-প্রকৃতি ও ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যা-লালসায় নীতিভেদ ইউরোপ আজ অত্মদেশ ও জাতির

ভ্রাতা, ১৩০২]

মহদলন

২২৭

উপর বীথ ভাব ও ইচ্ছা চাপাইবার অধিকার হারাইয়াছে। আমরা শান্তি ও সামাজিক জায়াধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত একটা নব সভ্যতা রচনা করিতেই চাই। আরববংশীয় আমরা নানা জাতি ইলগও, ফ্রান্স, ইতালী ও স্পেনের অধীনতাপাশ হইতে মুক্তি লাভে ব্যাকুল হইয়াছি। ইঙ্গিরে আমাদের ভ্রাতৃগণ প্রথম আঘাত হানিয়াছে, এবং আমি বিশ্বাসভরে আশা করিতেছি, ভ্রগৎ এবার দ্বিতীয় আঘাত এই মরক্কোতেই দর্শন করিবে। তার পর আলজিয়ার্স, টিউনিস ও টিপোলি-মেখানে মেখানে যতগুলি জাতি মহামুক্তির প্রতীকায় আপনাদিগকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছে, একে একে সকলেরই দিন আসিবে।

আমাদের উদ্দেশ্য জায়াহুমোদিত, ঠিক যেমন আপনাদেরই ছিল। স্পেনের প্রতি যুগার ভাবের দ্বারা আমরা প্রণোদিত নহি, সে যে আমাদের পুণ্যতন পিতৃভূমি—অদিপুঙ্খগণের জন্মভূমি। সকল শিক্ষিত স্পেনবাসীই জানেন, তঁহাদের শিক্ষ-কলার স্বর্ণগুণে, তাহাদের জাতির অধিকাংশই ছিল—আরববংশীয়। আর যে মন্দিরগণ, এক যৌর ধর্ম্ম-যুদ্ধের ফলে, আমাদেরই শিরকলাগোন্দ্যভূতিত ও শ্রমসাধনায় সমৃদ্ধ উপবীপের কোড়চাত আমরা হইলাম, সে কাল-মুহূর্ত্ত হইতে সেই প্রিয়ভূমি অধাপনাদের অতল গর্ভরে ডুবিয়াছে, বৃষ্টি আর উত্তিয়ার সম্ভাবনা নাই।

স্পেনের ক্যাথলিক ধর্ম্মী যোদ্ধাশ্রেণীর দারুণ দুর্ভিক্ষিলে, সমগ্র জাতি এক উদ্ভ্রাণ, সর্বশাসনকর সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছে, বাহাতে মরক্কো আজ তাহার অঙ্গে সম্ভানগণের শাশন চিত্তা সাজাইয়াছে, অতল ক্ষম-কূপ ভরাহিতে আপনার ধনভাণ্ডার নিবেশণ করিয়া তালিতে হইয়াছে। স্পেনের যুবজনকে আজ এখানেই দলে দলে মরিতে পাঠান হইতেছে, যেমন

শতবর্ষ পূর্বে আঙিসের উপত্যকাক্ষেয়ে ও ত্রিশ বৎসর পূর্বে কিউবার জরাকান্ত জলাভূমিতে তাহাদের পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

এই হত্যাভাণ্ড আমরা বুগ করি। আমরা চাই স্পেনিয়াভগণ এই বার্ষ বীরত্ব প্রকাশে বিরত হইয়া মরক্কো ছাড়িয়া চলিয়া যাক, যেমন একদিন তারা আমেরিকা ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছিল—তবেই আমরা শান্তি, শির ও জান সাধনায় নিরীক্সাবদে শ্রম তালিয়া, আপনাদেরই মত জাতিসংজ্ঞের সাত্-পরিসারে আমাদের যোগ্য স্থান অধিকার করিতে পারিব।

আমি আপনাদিগকে ভ্রাতৃসম্মুখেই সন্ধানন করিতেছি, কারণ আপনাদের ধর্ম্মনীতি যে স্পেনীয় রক্তপ্রবাহ উহা মূলত: আরব—এমনি আরব রক্ত লইয়াই উপত্যকার দক্ষিণাধিবাসী স্পেনিয়াভগণ পালে, দেউল ও কাউজ হইতে অভিবানে বাহির হইয়াছিল—আপনাদেরই আমেরিকায় আরব-ভাব প্রচার করিবার জন্য। অবাপি তাহার প্রভাব অত-ধর্ম্মের পতাকালে দোড়াইলেও, আপনাদের গোচোস (Gauchos) ও লানেরোসে (Leanceros) স্পন্দিত হইতেছে।

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, রক্ষণতন্ত্রের প্রত্যেক নাগরিক আজ আরার কাছে আপনাদের উভিত ও হুৎকামনায় যে প্রার্থনা করিতেছে, আপনারা তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করুন। সেই-সঙ্গে আপনাদেরও স্বধিদের কাছে, এই প্রার্থনা জানাইতে অহরোধ করিতেছি, যেন সেই দিন আসে যেদিন আমাদের স্বাধীনতা হুৎযোগ্যে নব উদার হুতনা হইবে, যেমন আপনাদের ইতিপূর্বে হইয়াছে।

আয়াকুচোর যোগৌরবপূর্ণ সাধৎসরিকের উৎসব-প্রেরণা আজ প্রত্যেক পর-পাণ্ডিত জাতির জনয়ে উৎসাহ সঞ্চার করিতেছে।

অমূল্য শিক্ষা দ্বারা শত সহস্র প্রাণ বিকসিদ্ধি আমাদের স্বাধীনতা সম্পত্তি রক্ষার জন্য উৎকৃষ্ট হইয়াছি।

আমরা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সংগ্রাম করিয়া যাইব; যত দিন না আমরা ভূমধ্য সাগর ও পূর্ব এশিয়ার উপকূলবর্তী সমগ্র আরবজাতির মুক্তি বিধান সম্ভব করিয়া তুলিতে পারি। স্বাধীন মর ও স্বাধীন মিশর যুদ্ধত্ত্বের মত সেই মহাজাতির নবাত্ম্যদয়ের উৎস-স্বরূপ হইবে, যাহারা বার বার তিনবার বিশ্ব-মানবকে তিনটি মহনীয় সভ্যতার অবদান দিয়া পৌরষাভিত করিয়াছিল।

প্রিয় ভাতৃগণ, আজ মুরজাতি আমার কর্ণ দিয়া তাহাদের হৃদয়ের সন্ধাননি তাক্সা রক্ত মিশাইয়া এই যে বার্ষিক প্রেরণ করিতেছে, তাহা আপনারা সহানুভূতি সহকারে শ্রবণ করুন। বলা বাহুল্য, আপনারদের সহানুভূতি চাহিতেছি, তাহার মানে এ নয় যে আমরা আপনারদের স্পেনের বিরুদ্ধে শত্রুতা করিতে থাকিতেছি। স্পেন যে দিন হইতে আপনারদের পুণ্য স্বাধীনতা অধিকার স্বীকার করিয়াছে, সেইদিন হইতে তাহাদের সহিত আপনারদের সকল বন্ধ মিটিয়াছে। আমরাও আয়াকুচোর পর আলোর রূপাণ ও আমাদের বীরদের গুণে পরিণামে যে জয়গৌরব অধিকার করিবই করিব, তাহার ফলে স্পেনকে আমাদের স্বাধীনাদিকার স্বীকার করিতেই হইবে;

সেদিনই আমরা তাহার সহিত পুরাতনী, প্রিয়া সখীমোচিত আমাদের পুন্স-মৈত্রী-সম্বন্ধের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিব।

আমাদের এই ছুঃখ রহিল যে যুদ্ধের দরুণ ও ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শাসনতন্ত্রগুলি আমাদের স্বীকার করেন না বলিয়া আয়াকুচোর বিজয়োৎসবে আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিলাম না: কিন্তু নিশ্চয় জানিবেন, আমরা এক শতাব্দী অস্ত্রে দ্বিতীয় সাধাৎসরিকের আর প্রতীক্ষা করিব না; পরন্তু তৎপূর্বে আপনারদের শাসনতন্ত্রের সহিত স্থায়ী ভাতৃত্ব ও সংস্বাহ্যে সম্মিলিত হইতে পারিব— আর এই সম্বন্ধ প্রচলিত ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের কূটনীতিহুল্লদ চাতুরী ও ভগাবীভাৎপ্রস্থত নহে, পরন্তু অকপট, সহজ, সরল স্রীতির প্রণোদনা লইয়াই সংস্থাপিত হইবে।

প্রিয় ভাতৃমণ্ডলী, মুরজাতি আজ দিনে দিনে শত্রুপরিভ্যক্ত রশকৃষ্মিতে আগাইতে আগাইতেই এই কথাগুলি আপনারদের প্রতি নিবেদন করিল— আর আপনারদের শত বার্ষিক আয়াকুচো উৎসবে তাহারা তাহাদের অন্তরের যোগাহকৃতি জ্ঞাপন করিল—আর হায় আপনারদের এক বন্ধুকে প্রেমূণ করিয়াই—

ইতি—আবদুল করিম—

বিফণবরাষ্ট্রের সাময়িক তত্ত্বপতি।

সমালোচনা ও পুস্তকপরিচয়

শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজির জীবনের ঘটনাবলী

—১ম ভাগ (সেবা—স্মৃতি)। লেখক শ্রীমহেন্দ্র নাথ দত্ত। মূল্য ১০ মাত্র। বছরদিনের পর ঠাকুর রামকৃষ্ণের ও পুণ্যপাদ স্বামীজির পুণ্য-স্মৃতি-বিশুদ্ধিত একখানি মূল্যবান ও স্বয়ংগ্রাহী স্মৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। এই উপদেশ বহুখানি পড়িয়া আমার পদম পবিত্র লাভ করিয়াছি। লেখক প্রভাসদর্শী ও ভাবগ্রাহী—সেই পুণ্য নরপীলার একজন জীবন্ত সাক্ষীস্বরূপ। তাঁর স্মৃতির পঞ্জিকা হইতে বিনাক্ষণে পারস্পর্য না রাখিয়াও যে অমূল্য চরিতাভ্যাস ও ঘটনার নিদর্শনগুলি বিবৃত করিয়াছেন, তাহার মধ্য দিয়াই একটা শব্যায় যুগ নির্ধারণের সজীব আলোচনা যেন চক্ষের সমক্ষে আবার স্ফুটাই উঠে। তাঁর বর্ণনার তরঙ্গী ও বড় জীবন্ত, প্রত্যক্ষাভিজ্ঞতা-মূলক ও আন্তরিকতাপূর্ণ। এগুলি যেন স্মৃতির স্রোতে ভাসিয়া আসা ফুল গুলিকে পুনঃ স্বপ্নের কল্পনার স্ফেদে বাঁধিয়া বাতবতা পূর্ণ ছবির মত আঁকিয়া দেখান হইয়াছে। পড়িতে পড়িতে একটা যুগান্তরের কোলে গিয়া পড়ি। সত্যই ধ্যানলোকে ঠাকুরের স্মার্য্যকৃতিপ্রাপ্তাঙ্গি দ্বিগুণক ও ভক্ত-মণ্ডলীর সঙ্গে আগতে, বিহারে, শ্রমণে, উপবেশনে, কথাবার্তার যেন সঙ্গী ও সহচররূপে মিশিয়া যাইবার অধিকার পাই। এ বড় কম পুণ্যময় অধিকার নয়।

লেখক বলিয়াছেন—“.....মঠের প্রত্যেক

বস্ত্রই স্মৃতি অতি পবিত্র, অতি মধুর। রামকৃষ্ণ মিশন যে শক্তি এখন প্রকাশ করিতেছেন তাহা কানী-পুর উজান ও বরাহনগর মঠের স্মৃতি হইয়াছিল।” ঐখানেই যে বন যুগ নির্মাণের অধ্যায় ভিত্তি গঠিত হইয়াছিল, তাহার নিম্নে ইতিহাস এখনও আমরা মারাখানি তুলিতে পাই নাই। “ঘটনাবলীর” লেখক তাহারই কতক স্মৃতি উদ্ধার করিয়া, আমাদের সমুখে ধরিতে, আমরা প্রাণ ভরিয়া সেই পবিত্র জীবন সাধনার কথা পাঠ করিলাম। এখানি প্রথম পত্র—আমরা আরও অধিক মাত্রায় পুণ্যচরিতপ্রসঙ্গ তুলিবার আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে রাখিয়াই এই বইখানি সর্ব সাধারণের কাছে সমাদর আশায় ও প্রতীক্ষায় রাখিলাম।

মহাজ্ঞাজীর বাণী—বা চরকা। ত্রিবিধ লাল চট্টাপধ্যায় প্রণীত, মূল্য ১০ আনা মাত্র। লেখক চরকা-মতদ্বীপ চরকার ঋষি মণ্ডাখার অমূল্য বাণী-গুলি সংগ্রহীত করিয়া বাঙ্গালী পাঠকবর্গকে উপহার দিয়াছেন। এক্ষণ পুস্তকের পরিচয় বাহুল্য মাত্র। মহাত্মার একটা বাণী উদ্ধৃত করি:—“যখন কোনও ব্রাহ্মি অনাহারে কষ্ট পাইতে থাকে অথবা কোনও কার কহে না, তখন একটা মাত্র স্মৃতিতে ভগবান দেখা দিতে সাহস পান। সেই স্মৃতি হইতেছে কাজ এবং কাজের মজুতীস্বরূপ অন্ন।”—আমি কষ্টের দেবতাকে বাঙ্গালী সাধাবন করণ—তাঁহা হইলে মহাত্মার বাণীর প্রকৃত মর্যাদা রক্ষিত হইবে।



লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ

[লেখক—শ্রীহরেন্দ্র নাথ দত্ত]

১৮৯১ খৃষ্টাব্দের মার্চের শেষ বা এপ্রিলের প্রথমে B. S. S. N. Company. "Rewa" নামক কাগজে করিয়া স্বামী সারদানন্দ লণ্ডনে গমন করেন। পূর্বেই E. F. Sturdyর সহিত ইংলণ্ডে আসিয়া বক্তৃতা করিতে মনস্থ করিলেন। চিঠি পত্র বেধা ছিল, সেই জন্ত স্বামী সারদানন্দ লণ্ডনে পৌঁছিলেই Sturdy আসিয়া তাঁগকে Reading নগরে আপন তখনে লইয়া যান এবং উভয়ে তথায় একত্র বাস করিতে লাগিলেন। Sturdy পূর্বে থিরোজ্জিই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং ভারতবর্ষে আসিয়া হিমাচল প্রদেশে ভাড়া লইয়া যোগাভাস করিবার জন্ত একটি বাড়ী ভাড়া লইয়া তথায় কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। আগমোড়ায় অধস্থানকালে শিবানন্দ স্বামীর সহিত Sturdyর বেশ সখা হয় এবং কিছুদিন পরে উভয়ে এক সঙ্গে মাজাজে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। যাহা

হটক, Sturdyর সহিত স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকা হইতে পত্রাভি চলিতে লাগিল এবং Sturdyইই অল্পনয়ে তিনি আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে আসিয়া বক্তৃতা করিতে মনস্থ করিলেন। ১৮৯৪ বা ৯৫ সালে স্বামী বিবেকানন্দ একবার ইংলণ্ডে আসিয়াছিলেন। আমেরিকায় অনবরত বক্তৃতা করিয়া ক্রান্ত ও শ্রান্ত হইয়া কিছুদিনের জন্ত বিশ্রাম করিবার মানসে ইংলণ্ডে আসিয়াছিলেন। কিন্তু সে বার বিশেষ কোন প্রচার কার্য করেন নাই, হুই এক মাস পরে পুনরায় আমেরিকায় ফিরিয়া যান। ১৮৯৬ সালে এপ্রেল বা মে মাসেতে তিনি পুনরায় আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসেন। স্বামী সারদানন্দ কলিকাতা পরিত্যাগ করিবার এক সপ্তাহ পরে বর্তমান লেখক আইন অধ্যয়ন করিবার জন্ত লণ্ডনে গমন করেন, কিন্তু আইন

ভাষ্য, ১৩০২]

লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ

৩০১

পড়িতে স্বামীজী নিবেদন করায় বর্তমান লেখক অল্প বিষয় অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। স্বামীজী "বাল্পতাম্ অভিদানম্" চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন, সেই জন্ত বর্তমান লেখক লণ্ডন যাত্রাকালে আপনীর সহিত স্বামীজীর জন্ত একটি বাগ্ধ করিয়া 'বাল্পতাম্ অভিদানম্' লইয়া যান।

স্বামীজী আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তন করিয়া রেডিং নগরে Sturdyর বাড়ীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। স্বামী সারদানন্দ সেই সময় Sturdyর বাড়ীতে কয়েক দিন পূর্ণ হইতেই বাস করিতে ছিলেন। ক্লফমেনন্ নামক কঠিনক মাজাজী যুবক একদিন আসিয়া বর্তমান লেখককে বলিলেন, যে "Sturdy, Lady Murgusan এর সজ্জিত বাড়ী ভাড়া করিবেন, Lady Murgusan তাঁহার সম্বানাদি লইয়া কয়েক মাস অগ্রজ বাস করিতে মনস্থ করিয়াছেন।"

সজ্জিত বাড়ীর অর্থ যে বাড়ীর রন্ধনের তৈজসাদি, পরিচারকগণ, আসবাব সম্বন্ধে ইত্যাদি যাহা কিছু আবশ্যক হইতে পারে, সে সমস্তই পাওয়া যাইবে, শুধু নিজের পরিধেয় বস্ত্র লইয়া প্রবেশ করিতে হইবে। স্বামীজী, সারদানন্দ স্বামী, বৃদ্ধা Miss Henryata mullar ও J. J. Goodwin, Lady Murgusan এর বাড়ীতে সকলে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। বর্তমান লেখক তখন একই ঘরে অপর গম্বীর একটি বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন। ক্লফমেনন্ আসিয়া বর্তমান লেখককে 57 Saint George Street এর বাড়ীতে লইয়া গেলেন। স্বামীজী জ্ঞানদা করিয়া বর্তমান লেখককে একটি কলম দিলেন। এই কলমটি উপহার স্বরূপ স্বামীজীকে আমেরিকায় একজন দিয়াছিলেন। অতীতে যে রকম মাদা ভোয়া-কাতা নীল পাথর থাকে, সেই রকম পাথরের হাতল, নিব্টি ও নিব

বসাইবার স্থানটি দোণার ছিল। কলমটি খুব মৃণাল ছিল। বর্তমান লেখক সেই কলমটি তাহার ছোটভাই, বর্তমানে ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম. এ. পি., ই.ই. ডি.কে ডাকযোগে পাঠাইয়া দেন, কিন্তু চতুর্ভাগ্যবশতঃ ডাকওয়ালাদের হাত হইতে তাহা আর পাওয়া যায় নাই।

বর্তমান লেখক তখন অল্পদিন মাত্র লণ্ডনে গিয়াছিলেন। বিবৃত সতর, স্বতন্ত্র আচার ব্যবহার, স্বস্তর ভাবমতীক। নিমেষের এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া, বর্তমান লেখক একটু আশ্চর্যব্রিত হইয়া একদিন পদচারণ করিতে করিতে Cheap-side এর দিকে যান। কলিকাতায় যেমন বড় বাজার কারবারের প্রধান স্থান, London এর City অংশেও (City of London) Cheap-side ও তরিকট স্বানগুলি কারবারের কেন্দ্র-স্বরূপ। অতিশয় জনাকীর্ণ। জনতা এত অধিক, যে ঘোঁরে ঘোঁরে পদবিক্ষেপ করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। যাওয়া আসাও জন্ত সর্বস্বাধি যেন লোক-সমূহ চাপ-জমাট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এমন কি বৃষ্টি বা বরষা হইলে ছাতি পুঁলবার উপাধা নাই, তাহা হইলে ছাতিটা অপরের মাথায় লাগিয়া যাইবে এবং ছাতি পুঁলবারও আমোদ স্থান নাই। কলিকাতায় যেনা বা উৎসব উপলক্ষে কখনও কখনও যেক্রম লোকসমাগম হইয়া থাকে, এই City of London এ বেলা ১০টা থেকে ৪টা পর্যন্ত ঠিক সেই ভাবের লোক সমবেদ হইয়া থাকে। মোটকথা, যদি জনসমূহের মাথা ও উপর একখানি তক্তা কেবলি দেওয়া যায়, তাহা হইলে বোধ হয় তাহার উপর দিয়া কয়েক মাইল পরি-ভ্রমণ করা যাইতে পারে। এই City of London সমস্ত পৃথিবীর কারবারটি নিজের হাতে রাখিয়াছে ও চালাইতেছে।

স্বামীজী, সারদানন্দ স্বামী ও Goodwin তিনজন Cheap-sideএর একটা চৌমাথার কোণে ঠাঁড়াইছিলেন। বর্তমান লেখকও মহা-জনতা দেখিয়া, অবাক হইয়া একদিকে ঠাঁড়াইয়া আছেন। Goodwin অপরিচিত সাধারণ ইংরাজের ভায় একজন হইয়া গিয়াছেন। সারদানন্দ স্বামীকে চিনিতে পারা যায়, কিন্তু স্বামীজীকে বহু বৎসরের পর দেখিয়া বর্তমান লেখকের চিনিতে একটু বিলম্ব হইল। ইহার একটা বিশেষ কারণ এই যে, কলিকাতা বা বাংলাদেশে যে নরেন্দ্র নাথ ছিলেন, সে লোক আর তখন নয়, তিনি বতর অপর এক ব্যক্তি হইয়াছেন। বর্ষ ধর্ম্মে ফরসা, মাথায় ঘদিও অর্দ্ধচক্রাকৃতি শাড়ীর তাল্পের মতন কালো মোটা কাপড়ের টুপি ছিল, কিন্তু মাথার সম্মুখেতে দি'বি-কাটা দেখা যাইতেন। পরিচানে কালো রংএর ইজের, কালো রংএর ভেট্ট এবং গলায় কলার ছিল, কিন্তু টাই ছিল না। লম্বা একটা আলপাশা চোগা ছিল। চক্ষুর স্বর্নাব ও প্রশান্ত, চক্ষুর পাতার নিম্ন প্রান্তে দাঁত এবং অঙ্গিষ্ঠ মাথার নোকে অগেঁকা ক্রিম-পরিমাণে স্বর্নাব ও বিক্ষারিত এবং নেত্র হইতে মদ্যোজঃ ও আকর্ষণ-শক্তি বাহির হইতেছে। চক্ষুর বতর ভাবে পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত হইয়াছে। কণ্ঠের অতিশয় গম্ভীর ও তেজঃপূর্ণ এবং শব্দস্রোত বহুদুগুণী। গায়ের বর্ণ অনেকটা উজ্জল বা হাফকে ইয়ারিতে Fairbrown colour বলা যায়, হুদু white নয়। আকস্মিক এভাবে দেখিতে বর্তমান লেখকের একটু ইতস্ততঃ ভাব হইয়াছিল, সেই জ্ঞাত চিনিতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল। বাহা হউক, কথাবার্তা করিয়া সকলের প্রস্থান করিবে।

বর্তমান লেখক পর দিন মেননের সহিত Saint Surgeshut বাটতে যান। দেশের পট্টা কথ

কহিয়া, স্বামীজী বর্তমান লেখককে অপর একটা ঘরে লইয়া যান। ঘরটিতে অপর কেহ রহিল না, তখন স্বামীজী বর্তমান লেখকের মনের ভিতর কি ভাব হইতেছিল এবং কয়েক দিন ধরিয়! কি চিন্তা করিয়া ছিলেন, সমস্ত পড়া পুথির দ্বার বন্দিয়া বাইবে লগিলেন, কোন ভাবিধা চিরিয়া নয়, স্বাভাবিক ভাবে বসিতে লাগিলেন, এবং প্রত্যেক কথাগুলি সত্য হইয়াছিল।



স্বামী বিবেকানন্দ

তাঁহার পরেই পুনরায় নোঁচেরকার বৈঠকখানা ঘরটিতে আসিয়া স্বামীজী আবার স্বাভাবিকভাবে কথা কহিতে লাগিলেন এবং সোপার কলমটি ধিলেন। এবং পুনরায় পূর্ণতন বাদ্যনা সোপার নরেন্দ্র নাথ হইয়া বেশ হালি তামসার ভাবে কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। বাহা হউক, স্পষ্ট বোঝা গেল যে পূর্ণতন নরেন্দ্রনাথ আর নয়, পূর্ণ মেখে বিবেকানন্দ

ভাঙ্গ, ১৩০২]

লগুন স্বামী বিবেকানন্দ

৩০৩

নামক এক মহাপ্রকৃতি প্রবেশ করিয়াছে। এক দেহের ভিতর কখন বা কলিকাতার নরেন্দ্রনাথ বাস করে, কখন বা বিগবিজ্ঞা বিবেকানন্দ বাস করে। ভাবভঙ্গী, আচার ব্যবহার, হাত-নাড়া, আঙ্গুল-নাড়া বতর হইয়া মিলাছে। কোন কিছু ভাব প্রকাশ করিতে হইলে, বাম হস্তের এটা অঙ্গুলি দৃষ্টিত বা বিক্ষিপ্ত করিয়া ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন, ডান হাত তত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন না। কিন্তু প্রত্যেক হস্তসঞ্চালনে বা শিরঃসঞ্চালনে স্পষ্ট, নির্দিষ্ট ও নির্দ্বারিত ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হাঁ বা না যাহাই হউক না কেন, ভাবগুলি কিন্তু দ্বিধা-শুল্ক, যেন বতর লোক, পূর্বে কখনও এভাবে তাঁহার দেখা যায় নাই।

শুধু ইচ্ছা করিলে পূর্বের অবস্থায় নামিতে পারেন এবং পূর্ণ অবস্থায় স্থিত ও ভাবভঙ্গী একটু কষ্ট করিয়া আনিতে পারেন।

কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায়ও সব সময় যেন আজ-ধাতা মহাপ্রতিমান পুরুষ, সমস্ত কথাগুলি যেন Hushing, commanding voice (ঘৃণাতীত, আজ্ঞাপদ গম্ভীর স্বর)।

স্বামীজী বর্তমান লেখককে নিজের জেব হইতে ৫ পাউণ্ড দিয়া দিলেন এবং ক্রয় মেননকে সঙ্গে করিয়া পাঠাইয়া দিলেন, পথে যাইতে যাইতে ক্রয় মেননের সঙ্গে কথা হইতে লাগিল। ক্রয় মেনন বসিতে লাগিলেন, "মাত্রায়ে যে স্বামীজীকে দেখিয়াছি তিনি এমনিজন নন, এবং বাহার আমি তামাক শক্তিমান এবং যিনি আমার সঙ্গে হাসি তামাসা করিয়েন তিনি এমনিজন নন। ইহার ভিতর এখন অনেক শক্তি আগ্রহ হইয়া উঠিয়াছে, এখন যেন সমুখে যাইতে বা কথা কহিতে ভয় করে। ইচ্ছা করিয়া নিজে নিয়ন্তরে আসিয়া কথা না কহিলে, অশ্লের কথা কহিতে সাহস হয় না। একদে

যোগিক শক্তি নানা প্রকার বর্ধিত হইয়াছে," এরূপ কহিতে কহিতে মেননের কাকি পাঠিতে ইচ্ছা হইল, এবং একটা (First class) প্রথম শ্রেণীর কাকির দোকানে প্রবেশ করিলেন। ভায়তবাগিষা বিদেশের যাত্রা গল্প পান, অধিকাংশ স্থলে কাটা-ছাটা শুদ্ধ কয়েকটা ভাবনা, কিন্তু সেখানকার আচার ব্যবহার রীতিনীতি প্রভৃতি এ সকল জানিতে অনেকের ক্ষৌত্ৰহল হইয়া পাকে। এথলে যদিও গল্পগুলি অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু মাঝে মাঝে হাসি তামাসা না দিলে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইতে পারে, এই জ্ঞাত এই স্থলে এষ্ট উপাখ্যানটি প্রদত্ত হইল।

Victoria Stationর সন্নিগটে একটা প্রথম শ্রেণীর কাকি হাউস বা চাঁর শোকাই ছিল, বসন্ত বা গরমের প্রারম্ভ এই জ্ঞাত রাত্তার মায়ের দোকান-গুলিতে Oyster, কাঁকড়া, গলদা চিংড়ি ও কুঁচো চিংড়ি বিক্রয়গ্রহণ রহিয়াছে। Oyster, আমাদের বাঙ্গালা দেশে বিহ্বল যে রকম লম্বা গম্ভীর হয় সে প্রকার নয়। পূরীধামে সমুদ্রে এক হাফি পরিমাণ গোলা গোলা ঝিকক হয়, ইহা সেই জাতীয়। Oyster-এর খোয়ার মাংসখণ্ডে সাধাতে-হৃদয়ে মিশ্রনো হুড়হুড় নাগের মত শাস হয়, সেই হুড়হুড় নাগের নত শাসটা চামুচে দিয়া স্বতঃ স্বতঃ করিয়া বাইতে থাকেন, কিন্তু এতদেদীনীর লোকের স্তনিয়া ঘৃণা হইবে। ইংলওবাসীরা এই Oysterকে পরম উপায়ে বন্দিয়া গল্প করেন। আমাদের দেশে যেমন ছোট ছোট গুলি, ইংরাজ দেশে সেইরূপ ছোট ছোট গুলি হয়। এসব গুলিকে সিদ্ধ করিয়া বাজারে বিক্রয় করে, ৮-১০ দিনের পুরাতন হইতে পারে। এইগুলি একটা টানে মাত্রাণ গলায় লইয়া, একটা পিন দিয়া ভিতরকার সিদ্ধ শাসটি বিম্বিয়া বাহির করিয়া ধায়। জীলোকেরা অনেক সময় মাথার পিন দিয়া ভিতরকার শক্ত শাসটা বাইয়া থাকে, তবে বাঙ্গালা দেশে বেরূপ গুলির কোল ধায়, সেসকল এখানে হয় না। (ক্রমশঃ)

স্বাধীন বাংলার গণ শিক্ষা

স্বাধীন বাংলা কোন বিশেষ যুগের ইতিহাস নহে; পরন্তু বাংলার এবং বাঙালীর স্বাধীনতার ইতিহাস। আর এই কথা কেবল কোন শিলা-লেখ, তাম্রলিপি, কোন যুগপ্রাচীন প্রাচীরেই আবদ্ধ নহে বা লিপিবদ্ধ নাই। ইহা আছে বাঙালার বিগত ধর্মজীবনে, অতীতের পদ্ধতি প্রথা, উৎসব অঙ্গনে, ভিখারী বাড়ির পানে এবং ব্রত নিয়ম পূজা পার্বণে। সেই সব অবলম্বন করিয়া স্বাধীন বাংলার কথা বিবৃত করা হইল। ইহা কল্পনাও নহে, আবার-একান্ত বাস্তবও নহে বাস্তবের কদাল লইয়া কল্পনার মাদুরী মিশাইয়া স্বাধীন বাংলার রূপ দান করিতে চাই।

স্বাধীন বাংলার সত্য

বাঙালার একটি নিম্নস্বরূপ আছে—একটি অস্তরঙ্গ ভাব আছে—একটি একান্ত অমিশ্র ও অকৃত্রিম বৈশিষ্ট্য আছে—সেই একান্ত অবিশিষ্ট বাঙ্গলার বিশিষ্ট ভাবাদর্শ ও কর্মপদ্ধতির কথাই বলিতে হয়। যে সভ্যতা-শিক্ষা, যে ধর্মনীতি, যে যে আদর্শ শুধু নিম্নতর আলোকে প্রকৃষ্ট হয়, বাহ্যতে কেবল আপনার অস্তরের পল্লিই প্রতিফলিত হয়—তাহাই স্বাধীনতার স্বভাব।

বাংলার এমনই একটা স্বাধীন যুগ ছিল। রাষ্ট্রীয় বিপ্লব এবং স্বাধীনতার মধ্যেও বাঙ্গালীর স্বভাবটী আত্মপ্রত্যয়ে অক্ষর ছিল। একটা স্বাধীন যুগ ধরিয়া বাঙ্গালী জাতি ধর্মশাসনে, সাহিত্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে, সমাজবিজ্ঞানে নিজেদের এমন অপরূপ ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছিল, যাহা মানব জাতির

একান্ত অধ্যয়নযোগ্য বস্তু। বাংলার এই স্বাধীন তত্ত্ব জীবনসাধনাপ্রণালী এমন সহজ ও স্বভাব মনস্ত ভাবে গঠিত হইয়াছিল, যে উহা প্রত্যেক জাতিরই অমূল্য ও অমূল্যযোগ্য।

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাই একমাত্র স্বাধীনতা, মানব-জাতির এমনই একটা ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে। উহা কিন্তু সর্বাংশে সত্য নহে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা না রহিলেও স্বাধীনতা অটুট রহিতে পারে। রাষ্ট্রস্বাধীনতা কেবল শারীরিক সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে এমন নহে। স্বাধীনতা কিন্তু আত্মিক ঐশ্বর্য। উহা দৈহিক বলবতার তেমন অপেক্ষা নহে। সংগ্রামে পরাভব ঘটিলেও জাতি স্বাধীন রহিতে পারে। অস্তরে যিনি শূন্য, কারাক্ষের পাখা প্রাচীরের অভ্যন্তরেও তিনি গগনচ্যুত বিদ্রোহের অপেক্ষা মুক্ত। আত্মীয় মুক্তির অমূল্য রহিলে বাহিরে কোন বন্ধনেই তাহাকে আবদ্ধ করিতে পারে না।

তাহার পর রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা কেবলই জাতির দুর্বলতায় নহে, উহা নানা কারণে ঘটতে পারে। শত্রুর সংখ্যাধিক্য, অস্ত্রশস্ত্রের প্রাচুর্য্য ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং ছল বল কৌশল। ইতিহাসে ইহার অল্পসংখ্যক প্রমাণ আছে, নরকল্পে নিম্নয়োজন।

দ্বিতীয় কথা—অস্তর-স্বাধীনতা রহিলে যে সব সময়ে শত্রু বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে না, বরং বিজিতই অনেক ক্ষেত্রে বিজয়ী হয়, ইতিহাস তাহারও সাক্ষ্য দেয়। শত্রু-হীন ভারত আক্রমণ করিয়া, পরিশেষে ভারতের সভ্যতার কাছে আত্মদান করিয়া, পরাজিত ভারতের কাছে

আত্মদান করিয়া আত্মবিলোপ করিয়াছে, ইহাই পরাজয়।

ভারতে রাষ্ট্র-স্বাধীনতার কালে হয়তো কোন বৈদেশিক নৃপতি সিংহাসন অধিকার করিয়া কর সংগ্রহ করিতেছে—শাসন করিতেছে, ক্ষত্রশক্তি প্রয়োগ করিয়া সমস্ত দেশের কর্মশক্তিকে ধর্ম করিতেছে; কিন্তু তাহা জাতির প্রাণকে আক্রমণ করিতে পারে নাই, অর্থাৎ শিক্ষাকে নিরস্ত্রিত করিতে পারে নাই, সমাজকে বিপদভিত্ত করিতে পারে নাই, ধর্মকে বিকৃত ও পরিবর্তিত করিতে সক্ষম হয় নাই, উহা তাহার সনাতন জীবন ধারার অক্ষুণ্ণ প্রবাহেই প্রবাহিত হইয়াছে। পররাষ্ট্রের আক্রমণ একটি সাময়িক উপভ্রমের মত ঘটয়া গিয়াছে। ষট্কার অস্ত্রে প্রকৃতি যেমন পুরুষশ্রীতে প্রকাশিত হয় এই সব বিপ্লবের পর দেশও তেমনই শাস্ত ও স্বস্থ হইয়া উঠিয়াছে। অস্ত্র কোন দেশে এমন হউক বা না হউক, ভারতে ইহা হইয়াছে। কাজেই বাংলায়ও রাষ্ট্র-বিপর্য্যে এই মানসিক মুক্তির ব্যাঘাত কখন ঘটে নাই। বাংলার শরীরের শাসন যে খুশি স্বক্কর, মনের আধিপত্য তাহার অক্ষুণ্ণবতাই করিয়াছেন। এই আত্ম-স্বাধীনতার কালটাই বাংলার স্বাধীনতার কাল। আর এগুণের জীবন-কাহিনী স্বাধীন বাংলার কথা। এদময়ে সিংহাসনে হয়তো মোগল বা পাঠান উপবিষ্ট ছিল; রাজ-নৈতিক বিচারে উহা হয়তো স্বাধীনতার কাল; কিন্তু সত্য সত্য উহা মুক্তির অবস্থাই প্রমাণিত করে। আত্মা যতক্ষণ নিরায় থাকে, বাহিরের বিরুদ্ধে ঘটনায় ততক্ষণ কিছুই করিতে পারে না।

বাংলার এই স্বাধীন যুগের সময় সমাজজীবনের এমন একটা বিশিষ্ট ভঙ্গিমা ছিল যাহা, শুধুই সকল হইতে বিভিন্ন ছিল না, পরন্তু এমন মহিমা ছিল

যে তাহার স্পর্শে জীবন অমৃতময় হইয়া যায়। তাহার ফলে—সমাজে শান্তি, আলো, অন্ধারয় হয়।

স্বাধীন বাংলার কথা বাংলার সেই মহিমা যুগের শিক্ষা, জনশিক্ষা, ধর্মসভ্যতা, তপশ্শক্তি, এককথায় সমস্ত জাতির জীবনকাহী আলোচিত হইবে।

স্বাধীন বাংলার গণশিক্ষা

স্বাধীন বাংলার যে কোন কথাই কথা যাউক, তাহা তুলনায় আলোচনা করিতে হইবে। বর্তমানের মধ্যে উহার একটা তুলনামূলক আলোচনা ছাড়া উহার ভালমন্দ বোঝা যাইবে না। এখন যাহা আছে তখন কি ছিল—তখন কি ভাল ছিল, এখন কি ভাল, তখন কি ছিল না, এখন কি নূতন, সে কথাও বলিতে হইবে। এবং সে সকল আলোচনার পূর্বেই শিক্ষার অবতারণা করিতে হইবে। কারণ শিক্ষার আদর্শ, প্রচার ও প্রাপ্যে জাতীয় চরিত্রটী অধ্যয়ন করিবার ও প্রাপ্যে জাতীয় চরিত্রটী অধ্যয়ন করিবার সুবিধা হয়। তাই সর্বাঙ্গে গণশিক্ষার কথাই বিবৃত হইতেছে।

শিক্ষা জাতির আধ্যাত্মিক সাধার্ম্য। শিক্ষাতে জাতি-চরিত্রের বলাধান করে। যে জাতি শিক্ষায় সত্য উন্নত হইয়াছে, তাহার তত্ত্বানি সভ্য এবং বলবীর্ঘ্যমঙ্গল।

একটা জাতি বা সমাজের ভিতর দুই প্রকার শিক্ষাপ্রণালী চলিতে পারে বা চলে। সমাজের মধ্যে প্রধানত—দুইটি বিভাগ—অভিজ্ঞাত এবং জন-সাধারণ। সর্বসম্মত ও সমাজজাতির মধ্যে প্রধানত এই অভিজ্ঞাত শ্রেণীই শিক্ষা পাইয়া থাকে। জন-সাধারণ শুধু কর্মক্ষেত্রের মত ঘাটিয়া যায়, বিভা বা জ্ঞানের বড় চর্চা করে না, বিধা করিবার তেমন সুবিধা পায় না!

ভারতে জ্ঞানকে মানবজীবনের চরম মাধ্যম বুলিয়া স্বীকার করায়, শিক্ষা অপরিহার্য মানবতার অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানে মানুষকে বৈচিত্রে হইলে জ্ঞানকে এড়াইয়া চলিলে চলিবে না। সর্ব শ্রেণীর মানুষকে শিক্ষিত হইতে হইবে। মতিবজ্ঞান ও জ্ঞানের সাধনা করিবেন, শ্রমিক ও বিজ্ঞানভক্ত করিবেন। পার্থক্য কেবল বিদ্যালয়ের পদ্ধতিতে।

অভিজ্ঞাত শ্রেণী—বা যাহাদের শারীরিক শ্রমে জীবিকাার্জন করিতে হয় না, তাহাদের শিক্ষার একটি পদ্ধতি আছে; উহা লেখা ও পড়া। এখানে ইহার সীমারে আলোচনা নিম্নয়োজন। যাহারা নিখিলে পড়িতে সক্ষম পায় না, যাহাদের দিবসের অবিকার্য সময়ে চল চালা করিতে হয়, কাঠ ও মাটি কাটিতে হয়, নানাবিধ শ্রমসাধ্য কাজে সময় অতিবাহিত করিতে হয়, তাহাদের শিক্ষার কথাই আলোচিত হইবে।

অভিজ্ঞাত শ্রেণীর লেখাপড়া যেমন নিত্য কৰ্ত্তব্য—জনগণের যেন তেমন নহে, এমনই একটি ধারণা আছে। তাই যাহারা বুঝিয়াছেন, যে বিদ্যালয় সকলেরই একান্ত কৰ্ত্তব্য, তাহারা জনগণের শিক্ষার প্রয়াসে অভিজ্ঞাত শ্রেণীর অহঙ্কর্যে বিদ্যালয় স্থাপন করিতেছেন। দিনে কাজের প্রতিবন্ধক হয় বলিয়া, রাতে এইসব শ্রমজীবী পাঠশালায় পঠন পাঠন হয়। ইহারই নাম শ্রম-জীবী নৈশবিদ্যালয়।

পাশ্চাত্য সভ্যতার পূর্বে, এমনকি বিশপ্তাব্দীর আগে বাংলায় নৈশ বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব ছিল না। কোন পাঠশালায় বসিয়া বই কাগজ কলম লইয়া লেখাপড়ার বিশেষ ব্যবস্থা রাখে বা দিনে কখনই ছিল না। একান্ত মনে হইতে পারে, বাংলা গণ-শিক্ষার অনভিজ্ঞ ও উদাসীন।

বাস্তবিক তাহা নহে। বাংলায় গণশিক্ষা ছিল এবং বিশেষভাবেই ছিল। তবে উহা তাহার নিজের মতই ছিল। এবং উহা নিজের মত ছিল বলিয়াই, অস্ত্রের সাধে মিলে না বলিয়াই অপরে বাংলায় গণশিক্ষা ছিল না বলিয়া অপবাদ দেয়।

যে দেশে “বিদ্যায়মৃত মমাত” পরম বাণী, সে দেশে মানুষকে অবিদ্যায় আচ্ছন্ন রাখা অর্থহীন অপেক্ষাও অকৰ্ত্তব্য। তবু এদেশে বিদ্যা দানের পদ্ধতি একটি বিশেষ পদ্ধতি। উহা কাহারও সহিত মিলে না, এ দেশের অভিজ্ঞাত শ্রেণীর সঙ্গে নহে, ও দেশের কাহারো সহিতও নহে। উহা লেখাও নহে—পড়াও নহে।

এদেশে জ্ঞানলাভের একটি নিম্ন পদ্ধতি ও আদর্শ ছিল। উহাতে লেখাপড়ার তেমন প্রয়োজনীয়তা ছিল না। লেখাপড়া না করিলেও জ্ঞানলাভ হয়, ইংহাই ভারতবর্ষীয় ধারণা। লেখা পড়াটা এখানে জ্ঞানলাভের একটি অন্ততম উপায় মাত্র, উহা একমাত্র পন্থা নহে। আর এখানে বিদ্যার আদর্শ কেবল তত্ত্ব তথ্য নহে, উহা আধ্যাত্মিক উন্নতি।

শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন এদেশে সঙ্গত্নমায়া জ্ঞান গ্রহণ পদ্ধতি যে জানারী—বিদ্যালয়ে তাহার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা আছে, সে জ্ঞানের বিষয় কনিয়া, উহার সত্যকে চিন্তা করিয়া, উহাকে অন্তরস্থ করিয়া জ্ঞানলাভ করিতে পারে। এদেশে আবশ্যক উপদেশ। উপনিষদ হইতে গীতা পর্যন্ত যাবতীয় জ্ঞানবাক্য গুরু মুখে বলিয়াছেন, শিষ্য তাহা কাণে শুনিয়া অন্তরস্থ করিয়াছেন।

সেই ধারাটী, সেই শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন বাংলার শিক্ষাপদ্ধতিতে, বিশেষভাবে গণশিক্ষা প্রণালীতে অস্থায়ত হইয়াছিল। লেখাপড়া যে করিতে পাইত সে করিত, যাহার সে অবসর

ছিল না সে যাত্রায়, গানে, কথকতায় নানা উপদেশ পাইয়া, শিক্ষা পাইয়া, শিক্ষার যাহা সার তাহাই লাভ করিত।

বর্তমানে শিক্ষাটি অতি সূক্ষ্ম অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখন লেখাপড়াই একমাত্র শিক্ষা, যে নিখিলে পড়িতে জানে সেই শিক্ষিত। এ উপায় ভাল কি মন্দ—উহার আলোচনা অন্তর হইবে। কথা হইতেছে, যে লেখাপড়া ব্যতীতও শিক্ষা হয়। আর বাংলার গণশিক্ষায় সেই লেখাপড়া-বিহীন প্রাণীই প্রবর্তিত ছিল।

মানুষ প্রধানতঃ দেখিয়া শেখে। তাহার পর সে শুনিয়া শেখে। শুনিয়া শেখা—পড়িয়া শেখাই প্রায় অসম্ভব। প্রভেদ—একটার নিজের শক্তির প্রয়োগ করিতে হয়, অষ্টটিতে অপরের সাহায্যের প্রত্যাশী হইতে হয়। ফলে কিন্তু খুব বেশী প্রভেদ হয় না।

এখন শিক্ষার কথা। শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য চারিত্রিক বিকাশ। সাধারণ জীবনকে অসাধারণ জীবনের অধরূপে অধঃপ্রাণিত করা, সামান্যকে মহৎ দণ্ডিত উদ্ভাসিত করা শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য। শুধু কতকগুলি তত্ত্ব, তথ্য, রহস্য, ইতিবৃত্ত, গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি শেখানো বা শিখিয়া যাওয়া শিক্ষার নিত্য সর্গীষ ব্যবস্থা।

লেখাপড়া না শিখিয়াও এই চারিত্রিক শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। প্রাচীন কালে গুরু শিষ্যের কথোপকথনে ইহা প্রচলিত ছিল। সঙ্কেতিসের সময় ইউরোপেও এই প্রথা চলিত। বর্তমানে পাশ্চাত্য দেশেও ইহারও প্রচলন রহিয়াছে। আদ্যাপক ও প্রচারকের বক্তৃতা আচার্যের উপদেশ এমনকি সেই মুখে মুখে শিক্ষা দেওয়া। ইহাতে লেখাপড়ার আবশ্যক হয় না। কেবল পণ্ডিতের কাছে যাহা ঙ্গটনভাবে ব্যাখ্যাত হয়, সাধারণের

কাছে তাহা সরলভাবে কথিত হয়।

বাংলায় জনসাধারণের মধ্যে যে আক্ষরিকতা ছিল না এমন নহে; উহার প্রমাণ ছিল না। কাগর আক্ষরিক শিক্ষায় স্থিতি যেমন, অস্থিতি তাহার অপেক্ষা কম নহে। ঠিক ঠিক ব্রহ্মচর্যের বিধান মত অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞানপিপাসা বিদ্যার্থীর মত না চলিলে আক্ষরিক শিক্ষায় মানুষকে অনেকটা শক্তিহীন অক্ষম করিয়া তোলে। পাটিবার, জীবনযুক্ত বোরের মত সংগ্রাম করিবার, একটা কিছু নির্ধারণ করিয়া স্বাক্ষার সহিত প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করিবার সামর্থ্য তাহার চলিয়া যায়। আমাদের দেশে ইহা ঘটিয়াছে, ইউরোপেও ঘটিতেছে। ব্রিজার্স বিদ্যার্থী না হইলে, কেবল অবশ অপ্রবৃত্ত আকাঙ্ক্ষার বশে চলিলে এমনই হয়।

শিক্ষা বিজ্ঞানের আলোচনা বর্তমান বিষয়ে আবশ্যক হইবে; তবে ততটা বিস্তৃতভাবে নহে। এখন প্রধান কথা, বাংলার গণশিক্ষা কেমন ছিল তাহাই অস্বস্তান করা।

স্বাধীন বাংলায় প্রত্যেক মানুষটিকেই শিক্ষা দেওয়া হইত; এবং সে শিক্ষা প্রধানতঃ চারিত্রিক শিক্ষা। যাহাতে মানুষ মানুষ হইতে শেখে, অর্থাৎ পবিত্র চরিত্র হইতে শেখে—ভাগ্য করিতে শেখে, পরের ক্ষমতা কামিতে এবং ভারিতে এবং সত্যতাই হইতে অভ্যাস করে। এখন দেখা যাইতেছে, আক্ষরিক শিক্ষায় সম্পূর্ণ কৃত্রিম ইয়াও মানুষের মনুষ্য পরিপূর্ণ হইতেছে না, বরং হ্রাস পাইতেছে। আর যখন এই লেখাপড়ামূলক শিক্ষা ছিল না তখন বাংলায় কতখানি মনুষ্য ছিল ইতিহাস তাহার সঙ্গত সাক্ষ্য।

যাহা হউক স্বাধীন বাংলার গণশিক্ষা ছিল এবং ব্যাপক ভাবেই ছিল। ভদ্রন সমাজে নানা

উৎসব প্রচলিত ছিল এবং সেইসব উৎসব নানা প্রকার পৌরাণিক ঘটনার স্মরণে ইতিবৃত্ত লইয়া। এইসব উৎসবে যে যাত্রা গান কথকতা হইত, যাহাতে শাস্ত্রের নিরূপণের নানা ত্যাগ ও মৃত্যু এবং শৌধ্য ও বহু প্রকারের পুণ্য কাহিনী শ্রবণ করিয়া সেইভাবে প্রবৃত্ত হইত।

শুধু ইহাই নহে—বৈরাগী নিত্য যে গান গাইয়া বেড়াই, ভিক্রম যে স্থানে ভিক্ষা চাহে, এক একটি পার্শ্বে মেলায় যে কীর্তন কথকতা কবি তর্জনা হয়, তাহাতে জাতি-সাধারণ একটি উনার শিক্ষায় অভিমুখ হইত।

এই যে গানের সহিত নাট্য ও সঙ্গীতকার সহিত শিক্ষার প্রচার, ইহা শিক্ষা-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতম পদ্ধতি। ইহার আশংক্য অতি প্রবল, ইহার প্রভাব অমোঘ।

বাণী বাংলা শিক্ষায় তার সারা জীবনটাকে নিমজ্জিত করিয়া রাখিল। কারণ, জানকী যে প্রাণের সহিত অঙ্গীভূত করিয়া লইতে হয়। নবিলে বিশ্বিত আসে, মোহ-মোহিত সত্যকে ভুলিয়া যাউতে হয়। যে তপস্বীর জ্ঞানজীবনের সহিত অচ্যুত সংলগ্ন থাকে, সাধারণ মানুষের তাহা নাই। সেই জন্ত অহারের বিহারে কর্ণে বিশ্রামে উৎসবে ছদ্মবেশে সত্যকে লক্ষ্য করিতে হয়। বাংলার গণ-শিক্ষায় এই জপের পদ্ধতি ছিল। দিবসে বৈরাগী বাউল গান করিতেছে—গৃহস্থের দুয়ারে, হাটেরয়ার হাটের মাঝে, দোকানির কেনাকাটার সামনে, খান্না-খান্নার সম্মুখে, গৃহকন্ডরতা কৃষাঙ্গনার কন্ডবাগ্গতার নিকটে, এই গানের ভাবে ও স্বরে মাটিতে ছড়ান মনটা ঈশ্বরের দিকে দাবিত হয়, সব পার্শ্বে সঙ্গীতভায় পানপাতার সহস্র বন্ধনে আবদ্ধ ছিল, তাহা ঐ বৈরাগী বাউলের সঙ্গীতে মুক্তির আনন্দে মাতিয়া ওঠে। এই সব গান মুচুক মহন্ত করে, ভাস্ককে পথ

দেখাইয়া দেয়। ইহা বাংলার একটি শিক্ষা প্রকরণ। বাংলার গণশিক্ষায় কেবল এই একটি মাত্র পদ্ধতিই ছিল না, বাণী বাংলা তাহার সমাজকে এমন ভাবে বিভক্ত করিয়াছিল, যাহাতে জ্ঞান লাভের সহস্রবিধ দ্বার উন্মোচিত ছিল।

বাংলার পূজাপার্বণ আর একটি শিক্ষণীয় ব্যাপার। বায়ো মাসে তেরো পার্বণ আছে। প্রত্যেক পূজা পার্বণের পিছনে এক একটি মহিমাযম পৌরাণিক কাহিনী বিজড়িত। ইহা সমাজের সহিত এমন নিবিড়ভাবে বিমিশ্র আছে, যাহাতে প্রত্যেক মাতৃহৃদিকেই উদ্ভূত করিয়া তোলে—একটি পুণ্য স্পর্শে পবিত্র করিয়া দেয়।

এই সব পূজা পার্বণের আর একটি বিশেষ পঞ্জিলালী প্রভাব আছে। ইহা কোন না কোন শিল্প কলাকে আশ্রয় করিয়া অহুষ্ঠিত হয়। সেই সব মূর্তি ও প্রতিমা ভাস্কর শিল্পীর হাতে পড়িয়া এমন আশ্চর্য দর্শন করে যাহাতে অতি বড় ভাবনামের গভীর ভক্তি শ্রদ্ধার অহুষ্ঠিত জাগাইয়া তোলে। এই সব পূজার আয়োজন নিত্য নহে, মৈমিত্তিক। আবার মন্দিরে নিত্য যে বিগ্রহ সম্পূর্ণিত হন, তিনি অজ্ঞাত জ্ঞান উৎস। প্রত্যেক পক্ষীর গ্রাম্য দেবতার ত্রিাদিকায় আরতি বোধনের বাদ্যধ্বনিতে বিশ্বত মানবকে প্রতিদিনকার বিশ্বস্ত হইতে জাগরিত করিয়া দেয়। আবার এই মন্দিরে বৈশ্য পতি হই-তেছে, শাস্ত্র ব্যাখ্যা হইতেছে, কথক ঠাকুর স্থলিত কর্তে নিত্যন্ত সহজ করিয়া মহিষকাহিনী গুলি বিবৃত করিতেন। কীর্তনীয়া আসিয়া কীর্তনের হুখাধারায় জন-সাধারণকে বিন্ম করিতেছেন, কেহ মঙ্গল কামনায় সমাহার করিয়া দেবতার কাছে পূজা দিল, অল্পস দান ধ্যান করিল, মন্দিরে কোন গুপ্ত সম্রাসী আসিলেন, এ সবই সাধারণ চরিত্রের উপর প্রভাব ফেলিয়া যায়, এসবলই এক একটি শিক্ষার অঙ্গ।

ইহার পর বায়োয়াড়ী। বায়োয়াড়ী সামাজিক আনন্দের ব্যাপক অহুষ্ঠান। ইহাতে কোন ব্যক্তি-গত ইচ্ছার ও মনের ঠাই নাই, পরন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির ইচ্ছায় ইহার অহুষ্ঠান। এই বায়োয়াড়ী নিকল আনন্দ প্রমোদ নহে, কেবল মাত্র বিলাপের উপভোগ্য নহে, বায়োয়াড়ীতে শিক্ষা ও আনন্দের একত্র সমাবেশ। ইহার কেন্দ্র স্থলও কোন দেবতা আছেন। কাজেই ইহার মাঝেতে একটি তত্ত্বের ভাব জাগরক থাকে। এজন্য দেবতাকে পুরোভাগে রাখিয়া যে উৎসবের আয়োজন ও পুণ্যময়, কতকটা সংযত, সংহত, কতকটা পাবনী-শক্তিযুক্ত।

এখন যেমন থিয়েটার বায়স্কোপ লোকের প্রমোদের অহুষ্ঠান, তখন যাত্রা গান কথকতা কবি পাচালী তর্জনা প্রভৃতি ঐ চিত্র বিনোদনের অবলম্বন ছিল। থিয়েটার প্রভৃতি দেখসম্পর্ক, অনেকটা প্রভুপ্রধান কাহ্নকলা, আর যাত্রা প্রভৃতি আধ্যাত্মিকতা পরিপূর্ণ। এসবের আনন্দ শুধুই ব্যসন নহে, ইহা আনন্দের সহিত শিক্ষা—শিক্ষার সহিত আনন্দ।

ইহা ছাড়া আরও ছোট ছোট বায়োয়াড়ী ছিল। ধনী নির্ধন প্রায় সকলেই জ্যোৎসংবে বিবাহে উনয়নে গৃহস্থের কোন কিছু ভুত কণ্ড উপলক্ষে, বিধা জন কয়েক মিলাই হুটুই আসর উপভোগের জন্ত পাড়ায় অথবা কাহারো বাড়ীতে কবি, পাচালী প্রভৃতির আসর বসাইত। শিক্ষার শিকড় এমনি করিয়া জাতির সর্বাঙ্গে বিমিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল।

এই গণ শিক্ষার আর এক সহায় ছিলেন তখনকার সাহিত্যাচার্যগণ। ঠাণ্ডারা এমন লোকসাহিত্যে মহিষ ভাষ্যভূত কাব্য নাটক কাহিনী গাথা গীতি রচনা করিতেন যাহাতে জনসাধারণ যেন মাতিয়া উঠিত। এক একজন সাহিত্যিকের মণীষা জন সমাজের

অন্তঃস্থল পর্যন্ত আলোড়িত করিয়া তুলিত। উদাহরণ স্বরূপ মনসা মঙ্গলকে ধরা বাড়ুক। মনসার ভাগান এমন পল্লী নাই যে যানে গাওয়া হয় নাই। অশ্রুতঃ ২০০। ৩০০ শত বছরের মধ্যে অশ্রুতঃ ২০ হাজার বার গাওয়া হয় নাই। মনসা মঙ্গল যে কত কবির লিখিত এবং অলিখিত আছে তাহার সঠিক হিসাব নাই; মোটের উপর বাংলার প্রত্যেক প্রদেশে ও পল্লীতে উহার প্রচলন আছে। ফল হইয়াছিল বেহুলার পাতিত্ব যা বাংলার নর নাগীর প্রাণে প্রাণে গাথিয়া গিয়াছিল। এখনকার কোন কাণ্য নাটকে এমন হয় নাই। কাণ্য এমাহিতা নোক সাহিত্য নহে শিক্ষার সাহিত্য নহে। ইহা জন শক্তিকে উপেক্ষা করিয়াছে এমন কি অস্পৃগু করিয়াছে বলিলেই ভুল হয়। তখনকার অস্পৃগুতা ছিল দেহের সহিত এখনকার উহা প্রাণের সহিত প্রাণের। তখনকার সাহিত্যিক ধর্মবোধে সমাজ পতি জাতির ধ্বংস প্রাণ বরিবার জন্ত ব্যর্থ হইলেন, আর বর্ধমানের ইংরাজ জন গণের দেহটা একটু ছুইতেছেন মাত্র সেও বৈরাগীর আবেগে নহে কুপার বশে নিজেদের দাম্ব নিয়োগ করিবার জন্ত। ইংরাজ নিজেদের জন্ত একটি ললিত কাকতালপূর্ণ সাহিত্য ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রচনা করিয়া জনগণের জন্য কেরসিনের ডিগা বেগোইরা দুখনি ভাপাবেজি ও চোরা দিগা অহুশোচনা অসুতোভয় পারলৌকিক কুখ্যাতিকার সাহিত্য ও শিক্ষার রচনা করিয়া গণ শিক্ষার গর্ভ করিতেছেন।

আর সে কালের উৎসব আনন্দ আশোকামালা স্বপ্নকিত বায়োয়াড়ী তলা এবং সেখানে কাঠুরি। হইতে জমিদার পর্যন্ত এক ক্ষেত্রে অথবা সন্নিবন উল্লসিত পুণ্য কথার শিক্ষা লাভ।

এখন নৈশ বিজ্ঞানে ছাত্র হয় না, হইতে বিজ্ঞান প্রকাশ করে। আর তখন দেবদানির হইতে প্রমোদগার প্রমিকের কণ্ড মুখর কণ্ডক্ষেত্র পর্যন্ত

একটা বিশ্বত স্বাভাবিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। আর সেখানে অবশ্যে অতীত উল্লাসে শিক্ষা পাইয়া ধন্ডা হইত। বই পড়া নয় কিছু মুখস্থ করা নয়, মাহুৎ হইয়া উন্নত চরিত্র হইয়া ধন্ডা হইত, জাতিকে ধন্ডা করিত। স্বাধীন সে কালের বাংলার আর একালের সমুদ্রত বাঙ্গালার স্বাবধান কতখানি।

স্বাধীন বাংলায় মাণ্ডলিকগণ শিক্ষার অগ্রতম উৎস ছিলেন। তাঁহাদের সম্ভ্রমতা চরিত্রবস্ত্রাউক্ত নীচ নিক্ষেপে হিত্যাকঙ্ক। মাহুৎকে সহজেই পূণ্যবস্তার দিকে আকৃষ্ট করে। এই সব সমাজপতি যখন সঙ্কায় বিস্রাম কালে চণ্ডিমণ্ডপে বসিয়া শায় পাঠ নানা সংকথার আলোচনা করিতেন পৌরানিক কাহিনী বিবৃত করিতেন তখন পল্লীর আগাধার সাধারণ শ্রদ্ধায় সেই সব তনিয়া যাইত। শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানন্; এই শ্রদ্ধা তাহাদিগকে পণ্ডিত না করুক, জ্ঞানী করিত। অবশ্য এ জ্ঞান পবিত্রতার জ্ঞান।

প্রচলিত শিক্ষার ধারণা মনে রাখিয়া বাংলার জনশিক্ষার পরিচয় লইলে চণ্ডিবে না, ইহাতে শিক্ষার ব্যাপক ও গুণ ভাটকীকে ধরিতে হইবে। পড়া শুনা ব্যতীত মনুষ্য জীবনের বহু শিক্ষা ও শিক্ষণীয় আছে। সে সব হয় কেবল দেখিয়া তনিয়া এবং ইহাই শিক্ষার প্রধানতম পদ্ধতি। বাংলার শিক্ষায় এই প্রবাহ ছিল প্রধান।

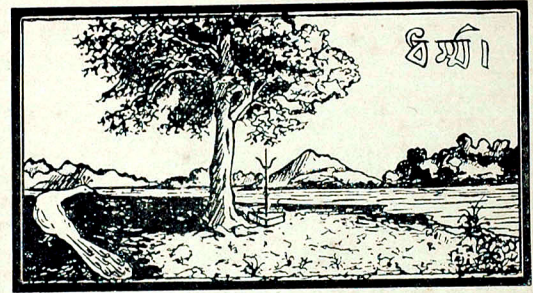
সেইজন্য মেলাগুলিকে আর একটা প্রভাবশালী শিক্ষাকেন্দ্র বসিয়া ধরিতে হইবে। এখনকার মেলা আর তখনকার মেলা এক নহে। সেদিনের মেলাগুলিও পূজার মত দেবপ্রদান অথবা কোন

সাধু সত্বের আবির্ভাব তিরোহানে প্রবর্তিত। কাহ্নেই উৎসাহ সেই ধর্মভাবপুষ্ট। এই মেলাগুলি হুইই প্রবর্তনী (Exhibition), বণিকবৃত্তি অথবা প্রমোদ অমুঠানের জন্ম নহে। ইহার প্রধানতম লক্ষ্য সাধু পূজা; আমোদ প্রমোদ পরোক্ষ। এস। পূজার উপলক্ষে সারাজাতি মাতিয়া উঠিত। পূজা ও পবিত্রতা ছাড়া উন্নততর আনন্দ মনুষ্যজীবনে আর কি থাকিতে পারে? স্বাধীন বাংলার এই মেলাগুলি জনসমাজকে মায়ের মত আদরে সোহাগে তাহার কোলে টানিয়া আনিয়া, পূণ্যপ্রবণ আনন্দের গুহুধারায় পরিপুষ্ট করিত। ধর্মটা বিদ্যালয়ে ধর্ম-বছরে বাহা না হয়, এই এক একটা মেলায় তাহা অনায়াসে সফল হইয়া যাইত।

এই সব প্রধান প্রধান বিষয় ছাড়া, মণ্ডলী, গেজী, বাশ, সমুদ্রায় প্রভৃতির ভিতর কত যে শিক্ষণীয় ব্রত পূজার প্রচলন ছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। এমনি ভাবেই স্বাধীন বাংলার গণশিক্ষা বটবৃক্ষের মত বহু পল্লবিত হইয়াছিল।

স্বাধীন বাংলার গণশিক্ষা বাহারা ছিল না বলেন, তাঁহারা বাংলার বিখ্যাত যুগের ইতিহাসখানি শ্রদ্ধায় ভরে একবার আপনার চক্ষে দেখিয়া লইবেন। দেখিবেন বেথাপড়া হুইতো ছিল না—কিন্তু বেথাপড়ার বাহা চরম ফল—সেই চরিত্রবস্ত্রা—বাঙ্গালীর জীবনের সমস্ত ব্যাপার হইয়া গিয়াছিল, যে শিক্ষার মাহুৎ ধর্মার্থে মাহুৎ হয় সেই শিক্ষাই ছিল।

ঐবলাই দেবশর্মা



সত্য ধর্ম

—২—

এক লক্ষ পচিশ হাজার যোগের কথা শারে লিপিত আছে। পৃথিবীর পরমাণু যত বাড়িবে, সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইবে সন্দেহ নাই, কেননা নানা মূর্খির নানা মত। মত মত তত পথ, এক্ষণে কোন পথ প্রশস্ত, ইহাই সমস্যা।

মাহুৎ এত সমস্যার দায়ে পড়ে না, যদি ধর্মের নামে তার মনে যাদুর আকর্ষণ না জাগে। ধর্মসাধকের ঐ যে একটা অপার্থিব প্রভাবের বিজ্ঞাপন কপালে লাগান আছে, না আশ্রয় করার জন্ম তাকে জীবন পথ করিতে হয়—এই ঠোঁক যদি দেশের আবহাওয়া হইতে সরান যায়, জাতির ধর্মজীবন বোধ হয় সহজে নিরাময় ও সচ্ছন্দ হয়।

বহু নারী পুরুষের উপর প্রভুত্ব—বিনাশ্রমে

অধ্যাত্ম শক্তি প্রয়োগে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ-সংগ্রহ, বিচিত্র দর্শন প্রভৃতি ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে ইশ্বরপ্রাপ্তির আশায় অপেক্ষা এইগুলির দিকে জ্ঞাতসারে না হউক, অজ্ঞাতসারে মাহুৎকে চালিত করে। স্থূল স্বার্থে যে মোহিত নয়, অতীন্দ্রিয় জগতের বিচিত্র স্বার্থে সে পতিত হয়, প্রকৃতির ছলনা মাহুৎকে মাথা তুলিতে দেয় না।

ভারতের প্রচুর শক্তি আত্ম ধর্মাত্ম, স্বার্থের অদ্ভুত অপেক্ষা ধর্মের অদ্ভুত অতিশয় মারাত্মক। রূপ, যৌবন, ধনের গল্প দীর্ঘকাল স্থায়ী নয়, ধর্মের অহমিকা মাহুৎকে কত যুগ অন্ধ করিয়া রাখে। এক শ্রেণীর লোক যে বলে ভারত ধর্মের নামে উৎসাহ গেল, এই দিক দিয়াই ইহার সত্যতা

আছে। আমরা সর্ব-বিষয়েই অন্তঃসারশূন্য হইয়াছি। নিমজ্জমান ব্যক্তি শোভনের মূখে কুটা দেখিলে তাহা ধরিতে হাত বাড়ায়, প্রাণের দ্বায়ে জীবন সংগ্রামে নিরাশ হইয়া, ধর্মবলস্বরে কাণ্ডকর্মের হস্তপ্রসারণ—কড়ি মুঠা ধরিতে যে পুলা ধরিলে, ইহা বুঝি স্বাভাবিক।

প্রকৃতি বলহীকেই অধিক চলনা করে—“নায়মাস্তা বলহীনেন লভা।” আমরা চির দিনই বলিয়া আসিতেছি, এখানে ধর্ম ব্যতির ধর্ম নয়, সমগ্র ধর্ম। জাতি যদি স্বস্থ, দৃঢ়প্রতিষ্ঠা না হয়, ব্যক্তির পক্ষে আত্মসাধনার স্বযোগ লাভ বিভূষণ। ইহা স্বার্থপরতার চূড়ান্ত। বিশ্বের কল্যাণ এখানে নিম্ন জাতি স্থির উপরে নিরত করে—এ বাণী বিধাতার, লগ্ননকারী যে সে দেশ ও জাতি শক্ত।

যোগ বলিতে—অতীতের তিলে তিলে অভিজ্ঞতা অঙ্কনের ইতিহাস পুস্তকাগারে সমস্ত রক্ষা করা হউক, অতীত উদীয়মান নবজাতির নিকট মৃত, বর্তমান ক্ষেত্র হইতে যে পদ সদা উন্মিত সে চরণচিহ্নের দিকেও যেন তার দৃষ্টি না পড়ে। ভবিষ্যতে সিংহবাহিনী আকাশের কোলে যে আলোর পদচিহ্ন, সেই সঙ্কেত ধরিয়াই আজ আমাদের অভিনয়। বিপদের মেঘ আকাশের সন্ধান বার বার চাকা দিলে, গতি বহুদূর হউক ক্ষতি নাই, বার বার পা উঠান অসম্বল হইলেও থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়, তাহাও শ্রেয়, তবুও যে পথ ছাড়া হইয়াছে, সে পথের মোহে জীবন যেন পশ্চাতে না কুঁচিয়া পড়ে। বিধাতার ছাড়পত্র নাক্ত অবলম্বন করিয়া শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সম্ভব-রক্ষায় উন্মত থাকাই এগুনের সাধনা।

জীবনের প্রথম সম্ভব—সাধনার সিদ্ধ বীজ। ভগবান বঙ্গনারস্তুকোপে প্রতি আধারে এ সম্পদ রক্ষা করেন। মরীচিকালান্ত সাধারণপণে আমরা আত্ম-

হারা, হাদিরহাকরের অগাধ জলে ডুব না দিয়া, কাহা ঘাঁটিয়াই জীবন কাবার করি। এপথ-সেপথ করিয়া বেকারের সংখ্যাই বাড়ে, মানবজনি পতিত রহিয়া যয়, আবাদে সোণা ফলে না।

যুজিয়া বাহির কর—কি তোমার সম্বল? বাসনার বস্ততা হইতে নিজেকে সরাইয়া লও, চেষ্টার উদ্যম উচ্ছ্বল গতি রোধ কর, স্থির শাস্ত ভাবে নিশ্চিন্তে প্রতিদিন প্রভাতে নিশ্চিন্ত চিত্তে নিজের মধ্যে স্পষ্ট সঙ্কেতের প্রতীকায় ধ্যাননিরত হও, তার পর অবিশ্রান্ত বর্ধ—নিজের জ্ঞান, নয়, দেশের জ্ঞান, জাতির জ্ঞান। শুধু দেশ ও জাতির সম্পদ ও গৌরব কামনায় নয়, সমগ্র মানব জাতির বলাণ যে প্রভুর ইচ্ছা। যন্ত্রের মত শাসে প্রশাসে ইহা স্বরণ রাখিয়া, নিম্নাঙ্গতি, লাভ ক্ষতি, জয় পরাজয়ে অকোপ করিওনা। শুদ্ধি সিদ্ধি, তুষ্টি মুক্তি এই জীবনসাধনায় ফলপ্রদ হইবে।

চাই সম্বল, চাই আত্মজীবনে অটুট বিশ্বাস, চাই প্রভুর কাজে জীবন ভোর করার সাধ, চাই বিপদে ধৈর্য, সম্পদে বৈরাগ্য। চর খণ্ড কটিতেই জড়াইয়া লইতে হয় আপত্তি করিও না, বৃকস্ত যদি আশ্রয় হয় বিচলিত হইও না, প্রভুর কাজে জীবনের শোধ—তাগে ভোগে নির্ধাতোনে বিচিৎ বিধান—হইতে পারে। ছাড়িয়া দাও, প্রভুর হাতে নিজেকে। তোমার আর কেহ নাই, তুমি আর তোমার প্রভু। এই সম্বল অটুট রাখ, প্রভুর ইচ্ছা হয়, গড়িয়া তুলিবেন কি? সে সবই প্রভুর হাতে গড়া ভাগ্যবৎ স্থিতি। দেখানে পাপ নাই, তাই সম্বলের শাসন নাই, স্বার্থ নাই, তাই তাগের বাধন নাই, মুক্তির রাস্তা আলোর মাহুয়, প্রেম শান্তির শাসন, যথ, যথ, যথসুয়।

ভাষ্য, ১৩৩২]

সত্য ধর্ম

৩৩

এই দ্বিবা জাতিগঠনের সাধনা বিনা অস্ত্র সাধনার কথা নাই। ইহা যুগধর্ম। এই ধর্ম-পালনের জ্ঞান—আবার নবদীপ গড়িয়া উঠিলে, নান্দুর, কেন্দুবিধ, হালিসহর, দক্ষিণেশ্বরের স্থিতি হইবে। বাংলায় সমষ্টি গঠনের প্রেরণা আজ যুগ, শব্দ, বুদ্ধ, চৈতন্য, বিবেকানন্দের ত্রায়—তাগবীর, কণ্ঠবীর, নিকামচিহ্ন, মুক্তিকামী অগাধ সন্তানের আজ প্রয়োজন। ঘরে বসিয়া চল চেরা-হিসাবের অন্ধ কথিয়া জীবন ধন হইবে না। পুরাতনের মোহ ছাড়িয়া সম্রাণ লইতে হইবে। জাতিধর্ম কুল-বংশে বিসর্জন দিয়া, সম্পূর্ণ গোত্রান্তরিত হইয়া নব সমাজ গঠনে আত্মদান করিতে হইবে। আত্মমুক্তির পথবায় কাটাওয়া, জাতীয় জীবন যদি নূতন বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠা করিতে পার, তবেই সনাতন ধর্মের বিবরণ ভারতের কাঠামোয় পুনর্গঠিত হইবে। সেই তাগ, সেই সাহস, সেই তেজ, আত্মিকার যুগধর্ম বঙ্গের জ্ঞানপ্রয়োজন হইয়াছে। আজও অসংখ্য বিধা মাতার অশ্রু উপেক্ষা করিয়া, সহস্র সহস্র শব্দ গৃহতাগ করিলে, বুদ্ধ, রামায়ণ, চৈতন্য প্রভৃতি যুগের মাহুয়, তাহাদের সম্ভার ও বন্ধন ছিন্ন করিয়া নূতন ক্ষেত্রে, নব রচনায় আত্মদান করিলে। বাংলায়—এই যুগলীলার যুগচনা দেখা দিয়াছে, দেখিতে দেখিতে সমগ্র ভারতে ইহার প্রভাব বিস্তৃত হইবে। ব্যস্তির মুক্তি আজ আর লক্ষ্য নয়, চাই জাতির মুক্তি—বিশ্বের মুক্তি। মহাপুরুষগণের জীবন দিয়া, এই নবধর্ম প্রচার, পালন ও অচরণ করিয়া, সমগ্র জাতিকে এই পথে প্রবর্তিত করিলে।

শক্তির বিদ্যুৎ অজয় ধারায় স্রবিতোছে—কুহ মান আবারে পথোত্তের মত সামাজ্য আলোক বহিয়া ইতস্ততঃ বিকীর্ণ—প্রচণ্ড অগ্নিকণ্ডের মত

উজ্জল ভাষার যুগ্মি কোথাও দেখা যায় না। আবার-গত অতীত ইহার কারণ। ধারণাসামর্থ্যের অভাবেই ইশ্বরের দান সার্থক হইতেছে না। সত্য, শক্তি, প্রেমের নিম্বর নিরন্তর প্রবাহিত। আমাদের অবগাহিত হওয়ার স্পর্শ নাই।

হিসাব ছাড়, বাসনা ছাড়, আশা, আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ মুছিয়া ফেল, দুর্জটীর মত মাথা পাতিয়া দাও। অহুতির ছায়ায় সুলিয়া লক্ষ্য কর—কি অনির্নিচয়ীয় অমৃত বর্ষণে তুমি আজ সিদ্ধ। পাপ-দৌত, পুত, পুণ্যময় জীবন, ইশ্বরের অবদান বহিয়া মর্ত্যকে সিদ্ধ করার অজ্ঞেয় শক্তিমান তুমি—কঠে তোমার শিবের বিয়াণ, তুচ্ছে এরাবতের বল, স্বমেক্ষ শিপনের মত অটল পদভরে পৃথিবী যেন চলিয়া উঠে। হে বীর, হে যুগ্মিভাষ্য ভারত, ভবিষ্যতের অগ্রদূত—বিধি বিধানের আত্মগত, স্বতি পুরাণের অমুশাসন ছাড়িয়া অর্থায়মীর আশ্রমে জীবনকে উন্মত কর, সাধনার এই নব সঙ্কেত অচিরে জীবন ধন করিলে।

অতীতের শুদ্ধি-সাধনার নীতি তোমাদের বর্তমান জীবনের পক্ষে আদৌ উপযোগী নয়, বরং হলাহলের মতই প্রাণধাতী। কি হঠযোগ, কি মন্ত্রযোগ, কি রাজযোগ, কোন কোনগণের সম্পূর্ণ অস্ত্রধান পালন করার সাধ্যও নাই, প্রয়োজনও নাই। হঠযোগে নেতি, দৌতি, বস্তি প্রভৃতি যটকর্ম সাধনে কাম্যাত্তির আয়োজন, আসন ও মূর্তা সহ নীতি পালনে অস্ত্র-শুদ্ধি, প্রতাহার, প্রাণায়াম, ধ্যান ও সমাধির দ্বারা আত্মদর্শন,—কোন বিশেষ ব্যক্তির পক্ষে এই সাধনা সম্ভব হইলেও, একটা জাতিতে প্রবর্তিত করার ইহা যে স্বয়ং পথ নয় তাহা বলাই বাহুল্য। আমাদের আজ সেই পথই প্রশস্ত, যে পথে-জাতির প্রাণ-

রক্ষা হয়। জাতির সঙ্গে আরও দীর্ঘদিন যদি অসিদ্ধ অবস্থায় কালহরণ করিতে হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ। যোগের পথে জাতি-বর্ধ ছাড়া যদি অনিবার্য হয় তাহা উঠে, জানিও, ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে ইহা সুযোগ ও সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু জাতির পক্ষে বড় মার বলিয়াই গ্রহণ করিও। তুমিই জাতি, তুমিই ভারত, তুমিই বিশ্বের বিরাট রূপ; তোমার সাধনা তাই ক্ষুদ্র নয়, সর্বাঙ্গ নয়; বৃহত্তর শক্তি, বিস্তৃত আয়োজন, স্বদীর্ঘকাল আরম্ভে লইয়া চর্যম পথে তোমার যাত্রা, বাধার অন্তরায় পথ ছাওয়া পার্শ্ব ধাঁড়াইও না—উদ্দেশ্য বশতঃ সং ও মহৎ, ভগবান তোমার চির-সহায় জানিও, তাই যোগের পথে আশ্রয়প্রত্যয়ের সঙ্গে, ঈশ্বরপ্রত্যয় স্ফূট করিয়া তুলিতে হয় এবং মহাশক্তি হইতে এই বিপুল সাধনভার অর্পণ করিয়া, বৃদ্ধি-বৃদ্ধি বাহ্যতে সর্লক্ষ্যতায় ও সর্লক্ষ্যবস্তায় অবিচল থাকে, তাহার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়।

ঠাকুরের কথা—পুত্রের মাঝে একটা লাটির আড়াল দিয়া জলকে দুইভাগে দেবার মত, মায়াবী আরবের আমাদের প্রকৃতি ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। ইহাকে পুনঃ যুক্ত করার জন্ত, চিত্ত প্রাণ মন রূপ বুদ্ধি দিয়া ঈশ্বরের অহঙ্কৃতিকেই জাগাইয়া তুলিতে হইবে। এই সাধনার উদ্দেশ্যে বাহিরে কার্যের অভিব্যক্তি। নতুবা রাষ্ট্র, সমাজ, সম্ম প্রভৃতি স্বজনের প্রবাসে অন্তঃপ্রকৃতি দিয়া হইবে না। বাহ্যিকের সংঘাতে বরং বিপরীত ফল হইবে।

এই জন্ত জাগাইয়া তোলা অন্তঃকরণ—অন্তরের দিকেই। প্রভুর আদেশ—অন্তর্জগতেই অনাহত ধনীতে নিম্নারিত, সে বাণী যেমন স্পষ্ট তেমনই অবিকৃত, বাহিরের কোলাহলে একটুও বিস্তৃত নয়, প্রথম প্রথম কোন কিছুই সন্ধান না পাইয়া ভিতরটা মেনে ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিবে। স্থির থাকিও, ভগবান নিশ্চেষ্ট নহেন। তোমার আমার উৎসাহ উত্তেজনা প্রাণ মনের চাকলা কণ্ঠস্থারী। ভগবানের ইচ্ছা যখন প্রশান্ত অন্তরে পরশের পর পরশ দিয়া, তোমায় উদ্ভূত করিবে, সে ইচ্ছাকল্পিণী মহাশক্তির প্রেরণায়, তুমি বিরামহীন শ্রম দিতে পারিবে। কত প্রাণ তাহার ইয়তা করিতে পারিবে না, কত প্রেম, কত জ্ঞান তার সীমা পাইবেনা। ইহাই শক্তির অবতরণ। ভগবাণে সর্লক্ষ্যতায় আশ্রয়সমর্পণ ভাগবতশক্তির জাগে। ভগবানই তখন নরো নায়ায় মূর্তিতে প্রকটিত হন। ভগবানের বিরাট মূর্তি বরদেহেই মূর্ত হয়। সে কোথাও শ্রীকৃষ্ণরূপে, কোথাও গুরুমূর্তিতে, কোথাও শক্তি, ভক্ত, অবতার, প্রকাশ বেশে দেখা দেন। ধরা তখন স্বর্ণ, মন তখন ব্রহ্মাবন। দেবতার নিকটতম—দেবরাজ্য ভোমের নন্দন-কানন। শাস্তি ও আলোর প্রজ্ঞা মস্তাবাগী যোগের মধ্যে ভোগে তৃপ্তি, প্রেমে শক্তি ও জ্ঞানে আনন্দের পরশ পায়, রতমূলের এ আস্থান বজ্র-নির্ঘোমে হাক পাড়িতেছে—মাগ্ন আর কতকাল যুমাঁহবে?

পরিশিষ্ট

জাতীয় মেলা ও প্রদর্শনী

(২৬শে এপ্রিল—৬ই মে, ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ)

এ বৎসরের জাতীয় মেলা ও প্রদর্শনীর বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা মহাত্মা গান্ধীর শুভাগমন—তিনি এই মে তারিখে প্রদর্শনীক্ষেত্রে শুভাগমন করিয়া আশ্রম ও সংঘের ভ্রমণ করিয়া ও ধর্মজীবন সম্বন্ধে যে বাণী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এখনও সকলের কর্ণে ঝড় হইতেছে। মহাত্মা গান্ধী মেলা ও উহার উদ্দেশ্যবিশেষ বিশেষ কিছুই বলেন নাই, কিন্তু প্রথমে আমাদের যখন মেলার ঘোষণা করি, তাহার অনতিবিলম্বে ইংরাজ গবর্ণমেন্ট আমাদের প্রেরণ ও পাবলিশিং-ও পুস্তকাদির জিটিং ভারতে প্রবেশ-সম্বন্ধে যে কঠোর নিষেধাজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমাদের গণের ভবিষ্যতের জন্ত বিশেষ সন্নিধান হইতে হয়। এই সময়ে মহাত্মা গান্ধীর আশ্রমপরিদর্শন ও তাঁহার মহাপ্রাণ সমক্ষে আমাদের অকৃত্য আশ্বাদনের সম্ভাবনা যদি উদয় না হইত, তাহা হইলে মেনাকে আমরা হয়ত অকৃত্যে পর্যাবসিত করিতাম। এবৎসরের মেলার বিশেষ প্রেরণা ছিল ভারতীয় ধর্মশুদ্ধির প্রতীতি, মেলাতীর্থ ভারতীয়ে পরিচয় করাই আমাদের জাতীয় মেলা ও প্রদর্শনীর মূল সম্বন্ধ; গতবৎসরে জাতীয়-তীর্তীর্থে ভারতীয় মেলায় পূর্ণ হইয়াছিল, এবৎসরে ভারতের অন্তর্গতায় যে ধর্ম-শ্রোত প্রবাহিত হইতেছে, যে ধর্মই ভারতের প্রাণ, জগতের সহাবনী, তাহাকে স্পষ্ট করিয়া ভারতীয় শুদ্ধমূল্যের তীরেতীরে তাহার মূর্তা-চকল কীলার মূগমহিমা প্রকাশ করিয়া, মনে

কম্বাছিলিগাম, আমরা ধর্ম হইব, কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের পুর্বোক্ত নিষেধাজ্ঞার পশ্চাতে কি যের সন্দেহকালিমা লুকাইয়া আছে তাহা আমরা জানিভাম না, ফ্রেঞ্চ গবর্ণমেন্টও আবার কোন ছিন্ন দর্শন করিয়া চকল হইবেন কিনা তাহাও স্থির করা হইল। চিত্ত, এমন সময়ে আমাদের সমগ্র অন্তরাত্মা কাঁপিয়া আমাদের জাতি-সাধনার মর্মকোষ ছানিয়া মহাত্মার আগমন-বশ বৈদিক সভ্যতাকে জাগিয়া উঠিল সেদিন আমরা আর কান-বাধাই দেখিগাম না, আমাদের অন্তর-কোষতী কোষে কোষে উদ্ভূত করাই তখন আমাদের সমগ্র হইল—আমাদের সভ্যতা, আমাদের ধর্ম, দ্বিতীয় সপ্তমূল্য আমাদের জাতীয়তায় সন্দেহ করিবে কে? এই একান্ত তেজঃপূর্ণ শক্তি ও সরল মনোভাবই আমাদের পথ পরিদর্শন করিল, আমরা জাতীয় মেলা ও প্রদর্শনী-যজ্ঞ সমাপনের জন্ত বর্ণাশ্রম আশ্বাদন করিগাম। তেজঃ, সরলতা ও সভ্যতার ঐশ্বর্য মহাত্মা গান্ধীর আগমন-প্রতীকায় আমাদের সমগ্র সমগ্র জাতীয় অভিব্যক্তির বীজ বৈজ্ঞেপে অঙ্কিত হই তাহার বর্ণনা বাহুল্য নয়, কিন্তু মর্ম বিদীর্ণ করিয়াই তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল।

বলা বহুলা একজন অগাধ আশ্রয় বহু জনের নিকট গমন করিতে সক্ষম হই নাই, ইহার জন্ত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের প্রতি গবর্ণমেন্টের কঠোর বাধ্যতায় কেনে ভীতি ও শঙ্কাত আশ্রয় করার অনেক সাহসকৃত্তিমশার গতিও

আমাদিগকে অর্থদানে অল্পসুখীত করিতে পারেন নাই, তজ্জন্ম এবৎসর আয় অপেক্ষা ব্যয়ের মাত্রা অধিক হইয়াছে—কিন্তু ব্যয়ভার বহন করিয়াও আমরা প্রদর্শনীর চিত্র ও বিষয়গুলি আমাদের মনোমত করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। আমাদের মনোমত বিষয় ও দৃশ্যগুলি যে প্রতি দর্শকের মনোরঞ্জন করিয়াছে, তাহাতেই আমরা কৃতার্থ। মনোজ্ঞ বিপিনচন্দ্র মেলার অষ্টম দিবসে প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে উপস্থিত হন, সে দিন একটা হুন্দর বক্তৃতায় তিনি সকলকে মোহিত করেন; তাঁহার বক্তৃতায় ধর্মগুরুমণ্ডলের দৃশ্যগুলি সম্বন্ধে অল্পকৃত-ভরা যে অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়, তাহার অতি অল্প অংশই আমরা এইখানে এদান করিলাম—“এ-যে মেলার কল্পনা ও সৃষ্টি আজ আমি এখানে দেখিলাম, ইহা দেখিরা আমার সেই সেইদিনের কথা মনে পড়ে, যেদিন সে-মুগের জাতীয়তার স্ববি উপাধায় বঙ্গবান্ধব শিবাজী-উৎসবউপলক্ষে কলিকাতার পাত্তার মাঠে একটা বৈশি মেলার প্রতিষ্ঠা করেন—তিনিও সে-মেলার শব্দশব্দভাষ্যের সমাধা করিয়া বাজা, গান, বক্তৃতাতির দ্বারা লোকরঞ্জননে সহিত জনগণের মধ্যে বদেহীভাব প্রসারের জন্য এইরূপ মেলার উদ্যোগ করেন। কিন্তু আজ এখানে ধর্মগুরুমণ্ডলের দৃশ্যবলীর ভিতর আমি মতিবাবুর যে অধ্যাত্মশক্তি শক্তি উপলব্ধি করিতেছি তাহা এক অভিনব ব্যাপার—ইহা উপলব্ধি ও ধ্যানের বিষয়—এই দৃশ্যগুলির দ্বায়ে আমরা ভারতীয় অধ্যাত্ম-প্রবাহ লক্ষ্য করিতেছি; ইহাই আমাদের backbone, জাতীয়তার মজ্জা-মর্ম”। ইহার পরে তিনি প্রস্তাব করেন, “মতিবাবু এই দৃশ্যগুলি ব্যাঙ্গার কেন্দ্রবিন্দু অর্থাৎ কলিকাতার লইয়া চন্দ্রন, আমরাও তাহাকে ধ্যানসত্ত্ব সাহায্য করিব, বাংলার এই নিরাশ্রয়সম্পন্ন বঙ্গবাসীকে যে যেখানে বসে—আমনি। আমরা প্রস্তাব কার্যকরী হইবে কিনা”।

চিত্রাচারী বুদ্ধ বিপিনচন্দ্রের উক্তি সাধারণ-ভাবে দর্শকদিগের মনোভাবই ব্যক্ত করিয়াছে—কোন কোন দর্শক ধর্ম-দৃশ্যগুলির ভাববিকাশে মাহিত হইয়া তাহার মর্ম্মসেবাধারের পুর্বেই বহন আমাদের সামাজিক আলোচ্য ও চিত্রগুলি দর্শন করেন, অষ্টমবর্ষে গোবিন্দান হইতে আরম্ভ করিয়া শেষে হিন্দু বিশ্ববাবালায় হয় উৎকলনে মৃত্যু, না-হয় মূলমন্ত্রের অক্ষয়ানিবি অবস্থা দেখিরা তাহার বিম্বা উঠেন, ধর্মদৃশ্যগুলির ভাব-ধারণার মধ্য উল্কাটন করিতে পারি না, পারি-এই সমাজদৃশ্যগুলি সত্যই অসুত। হিন্দু বিশ্ববাবার অস্বাভাব, জল-অচল জাতিসম্বন্ধে আমাদের জঘন্যমান বাবস্থার ছিড়ে ছিড়ে হিন্দুদের দর ও মূলমানবদের বুদ্ধি যে কিরূপে সযত্নিত হইতে পারে, তাহা আলোচ্যদৃষ্টে লোকসম্বন্ধের স্পষ্ট-রূপে অঙ্কিত হইয়া যায়। সমাজের অজ্ঞান নারীর অবগুষ্ঠন ও অজ্ঞানতা যে তাহার দলন ও ধর্ম্মের বীজরূপে নারীকে দিনে দিনে পশু, পাশাপাশী করিতেছে, তাহা চিত্রদর্শনে প্রত্যেক নারী ও পুরুষ এমন হৃদয়রূপে জঘন্য করিয়াছিলেন যে আমরা ইহাকে আশাতীত বলিয়াই উপলব্ধি করিয়াছিলাম। ধর্ম্মচিত্র ও সমাজচিত্র, এই দুইটি চিত্র প্রবর্তক সাধকদিগের শিক্ষা ও সাধনার নির্দেশস্বরূপ—শান্তিগুরের-স্বপ্নশিল্পী শ্রীকৃষ্ণ নগেন্দ্র নাথ পাল মুষ্টিগুলি গঠন করেন, এতদ্বির দৃশ্যগুলির বাবতীর বিষয় এবং আলোচ্যগুলি প্রবর্তক-সাধকগণই-নিজহস্তে সৃষ্টি করেন। ইহারা নিজহস্তে মেশা-শেষাই ও নির্মিত করেন।

মন্দিরের সমুখস্থ বক্তৃতা ও অভিনয়াদির মণ্ডপটি গঠিত হয়। ইহার পরেই ছই সারি দোকান, তৎপরে প্রবেশদ্বার—প্রবেশদ্বার “ও বাগমত” এবং মন্দিরের ভূতীয় স্তরে বৃহৎ অক্ষরে “ও” মন্দিরভাস্কর্য হুঁকারস্বপ্নটি প্রথমী মাতৃবীর আরাধনার

শরীরমন জাগ্রত ও কটকিত করিয়া তুলে—মেশাংশ যে আর্যধনার স্থান, আমাদে ও তরল উজ্জ্বল যে তাহাতে নাই, তাহা অন্তর-দেবতা প্রবেশপথেই জানাইয়া দেন।

দোকানগুলিরও এবার বিশিষ্টতা ছিল, বন্ধরের কাপড় ও পোষাক ভিন্ন গালা, দস্তমজনে, মোজা ও দেশালাই তৈয়ারী প্রভৃতি প্রদর্শন করা এবার মেলার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল; নিরুপস্থে অল্প মূল্যেই কিরূপে পুর্ণোক্ত ব্যবসায়গুলি পরিচালন করা যায় মধ্যবিত্ত গৃহস্থের যুবক চাকুরীর আশ্রয় না লইয়া স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন পুর্নক দেশের কল্যাণসাধন করিতে পারেন, ইহা প্রদর্শিত হওয়া মেশা কল্যাণের উদ্দেশ্য ছিল; আমরা এবিষয়ে অধিক-কিছু করিতে পারি নাই, তথাপি বাহা প্রদর্শিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে সোপোন সারভিন্দুগীষ পরিচালিত গুয়ার্কি মানস ইনস্টিটিউট-এর মোজা তৈয়ারী, মেশার বি এও ডিয়ার কোম্পানির গালা প্রস্তুত, ভবানী ইন্ডিয়ানার এও ট্রেডিং কোম্পানীর দেশালাই-তৈয়ারী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহারা আমাদের নিয়ন্ত্রণে মেলার উপস্থিত হওয়ার আমরা বিশেষ কৃতার্থ, ইহারা ইহার জন্ত আমাদের গভীর ধন্যবাদে পাত্র হইয়াছেন। এই উপলক্ষে আমরা উত্তরপাড়া রামকৃষ্ণ সন্ত ব্রহ্মচাশ্রম ও কলিকাতা শ্রামবাগীরের মোব নাশীকেও গভীর ধন্যবাদ জাপন করিতেছি। ব্রহ্মচাশ্রমশ্রমের নির্মিত বস্ত্র ও অজ্ঞাত ভ্রব্য এবং মোব নাশীরা বাগান-চাষের বীজপ্রদর্শন মেলার উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্যকে বিশেষ পরিষ্কৃত করিয়াছিল।

আমরা স্থানান্তরে সকল লোকানের নাম করিলাম না, বাহা হইয়া তাঁহার না আসিলে মেলা বেশে জম-জমা হইত না। বন্দরবিক্রেতাদিগের মধ্যে প্রবর্তক এম্পোয়রম্, মুগালিনী বজ্রবন কাগলার, মাতার বেষ্টন করিয়া যে অধ্যাত্ম-সৌধ রচনা করেন, তাহার বর্ণনা চিত্রেই অধিকতর পরিষ্কৃত

বিক্রেতে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। বক্তৃতা-মণ্ডপ ও মন্দিরের উত্তরাংশে সমাজচিত্র স্থান পাইয়াছিল, বাহাদের আবির্ভাবে আমরা সমাজের দুর্নীতিকে দুর্নীতি বলিয়া বৃত্তিতে শিথিয়াছি—সত্যদাহ, অষ্টমবর্ষে গোবিন্দান, বিশ্ববাবার চিত্র-দৈব্য, অম্পুজের প্রতি পত্তনং আচরণ, বিশ্ববাবার একাদশী প্রভৃতি বাহাদের রূপায় ধর্ম ও নীতির স্থানচ্যুত হইয়া সাধারণ মানবকল্যাণের ভণ্ডাত্ত চিত্ররূপে বিশ্লিষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেই কয়েক পুণ্যলোক মহাআর চিত্রও এই অংশে বিশেষভাবে স্থান পাইয়াছিল। রাজা রামমোহন রায়ের মূমর মূর্তির গঠিত মর্হাণ দেখেজনাখ ঠাকুর, স্বদানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, দীনবন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিত্রাবলী উত্তর-অংশের দেবতারূপে বিরাজ করিয়া-ছিল। এই অংশে প্রবর্তক-সাধকদিগের সমাজ-চিত্র ভিন্ন প্রগ্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীকৃষ্ণ গগনেন্দ্র নাথ ঠাকুরের বাগচিত্রগুলি বিশেষ বিবরণভুক্ত হইয়া লোক-চক্ষের সাগ্রহ দৃষ্টিলাভের বিষয়ভূত।

মন্দিরের দক্ষিণে বিশেষ মণ্ডপে ধর্মগুরুমণ্ডলের স্থান হইয়াছিল। মণ্ডপটি চতুষ্কোণ, মধ্যস্থলে একটা বংশনির্মিত মন্দিরে ভারতমাতার মূমরমূর্তি স্থাপিত হইয়াছিল—বরদে বাণী-বিদ্যাদায়িনী হুজলা ভাট ভারতমাতা চতুর্হস্তে অম-বস্ত্র-শিলা-দীপা-বিগাহিয়া কবি শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভামন্দিরে বেক্রমে অধিষ্ঠিতা হইয়াছিলেন, এবারের মেলার ও প্রবর্তক-সাধকদিগের বিশেষ প্রেরণায় তাহাই মুম্বী (ও চিত্রাবলী) রূপে মেশাংশ পূর্ণ করিয়াছিল। চিত্রাবলী মাতৃ আখ্যার বিশেষ দীক্ষাংশলক্ষেই ধর্ম-গুরুমণ্ডল করিত হয়।

ভারতীয় ধর্মগুরুদিগের একাদশী দৃশ্য ভারত-মাতার বেষ্টন করিয়া যে অধ্যাত্ম-সৌধ রচনা করে, তাহার বর্ণনা চিত্রেই অধিকতর পরিষ্কৃত

হইবে। ভারতে যখন ভগবানের বাণী উদ্ভিত হয়, কুরুপাণ্ডববিগ্রহে মধ্যে পাকজ্ঞানধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া মহাশয়, বৃদ্ধদেব শকর, রামানুজ, নানক, রামদাস, রামানন্দ-স্বামী, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরাধাকৃষ্ণ বৈকোণ্ঠ, যুগান্তর ভাগবতবাণী প্রচার করিয়া ভারতবর্ষ ধ্রু করিয়াছেন, কেহই বর্ষ বা অশুভভাবাধার তাঁহাদের বাণী ক্ষুণ্ণ করেন নাই, এবং তাঁহাদের অধ্যাত্ম পুঙ্খ ভারত-সমাজের বর্ষ, অশুভভাব ও অহিন্দুতার সর্ব সংহারমুক্ত হইয়াই ভাগবতোক্তাস্থে পূর্ণ হইয়াছিল—দৃষ্টান্ত ভাষ্যে এই মন্তব্য স্পষ্ট করিয়া সূত্রিয়া উঠে, এবং বর্তমান সমাজ ভারতের এই শাখা: প্রবাহ ক্ষুণ্ণ না করিয়া বাহাতে তাহার স্বরূপের হৃদ প্রকাশে পরিণত হয়, তজ্জ্ঞ এক ব্যাকুল জিজ্ঞাসার দর্শকের মন প্রাণ ভরাইয়া দেয়।

এতদ্বির মন্দিরের উত্তর পাশ্বে এবং বড় হলটিতে সোমেন্দ্র নারায়ণ লীগ ও পল্লী মন্দিরের প্রদর্শিত দেশের অবস্থা-চিত্র স্থান পাইয়া লোকশিক্ষার প্রচুর সাহায্য করিয়াছিল। ইহার জ্ঞান আমবা লীগের তরবার শ্রীকৃষ্ণ বিজ্ঞেন্দ্রনাথ মৈত্রেয় ও পল্লী-মন্দির শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানেন্দ্র নাথের নিকট বিশেষভাবে শ্রী। ছোট হলটি নারায়ণের প্রদর্শনী-রূপে ব্যবহৃত হয়, নাগী-হস্তে বিচিত্র ও স্থল শিল্পসম্বন্ধে এই গৃহ পূর্ণ হইয়াছিল। অল্প পুর্বে হইতে শ্রীকৃষ্ণ এ. সি. ভৌমিক মহাশয় যে কর্তা নারায়ণের নমুনা প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা অত্যন্তই স্থান অধিকার করে। কলিকাতার নারায়ণশিক্ষামিতি ও স্থানীয় নারায়ণের কাক্ষ্যার্থে

অনেকগুলিই বিশেষ প্রশংসার যোগ্য, আমরা এই স্থলে ছয়টি প্রবোধ বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতেছি। • শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণচন্দ্র বসাকের চৌধুরী নারায়ণশিক্ষামিতি ও বিদ্যাসাগর বাণীভবনের প্রেরিত প্রবোধি আমাদের হস্তগত হয়—এতজ্ঞ আমবা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

জাতীয় মেলায় ভাব প্রচারই বিশেষ অঙ্গ—এই অঙ্গে আমরা এবার প্রত্যহ চিত্র-প্রদর্শনে বহুতা নিবারণ ব্যবস্থা করিতে পারি নাই, দৈবহৃদয়টাই ইহার বিশেষ কারণ—তথাপি শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানেন্দ্রনাথ বাবু দেশের ডাক ও শ্রীকৃষ্ণ যামিনীচন্দ্র মজুমদারের প্রবচন এই অঙ্গ অনেক কাংশে পূর্ণ করিয়াছিল। উদ্বোধন-দিবসে দেশপ্রাণ যমস্বী শ্রীকৃষ্ণ রায় বসন্তেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় যে স্বর বিধা মেলায় সফল-সম্পন্ন হুত্বিত ব্যক্ত করেন, যেই স্বরের দোহনা আমরা প্রত্যেক ভাবপ্রচারমণ্ডলে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ সত্যানন্দ বহু, কাজী নবকুল ইসলাম, শ্রীকৃষ্ণ দিলীপকুমার, বৃদ্ধ বিপিনচন্দ্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ বাবু, যামিনী বাবু, শ্রীকৃষ্ণবিজ্ঞেন্দ্রনাথ মৈত্রেয়, সকলেই প্রাণ ভরাইয়া, স্বর ভরাইয়া, আত্মদানে মেলায় সফলভিত্তিতে বেরূপে অগ্রসর হন, তাহাতে আমরা সকলেই কৃতার্থ। ইহার জ্ঞান ইংল্যান্ড বিশেষ ধন্যবাদ।

পরিশেষে নারায়ণ পুঙ্খ দর্শক সাহায্যকারী সকলকেই অভিনন্দন করিয়া আমরা জাতীয় মেলা ও প্রদর্শনীর এই প্রথম বিবরণী প্রকাশ করিলাম।

বিভাগে বাহ্যের প্রদর্শনী দর্শন করিতে, রাজি-কালে তাঁহারাই ইংল্যান্ড বিশেষ অভিনবরূপে দেখি

যাইতে, এই অভিনবতার কারণ আলোকমালা তাঁহার বিনামূল্যে ও নামমাত্র মূল্যে বৈজ্ঞানিক ও আলোকের বিশেষ স্বসজ্জা—ইহার জ্ঞান আলো ও তাঁহার সঙ্গমাদি দিয়া আমাদের বিশেষ আমতা চন্দননগরের ইংকুটি কক্ষে এবং সাংঘ্য করিয়াছেন—ইতি ১লা জুন, ১৯২৫ কলিকাতার নরসিং দাস মদনগে পাণ স্পাদক, জাতীয় মেলা ও প্রদর্শনী কক্ষে দ্বয়কে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি। প্রবন্ধক-সত্য, চন্দননগর।

K. Paul.
16.9.25.

• হরের কাছ—শ্রীমতী বিমলা সুন্দরী পাল (পুর্ণিমা), শ্রীমতী কুমারী ভৌমিক (পুর্ণিমা), শ্রীমতী অবলা বালা ভৌমিক (পুর্ণিমা); পাতকি কাঁধা—শ্রীমতী সুধারাবী চট্টোপাধ্যায় (নাট্য, চন্দননগর); পাখা—শ্রীমতী সুধারাবী চট্টোপাধ্যায় (নারায়ণশিক্ষামিতি); কলের সাজ—শ্রীমতী লাল দাসের বাণী (লাল বাগান, চন্দন নগর)।

পূজার বিশেষ সংখ্যা

“প্রবর্তক”

বাংলার শক্তি-সাধনার মর্শ পরিচয়

রামশশাদ ও ঠাকুরের শক্তিওপ, রক্তা কামমোহনের তত্ত্বোপাসনা, বন্ধিন ও শ্রীঅবধিন্দব জাতি-শক্তি, পরিশেষে চিত্রাঙ্গন ও গান্ধীর স্তম্ভ ও সংযুক্ত শক্তিপ্রেরণা—একে একে হৃদয়ের স্থান পরিষ্কৃত করিয়া দেখান হইবে।

নির্মাণসাধনার প্রবর্তক

শ্রীমতিলাল রায়ের—

অনুভূতিময় সিদ্ধভাষার আত্মসাধন ও বাংলার শক্তিবিদের কেন্দ্র রহস্ত “দশমহাবিদ্যা।” এই সংখ্যার বিশেষ বিশেষত্ব !!

বহু চিত্রালোকে হৃদোভিত।

গ্রাহক ছাড়া বীহারী এই সংখ্যা “প্রবর্তক” হইবেন, তাহার। পূর্ণ হইতে মূল্য ১০/০ আনা ডাকযোগে লইলে ১০/১০ আনা জমা দিয়া নাম রেজিষ্টারী করণ। নাম বুক করা না থাকিলে এই বিশেষ সংখ্যা “প্রবর্তক” পাওয়া দুষ্কর হইতে পারে।

কর্মক্ষর্তা “প্রবর্তক”

কলিকাতা ৬৬ নং মাদিকতলা ষ্ট্রীট, প্রকাশ প্রেস হইতে শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



১ম বর্ষ, }
৬ষ্ঠ সংখ্যা }

প্রবর্তক

{ আশ্বিন,
{ ১৩৩২

আমার দুর্গোৎসব

—:—

“আমায় দে মা পাগল করে”—পাগলের পান। চাহিয়া কাহাকেও পাগল হইতে দেখিয়াছ কি ? মাতৃপ্রেমে উন্মাদ হইয়াই ভারত পাগলের মেলা-বেদ, উপনিষদ, পুরাণের কথা ছাড়িয়া দাও, স্বর্গ। মাতৃপ্রেমহারা যে পান করিয়াছে, সে পাচ সাত হাজার বছরের নজির বাহির করার প্রয়োজন নাই। শুনা যায় বৃদ্ধ, শব্দ—ই হারাও মাতৃপ্রেমে উন্মাদ হইয়াছিলেন, তাই পাগলেরও মতসাধনায় সিদ্ধ, কিন্তু প্রত্যেক সাক্ষ্য দিবে কে ? প্রার্থনা—“আমায় দে মা পাগল করে”—জান-আমি কিঞ্চিদাধিক ২০০ বৎসরের মাতৃতত্ত্ব বিচারের পরে দম বদ্ধ হইয়া যায়, ভারত চায় প্রেম আর শক্তি। মাতৃসাধনায় ইহার সিদ্ধি। মাতৃ-প্রেমের আশ্বাদ করে নাই, সে মাহু হইয়াও পশু, পশুত্বের বলি এই মাতৃপ্রেমে। মায়ের মূখ চাহিয়া কাহাকেও পাগল হইতে দেখিয়াছ কি ? বেদ, উপনিষদ, পুরাণের কথা ছাড়িয়া দাও, পাচ সাত হাজার বছরের নজির বাহির করার প্রয়োজন নাই। শুনা যায় বৃদ্ধ, শব্দ—ই হারাও মতসাধনায় সিদ্ধ, কিন্তু প্রত্যেক সাক্ষ্য দিবে কে ? আমি কিঞ্চিদাধিক ২০০ বৎসরের মাতৃতত্ত্ব সন্ধানের সিদ্ধ জীবনের পরিচয় দিব। মাতৃপ্রেম-স্থায় এমন অমর প্রাণ কোনও দেশে গুঞ্জিয়া মিলিবে না, এমন প্রেমোন্মাদ, এমন আপনভোলা হিংসাবিদ্বেষ-বর্জিত শিবায় চরিত্র, যাহা স্মরণেও কলুষ ক্ষয়

হয়! তাই বাহালী, এই "তরুণী" যদি স্বা-
করিয়া বাহিয়া লইতে চাও, তবে বাংলার নিম্ন
সাধনার সুলভ উচ্চারণ করিয়া গাও

"জয় বাহালী জয় কালী বল
লোক বলে বলবে পাগল হলো"।

কালীর হাতে ঐ বৈষ্ণব বজ্র, উহা তোহিনার নয়,
উহা জ্ঞানের মায়ামোহ কাটার সিদ্ধান্ত। পুরাণ
ছাড়াই জীবনের ক্ষেত্র ইহার চরম পরীক্ষা লক্ষ্য
কর। লক্ষ্য কর, হালিশের রামপ্রসাদের জীবন,
লক্ষ্য কর বঙ্কমানের সাদক, কমলাকান্তের দিকে।
মাতৃনামের পরশে রামমোহনের কণ্ঠে নৃতন বেদের
স্বাক্ষর উঠিয়াছে, বসুটাল পাড়ার বঙ্কিম দত্ত
হইয়াছেন। কেশবের একাত্তার ব্রহ্মানন্দের নির্বাহ,
কৃত্যের অমৃতশীতল কণ্ঠে উপদেশ, তারাপীঠের
বামাক্ষাপার কণ্ঠে মাতৃনামের বিঘাণ—সে সবই
যে আমার মায়েরই মহিমা। আর যদি ত্রিক দেখিছা
ধাকি, বঙ্কমানের কৃষ্ণটিকা বিদীর্ণ করিয়া যদি
তবিক্রান্তের স্বর্গউষা দেখার সুযোগ পাই, তবে
বলিব, মাতৃপ্রেমে উদ্ভাদ হইয়াই অশ্রুপ্রবিন্দ
জড়ে চৈতন্য দেখিয়াছিলেন, মাতৃপ্রেম-মদিরায়
টলিতে টলিতেই বাঙ্গালীকে নবজন্মের কোল
দিয়াছিলেন।

কালী যেমন শিবের রাজ্য, বাংলা তেমনি মায়ের
নিক্ষিপীঠ। কোটা কোটা জন্মের কঠোর তপস্রায়
মাতৃ বাহালী হয়। পদ্মা-ভাগীরথী-অধ্যায়িত
স্বজলা শতজামলা বাংলা পূণ্যময়ী ধাত্রী আমার—
জন্মদাতা আমার। তোমার কোলে রমিয়া যে
ভাষিয়াছে, সেই তো জগজ্জননীর সাফল্য পাইয়াছে,
আমি কেন পাইব না তা?

সে শুণু আমার তোমার মা নয়, সে জগতের মা।
বাংলার দুর্গোৎসব শুণু বাঙ্গালীর পূজা নয়, জগতের
পূজা, জগদ্ধাত্রীর পূজা। এই পূজামণ্ডপে শুণু যে

হিন্দুরই অধিকার আছে, আর কোন জাতির নাই—
তাহা নহে, জীব মাকেরই আত্ম মাতৃ-উপাসনার দিন।
শরতের আকাশ আজ স্ফুল্ল নীল, সরোবরে কুমুদ
কল্লার বিকশিত, আকর্ষিত দোপাটী স্থলপথের
রাধা হাসি, হারটের জলধারাধারিত বিটপী বন্যরী
গুচিবিশে শ্রাম বসনে দেবীর আস্থানে উদ্গদ্যবী।
হৃদয় ক্রিরণে গলান দোণা ছড়াইয়া পড়িতেছে—
জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর আগল চৈলিয়া পুলকের স্পন্দন
আবালবুদ্ধবনিতার শরীরে শিথল তুলিয়াছে। হরিৎ
নীল ক্রমিক্রমে কাশকৃষ্ণের চেউ বেয়েল বুলবুলের
শিখ—মরি মরি, অলক্ষ্য পদসঙ্করে বাংলার পূজা-
মণ্ডপে একার হৃদয় গুণন রে!

অহং রাষ্ট্র সংগমনী বসুনাং

চিকিত্ত্বরী প্রথম যজ্ঞানামা।

তাং মাং দেবা বাসুদং পূজাতা

তুরিয়ার্থং তুর্ধ্যাবেশহ্যম্।

অহং রাষ্ট্র—আমি জগতের ঈশ্বরী, তথা বসুনাং
সংগমনী—আমিই বাহিতদের ধনধাত্রী, সর্গশরীরে
বিরাজিতা, সমস্ত বস্তুর সত্তা, জগতের লোক
দেখানো অধিষ্ঠান পূর্বক যে কোন কথের অধিষ্ঠান
করে, তাহা আমারই উপাসনা।

এই অগংপালিনী মহাশক্তির আরাধনা-
মণ্ডপে কে জাতি বিচার করিবে, কাহাকে
অনধিকারী বলিয়া দূরে রাখিবে? আমার
ধর্মক্ষেত্র ত্রিক্ষেত্ররূপে সর্গজাতি সর্গ সম্প্রদায়ের
তীর্থ, আমার পূজামণ্ডপ ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-হিন্দু-
মুসলমান-জৈন-গুপ্তান—সকল ধর্মবিশ্বাসীর উপাসনা-
ক্ষেত্র, আমি বিশ্বের পদরেণু মাথায়
বহিয়া শুচি হইব, জগতের চরণে টুটাইয়া
মায়ের দয়া লাভ করিব, মা যে আমার জগদ্ধাত্রী!
মায়ের করুণায় একাদশ রুদ্র, অষ্টবহু, দ্বাদশ
আদিত্য—বহু বহুদ্বার কল্যাণে শূন্য বিচরণশীল,

মায়ের করুণায় মিত্র, বরণ, ইজ, বহি, অশ্বিনী-
কুমারধ্বজ, অমরলোক হইতে মন্তোর বৃক অমৃত
নিকমে নিয়োজিত। মা আমার সোম, বৃদ্ধা, শ্রোত
পুণ্য, ভগদেবকে বৃক ধারণ করিয়া জীবের পুষ্টি-প্রীতি-

আমার—নিবাস, প্রথাস, ক্রময়ের স্পন্দন, মা
আমার—দৃষ্টি, শক্তি, জ্ঞান, আশ্রয়, স্পর্শ। ধর্মদীর
মায়ের দয়া মূর্তিমতী, এ মা কি শুণু আমাই মা!
পশু পক্ষীর চেতনা নাই,
তবু শরতের প্রভাতে,
স্বর্গোদয়ের সঙ্গে, মাতৃ-
শক্তির জাগরণ অতীব
করিয়া, কি মধুর কালী
ধ্বনি করে, একবার কাণ
পাতিয়া শুন, দেশ নয়ন
ভরিয়া—শরতের আকাশে
কি নীলের স্বর্ণাঙ্গ সবে,
চক্ষু কি বিমল জ্যোৎস্নায়
ধরণী ভাসায়, তুণে পলবে
ফলে ফলে কি স্বপ্নমার
আলিঙ্গনা—মায়ের এই
বিস্তৃত রূপরশি গুটাইয়া,
ভানিয়া ভানিয়া আমি
যে প্রতিমা গড়িলাম,
তোমার কি ইহা মুগ্ধমী
বলিয়া আমার চিন্তায়
মাতৃমূর্তির চরণে শ্রদ্ধা
অর্পণ করিব না?



শক্তিরূপের অবতরণ।

সম্পাদনে উদ্ভাত, মায়েরই করুণায়—জায়ের রশ্মি
নয়, সমীরণে অমৃত, শব্দে বীর্ঘ, মা আমার—সর্গভূতে
চেতনা বুদ্ধি, নিভ্রা ক্ষণ, শক্তি, তৃষ্ণা, কাঙ্ক্ষা, মা
আমার—লজ্জা, শাশি, শ্রদ্ধা, বৃত্তি, শ্রুতি, দয়া, মা

হইল, সেই দিন হইতেই মাতৃময় জপ করিয়া,
অনির্বচনীয় বিশ্বজননীর বিরাট মূর্তিকে রূপের
কাঁদে কেলিয়া, ক্রময়ের মণিকোটায় তিলে তিলে
পড়িয়া তুলিয়াছি—পূজার মণ্ডপে ঐ যে প্রবল

হানায় যেদিন ধূম ক্রমবর্ধ

অগিরি স্রায় প্রভাব-

সম্পন্ন শুভবর্ধ দিমমান—

ক্ষা কাণো মেঘের

পশুপতির পুটে পদস্থাপন করিয়া, অতঃপর মনকে পাশবন্ধনে বাঁধিয়া, মায়ের শঙ্ক-বিমর্দিনী দশ-প্রহরণ-ধারিণী চূর্ণামূর্তি—উহা-যে তোমার আমার সর্বজীবের মাংসগুলিনী আশ্বাশক্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞানময়ী শ্রীসম্পদ-ঐশ্বর্য্য-প্রদায়িনী, তেজোবীৰ্য্য-শালিনী, সর্বাভীষ্টপূর্ণকারিণী বিশেষত্বী। জগদ্বাসীরা মন্তক ভূত হউক, মানব জাতির কণ্ঠে আজ ময়ূরপনি উঠুক—



মাতৃ-পূজা।

ও আগচ্ছ মনুগৃহে দেবি অষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ।
পূজাং গৃহাণ বিধিবৎ সর্বকলাশংকারিণি ॥
প্রাণান্ রক যশো রক পূজারধনং সদা।
সর্বরক্ষা-কারী যম্যং অং হি দেবি স্বয়ংপ্রিয়ঃ ॥
এস ভাই মাতৃভক্ত সাধক—মহাশয়র যোরা
দুজনীতে, শশানের চিতাশয্যা বসিয়া, অতীতের
অশ্রিত আকর্ষ নিবেশ করি, পিতৃলোকের তৃপ্তি-

বিধান হেতু অঞ্জলি অঞ্জলি শ্রদ্ধা দান করিয়া
প্রার্থনা করি। পিতৃপিতামহাদি উজ্জ্বল চতুর্দশ
পুত্র যেন আমাদের বংশ-জাতি-পোষক-আভি-
জাত্য সকল অভিমান হইতে মুক্তি দিয়া,
নবপত্রিকা-হস্তে বিশ্বজনীন এই মহাদেবীর
পূজামণ্ডপে সর্বজাতির সহিত কৃতাধীন অন্তরে
প্রবেশের অধিকার পাই, সর্বাধীনতা ও ক্ষমতার
মোহে মায়ের বেদী যেন জাতি ও সম্প্রদায়

বিশ্বাসের স্থান মাত্রে পরিণত না হয় কাজে
ও কথায় জীবনবন্ধ যেন সমস্তরেই বাজতে
পারে, বিশ্বজননীর পূজায় বিশ্বজাতির পুষ্পাঞ্জলী
মায়ের শাদপদ্মে বাহাতে পড়ে, তাহার ব্যবস্থা
করি।
ভারতের ইহাই সম্মান ধর্ম। যে শক্তি
সর্বভূতে সমভাবে বিরাজিত, সেই শক্তি

উদ্বোধন করার অধিকার-বোধ সর্বজীবের
বাহাতে জাগ্রত হয়, পৃথিবীর সর্বজাতি একই
জননীর আরাদনায় একই কণ্ঠে বাহাতে জয়ধ্বনি
ভুলে, লক্ষকোটি বাহ—একই জননীর সম্মান এই
অহুত্বিতে ভাইকে ভাই বলিয়া আশ্বিন দেয়,
এইরূপে পূজার ব্যবস্থা যদি আমরা করিতে
পারি—তবেই তো দেবীপূজার যোগ্য আয়োজন
করা হইল। কৃষ্ণ ভরিয়া সপ্তসিন্ধুর বারি
আহরণ করিতে গিয়া, সপ্তসিন্ধুর তীরে যত দেশ
যত জনপদ, যত জাতি, সবাইকে আজ মায়ের দেউলে
নিমগ্ন কর, আশ্বিনায় বিশ্বের মহাশোলা বসাইয়া

দাও। সপ্তসিন্ধুর জলে, তোমার হরিপাদপদ্ম-
নিঃসৃত গম্ভাবারি মিশাও, আকাশ-নিঃসৃত
অমল জলধারা ধরিয়া—প্রোতধিনী সরস্বতী
নদীর বক্ষ ছানিয়া পদ্রেণু মিশ্রিত চন্দন-
স্বাসিত নিরুরোধকে সর্বতীর্থজলে দেবীর
বেদীতল বিখ্যোত কর—মহাদেবীর আসন বিশ্বের
উৎসর্গে মহিমাশ্রী হউক—এস জাতি-নির্কিশেয়ে
এই আদ্যাশ্রিত চরণে ধ্যাম করি—

প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বান্তিহারিণি!
তৈলোক্যবাসিনামীভো লোকানাং বরদা ভব।

তত্ত্বের কথা

—:—

মন তোমার এই ভ্রম গেল না—

কালী কেমন ভাই চেয়ে দেখলে না।

ওরে জিত্বন বে মায়ের মূর্তি

জেনেও কি তাই জান না!

অহুত্বিতর বাণী—বুদ্ধির সম্প্রদারণে জগদ্বাসী
মাতৃমূর্তির কল্পনা নয়। এই মায়ের মাটির মূর্তি
গড়ার উপাসনাপদ্ধতিকে সাধক শ্রেয় করিয়া
বলিয়াছেন—জগৎকে যে মা নানা রস সোণা
দিয়া নিত্য নব নব বেশে শোভান, সেই মায়ের
মাটির অঙ্গে ডাকের গহনা পরাইয়া দেওয়া বড়
লজ্জার কথা! জগৎপালিনী অমরপুর্ণকে
আলোচাল আর বৃত্ত ভিজান দিয়া ভুলান যায়
না, কল্পাময়ী সর্বজীবের অধীশ্বরী মহাদেবীর

চরণে কেমন করিয়া মাহুয় মহিষ আর ছাগ বলি
দিয়া তৃপ্তি পায়, ইহা মতাই সমস্তা—মাকে পাণ্ডার
উপায়, প্রাণভরা ডাক ছাড়া অল্প কিছু নয়:—

“প্রসাদ বলে ভজি মন্ত্র, কেবল তের তাঁর উপাসনা।”
পূর্বেই বলিয়াছি, এই মা কুণ্ডলিনী শক্তি,
জীবের যেটুকু শক্তি সঞ্চারিত আছে, তাহা
শক্তির সবধান নয়, এই অখণ্ড শক্তির অহুত্বিতর
জন্তই সাধনা। শক্তির উপাসনা ব্যতীত আত্মতত্ত্ব
অহুত্বিতপ্রাপ্ত হয় না, ঠাকুর বলিতেন,—“মা
না দোর ছাড়লে, ঠাকুর দর্শন হয় না,”—মা কি
ছায়ার আগলু দিয়া আছেন?
হাঁ। শক্তির আধরণ উদ্ভিত না করিলে সেই
নিত্যযুক্ত শক্তিদানক স্বরূপের সাক্ষ্য মিলে না।

এই শক্তি, প্রকৃতি ভেদে, নানা মস্তিষ্কে, সাধকগণের নিকট প্রকাশ হন, যাদের মস্তিষ্ক অসংখ্য, তিনি করেন কি ভাবে কাহাকে দেখা দেন, তাহার ঠিক নাই, মহামায়ার কীল-বেচিত্রের সীমা নির্ধারণ করে কার সাধ্য !

সাংখ্যিক জীবনের আত্মাত্মিক দৃষ্টি নিবৃত্তির উপায় অজ্ঞেয় করিতে পিয়া, এই মহামায়াকে আত্মপ্রকৃতিরূপে নির্ণয় করিয়াছেন, প্রকৃতি-তত্ত্বের রহস্যময় উন্মোচন করিতে অসমর্থ হইয়া তিনি নিরাশ্রয়তার প্রচার করিয়াছেন জ্ঞানের আলোয় চূর্ণিত মহাকাশীর মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া নিত্য ভগবানের জ্যোতির্ময় স্বরূপের সন্ধান পান নাই। জ্ঞান যেখানে লুপ্ত, শক্তি যেখানে লম্বের পৃথলীর মত, শক্তি সমুদ্রে লয় পাইয়াছে, ভক্তি যেখানে ডুব দিয়া মহারত্ন আহরণ করিয়াছে, তাই ভক্তিই সাধনার শ্রেষ্ঠতত্ত্ব—সকলেই একব্যাক্য স্বীকার করেন।

চক্ষু যেখানে হার মানিয়া ফিরে, শ্রুতি যেখানে বধির, বুদ্ধি দিশেগারা, জ্ঞান নিরাশ, সেখানে ভক্তির অগ্রদূত বিশ্বাস চক্ষু বন্ধিয়াই, রসায়কের অগাধ জলে রাপ দেয়, যুক্তি বিচার তাহে ক্ষুর করিতে পারে না। অন্ধ বিশ্বাস বলিয়া বুদ্ধিমান লোকে হাসে, কিন্তু বিশ্বাসের প্রভাব দেখিয়া সকলেই বিমিত হয়,—সর্বাঙ্গী দৃষ্টি এদিক ওদিক দশদিক, দশবার দেখিয়া পথ চলে, বিশ্বাসের একটা উদার সম্পর্ক দৃষ্টি আছে, তাই সে অন্ধের মত, যেখানে বুদ্ধিমান জীব আর পথ পায় না, উপায়হীন বলিয়া নিশ্চেষ্ট হয়, যেখানে “জ্ঞানকালী” বলিয়া রাপাইয়া পড়ে। পাথর ভেদ করিয়া পথ বাহির করে, সমুদ্র শোষণ করিয়া গুপ্ত বস্তু আবিষ্কার করে। জগতের দুর্ভাগ্য পথে বিশ্বাসের মত উপকারী বস্তু আর দ্বিতীয় নাই। বিশ্বাস

দৃষ্টিহীন নয়, বিশ্বাস যাহা দেখে তাহা চরম এবং পরম, তাই সেখানে জগতের সব শ্রদ্ধা যোগান দেয়, তত্ত্ব-মন-প্রাণ উন্মোচন হয় বিশ্বাসের লক্ষ্য অজ্ঞাত, পরেশ পাথরের মত যাহা চোখে তাহাই শোণা হয়, জগতে অতীন্দ্রিয় অশুভতির সকল রহস্যই বিশ্বাসবলে সিদ্ধ হইয়াছে।

মুক্তার জয় যেমন শুভ্রিতে, বিশ্বাসও তজ্জন্ম সং ভিন্ন অতত্ত্ব উপদাত্ত হয় না, ইহাই বিশ্বাসের প্রকৃতি, এই হেতু অন্ধ বিশ্বাস বলিয়া যে কথা উহা অজ্ঞ জ্ঞেয় মুখেই বাহির হয়,—বিশ্বাস করিয়া সাধক কাল-রূপে রাপ দিয়াছিল, ‘কালী’ ‘কালী’ বলিয়া কাদিয়াছিল, তাই সে কুল পাইল, সৃষ্টির মূলে পরমেশ্বরের দর্শন পাইয়া জীবন সাধক করিল। এই হৃৎপ্রের মর্ম ভেদ করিয়াই, মানুষ রামরূপে বলিয়াছিলেন, শক্তির উপাসনা কর, তুমি সম্ভ্রমের সন্ধান পাইবে, বাংলায় তাই শক্তি-সাধনার অসংখ্য সিদ্ধপীঠ, সিদ্ধ জীবনের পরিচয় দেয়।

বাস্তবালী বেদ উপনিষদের চর্চা করে, কিন্তু ইহা ঈশ্বর লাভের উপায় বলিয়া স্বীকার করে না। বেদ উপনিষদের পরমাত্মতত্ত্বের দার্শনিক তত্ত্ব আছে, কিন্তু সাধনার বিধি নাই, বাস্তবালীর সাধনা—তত্ত্ব আর সহজিয়া। বাংলায় যারা সিদ্ধ বলিয়া ভবিষ্যতের পুণ্যার্থ্য গ্রন্থের অধিকারী, তাঁরা সকলেই এই দুই পথে আত্মদর্শন করিয়া সিদ্ধকাম হইয়াছেন, বাংলায় শতাব্দির হান হয় নাই। বুদ্ধের সাধনা বাস্তবালী তুড়ি দিয়া উড়াইয়াছে, গীতার শ্রীকৃষ্ণকেও বাস্তবালী তেমন দ্বন্দ্ব দিয়া বরণ করে নাই, ভারতের অগ্রদূত প্রদেশের তুলনায়, ইহাও জ্ঞান বাস্তবালী যে সমর্থক হীন হইয়া আছে তাহা নহে, বরং বাস্তবালী যে দিন তার স্বরূপের সাধন-তত্ত্বটা গোপন পুরী হইতে তৈরি বিরাট প্রকাশ

ক্ষেত্রে দাঁড় করাতে পারিবে, সে দিন সে মুক্তির বাজী বোঝা করিবে, সেই দিন পরের বোঝা বাড় হইতে নামাইয়া জীবন-সাধনার সত্য বেদ প্রচার করিবে। মহা পরাশরের কদাল-ভার, রঘুনন্দনের কাদ হইতে বংশপরম্পরায়ুক্রমে বহিয়া বহিয়া, আমরা রাত্র হইয়াছি। ইহার সংকার করার ভার ভবিষ্য জ্ঞাতীর উপর নির্ভর করে। এই দায়-ভার নামাইবার সঙ্কেত তত্ত্ব সহজিয়ার পাওয়া যায়। কিন্তু বাহিরের ঠাঁট বজায় রাখার মোহে, আমরা তাহা জীবন দিয়া শিকার করিতে পরাশ্রয় হই। কুমার সাধনায় উদাত্ত জীবন যাদের, তাদের আচার বিচার ছুঁমাপীর মত কেন এমন সীমার মধ্যে আবদ্ধ কেন এত সর্বাঙ্গী ? শুনা যায় বৈদেশিক সভ্যতা ও শিকার বানে, হিন্দুদের আসনখানি পাছে ভাঙ্গিয়া যায়, তাই এই সতর্কতা। যে ধর্ম এমন পল্কা, লম্বু, তাকে ধরিয়া রাখার জগৎ জগতের লোক-সংখ্যার তুলনায় যারা অগ্রগণ্য, তাদের এতখানি শক্তিপ্রয়োগ যে বাতুলতা, সে কথা যে শুনিবে সেই বলিবে, কিন্তু ঠিক তা নয়, ভারতের ধর্মের বনিয়াদ বাসুর উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, আলোক-সত্যের মত শূন্যে তাহার শিকড় মূলে না। পরের ধন বৃকে বহার মোহ আমাদের ভ্রান্ত করিয়াছে, যাহা আমার নয় তাহা যে হারাই হারাই ভাবে আমাদের পাগল করিয়া রাগিবে, ইহা অস্বাভাবিক নয়। বাংলায় শক্তিমায়ক সাধনার জগৎ যে উদার আচার প্রবর্তিত করিয়াছে, ব্যবহারিক জীবনে তাহা যদি নামাইয়া আনে, তাহা হইলে এই জ্বল ধরা পড়ে,— তেমন মিহরিয়া কাহার আছে, স্বরূপ-রতন দিয়া জাতিক নৃতন করিয়া গড়িবে ?

তত্ত্ব কি জ্ঞাতী মানে ? তত্ত্ব কি ভোজ্য অভোজ্য বিচার করে ? তত্ত্ব কি তলে তলে বর্তমান সমাজ বিধানের মূলকয়ের ব্যবস্থা করে নাই ?

সাধনার ক্ষেত্রে, বৃত্তিগত বিন্দু পণ্ডিত যাহা অবাধ বোঝে অচ্যুতানে অচ্যুত, ব্যবহারিক জীবনে তাহার ব্যবস্থায় কেন বৃষ্টি ত ? ঈশ্বর লাভের পথ যদি প্রকাশ্য ক্ষেত্রে বলার সাধ্য না হয়, তবে তাহা কি গোপন প্রবৃত্তির চরিতার্থতা হেতু ভগবানের নামে প্রকাশ ভগবানী নয় ? বাংলার তত্ত্ব সহজিয়া কেবল তো আত্মমুক্তির লক্ষ্যে অচ্যুত নয়, উহা জ্ঞাতীর সম্ভবিত্ব সমগ্রসামান্যের দ্বিতীয় রীতি, বাংলায় রাম মোহন এই নজির ধরিয়াই সমাজের নৃতনমুখি গঠনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তিনি একটা পুরুষের মত পুরুষ ছিলেন, তার পর বর্ষ-চোরা আসের মত ভিতরেই সব পাকেন, বাহিরে পাছে চোকার খাঁইতে হয় এই ভয়ে আত্মগোপন করেন, অস্তুর বাহির ভিন্ন হওয়ায়, ঠিক যেন ছুই-মুখ-জলা বাতির মত আমরার বড় ঝিল্লি নিশেষ হইতেছি। বুদ্ধের নির্লিপ্য, শূন্যবাদ, শব্দের মূক্তি-মোক্ষ বাংলায় জীবনসাধনার উদ্দেশ্য নয়, এইজন্য বাস্তবালীকে আজ হইতেই সতর্ক হইতে হইবে।

শক্তির সন্ধান চাই, জীবের শক্তি বাসনার আচ্ছন্ন, তত্ত্ব তাই বামাচারী ও দক্ষিণাচারী তাত্ত্বিকের পথ নির্দেশ দিয়া মুক্তির পথ দেখাইয়াছেন, কাপুরুষের মত কেন কুছ তাহা নিজেদের জীব বিবর্ধ করিতেছে, যেখানে বাসনার টান মাত্রেমমদিসাধ দমিত নয়, সেখানে গুরুমুখী হইয়া ভোগের সংযত বিধি অসমর্থ করিয়া বাসনা-ক্ষম কর। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ভিন্ন তো অন্য পথ নাই ! কে তোমায় বলিল নিবৃত্তি পথই শ্রেষ্ঠ, প্রবৃত্তির পথ অপকৃষ্ট, কে তোমায় বলিল ভ্যাগে শক্তি, ভ্যাগে পদার্থ ? সবই ভগবানের পথ। ভাগবত শ্রবণ নিরন্তর স্থির রাখিয়া শক্তির দ্যোতনায় জীবন ভাঙাও, ইহাই তত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য। সহজিয়াও সাধন ভেদে ভিন্ন নয়।

ইহুদীর পার্থক্য জীবননীতির গতি বিপরীত হয় না। তত্ত্বের পক্ষসমর্থক, সহজিয়ার পক্ষ তত্ত্ব অতত্ত্বের ক্ষেত্রে একই পদার্থ, ইহার অধ্যাত্ম ব্যাখ্যা জীবনকে ছলনা করে। জানিও, প্রাণ বলিয়া একটা বস্তু আছে। প্রাণের ধোঁরাক বাহ্য তাহা যদি সে না পায়, তবে সে অচল হইবে। জ্ঞাতিতা সত্য ধর্মের সন্ধান না পাইয়া ধর্মের দায়েই মৃত্যু-সলিলে ডুবিল। হে ভগবান—তোমার দেওয়া জীবনের এমন অগণ্য নিবারণের জন্য তুমি আর একবার রাজস্রোতের স্রুতিতে অবতীর্ণ হও।

জাগ্রত একরকম ক্ষীণবস্তুর মত বীর্যবান পুরুষ, একটা স্রুতি স্রুতি করিয়াও যিনি হতশ্রী জরাগ্রস্ত নন, আমার জাগ্রত নিকির্কারণ শুক সনকের আত্মার ত্র্যক্ষর্যের দ্বিধা মুক্তি। তুলনায় এই উভয় বীজের ইতর বিশেষ নির্ণয় করে কার সাধ্য। স্বরূপ ধরিয়া সাধনার রীতি হারাইয়াই আমাদের এই চর্যগতি, আদর্শের মরীচিকায় আমরা আত্মবাহী—তাই বলি, তাই বাস্তবী, বাহ্য স্বর্ষ্য তাহার আচরণ কর, পর-ধর্মের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া, উৎসবের পথ প্রশস্ত করিও না।

সাধনা সহজ, অস্বাভাবিক নয়—বাস্তব ইহাই বিশেষত্ব। যেখানে রুদ্ধতা, সেখানে জানিও পর-ধর্ম আক্রমণ করিয়াছে। আত্ম-সংগঠনের ক্ষমতা ও তপস্বিতা, তাহা স্বতঃ-উৎসারিত আত্মশক্তি, উহা রুদ্ধতা বলিয়া বোধ হইবে না। আমার অনন্ত শক্তি আচ্ছন্ন রাখিয়াছে বাহ্য, তাহা বীর্য্য করার অধিকার আমার নিজেরই উপর নির্ভর করে, আপনার সম্পদ হইতে বঞ্চিত হওয়া—খাল কাটিয়া কুমীর পান। যেখানে শক্তি সমুচিত, সেইখানেই ধর্ম। যিনি টান দায়, যেমনটা করিলে উহা বিশ্বস্ত মুক্তি নীলাস্রত হয়, তেমনটা করিতে

ইতস্ততঃ করিও না, কেবল লক্ষ্য রাখিও, একটা অথও শক্তির নিজস্ব জীবনের রক্ত-কলিকায় সঞ্চারিত হইয়া পুলকের স্পন্দন আশ্রিত করে কি না। বাসনা-ক্ষয়ের জন্তই যদি কিছু প্রশ্রয় পায় ক্ষতি নাই, শোষণের নামে পূরণের ব্যবস্থা হইলেই, আপনার জ্বালে আপনি জড়াইবে।

চাই শক্তির সাক্ষাৎকার—আর সেই শক্তির হস্তে চালিত হইতে গিয়া, শক্তিকেই আত্মবশে নিয়ন্ত্রিত করার আয়োজন—ইহা বার তিথি ধরিয়া সাধিবার বিষয় নহে, জীবনটাই তত্ত্ব-সাধনার চালিতে হইবে, লোকের বস্তু সমূহে রাখিয়া দিয়া চিদানন্দময়ীর অপারিষ প্রেমে যে উদ্ভাস, সেই তত্ত্বসিদ্ধ—স্বয়ং শিব। ত্র্যক্ষর মানস-পুত্র বশিত ব্রহ্মানন্দ লাভের জন্ত সহস্র বৎসর কঠোর তপস্বিতা করিয়া যখন বার্ধ হইলেন, তখন পিতৃ-সন্নিধানে গিয়া সাধনার প্রকৃষ্ট বিধি জানিতে চাহিলেন, ত্র্যক্ষা তাঁহাকে মহাতীনে বৃক্ষের শরৎপাত হইতে উপদেশ দিলেন। তিনি হিমালয় উজ্জ্বল করিয়া মহাতীনে বৃক্ষের আশ্রমে উপনীত হইয়া দেখিলেন, সহস্র সহস্র যুগতী নারী বেষ্টিত হইয়া বৃক্ষ পরমাঙ্গেল হুরাপানে প্রবৃত্ত। বশিত বিশ্বস্ত হইলেন, বাহ্য বর্জনীয় তাহাই গৃহীত হইয়াছে—অগ্নি বৃক্ষের নগ্ননে শরৎের স্রোতি ঠিকারি, বাহির হইতেছে। বিষয় ভ্যাগে শাস্তি নাই, প্রতিষ্ঠা নাই, শাস্তি ও প্রতিষ্ঠা বাসনার বিসর্জনে—তত্ত্বসিদ্ধ, আগম নিগম শাস্ত্রে ইহার দার্শনিক ব্যাখ্যা না দিয়া, সাধনার বিধি দিয়াছেন, বাস্তবী, তাই জীবনসাধনায় বোনাচার ছাড়িয়া, তত্ত্বকেই মহাপথ বলিয়া বরণ করিয়াছে।

২ তত্ত্বের কালী

তত্ত্বের কালীই স্রুতি-স্থিতি-লয়ের শক্তি :—

“তত্ত্বপাদিষ্ঠায় জগৎ স্বজ্ঞী”

বিষয়পাদিষ্ঠায় চ পালয়ন্তী।

শিবোপাদিষ্ঠায় চ সমহরন্তী

স্বং কালী—”

শুধু তাই নয়—“যত কিঞ্চিৎ কচিৎস্বয়ং সদ-
মুখাধিপালিকাকৈ।

তত্ত্ব সর্গসাধা যা শক্তিঃ সা ত্বং—”

কালী অসুখকালীন শক্তি, দর্শনশক্তি, শ্রবণ-শক্তি, ইন্দ্রিয়-জ্ঞান-জ্ঞান, ব্যাক্ত অব্যাক্ত জগতে সকল শক্তিই কালী-শক্তি। রামপ্রসাদ কালীর কথা বুঝাইতে গিয়া প্রাণ দিয়াছেন, মন দিয়া বুঝাইতে পারেন নাই। রামকৃষ্ণ শক্তির সাক্ষাৎকার পাইয়াছিলেন, তিনি থাইতে গিয়া তিনি হইলেন, তাই ঠাকুরের সাধনাই কালীর সাধনা, ঠাকুর কালীর বিগ্রহমুষ্টি।

কালীকে জানিতে গিয়াই ত্র্যক্ষা, বিষ্ণু, মহেশ্বর স্বরূপের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহার জানিয়া-ছিলেন—“গর্ভঃ গর্ভমেবাবাহং নাভ্যন্তরীণং সনাতনম্”—কালী ভিন্ন বস্তু নাই, সবই কালী—তাই তত্ত্বের মহিমা শিব ব্যক্ত করিয়াছেন, কালীর চরণপদ্ম বুকে ধরিয়া অমর হইয়াছেন।

দেবী বাগমতে এই আরাধ্যশক্তির পরিচয় দিতে গিয়া, এক উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। ধর্মী-প্রলয়-কালে জলময় হইলে, শৈবনামের উপর বিষ্ণু নিহিত হইলেন, তাঁহার নাভিপরি হইতে স্রুতিকর্তা ত্র্যক্ষা উৎপন্ন হইয়া দেখিলেন, দিগ্দিগন্তে শুধু জল থৈ-থৈ করিতেছে। তিনি কোথা হইতে স্বজিত হইলেন, চিত্তা করিত করিতে মৃগাল-তন্ত্র ধরিয়া নীচে অবতরণ করিলেন, দেখিলেন বিরাট বিষ্ণু-

মুষ্টি ধামনে নিরত, ত্র্যক্ষা তাঁহাকে স্রুতিকর্তা ভাবিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি আমার স্রুতি কীর্তন করিতেছ কেন?” ত্র্যক্ষা উত্তর দিলেন, “আপনি আমার স্রুতিকর্তা, হুতরাং প্রজ্ঞা ঈশ্বর, তাই আপনার উপাসনা করিতেছি।” বিষ্ণু বলিলেন—“আমি তোমার স্রুতিকর্তা নহি, অধীশ্বর নহি, আমিও কোন এক অজ্ঞাত পরমাশক্তির অধীন, সেই শক্তির স্রুতিতেই বার বার ধর্মগীতে জন্মগ্রহণ করি, আমারও কর্ম আছে, এই দেখ আমার পক্ষান্তে মহাকালরূপে মহেশ্বর আমার ধারণ করিয়া আছে, ইনিও সেই অনিরুদ্ধনীয় শক্তি বিহিত হওয়ার জন্ত ধানময়।” তখন তিনজনে কঠোর তপস্বিতা আরম্ভ করিলেন, সকলেই চিত্তা করিতে লাগিলেন, “কে আমাদের স্রুতি করিল?” কত যুগ তপস্যার পর দৈববাণী শুনিলেন, “আমিই অখিল স্বজনের অধীশ্বরী, তোমরা স্বজনে প্রবৃত্ত হও।” কিন্তু স্বজ্ঞ করিবেন কি, অগাধ জলরাশি ভিন্ন স্রুতির স্রুতি উপাদান কোথা! ত্র্যক্ষা কহিলেন—“স্রুতি করিব কি দিয়া?” ভগবতী বিমান পাঠাইলেন। বেবতাত্রয় বিমানে উত্তিবিমাচ্ছ ইহা উত্তরগামী হইল—কিছু দূর গিয়া তাহার দেখিলেন, ত্র্যক্ষার সাদৃশ্য মুষ্টি—আরও অধিক মহিমায ও শক্তিতে সার্বিকীর্ণ হইয়া বৈরাগ্য করিতেছেন, গন্ধর্ব্ব কিশরগণ গান করিতেছে, অসুখা মানসপুত্রগণ আদেশ প্রতীক্ষায় করমোড়ে দণ্ডায়মান, ত্র্যক্ষা ইহা দেখিয়া আত্মহারা হইলেন, বিশ্বস্ত ও স্নানদেয় স্বীয় ঐশ্বর্য দেখিয়া বিমোহিত হইলেন। বিমান আবার চলিল, আরও কিছুদূর গিয়া দেখিলেন, বিষ্ণুর বিরাট-মুষ্টি মহালক্ষ্মীকে লইয়া উপবিষ্ট আনেন। দিয়া বৈষ্ণবধর্মের শোভা ও সম্পদ অনিরুদ্ধনীয়, বিষ্ণু হস্তবদ্ধ হইলেন। বিমান আবার চলিল, এইবার

কৃত্যলোক কৈলাশের অভুলনীয় সৌন্দর্য্য, মহেশ্বর মুগ্ধ হইলেন, দেখিলেন হরগৌরী বিরাজ করিতেছেন, জয়া বিজয়া, নন্দী, প্রভৃতি দেবিকা ও অচ্যুতবর্ণগণে পরিবেষ্টিত হরগৌরীর লীলাময়ুরী দেখিয়া শিব হস্তান্ত হইলেন। বিমান কিছুক্ষণ সেইখানে স্থির থাকিয়া আবার চলিল, আরও উত্তরদিকে—সমুদ্রের পর সমুদ্র, শেষে স্বধামাগরে গিয়া উপনীত হইল, ইহার মধ্যভাগে দেখিলেন পরম রমণীয় মণিবীণ শোভা পাইতেছে, কি বিচিত্র নীপবন, কল্পবৃক্ষ দলভারাবনত, আর রমণীয় কনক-মন্দিরে রত্নসিংহাসনে এক দিব্যমুষ্টি, নিরুপমা রূপবতী সর্গদেবীসুন্দরী, ইনিই জগদ্ধননী ভুবনেশ্বরী—স্বতঃসহ প্রসিদ্ধিকারী ইহাকে ঘিরিয়া দেবী করিতেছে, দেবতারার গুণ করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবী গুণে ভূত হইয়া আদেশ করিলেন,—“তোমরা ফিরিয়া যাও, সৃষ্টি কর”—চক্ষের পলকে তিন জনেই পূর্ণহাসনে নিপতিত হইলেন, কিন্তু পূর্ণ মুষ্টি আর নাই, তিনজননেই স্বীকৃতি ধারণ করিয়াছেন। এই অবস্থায় দশ সহস্র বৎসর অতীত হইলে, ভুবনেশ্বরীর বরে তাঁহার পুরুষ হইলেন এবং নিজ দেহ হইতে ত্রিশক্তি পরিভাবিত মিত্র করিয়া মহাসুরেশ্বরী, মহালক্ষ্মী ও মহাকালীকে তিনজনে প্রদান করিয়া দেবী বলিলেন, “এই শক্তির স্বারা তোমরা সৃজনে সমর্থ হইবে”—সবই মহামায়ার ভেলুকী, কেনম করিয়া যে কি হইল কেহই বুঝিলেন না—শক্তির পরনে, নিজ নিজ স্বরূপ যোগরূপ বিমানে চড়িয়া যেমন যেমন দেখিয়াছিলেন, তেমন তেমন ভাবেই আত্মপ্রকাশ সিদ্ধ হইতে লাগিল—যাহা নাই বলিয়া বোধ হইয়াছিল তাহা যেন স্বপ্ন, সব যেন ছিল, যোগমায়াবলে আবার সৃষ্টিয়া উঠিল। ইহা উপকথার মত প্রতীত হইলেও, উত্তম রহস্য ইহার মধ্যেই নিহিত। জগৎসৃষ্টি

কেন, প্রতি ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ, বাহিরের স্রোত, অর্থাৎ ও নানাবিধ সামগ্রীর সমাবেশ লক্ষ্য করিয়াই যেন জীবন উদ্যত হয়, এইরূপই আমাদের ধারণা। কিন্তু ইহা সত্যের উল্টা দিক, প্রতি আধারের পক্ষাতে এই যে কল্পলোক, উহা ধরিয়া সাধন কর আর নাই কর, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কল্পের স্বজনই জীবনে ফলিয়া উঠে, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের জীবন আর তোমার আমার সকল জীবের অভিব্যক্তির দ্বারা একই প্রকারে হৃদয়িত হয়, জৈওগাম্যী প্রকৃতি বলিয়া জিহ্বা জীবনের দুঃখ দিয়া পুণ্য এই কথাই বুঝাইবার প্রয়াস করিয়াছেন।

অবিদ্যাচ্ছন্ন আমরা। শিবের ঐক্যে ব্রহ্মার দৈব, বিষ্ণুর অভিব্যক্তি দেখিয়া শিব লালায়িত। কল্প-ছাড়া পথ নাই, এই জ্ঞান থাকিলে সংসারে জীব আনন্দের অধিকারী হইত। উপনিষদের বাণী—“মা গৃধঃ কৃত্বিদ্ ধনম্”—ইহার অর্থার্থ অর্থ উপলব্ধি করিয়া—“তেন ত্যজেন ভূত্বীবা”—ত্যাগের স্বারা ই ভোগের পথ বাহির করিতে পারিতাম।

এক ব্যক্তির যে ভাবে সকল আত্মপ্রকাশ সাধিত হইয়াছে, অজ্ঞ ব্যক্তি সেই পথ ধরিয়া চলে বলিয়াই ধর্ম ও কর্ম সাধ্যো জগতে অশান্তির মারকা বাড়িয়া উঠে। মাছের জীবননীতি যোগ-পথ ধরিয়া না চলিলে, এই বিপদের দায় হইতে জীব মুক্তি পাইবে না, স্বজনের আদি পরাই এই তপঃ-তপঃ-তপঃ।

সৃষ্টির মূল তত্ত্বের অন্বেষণ করিতে গিয়াই আদ্যাশক্তি মহামায়ার সাফল্য ধারণা সাধকের চিত্তে অহুত হইয়াছে। উক্ত প্রকার উপাখ্যান ছাড়া তত্ত্ব ইহার মুক্তিপূর্ণ দার্শনিক ব্যাখ্যাও প্রদান করিয়াছে।

সাংখ্যের মতে, প্রকৃতি হইতে মহেশ্বর, পর পর

অহংকার, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্ত্র ও পঞ্চভূত, এই চতুর্দশটি তত্ত্ব সৃষ্টির রচনা, পরমাণুর সংগঠিত যে স্বজন তাহা দৌলিকী সৃষ্টি, উহাতে তত্ত্বাশ্রয় উৎপন্ন হয় নাই—তত্ত্বের মতেও জগৎ

অহুত পাপায়া যঃ—স্বজনের মূলতত্ত্ব মায়ের লীলামাধুরীময় হইয়া, সাধকের অন্তরে শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রেমের নির্ঝর বর্ষাইয়া দেয়।

বাঙ্গালীর সাধনার পথ যে বেদাচার হইতে সম্পূর্ণ

স্বতন্ত্র কেন, তাহা জীবনের শিল্প ধরিয়া বাঁহারা শক্তির সাফল্য করেন তাঁহারাই বুঝেন। লব বা নির্লাপের পথ, আর এই শব্দদেহটা শক্তির প্রবাহে ভাসাইয়া চলা, দুইয়ে প্রভেদ অনেকখানি। আত্মসমর্পণের সাধনায় তত্ত্ব ও সহজিয়ার এত বিস্তৃত স্থান, যাহা ভিতরের দিক হইতে আবিষ্কৃত হওয়ায় আমি এই আশা পাইয়াছি—যে বাংলায় এই হাজার বৎসর ধর্মের যে স্বভাবগতির সাহায্যে জীবনের উত্তম রহস্য বিদিত হওয়ার প্রয়াস হইয়াছে, তাহা সিদ্ধান্তিতরূপেই জাতিক সাধক করিবে—কেবল মাছের মন হইতে সাধনা করার ভগবানীটা অর্থাৎ সাধনা বলিতে কি যেন একটা প্রকাণ্ড অমায়িক কাণ্ড, এমনই উদ্ভট ধারণা দূর করিতে হইবে—ইহা মাছের সহজ গতিতে বড় কম বাধা দেয় না, অনেক সময় সাধনা করিতেছি,



তত্ত্বের কালী

সৃষ্টির এই একই রহস্য। কিন্তু উদ্যত এমন আদ্যাজননীর শ্রীমুক্তিটা ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে, যাহাতে মুগ্ধবৎ বিষয় ও আনন্দের শিহরণ তুলিয়া, জীবনের প্রতি ছন্দীর সহিত মায়ের প্রত্যক্ষ স্পর্শের

এই ভাব রাখার দ্বায়েই জ্ঞাত যে ধর্মাহুত্বের উপর ভর করিয়া ঈড়াইবে তাহা নষ্ট করে, সকল অবস্থার মাছের পক্ষে ধর্ম স্বপ্ন না হইলে, সহজ জীবনের পথ ছাড়া একদল মিলিত মাছ

হিমালয়ীর ঘরে বসিয়া, ধর্মকে চির দ্বন্দ্বোধা করিয়া বাবিয়ে—সে স্বপথ বাংলার তর। তবে ইহা আরও সুসজ্জিত ও পরিষ্কৃত করিয়া তোলা চাই।

তত্ত্ব-সাধনা অনেকে বীভৎস ও অস্বাভাবিক ধারণা করে। সাধকের চরিত্র অস্বাভাবী সকল সাধনাই বিকৃত হয়, তত্ত্বও অস্বাভাবিকতার হাতে পড়িয়া যে অস্বিকৃত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু সাধনার লক্ষ্য যদি স্থির থাকে, তবে ইহা সর্লসাধারণের পক্ষে যেমন সহজসাধ্য হইবে, তেমনই অস্বাভাবিক অসাধারণ সাধন পদ্ধতির মাহুষের তুলনায় তত্ত্ব-সাধক অধিক উচ্চমান অধিকার করিবে—এ বিষয়ে আমি নিম্নোপস্থ্য।

বাংলার সহজিয়ার যেমন জ্ঞাতিসাধনার সন্কেত আছে, বৈষ্ণব সেবনের বিধি আছে, তত্ত্বে সেই-রূপ কলাচার পালনের নির্দেশ দেখা যায়। এই কলাচার বংশমর্যাদা রক্ষার সামাজ্য রীতি নহে, কলাচার পালন ধর্মসাধনার প্রধান অঙ্গ। ইহা কদাচ গতাশ্বতক পথাকে প্রশংসা করে না। ধর্ম মাহুষকে নবজন্ম দেয়, জীবনের খড়াব ও সংস্কার সমূলে উৎপাটিত করিয়া, দিব্য স্বভাব ও দিব্য সংস্কারে জীবনকে নূতন করিয়া তোলে, ধর্মের এই উত্তম রহস্ত ভারতেই শিকড় গাড়িয়াছে, এখনও অটুট প্রতিষ্ঠা পায় নাই। ধারণায় সব পাওয়া যায়, মোহ জীবনে উড়া কলিতে দেখে না, যদি জোর করা যায়, আসে সমাধা। সংস্কার, সমাজের বাহিরে গিয়া ধাঁড়াইতে হয়। তত্ত্ব ও সহজিয়া নূতন জাতি পড়িয়া, নূতন সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া এই সনাতন ধর্ম রক্ষা করিতে চায়, বাঙ্গালীর অন্তরে ঈশ্বরের এই বাণী হাজার বৎসর ধরিয়া গুমরিয়া গুমরিয়া রক্তার তুলিতেছে,

তেমন তেজবী-সাহসী-বিশ্বাসী আধার মিলিল না—
ইহা পরিতাপের কথা। বাপ্তি মিলিয়াছে, সমষ্টির
অভ্যুত্থান সম্ভব হয় নাই—“প্রবর্তকের” ইহাই
লক্ষ্য।

তত্ত্ব যে কুলের কথা উল্লেখ আছে, তাহা গোড়াব্রতীর হইয়া ব্রহ্মকুল লাভের ইচ্ছিত, সহজিয়া সাধনারও এই রীতি, দেখানো কুল না বলিয়া “স্বজাতি” সাধনের উল্লেখ আছে :—
“স্বজাতি মহং সাধুসঙ্গ না করিলে।
না জানিলে গুরুবস্ত্র বিজাতি হইলে।”

এই স্বজাতির লক্ষণ নির্ণয় করিয়া অনেক কথা উক্ত হইয়াছে, মূলতঃ বৈদিক জপ তপ ছাড়িয়া, পুরুষপ্রকৃতি-রূপ “রাধাকৃষ্ণ যুগল সেবা” যে মানস ভরিয়া চিন্তা করে, সেই স্বজাতি অর্থাৎ ঈশ্বরপথের পথিক ভিন্ন সহজিয়া সবাইকে বিজাতি বোধে তাগ করিতে বলে, নিম্নত যুক্ত-জীবের সমষ্টিই নবজাতি, তত্ত্বের কথাও তাই :—
“ন কৃষ্ণ কুলমিত্যাহঃ কৃষ্ণ ব্রহ্মসনাতনম্”
যিনি ব্রহ্মত্ব অবগত হইয়াছেন, নির্দ্বিকার, পাশমূল হইয়াছেন, তিনিই কুলতত্ত্ব, ইহাই কলাচার।

“কৃষ্ণ কুণ্ডলিনী শক্তিঃকুলং মূলাধারঃ”
কৃষ্ণকুণ্ডলিনী শক্তি, অকূল মহেশ্বর। শক্তি ব্রহ্মময়ী কালী—ইহা পরিজ্ঞাত জন যে ব্রহ্মদর্শী হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। ব্রহ্ম বলিতে শক্তি-মূল চৈতন্যকেই বুঝায়, নতুবা শব্দের অস্তিত্ব থাকে না, কৃষ্ণিকাতত্ত্ব আছে :—

“ব্রহ্মণী কৃকতে সৃষ্টি নতু ব্রহ্মা কদাচন”
“বৈষ্ণবী কৃকতে রক্ষাং ন তু বিষ্ণু কদাচন।”
“কৃষ্ণাণী কৃকতে গ্রাণং নতু কৃষ্ণঃ কদাচন।”

শক্তিদীন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, শব্দ ভিন্ন কিছু নহে। পৃথক চৈতন্যময় কিন্তু কর্তৃদেহীন, শক্তি কর্তৃদেহী

কিন্তু তাঁর চৈতন্য নাই, এইজন্য প্রলয় শক্তির সাম্যাবস্থায় স্তম্ভিত হয়। পুরুষের কর্তৃত্ব থাকে না, সৃষ্টির চিত্র চৈতন্যে সংরক্ষিত হয়। পুরুষ উপাধ্যানে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের দেবতা বিমানে অক্ষপ বা আভ্যাক্ষত, যেখানে বিষ্ণু-রূপ শিবের স্থান, সেই সংকত। শক্তি চৈতন্যের উপহিত হইলে, পুনঃ সৃষ্টির দ্যোতনা জাগ্রত হয়—ব্রহ্মতত্ত্ববিদ্য যে, তাকে শক্তির আদ্বান ভনীয়াই চলিতে হয়, তাই বিদ্যাত্ত শিব, বিষ্ণু, মহেশ্বরের কর্ণে আকাশবাণী প্রবেশ করিয়াছিল :—

“সর্বমি বর্ষিমমেবাংহং”
আমিই সব—এই কর্তৃত্বের অভিনয়ই মহং তব—
স্বজনের মৌলিক উপকরণ। একথা পরে বলিতেছি।
তত্ত্ব ও সহজিয়ার নিগূঢ় রহস্ত-কথা বিবৃত করিয়া বলার ইহা ক্ষেত্র নহে, দেবী মাহাত্ম্য কীর্তন করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, জগজ্জননীর পূজাকালে তাঁর কথা অন্তরে বাহিরে, ক্রুর “প্রবর্তক” যতখানি ধরে, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই, আশ্রয় লেখনী সংকত করিতে হইবে।

বাংলার শক্তি-উপাসনা আশ্রয়শক্তির উপাসনা। এই আদ্যাপক্তি চতুপ্পান ব্রহ্মকুল মূল-প্রকৃতি। ইনিই মায়া, মহামায়া, কালী, মহাকালী প্রভৃতি নানা নামে উপািসিত। অজাগ্রত পুরুষে সর্লসজ্জিত অবাক, অমৃতায়িত এই মহাশক্তিই সকল সিদ্ধির বাস্তব রূপ ফুটাইয়া তুলেন। তাই মায়ের উপাসনা—নাম ও রূপের উপাসনা। মা আমার মময়মী—

“ং বাহাঃ বাঃ বাঃ হি বর্ষটকার শ্রুতাস্তিক।
ত্বা ভ্রমকণের নিত্যে জিহা মাত্রাঘ্রিকা হিতা”
ত্বা ভ্রমকণের নিত্যে জিহা মাত্রাঘ্রিকা হিতা।
প্রবব—মায়ের আদি নাম। এই নাম ধরিয়া ডাক দিলে, মায়ের কি বিরটি মৃষ্টি সাধকের

কল্পণটে সমুদিত হয়, তাহা অবগত হইতে পারিলেই, শক্তি-উপাসনা যে জগজ্জনীর সাধনা, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। তত্ত্ব আছে, মা মহাকালকে প্রণব করিয়া বলপূর্বক তাহাতে উপগত হনি। এইরূপ বিপরীত রতিতে প্রবৃত্ত হইয়াই, তিনি বিব স্বজন করেন; ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে এই আদ্যাপক্তিকে রাধা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। রাধা গোলক এক অণু প্রসব করেন, তাহা হইতেই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের উৎপত্তি—তত্ত্বের মহাকাল, সহজিয়া বৈষ্ণব সাধনার শ্রীকৃষ্ণ। স্বরূপে একই। গোলক অর্থে অসীম ব্রহ্মণ্ড-মণ্ডল—রাধাকৃষ্ণ, অথবা মহাকাল-কালী, ব্রহ্মকুল মূলপ্রকৃতি। প্রকৃতির গুণকোষ হইলেই নানের উৎপত্তি, সাংখ্য এই নানকে মহত্ত্ব বলিয়াছেন, ইহা গুণভেদে ত্রিবিধ—সাবিক, রাজসিক, ও তামসিক। নাদ হইতে বিস্মর সৃষ্টি, ইহাই সাংখ্যের অংকুর তত্ত্ব, তামসিক অংশ হইতে মহেশ্বর ও মহাকালী, রাজসিক অংশ হইতে ব্রহ্মা ও মহাস্বরভী, সাবিক অংশ হইতে মহাবিষ্ণু ও মহালক্ষ্মী। বিষ্ণু—মাহার দীর্ঘতা নাই, প্রব নাই, উচ্ছতা নাই, একপ্রকার নিরাকার স্বরূপ, কিন্তু এই অংকুর-বীজ হইতেই ভূতত্ত্বাজ, ভূতাদি শক্তি ও ভূতাদি জ্ঞানের উৎপত্তি। তন্মাত্র হইতে পঞ্চভূত, শক্তি হইতে কণ্ঠেরিণ ও জ্ঞান হইতে জ্ঞানেশ্বরী। মহেশ্বর, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু শক্তি হইতেই এই অপকীর্তিত ক্ষিতি অণু, তেজ বায়ু আকাশ ও মন প্রভৃতির স্বস্বরূপ উৎপন্ন হইয়াছে। মা আমার এখানে নিরাকার, তারপর পকীর্তিত্বল ভূতাদিরূপে মায়ের ব্যক্ত মৃষ্টি—“উৎপ্রেতি তদা লোকো মা নিত্যাপাভিবীভতে” —বাশ্যকল্পশ্রুতপীঠা মায়াময়ী দিব্যদেহ ধারণ করিলেও, তিনি নিত্য, উৎপত্তি বিনাশের অতীত, তিনি বিব ও

বিরচিত্তজ্ঞ-হিরণ্যগর্ভ, অব্যাকৃত প্রাক্ক এবং অব্যাক সর্বস্বরূপ। তিনি জাগ্রত, স্বপ্ন স্বপ্ন ও ত্রীয়া যান পরিবাস্য কবিয়া আছেন, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-কৃষ্ণ, ঈশ্বর-মহেশ্বর, পর-শিব। পরম শিবের তিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তিনি সপ্তবিম্বগুলোর নিয়ন্ত্রী; সপ্তমন্ত, সপ্তক্ষেত্র, সপ্ত আশ্রম, সপ্ত সপ্তদ্বার, সপ্ত পদ, সপ্তদেব, সপ্ত তীর্থ, আচার্য্য বেদ, ব্রহ্মচারীর প্রযতি—এই অখিলস্বরূপ মাতৃ-মুষ্টির চরণ বন্দনায়, বিশ্বের প্রাণ যে নাতিবে, পূজিত হইবে—ইহা আর বিচিহ্ন কি!

“স্ব সর্বরূপিণী দেবী সর্বোমাং জননী পরা।”

তোমাকে আমরা ভূয়ঃ ভূয়ঃ নমস্কার করি।

৩

তন্ত্রের প্রণবতত্ত্ব

ভারতের আদিম সভ্যতা ইতিহাসের চক্ষে অসভ্য বর্ষের জাতির সভ্যতাক্রমে আশ্রয় প্রতিভাত। আখ্যেয় ভারত অজ্ঞান কাণ হইতে ভারতের মূল প্রাণ মুখ্য, পর ধর্মের ভারে অবলম্ব, তদুৎপন্নক্রেমে মাতৃসাদনার মহিমা অসূর।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর ধারণা, ভারতের আদিম জাতি বালা কালে মাতৃকোড়ে লানিত পালিত, পিতা পূর্বেতে কান্দনে মৃগয়ায় নিরত থাকার, পিতৃপুত্রের বন্ধিত হইত, তাই ঈশ্বর-কল্পনায় তাহারা মাতৃমুষ্টির হানই বড় করিয়া ধরিয়াছে, আখ্য সভ্যতার চাপে ভারতের প্রাচীন যুগের ইতিহাস আজ অনাবৃত নহে, অতএব ছাপার অন্ধরে বিজ্ঞানের গবেষণা মাথা পাতিয়াই আখ্য গ্রন্থে কল্পি, নিজেদের আখ্যবংশের বলিয়া গল্প হয়, কালী দুর্গা প্রভৃতি দেবী মূর্তি, আখ্য জাতির তদ্ব্যবহার উপাসনা—এই বোধে অন্ধব্ধের চরম পরাকর্ষ দেখাই। বিজ্ঞান জাতির বংশধরের

মধ্যে কেহ যখন আবার ইহার বিপরীত অর্থ আমাদের ব্যাখ্যা, তখন আবার আমাদের চৈতন্য কিরিয়্য আনে। বদ্ব্যধে অন্যথা কল্পিলে আখ্য প্রতীক্টা স্ফাটী টনিয়া পড়ে, আমাদের এমনই ছরবস্থা দাঁড়াইয়াছে।

জগতে অধ্যাত্মের সখ্যীয় যত জ্ঞান প্রচারিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই বুদ্ধিপ্রসূত, কল্পনা ইহার মূল, সভ্যতাহুতি গ্রাহ্য নহে—একম মত-পরিবর্তন নিতা হইতেছে কিন্তু দ্বিচ্ছ জনের উপলব্ধি বিচার তর্কের শানিত খড়্গে টুকরা টুকরা হইলেও, তাহা সিদ্ধ রূপেই প্রতিভাত, মাহুকের মনের ওগট পানটে পায় দিচ্কাবের অপনাপ হয় না।

তাহে দেবী-মুষ্টি অন্তরের বিচিত্র শক্তির যে অভিব্যক্তি, তদ্রূপাধিকার ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কালী, দুর্গা, ভৈরবী, বগল প্রভৃতি বিষ্ণু, চতুর্ভুজ, ষড়ভুজ, অষ্টভুজা প্রকৃতি কল্পনার ছবি নয়। অন্যকো নানা গুণভেদে বহুধুগা শক্তি জীব জগতে বিচিত্র ঘটনা স্বরূপ করিয়া, অগ্নিরূপা সংস্কি কবিতভেদে, ইগা তাঁহারা অস্বদ্বিষ্টি দিগা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। বেদেও এই শক্তির অস্বদ্বিষ্টি কথা লিখিত আছে। ইহা অস্বদ্বিষ্টি বা আখ্যের কথা নহে; সাধক মাত্রই প্রতি কাখ্যের পদ্ধতে শক্তির যোতনা লক্ষ্য করেন। উপনিষদের কথায় বলি,—

মন, প্রাণ, বায়ু, চক্ষু, শ্রোত্র কাহার প্রেরণার কাখে নিয়োজিত। এই প্র.মা মীমাংসার ফলে, কেনোপনবধু রহিত : যিনি যনের মন, প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু অর্থ্য মন বাহকে কল্পনার পায় না, বায়ু বাহকে প্রকাশ করিতে পারে না, অখত বাহার চালনার মন তিত্তা করে, বায়ু উজ্বরিত হয়, তিনিই অখ্য এবং তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান, অমৃত লাভ করিব—এইরূপ নানা উপদেশের পর, উপাধ্যায়

স্বকরে আখ্য প্রেরণ মীমাংসা করিয়াছেন। অখ্য মহিমা—এই বিজয় এবং মহিমা আমাদেরই, দেবতাদের হিষ্টের ব্রহ্ম ব্রহ্ম ব্রহ্মগণকে পরাভিত্ত অস্ত্রের নহে। মোহ-রা ব্রহ্মপে মহামায়া যখন চেতনা করেন, এই ব্রহ্মকৃত জয়, দেবতারা নিজে গল্প আচ্ছন্ন করেন, তখন কি দেবতা, কি অসুর, সকলেই



ও প্রণব।

ভাষিয়া গৌরব বোধ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অন্ধ অস্বকরে আখ্যাত্রী হয়-দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, নর প্রভৃতি সবই মায়ের সন্তান। জননীর করুণা ভাবিলেন—

‘অস্বদ্বিষ্টি এখ্যঃ বিজ্ঞঃ, অস্বদ্বিষ্টি এখ্যঃ বিজ্ঞঃ, সেই পাইয়াছে, কিন্তু অস্বদ্বিষ্টি চরমে

উঠিলেই, জ্ঞান-বাঞ্ছা মা সেই মোহ ছেদন করেন, তাই সাধক পাহিয়াছেন,—

“সন্তান মঙ্গল তরে, জননী ত্যাগ করে —
মায়ের কোমল হস্তি মায়ের উজ্জত অঙ্গি, সন্তানের
বক্ষঃ বিদীর্ণ করার ভয় নয়, অংঘ-নাশের ইচ্ছা
অভিবাঞ্ছিত, ভিতরের এই কথাটা বুঝিলেই শক্তি-
উপাসনার মধ্যে ভয়বাদের আতঙ্ক বৃথা বলিয়া মনে
হয়। পাণী যে, অংঘারী যে, সেই কালীর নামে
ভয় পায়, মাতৃহত্যা সন্তানের কণ্ঠে নামে মধু ঝরে,
পোনে উপাস্যের আশ্রয় আসে।

দেবতাদের অজ্ঞানতা দূর করার জন্য ব্রহ্ম
ছদ্মবেশে উপস্থিত হইলেন, কেহ তাঁহাকে চিনিলেন
না, অগ্নি পূজ্যভোগে গিয়া পাড়াইলেন, ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা
করিলেন—তুমি কে? অগ্নি উত্তর দিলেন—“অহম্
অগ্নিঃ, জাতবেদাঃ” ব্রহ্ম তাঁহার সামর্থ্যের
পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, অগ্নি সদন্তে বলিলেন,—

“অপীৰং সৰ্গং মহেশ্বরঃ”

অগ্নি পৃথিবীর বায়বীয় বস্তু দগ্ধ করিতে পারি।
ব্রহ্ম তাঁহাকে একগুণ ত্বণ দিয়া শক্তি পদীক্য করিতে
বলিলেন, অগ্নি অসমর্থ হইলেন, এইরূপে সকল
দেবতাই নিজ নিজ শক্তি প্রয়োগ করিয়া সেই ত্বণকে
না পারিলেন দগ্ধ করিতে, না পারিলেন ঝড়ে
উড়াইয়া দিতে, না পারিলেন উঠাইতে, না পারিলেন
জলে নিমগ্ন করিতে। তখন তাঁহারা অপ্রসন্ন হইয়া
দেবরাজ ইন্দ্রের সমুপে উপনীত হইয়া কহিলেন,
“হে মহাবল! এই ব্রহ্ম কে, জানিয়া আইল,”

ইন্দ্র এই ছদ্মবেশী ব্রহ্মের নিকটবর্তী হইয়া মাত্র
তিনি অন্তর্হিত হইলেন।

“দ পশ্বিরাগাক্ষেঃ গ্লিহবারগাম বংশোভমানামুদাং
হেমবতীম্।—”

এই বংশোভাসম্পন্ন ঈশ্বরতী উষা—হিয়ালয়-
সুতা ভগবতী—ব্রহ্ম নিত্যমুক্তা মহাশক্তি, জীব-

সমষ্টিরূপ ব্রহ্মমুখিত্তে তিনিই সর্ব সর্বের নিয়ন্ত্রী—
“পর্যাপরাগাং পরমা অমব পরমেশ্বরী”—এই শক্তি
কোন বিশেষ জাতি বা বস্তুপ্রভেদের স্পন্দ নাহেন,
ইনি সমগ্ৰ মানবজাতির উপাস্য দেবী! আমাদের
পূজামন্দির তাই জাতি-ধর্ম-ভেদে অব্যবহৃত, হিন্দুর
এই চৈতন্য বৈদিক ধর্মক্ষেত্রে বাস্তবমুখিত্তে প্রকটিত
হইবে, সেই দিন হিন্দুজাতির জয় নয়, সার্বভৌম
ভায়বর্ধম্, সনাতনবিশেষে “এক ধর্মরাজ্যপাশে”
জগৎকে আলিঙ্গন দিবে—জগতে সর্ব-রাজ্যের
প্রতিষ্ঠা হইবে।

বিশ্ব ও বিশ্বের অতীত যত কিছু বস্তু বা
কর্ম আছে, সবই শক্তিব্যাপ্ত প্রবৃদ্ধ, এই শক্তির
অগুণ অস্বত্বিত্য ত্বয়ের সাধ্য, একই শক্তিকেন্দ্র
হইতে অসংখ্য দ্বারায়, অসংখ্য রূপ ও কর্ম-
প্রকাশের জন্য শক্তির নানা মূর্তি। নানা মন্ত্রে,
তন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন শক্তির উপাসনা-বিধি প্রচারিত
হইয়াছে। যে শক্তিকে উদ্ভূত করিতে হইবে,
সেই শক্তিকে সেই নামে অভিহিত করা চাই।
একই শক্তির প্রত্যক জীব জগৎ, কিন্তু আকার-
ভেদে নামভেদে হওয়ার, ঠিক ঠিক নামে,
কোন নির্দিষ্ট বস্তু বা ব্যক্তির উল্লেখ না করিলে,
সেই সেই বস্তু বা ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়
না, রামকে ডাকিবার জন্য হরি বলিয়া ডাক দিলে,
হাই হিরায়া চাহিবে, রাম সাড়া দিবে না,
প্রাণ, ব্যক্তি ও অব্যক্তি শক্তির মন্ত্র, কিন্তু জগতের
বিশেষ বিশেষ কার্যসিদ্ধির জন্য, বিশেষ বিশেষ
মন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

বৈদিক জ্বিয়াও এই শক্তির স্বরূপ দর্শন
করিয়াছিলেন, তাঁহারাও শক্তির উপাসনা
করিয়াছেন :—

পার্বত্যঃ স্বরশতী বাজত্ৰিবাণীনীবতী।
বজ্রঃ বহু দ্বিগবৎ।

স্বরশতী দিবা স্রুতির দেবতা। রূপের আগে
নাম, নাম কানে পৌছিলে তবে রূপের দ্যোতনা
কালে, ভ্রামনাম তুমিরাই শ্রীরাধার শ্রাব্য আকুল
হইয়াছিল, তাই নামের মহিমা এত। মন্ত্র
বলিতে—প্রাচ্যজ্ঞানসংকীর্ণ, আধুনিক শিক্ষার
সম্মোহিত, দেশের বিজ্ঞানমণ্ডলী কুশলতার বলিয়া
উড়াইয়া সেন, অর্থ বিনা নামে তাঁদের নিজেদেরই
আত্মপরিচয় মিলে না, জড়চেতনার পশ্চাতে
যে হস্ত স্রুতি আছে, তাহার রহস্ত উপেক্ষার
বিষয় নহে, আর উপেক্ষা করিলেও অলক্ষ্য প্রভাব
বাতব জীবনে নিত্য আগ্রত নির্দশন লইয়া সাক্ষ্য
দিতেছে, ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব অবধারণ ওদালীভ—
মস্তকের অপদান, নিম্নেকেরও বর্ধক করা স্বেচ্ছা।

বস্তু, সম্পদ, পুণ্য, অত্যাচার, অর্থ, আসক্তি,
বৈরাগ্য, বাস্তবীয় গুণের পশ্চাতে শক্তির বিদ্যমানতা
আছে, সৌমা শান্ত মাহুদের মুখশী, আর সে
যখন কামোদ্ভূত হয়, কোষপরাগ হয়, পূর্নমুষ্টির
কি পরিবর্তন দেখা যায়, তাহা আমরা প্রতিদিন
লক্ষ্য করিতে পারি। সচ্চিদানন্দময়ী শক্তি সর্ব-
ব্যাপিনী, কিন্তু যেখানে কোন বিশেষ ভাব, গুণ
বা কার্য প্রকাশ হয়, শক্তি সেইখানে সেইরূপেই
সংকীর্ণিত হয়, এই আধার যে শক্তি আকর্ষণ
করিবে, সেই শক্তির আধার আমরা হইতে
পারিব, যখনই মোহ অংঘ্যের ভাব জাগে, তখনই
আমরা মোহ ও অংঘ্যের আধার হইয়া
একই আধার দমনবশে পশ্চাত্যের বিরুদ্ধে
পাড়াইয়া সংসার প্রদর্শন করে, আবার অবস্থা-
বিশেষে নিকেই সেই অত্যাচার শক্তির জীবনেই
টানিয়া আনে, তাই আগুনের মত শক্তিকে
প্রত্যয় দিয়া, সাপ হইয়া কাম্ভূজ, ওড়া হইয়া
বাজে, কখন কি করে তার কোন ঠিক-টিকানা নাই।

কিন্তু শক্তি যার কাছে বাধা পড়িয়াছে, সেখানে
স্বরশতী দিবা স্রুতির দেবতা। রূপের আগে
নাম, নাম কানে পৌছিলে তবে রূপের দ্যোতনা
কালে, ভ্রামনাম তুমিরাই শ্রীরাধার শ্রাব্য আকুল
হইয়াছিল, তাই নামের মহিমা এত। মন্ত্র
বলিতে—প্রাচ্যজ্ঞানসংকীর্ণ, আধুনিক শিক্ষার
সম্মোহিত, দেশের বিজ্ঞানমণ্ডলী কুশলতার বলিয়া
উড়াইয়া সেন, অর্থ বিনা নামে তাঁদের নিজেদেরই
আত্মপরিচয় মিলে না, জড়চেতনার পশ্চাতে
যে হস্ত স্রুতি আছে, তাহার রহস্ত উপেক্ষার
বিষয় নহে, আর উপেক্ষা করিলেও অলক্ষ্য প্রভাব
বাতব জীবনে নিত্য আগ্রত নির্দশন লইয়া সাক্ষ্য
দিতেছে, ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব অবধারণ ওদালীভ—
মস্তকের অপদান, নিম্নেকেরও বর্ধক করা স্বেচ্ছা।

এই শক্তির ব্যাভিচার নাই, আনন্দময়ী ভেদজ্ঞা-
প্রণোদিত হইয়া আধারে দিয়া ভাবই জাগান,
এই অবস্থাই সাধনার অবস্থা, নিম্ন বণিতে—
শক্তিকে বুকে ধরয়াছে যে শিবময় আধার,
তাঁহাকেই ব্রুথিতে হয়। প্রকৃত জীবনে শক্তির
গিচিৎ লীলা বিচিৎ ক্রিয়া প্রকাশ করে, শক্তির
চরণে জীবন ঢালিয়া, তক্তির বাধনে মহামায়াকে
বাঁধিবার কৌশল তত্ত্বসাধনা। যোগ ও মন্ত্র ইহার
অন্তর্ধান। শাস্ত্রে আছে, “নাদেবো দেবমর্কং”—
দেবতা না হইলে দেবতার আরাধনা হয় না,
দিশাশক্তির আরাধনা ব্রুথিতে হইলে, আধার বিস্তৃত
করা চাই। শক্তি সর্বত্র বিরাজিতা, এইহেতু তিনি
কো কোথাও অপ্রাপ্ত নাহেন, কি নিম্নময় সহজিয়ার,
কি তত্ত্ব, ঈশ্বরবস্ত্র নিত্য কামসংকলন স্থির
করিয়াছেন, সাধনা শুধু শোষণের, দর্শনিক তবে
দ্বন্দ্ব উদ্ভূত হয়, বস্তুর আশ্রয় হয় না, তাই
সাধনার বিধি বাংলায় তত্ত্বসাধনে বৈজ্ঞান্যচারে যেমন
মিলে যেন অজ কোথাও মিলে না, ইহাই জীবনের
সিদ্ধপথ।

নেপাল হইতে কলিঙ্গ, এক কথায় বিদ্যাপর্গতের
পূর্বদিক্ স্ব প্রদেশসমূহে, এমনকি মহারাষ্ট্রেও
তত্ত্বসাধনাই প্রচলিত, কিন্তু তন্ত্রের মাধু্য আচার
মাথা তুলিয়া পাড়াইয়া উঠিল না, দিবা চরিত্র লইয়া
তত্ত্বকথিত ধর্ম ও সমাধের নূতন রূপ ফুটাইয়া
তুলিল না, ইহা বড় আক্ষেপের বিষয়।

ইতার কারণ, সাধনা অধ্যাত্মজীবনের কয়েকটা
অনুভূতি লাভের লক্ষ্যেই নিয়োজিত, ইহা যে
জীবনে গলোজীবারা নামাইয়া আনিবে, সমস্ত
জীবনের ছন্দটাকে ব্রহ্মানন্দে বিভোর করিবে,
মাথা করি, মাথা পাই, মাথা ব্যবহার করি,
সবলই যে ব্রহ্মময়ী মায়ের লীলা, এই ভাবে
সংসা, সমাজ ব্রহ্মময়ীর রাজ্যরূপে গড়িয়া উঠিবে,

এইরূপ প্রশস্ত ধারণা লইয়া আমরা আজও সাধন-সংগ্রামে উদ্যত হই নাই—কালীকে জীবনময় করিয়া, মায়ের বাস্তবাত্মিকের প্রভা হইতে পারি নাই।

কালীতত্ত্ব যে জীবদ্রব্য, সে জীবদ্রব্য তাই যে তুমি আমি যে ভাবেই থাকি, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না, এই সহজ অনুভূতি আমরা সাধনায়গ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গাই ত্যাগ করি, মায়ের নাম লইতে লইতে কেমন একটা অসাধারণ, অস্বাভাবিক অবস্থা আমাদের পাইয়া বশে, মন না খাইয়া, মনে আমাদের ধার, শক্তিকে বুকে ধরিতে গিয়া, শক্তির চরণাবধিতে বুকই ভাঙ্গে, মায়ের মধুর মঙ্গল নৃত্য দেখা ভাগ্যে ঘটে না, জগৎ-মায়ের পাদপদ্মের বন্দন, গৃহে গৃহে মূর্তিমতী মূর্তির আবির্ভাব যে সাধনার সিদ্ধরূপ, যোগীর ইচ্ছা যোগসিদ্ধি, গৃহীর বসনা ভোগ, মায়ের ইচ্ছা যে যোগ-ভোগ, এ কথা ভক্ত তো ভুলে না, আমরা মায়ের দান মাধার বহিয়া, জ্বর স্বার্থ রক্ষা করা হেতু—একল ওকুল ছকুল ধারিয়া, আজ কাঙাল হইয়াছি, অধ্যাত্ম জীবনের আশ্রয় যেমন মনের ভক্তিমী, মঙ্গল সামগ্র্যও তেমনি আমাদের ছায়াবাজী, ধর্ম ও কর্ণে সামগ্র্য তত্ত্ব সাধনার লক্ষ্য, কৈ যে রূপ তো জীবনে আমাদের ফলে নাই।

তত্ত্ব বলে—“ন যোগেন বিনা ময়ো, ন ময়েন বিনাসৌ। যদ্ব্যয়বভাস্যযোগেন শীঘ্র সিদ্ধিমবাপ্তাং যাবৎ” যোগের সাহায্য বিনা ময় নিষ্ফল, কেবল ময় যাবৎ সিদ্ধি ফলে না, যোগমার্গ ও ময়মার্গ—এই উভয় অবলম্বনে সাধনা করিলে অচিরে অজীভাভ হয়।

যোগী কিসে? যে মায়ের ইচ্ছাতে, নিজের ইচ্ছা বৃদ্ধ করিয়া, পাপপুণ্য, ধর্মাদর্শ, মুক্তিমোক্ষ নিশাইয়াছে। যোগ অর্থে, ক্রিয়াযোগ নহে,

যোগের মূলমন্ত্রই হইবে—মিশ্রণ। যোগের শীকারই আপনাকে মায়ের পদকমলে নিশাইয়া দেওয়া। যোগ বলিতে নানাবিধ সাধন-পদ্ধতির প্রচারে, জীবনের অমৃতস্রাবী এই মহাসাধনা নির্বীর্ণ হইতেছে, আমরাও ধর্মের নামে যতখানি পণ্ড ও বার্ষ হইতেছি, এমন আর কোথাও নহে, শুধু—যোগভাবটুকু লইয়া টেঙে বসিয়া থাকিলে, সিদ্ধ জীবন হয় না, চাই বুদ্ধভা নাম, ডাকিতে ডাকিতে প্রান্তুরের আকাশের মত, বক্ষপঞ্জর বিদীর্ণ করিয়া চক্ষে অবিরল অশ্রুধারা। মায়ের নামে পাখাণ কাটিয়া নিরুর স্বরে, আর পানসে চোখে ছই ফৌটা ভক্তি অশ্রু করিয়ে না? মনের ময়লা ধূইয়া বাহির করিয়া দাও, তবে তো বিত্তল আধারে, মায়ের বিত্তল মূর্তি প্রকাশ পাইবে। সিদ্ধ জীবনে থাকিবে না তো তুমি, তুমি মরিয়া ভূত হইবে, স্বার শ্মশানে দাঁড়াইয়া মা আমার নাচিবেন।

সংকল্প-মঞ্চ দোলে

কালবদনা শ্রাম।

কথার কথা বাড়িয়া যায়, সংক্ষেপে তত্ত্বসাধনার গোড়ার কয়েকটা কথা বলিয়া, মায়ের ছেলে রামপ্রসাদ প্রভৃতি অধিমূর্তি সিদ্ধ কোনের মহিমা কীর্তন করিয়া কলুষনাশিনী মায়ের জয় দিরা পূবার “প্রবর্তক” শেষ করিব।

“মহামায়ার ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাদে”—কথটা মিথ্যা নয়। তুমি যে ঈশ্বর, বড়াই করিতে পার, কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন আনন্দমন মূর্তি কি তোমার? তবে ইহাই তোমার সত্য স্বরূপ, অবিদাচ্ছ হইয়াই প্রসিদ্ধি হয় “মনেন ভূতের ব্যাপার পেটে”—জীবনের বোঝা যার, তারে যদি ভুলি, বোঝার ভারে মেরুপুত্র ভাঙিয়া পড়ে। যার বোঝা তার খাড়ে চাপাইতে গিয়া, নিজের

কর্তৃত্ব গুচিয়া যায়। ঠাকুরের পেঁয়াজের খোলা ইহার মর্ম বুঝিবে, অস্ত্রের পক্ষে হয় উপেক্ষা, নয় ছাড়াইবার মত, গুলিতে গুলিতে সব শেষ। এই আইহু। অহং-নাশের জ্ঞান, সাধনার গোড়ায় তত্ত্ব ভূত-ঐ পিঠের মেঘদণ্ডটা খাড়া করিয়া ছই দণ্ড



“সত্যশিবোবাশে-স্বিয়দাঙ্গাম

বহুশোভমানাসুখং হৈমবতীম্।—”

তচ্চি কভার কথা আছে—কথটা কিছু গুরুতরও বস তো, কেমন একটা আশ্রম পাইবে, ভক্ততা নয়, নিতান্ত দোষাতও নহে, যে সাধক, সেই পূর হইবে, মরা প্রাণেও শক্তির জোয়ার অচেষ্ট

করিবে। কেন এমন হয়? যা আছে ভাঙে, তা আছে ত্রুটি। যে-কোনো-স্বর্গ্য সমগ্রভা-
ময়ী আদ্যাজননের সাক্ষ্য চাও, সে মা তোমার এই
চৌদ্দপেরা আধারেই বিরাজ করিতেছেন। জুব
দাও, দম বন্ধ করিয়া জুব দাও, বিবেক হরিদ্রা
পায়ে মাখিয়া কামাদি কুস্তার ছয় রিপুর্ষ দাঁতের
ফাঁক দিয়া তলাইয়া দাও, দেখে তুমি ষড় নও,
রক্ত-মাংস-বাসনার চিপি নও, তুমি কালী—
তুমি শক্তির প্রতীক। ভূতভক্তিই সাধনার পোতা,
এবং সাধনার অন্ত, আধার যদি শোধিত হইল,
আর বাহ্যি রহিল কি? দর্পণে মুখ দেখার জন্য
মরনা ঘোছাই তো কাঁচ। শক্তির জন্য যত যোগ
বাগ বিধি বিধান, সবই মায়া, জীবের অংহ।
মায়ের হাতে সব ছাড়িয়া, মাতৃবর্ণনের আশায়
চক্ষু বার-প্রথমে পূণকে ছল ছল—আশ্বদর্পনের দৃষ্টি
লইয়া শবের মত কেবল সাক্ষীকরণে মায়ের পাদপদ্মে
চক্ষু রাখিয়াছে যে, তার শোনের ভার মায়ের
উপরই নির্ভর করে। তোমার চক্ষু এড়াইয়া
অভক্তি রাখিয়া বাইতে পারে, কিন্তু মায়ে নিম্ননের
প্রবর করিলে এক বিদ্যুৎ আধার টিকিবে না,
পরিপূর্ণ ভক্তি, মায়ে হাতে পরিপূর্ণ আশ্রয়মণ্ডল।

প্রকৃতি বিস্কৃত হইলে যে নানের উৎপত্তি,
সেই নাদ হইতেই ত্রিগুণাত্মক বিদ্যুৎ, অজুরের মত
স্বপ্তির শক্তি ইহার মধ্যে নিহিত থাকে। শক্তির
প্রকাশে স্বকল্পের বীজকে প্রকাশ হয়। স্থল
এই ইন্দ্রিয়গোচর শরীরের পঞ্চাতে অঙ্গকীচ
ভূতগণকায়ক বীজ আছে, শারে তাহাকেই লিঙ্গশরীর
বলে। জীবনের চৈতন্য স্থলে নিবন্ধ, উহা যখন
অস্থানিহিত হইয়া তবের সন্ধান পায়, তখন ভূতভক্তি
হইয়া থাকে।

মেরুদণ্ড সোজা করিয়া বসিলে, শরীরমধ্যস্থ
লিঙ্গ শরীর সোজা ও উচ্চমুখী হয়। ব্রহ্মাবার

কুণ্ডলিনী শক্তি প্রশস্ত হয়, তাই আসন-সিদ্ধ
বাক্তিরও শরীরে অপূর্ণ তেজ ও লাবণ্য প্রকাশ
হইতে দেখা যায়। তারপর এই চৈতন্য-শক্তি
উন্নত-কণা ভূতপের মত যদি উঠেন, তাহা হইলে
চক্রের পর চক্র-ভেদে হইয়া ইচ্ছাকারীর বিস্তৃত ইচ্ছা
জীব ধারে কলিয়া উঠে। জরায়ু যেমন গর্ভর সন্তানকে
আবৃত রাখে, ভূতভক্তি বাতীত জীবধারও তদ্রূপ অস্পষ্ট
ও মনন থাকে, এইজন্য সাধনার গোড়ার কথা ভক্তি,
তদ্রূপ ভূতভক্তির উপরই আদিক জোর দিয়াছে।

প্রলয়কালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—আশ্রয়তব
অবগতির জন্য যখন ধ্যান-নিরত ছিলেন, নিম্নতর
বিষয় তদুৎ-ত-তঃ ভিন্ন একেই শব্দ ছিল
না, তখন মহামায়া গনিত শবের মত, বিষ্ণুর
চরণতলে আশ্রিয়া উপস্থিত হইলেন। বিষ্ণু চক্ষু
মুদিলেন, ব্রহ্মার নিকট পৌঁছিলে, তিনি স্থগার
এদিক ওদিক চতুর্দিকে মুখ দিরাইতে লাগিলেন,
এই ভ্রমই তিনি চতুর্দুখ হইলেন, শিব প্রেমবাছ
প্রসারিত করিয়া চূর্ণক শব্দমুর্তিকে টানিয়া তাহার
উপর উপবেশন করিলেন। অঙ্গকলহইতে শিবের
যোগশক্তির পরিচয় দেখিয়া হইয়াছে, শিব পরমযোগী
—সকল যোগের অধীশ্বর।

শক্তি মূর্তের মতই মূলাধার বেঠন করিয়া
অবস্থিত আছেন, সেই শক্তির উপর সব কিছু
নির্ভর করিয়াই, সাধক জগদ্রহস্ত অবগত হইলেন,
শক্তিই বহন করিয়া জীবকে দর্শন করায় অন্ত-
জগৎগতের সর্ববিধ হস্ত—মূলাধারে ব্রহ্মলোক পৃথিবী
তব, বায়িষ্ঠানে বিদ্যুলোক জলতব, মনিপুরে
রূপলোক ভেষজতব, অনাহতচক্রে সর্বলোক বাহু-
তব, বিতুচ্চক্রে শিবলোক আশ্রয়তব, আজা-
চক্রে বিদ্যুরূপ হিরণ্যগর্ভ, সাংঘার মহত্তব, সহস্রারে
পূর্ব প্রকৃতির একীভূত সজ্জাদানন্দময় মূর্তি—এই
বড়ভক্তি ভেঙেই ভূতভক্তির শাসন সঙ্গার হয়।

জীবের মেরুদণ্ডের অংশসীমা হইতে ব্রহ্মরহস্য
পর্যন্ত তিনটা নাকী আছে, ইচ্ছা ও পিঙ্গল
নাকী যেখানো বিদ্যারয়ী স্বয়ম্বা নাকী
মধ্যেই চক্রবীজ নিহিত, শক্তির করুণার চক্রভেদ
হইলে, জীবদুর্ভ হইয়া মাংস ইচ্ছাকৃপিনী কালীর
হস্তে যয়ের মত কার্য করে, অহঙ্কার বা অন্তর্ভি
থাকিতে ইহা কোন মতেই সিদ্ধ হয় না।

ইচ্ছা নাকী গলা, পিঙ্গলা যমুনা, স্বয়ম্বা
নাকীকে সরস্বতী বলে। মূলাধারে এই তিন নদী যুক্ত
হইয়া, আজাচক্রে গিয়া মুক্ত হইয়াছে, এইজন্য
মুক্ত ও মুক্ত দেবীর কথা শোক প্রসিদ্ধ। স্বয়ম্বা
নাকীর মধ্যেই ব্রহ্ম-নাকী বিদ্যমান, মূলাধার হইতে
ব্রহ্মবন্ধ পর্যন্ত এই নাকী বিস্তৃত। স্বয়ম্বা পথে
কুণ্ডলিনী শক্তির উচ্চমুখী যাত্রার সঙ্গে এই ব্রহ্মনাকীর
জাগরণ হয়, পঞ্চতবের এক একটা এরা এই নাকীর
সহিত প্রযিত, যোগশাস্ত্রে এইগুলিকে পন্ন্যাসে
অভিহিত করিয়াছে, পন্ন্যাসি স্ফাভব
অবিম্ব, নিমিত্ত আসন ও ধ্যানে কুণ্ডলিনী
চৈতন্য হইলে ইচ্ছা উচ্চমুখ ও পরিপূর্ণ হয়, ইহাতেই
অব্যাহত অমৃতত্বের স্পর্শ লাভ হয়।

প্রথম মূলাধার, তারপর পিঙ্গলমূলের সমস্থানে
বায়িষ্ঠান, জীবের সকল রক্তির আশ্রয়স্থল এই
প্রথীণ্ডলি। বায়িষ্ঠান বড়দল, মূলাধার চতুর্দল
পোতা। ইহার উপর নবপন্ন-বর্ণ অরুণ লিঙ্গ
প্রকাশ পাইতেছে, চতুর্দলে পন্ন্যাস, সহজানন্দ,
বীরানন্দ ও যোগানন্দ বিরাজ করিতেছে, কিন্তু
স্বপ্ন কুণ্ডলিনী এই লিঙ্গমুর্তিকে বেঠন করিয়া
বৃত্তাকারে পতিত আছেন। তদঃপ্রভাবে শক্তির
জাগরণের সঙ্গেই, সাধকের মনে আনন্দের স্ফার
হয়, কুণ্ডলিনী বিভ্রাৎ-বর্ণ বায়িষ্ঠানে পৌঁছিলে—
বেধা যায়, বড়দলে ছয়টা রক্তি বিরাজ করিতেছে,
উগার প্রাশ্রয়, অবজা, মূর্ছা, সর্বশাসন ও

কুরতা। নগিপুর দশদলপন্ন, বর্ণ গাঢ় নীল,
দশরক্তির আশ্রয়স্থান, এইগুলি লজ্জা, পিত্তনতা,
দৈর্ঘ্য, তৃষ্ণা, অসুপ্তি, বিদাধ, কষায়, মোহ, স্থগা,
ভয়। ইহার উর্দ্ধে ধ্বনয়তো অনাহত চক্র, রক্তবর্ণ
দাদশ দল পেরে, আশা, ভিত্তা, চেষ্টা, সমতা,
দম, বিকলতা বিবেক, অহঙ্কার, লোলতা, কপটতা,
বিতর্ক, অগ্রভাপ বিদ্যমান আছে। তারপর
কঠমূলে বিপ্লব চক্র, ব্রহ্মবর্ণ বোড়দল পথ—
পূর্ণোক্ত প্রকারে প্রথম হইতে নিবাহ, স্বভব,
গাঢ়ার, বড়জ, মধ্যম, দৈবত ও পক্ষম, এই সপ্ত-
স্বর, অষ্টদলে মিল, তৎপরবর্তী সপ্তদল, ফট, ফট,
বোহট, বহট, স্বা, স্বাঃ ও নমঃ এই সাতটা মিল
শেখদলে অমৃত রহিয়াছে। তালমূলে লালনাচক
নামে একটা গুণ্ডক আছে, ইহার বর্ণ রক্তাক্ত,
দাদদলে শ্রদ্ধা, সত্যোৎসাহ, অপরাধ, দম, মান,
বেহ, শোক, খেদ, ভক্ততা, অরতি, স্তব্ধম ও
উর্ধ্ব রক্তি থাকে। ক্রম-মধ্যে আজাচক্র—ইহা
ফিল, অষ্টপন্নময়ী ব্রহ্মত চতুর্দলে জ্ঞানমুদ্রা, কপাল,
উমক ও জপমালা লইয়া বিদ্যমান, ইহাই ব্রহ্মচার,
তারপর গুণ্ড মনচ্চক্র, পাকভৌতিক জ্ঞান ও স্বপ্নক্ষেত্র,
বড়দল পক্ষে ছয়টা রক্তি শোভা পাইতেছে—
তারপর সোমচক্র বোড়দলপূর্ণ—প্রথম কৃপা,
দ্বিতীয় মূর্ততা, তৃতীয় দৈর্ঘ্য, চতুর্থ বৈরাগ্য, পক্ষম
ধৃতি, ষষ্ঠ সম্পদ, সপ্তম কাল্য, অষ্টম রোগাক,
নবম বিদ্য, দশম ধ্যান, একাদশ সুস্থিততা, দাদদ
গাভীর্ষ, দ্বয়োদশ উদাম, চতুর্দশ অকোঁড়, পক্ষদ
ঔদাধ্য ও বোড়দলকার একাগ্রতা আছে। ইহার
উপর, নিরাশ্রয়পুরী, যোদীরা এইখানে পৌঁছিয়া
ঈশ্বর দর্শন করেন, এই দিব্যধামের সিংহাসনে
জ্যোতিষ্ময় প্রণব শোভা পাইতেছে, ইহার উপর
শেতবর্ণ নাদ, তদুপরি বিষ্ণু। ব্রহ্মরহস্যে অধ্যায়
সহস্রদল পেরে নিয়ে একটা উচ্চমুখী দাদদ

পদ্ম আছে, সহস্রদল হইতে যে সুখা-ক্ষরণ হইতেছে, এই দ্বাদশদলপরে তাহা সঞ্চিত হইয়া সমগ্র জীবাত্মার সঞ্চিত হইয়া, আমন্দে ও মৃদু হ্রাসে সবখানি পূর্ণ করিয়া দিতেছে। কুণ্ডলিনী শক্তি এই দেবধামে পরম শিব মগকানক্ষণী পরমাখ্যার সহিত মিলিত হইলে, ইনিই অজ্ঞাত তিমিরময়—ত্রিভুবনের সূর্য্য-বরুণ—ইনিই শৈবের শিব, বৈষ্ণবের পুরুষোত্তম, শাক্তের মগাকালী, যোগীর পরম ব্রহ্ম।

তত্ত্ব যজ্ঞচক্রভেদের জন্ত, নামের সহিত যে যোগের আশ্রয় লইয়াছে, তাহা বৈদিক যোগ, পাতঞ্জলের অষ্টাঙ্গ যোগ ও হঠযোগ। ইহা তত্ত্বসাধকের বিভ্রম। প্রাচীন প্রয়াসের অমূল্যবর্ণ-নীতি পরিত্যাগ করিয়া, যিনি মায়েদের কোলে শিশুর মত কাঁপাইয়া পড়িয়াছেন, তিনিই দিক্ হইয়াছেন, প্রমাণ রামচন্দ্র, দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর—তত্ত্বের শিক্তি, মায়েদের নাম, আর মায়েদের হাতে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ।

যজ্ঞচক্রভেদ—নীচের দিক্ হইতে না ধরিয়া, উপরদিক্ হইতে অবতরণনীতি যদি ধরা যায়, তাহা হইলে আধ্যাত্মিক, চতুর্নিশ্চলিত তবে স্বপ্ন স্থপ্তির বোঝ বাস্তবে কেমন করিয়া পরিণত করিলেন, তাহার অস্পষ্ট চিত্র ক্ষণেরে অঙ্কিত হইয়া যায়, বাহ্যাবোঝে এই বিষয়ের স্থবিপ্লুত আলোচনা হইতে নিরস্ত হইলাম। আত্মতত্ত্ব দর্শনের জন্ত, সকল সাধনার যজ্ঞচক্রভেদের কথা উল্লিখিত থাকে, সিদ্ধির জন্ত ইহা অবত সাধনার, বাহার যে ভাবেই অধ্যাত্ম

তত্ত্বের অমূল্যত্ব হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু হঠয়া চাই—কুণ্ডলিনীর ভাগ্যবশ না হইলে, সাধন ভ্রমের ভার বহনই সার হই, যুলে কিছু দাঁড়ায় না।

ঈড়া পিজ্জা নাম,
সুব্রহ্ম মনোরমা,
তার মধ্যে আছে জ্যামা,
ব্রহ্ম সনাতনী মা।

যে দেখেছে মায়েদের কোল
সেই পেয়েছে মায়েদের কোল—
রামপ্রসাদের এই বোল
ঢোল-মারা বাণী ও মা।

তত্ত্বসাধকের কুণ্ডলিনী শক্তির জগরণ হেতু প্রাণপাত প্রয়াস প্রশংসনীয়। দক্ষিণাচার তত্ত্বপথে গমন যদি বাধে প্রবৃত্তির আকর্ষণে, তত্ত্বসিদ্ধ মহাপুরুষ সেখানে বিদ্যি দিয়াছেন, প্রবৃত্তির উচ্ছ্বেদ চেষ্টা না করিয়া বৈষ্ণ উপায়ে প্রবৃত্তিকে উচ্ছ্বেদ করার জন্ত, মায়েদের নামে প্রকোপচারণে বাধ্য করা। মায়েদের উচ্ছ্বেদ মুখী জ্ঞানের পথে যির কামিনীকানন, মোহ তার অহংগান, মনে মন্ততা আছে, মায়েদের নামে মাতিয়া কামিনী জননীরূপে দেবার সাধনা—পৌরুষ। রামপ্রসাদ বগল বাঁধাইয়া বলিতেন—“ওরে হুতা পান করি নে আমি, হুতা বাই জয়কালী বলে”—তত্ত্ব সাধন সফলক শবিশেষ আলোচনা করার ক্ষেত্র ইহা নহে, এই পরাস্ত বলিদান, আমি এই প্রবন্ধ শেষ করিলাম।

দশমহাবিভা

কালী তারা মহাবিভা যোড়শী ভূগনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধ্রুবাবতী তথা।
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাঙ্কিকা।
এতঃ দশমহাবিভাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ।



কালী

শ্রীশান সাধনার স্থান। শ্রীশানে আছে ক্রি, জীবনের অভাবে মৃত্যু হই একটি নব্রহ্ম ব্রহ্ম; মৃত স্বকাল, মর কপাল, শূণ্য কলস, ছিন্ন শর্যা—জীবনের নশ্বর শরীর পুড়িয়া এখানে ছাই হয়। জগির উত্তাপে শ্রীশান তৃণহীন উত্তরক্ষেত্র। বাসনা অহঙ্কার প্রেতের মত এখানে নৃত্য করে, কঠে হা হা রব, নৈরাজ্যের দীর্ঘনিশ্বাসে বক্ষ বিন্দীর্ণ হয়। সাধকের ইহা পরম তীর্থ, শবের মত নিখর নিষ্পন্ন হইয়া সে অপেক্ষা করে মা কখন আসিয়া দেখা যেন, তাই বামীজী গাহিতেন—“দশম শ্রীশান হোক, নাচুক তাহাতে জ্যামা।”

মায়েদের দশমহাবিভা—সাধনার দশ অবস্থা—ঐ যে মায়েদের প্রথম রূপ কালী—চতুর্ভুজ, কৃষ্ণবর্ণ, হস্তে খেটক ধারণ—

“করালবদনাঃ যোরাঃ মুক্তকেশীঃ চতুর্ভুজাঃ”।
যোরাঃ দংশী, করালগায়া, পীনোত্তরপরাধরা বিপরীতরতা-ভুয়া মা—জঙ্ঘাণী। স্বপ্নপ্রসঙ্গ-বদনা—ইহার মর্ম্ম হোমরা বৃক্ষ কি? পৃথিবীর যত বীভৎস মায়েদের ঐ মুগ্ধির মধ্যে বনৌত হইয়া—জীবের মনে আতঙ্কের সঞ্চার করে।

দেখ, জীবের দেহ শ্রীশানক্ষেত্রে নিপতিত, প্রকৃতির সাম্যাবস্থায় যে গয়ের লক্ষণ, তাহা ইহাতেই পরিস্ফুট, যোগের চরমসিদ্ধি এই সমাধি—বুধা সে সমাধি বাহ্যতে মাতৃচে-নায় শব আবার মহাদৈবত্বের আনন্দে শিবময় মূর্তিতে প্রকটিত না হয়। সব, ব্রহ্ম, তমঃ, যখন অবিসৃষ্ট, তখন সমাধি—পরীর প্রাণে, প্রাণ মনে, মন বুদ্ধিতে, বুদ্ধি অহঙ্কারে,

অহঙ্কার মহত্তবে লয় পায়। অহং বিদ্যুতে, বিদ্যু
নাথে, নাথ আত্মপ্রকৃতিতে মিশাইয়া যায়।
জিওগময়ী প্রকৃতি—চেতনার পুনঃ-সন্ধারে তমের
দ্যোতনার আবার আগ্রত হন, এই তমঃ মহাকাল।
শক্তি কালে উপগত হইয়া স্বভবের অকুর নির্মাণ
করেন, তাই নিম্নে ঐ শব্দধার রূপ—পুরুষ,
তমঃ বিকাশে শব আশ্রয় করিয়া মহাকালের
অকুরান, আত্মপ্রকৃতি কাশী উহাতে উপগত
হইয়া সৃষ্টি হুচনায় উদ্ভাবিনী—এই ভূতই সৃষ্টির



তার।



মোড়শী

আদিরস মৈথুন, মাছের এই বীভৎস রূপ সৃষ্টির
মহিমায় মহিমায়িত—প্রাণপ্রসাদের ঢক্ষে মাছের এ
মূর্তি প্রকাশ হইয়াছিল, তিনি গাহিয়াছিলেন :—
কাশী গো কেন লেটা ফের।
ছি ছি কিছু লজ্জা নাই শেয়ার।

আপনি লেটা, পতিও লেটা, শ্মশানে মশানে ঢব।
তারপর দ্বিতীয় মূর্তি—তার।

প্রতালীচ পদার্পি শাস্ত্র, শবদলাগুট্টাঙ্গা

পরা বঙ্গোন্দীঘর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি ক্রমবর্ধীভাঙ্গণা ॥
জটাজুটমণ্ডিতা বথোদেহী, ব্যাঘ্রচর্মাসুহকটি মা স্বভবের
বীজ বহন করিয়া শব্দধারে নৃত্য আরম্ভ করিয়াছেন।
দার্শন্যহতে সৃষ্টিপন্ন শোভা পাইতেছে, ইনি বহুৰূপ, বহু-
বর্ণ দিয়া জিজ্ঞাসন ঘটনা করেন—মা তাই জগৎ-
প্রসাবিনী—“মায়ের উদর ব্রহ্মাণ্ড ভাঙ প্রকাণ্ড তা
জনি কেমন ?” মহাকালের বক্ষোবনন্ত স্বজনের ধার
নিরন্তর প্রবাহিত, তাই—



স্বভবেরী।



ভৈরবী।

“মহাকাল কেনেছে কালীর মধ্য অন্তে কেবা
জানেন্তেমন।”

মায়েও তুহী রূপ—মোড়শী।

বিষমাতৃকলাঙ্ঘক, বোদাদিমণ্ডিতা, দেবী শিব-
শক্তিময়ী স্বভবের উপরে উঠিয়া বসিয়াছেন।
কালাতীতা, তাই মহাকালের নাভিপদ্মের উপর
বাসয়া সৃষ্টি-হিত-বিগয়ের নিম্বরূপ অকুর, ব্যক্ত ও
অব্যক্ত সৃষ্টির দ্বিধা ও সমাধিব্যবস্থা পঞ্চদেবতা,
তার চরণতলে বসিয়া ধ্যাননিরত। স্বভব

এখনও হিরণ্যকেশব হইতে গন্তব্য মূর্তিতে প্রকটিত হয় নাই।

তারপর ভুবনেশ্বরী। জগজ্জননীর দৈববাণী শুনিয়াই দেবতারা ত্রুটিগাধনায় শিঙ হন, ইনিই নিজেকে ত্রিধা বিভক্ত করিয়া শক্তিরূপে—গৌরী, ভ্রাম্বী ও বৈষ্ণবী নামে, জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিরূপে ত্রিভুবন রচনার শক্তিদান করেন। ভুবনেশ্বরী বিশ্ব ও বিচারিকপে সর্বপুরুষ।



বদনা।



ভিন্নবস্তা।

স্বষ্টী সিক করিয়া আদ্যাশক্তি পাশাঙ্কুশ পরিভাগ্য করিলেন, শাবন পালনের কর্তব্য পরিভাগ্য করিয়া কমলাসুনে উপবেশন করিয়া, অক্ষপুষ্টি-বগ্নায় করে, ভৈরবী মূর্তিতে নিঃসঙ্গ হইলেন। শক্তি-বিরহিত শিব প্রমাদ গবিলেন, মায়ের এই ঔবশ্যিক - স্বষ্টী-রগতে বিস্রবেহ তাহা তার ভুলিল, স্বষ্টীর ছন্দভঙ্গ হওয়ায় কলুষগর্ভনে জীব বাতিভার-পরায়ণ হইল, ধর্মশঙ্ক, সমাজবন্দ্য, বহুবিধ পাপে ধবনী অতিষ্ঠ হইয়া মায়ের শরণাপন্ন হইল।

তিনি তখন ভীমামূর্তিতে জগতে অবতরণ করিলেন, বিগরীত আচার ও বৌতির উপর দাড়াইয়া, নিঃশব্দ ও ছেদন করিয়া নিজেই নিজের রক্ত পানে প্রবৃত্ত হইলেন, সঙ্গিনীশ্বর শবাসনে মৃত্যুপরাণ হইয়া বিগলিত রক্তধারায় লেলিহান রসনা পাতিয়া নিল। মায়ের এ-মূর্তি দর্শনে আতঙ্কে চক্ষু মুদ্রিয়া আসে, সাধক-জগতে এমন বিকৃত শক্তির পরিচয় কিছু বিদ্রল নহে। সাধকের মধ্যে শক্তির প্রথম জাগরণ যে তপোমূর্তির কল্প পরিদৃষ্ট



ধূমাবতী।

হয়, শক্তি সংহিত হইলে তপস্যার আগুন নিভিয়া আসে, ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি বিকৃত হয়, দ্রবিত রক্তভাষা নিঃকণ্ঠ ছেদন করিয়াই পান করিতে হয়, সঞ্চরীদেহও সে রক্ত শোষণে বাধে না—ইহা উৎসারের লক্ষণ, মায়ের শ্রেষ্ঠ অবস্থায় এইমূর্তি প্রকট হইয়াছে। ৩য় জীবনরূপে আকট হইয়া মা আমার মৃত্যুমুখী, ইহা বড় করণ এবং শোচনীয় দৃষ্ট। সংসারক্ষেত্রে যে কোন দৃষ্ট যে কোন অবস্থায় উপস্থিত হউক, ইহা আদ্যাশক্তিরই লীলাভিত্যক্তি, ইহা বুঝিয়াই তদ্বিধি মহাপুরুষ এই রূপের ধ্যান করিয়াছিলেন—

“বিবর্ণা কোমল ছটা দীর্ঘা মলিনাক্ষরা।

বিমুক্তকুলস্তা রক্তা বিদগ্ধা বিরলকিঞ্জা।।

জুৎপিপাসাকাতর, নিতা ভয় ও কলহস্ত্রিয় জীবন যে কি জুগেহ ও ভারবহ, তাহা শোধ হয় আমাদের বর্তমান অবস্থায় কারে বুদ্ধিতে বাকী নাই। এই সর্বট অবস্থা হইতে জগৎপালিনী যখন জীবকুলকে রক্ষা করেন, তখনই তাঁর বগ্নামূর্তির আবির্ভাব।

“সাধকানাং হিতার্থায়”

যে পাপ, যে মোহ, যে অনাধ্যাত্ম স্বভাব, শক্তির অনাহত প্রবাহ রোধ করিয়া ইহা বিকৃত করে, তাহা সংসারের জড়, তিনি কীল ও পদাঘাতে তাহা বিদূরিত করেন। কালী মূর্তিতে মায়ের পদলক্ষণ শিবের তেজনা উদ্ভূত হইয়াছিল, শক্তির উদ্যোগীতে, ছিন্নমস্তা ও ধূমাবতী মূর্তিতে তাহা পুনঃ শব মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। মা তাই আবার শবাসনা—ও পাপের জিহা আকর্ষণ করিয়া মাধার মুণ্ডার প্রবাহ করিতেছেন।

ও হুই বগ্নামুখী সর্বজ্ঞান্য বাচ মুখঃ

তন্তুর জিহবাঃ কীলয় বুদ্ধিঃ বিশাশয় হুই ও স্বাহা।

মায়ের নবম মূর্তি—মাতঙ্গী।

স্বামীদ্বয় শশিধোবাং জিনয়নাং রত্নসিংহাসনস্থিতাম্।
বেদৈ বাজ দণ্ডৈস্তসি খেটক পাশাঙ্কুশধরাম্॥

মাঘের ইহা বিরাট দক্ষিণা-মূর্তি। দেবী সৰ্গ
সিদ্ধিপ্রদায়িনী। রতি, প্রীতি সঞ্চারণ করিয়া
সামকে জিয়া, শ্রদ্ধা ও তপস্যার নিরন্তর নিহত
রাখেন। সাদক বদুহীন হইয়া, স্থিরচিত্তে ধন্য-
হাসমাগে মাঘের আসন বিছাইয়া দেয়; এই মাতৃ-
সামনার সিদ্ধ জীবনেই, মাঘের মহাজ্যোতি
আবির্ভূত হয়, ভোগ শোক তাপ হরণ করিয়া পরমা-



মাতঙ্গী।



কমলা।

প্রকৃতি সত্য স্ববর্ণপ্রতিম বর্ণ-কাষ্ঠ লইয়া সর্বস্ব-
পদমণ্ডে উপবেশন করিয়া, করুণা-বর্ণে জীবের
গুণ দ্রু করেন, চতুর্দিক হইতে বিচিত্রবর্ণ করি
কূল, সর্বদা গুরিয়া প্রধা বর্ণন করিতে থাকে, ইহা
পরম শান্তি—ইহাতে জীবের আত্যাত্মিক গুণনিরুতি,
এই কমল-দল-বাসিনী মাতৃ-মূর্তি, শেষ ভুবনের পরম
মূর্তি। পৃথিবীর রাস-মন্দিরে, কনক সিংহাসনে
সিদ্ধগণপাণিনি মাঘের এই জ্যোতির প্রতিষ্ঠা বেদিন
সম্ভব হইবে, সেইদিনই শ্রবণাঙ্কুর স্বপ্ন বাস্তবে
পরিণত হইবে।

সামনার জ্বরের প্রতি লক্ষ্য বাহাদের, তাতা
মাঘের এই দশবিধ অবস্থার লক্ষণ জীবনে
প্রত্যক্ষ করিবেন, পুরাণকার কিন্তু এই ঈশ্বর তত্ত্ব
সুবোধ করার জন্য উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন।
উহা যেমন বাস্তবিক, তেমনই সাধারণের স্বপ্নগ্রাহী।
উপসংহারে ইহা বলাই বাহুল্য—যে দক্ষ প্রজাপতির
কল্পা সত্যের সহিত কৈলাসপতি শিবের বিবাহ হয়।
শিবের আচরণ দক্ষের চক্ষু প্রীতিপদ না হইয়া,
দক্ষ তাঁকে আশ্রয় করা বন্ধ করেন, সত্যি পিতাভয়ে

বাণ্ডয়ার জিদ দরিলে শিব কষ্ট হন, মহামায়া তখন
কোণে অভিমানে দশবিধ মূর্তি ধরিয়া শিবের মনে
আতঙ্ক উপস্থিত করেন, অগত্যা শিব সত্যকে
দক্ষাভয়ে পাঠাইয়া দেন। সমাজ-জীবনে দৈনন্দিন
ঘটনার সহিত পৌরাণিকের অপূর্ণ শিল্পকন যে কিরূপ
সম্মত হইরাছে, তাহা বাঁহারা দক্ষবজ্র, সত্যের দেহত্যাগ,
শিবের বিশাপ, অভিনয়ে বা কথকের মুখে শুনিরাছেন,
তাঁহারা সকলেই অবগত আছেন—একোজ্রে উহার
পুনরুন্মেষ নিশ্চয়োজন।

জ্যৈষ্ঠ—তাত্তাতাড়িতে দশ মহাবিচার সত্য মূর্তি প্রকাশ করা গেল না। কালী, মাতঙ্গী, ঘোড়শী মূর্তি
ভুল রহিল।

সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি ষড়দর্শন, ঈশকেনাদি উপনিষদ প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থাদি রচিত হইলেও, জীবের মনে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান সমুদিত হইল না, মহামতি বাসদেব এইজন্ত মহাভারত ও সপ্তদশ পুরাণ রচনা করেন। মহাভারতের মহিমা ব্যক্ত করা ভাষায় কুলায় না, দর্শ, সমাজ, রীতি নীতি, সর্ববিষয়ের ক্ষেত্রজ্ঞান এক মহাভারত হইতেই লাভ করা যায়, তজ্জাত বেদের গৃহ ব্রহ্মতত্ত্ব সত্বেবোধ্য করার জন্ত তিনি সপ্তদশ পুরাণ রচনা করেন, উপাখ্যান-জ্ঞানে রূপকের সাহায্যে তিনি গভীর অধ্যাত্ম বোণের কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন। পুরাণ বিষয়ে এইরূপ জ্ঞান না থাকিলে, পুরাণ পাঠ করা বিড়ম্বনা।

পুরাণের মধ্যে শ্রীবাসদেব বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবত ও ঋষি মার্কণ্ডেয় প্রণীত চণ্ডী স্থবিখ্যাত। শ্রীমদ্ভাগবতের তত্ত্বকথা অন্তর্যমণির মত, জীবের জিতাপ জালা দূর করে। চণ্ডীও ব্রহ্মলোকের বল, পীড়িতের মহোদধি। বৃষ্টিনের যেমন বাহিবেল, মুসলমানের যেমন কোরাণ, হিন্দুর তজ্জপ গীতা ও চণ্ডী নিত্য উপাসনা-মন্দিরে পঠিতব্য। মাতৃমহিমা কীর্তন করিতে হইলে, চণ্ডী-মাহাত্ম্য অবজ্ঞা বর্ণনীয়। আমি অতি সম্বোধে ইহা বলিয়া, মাতৃসাধনার সিদ্ধ কয়েকটা মহাজীবনের সমান্ত পঠিত দিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে উপাখ্যান-জ্ঞানে মাতৃমহিমা প্রচারের প্রয়াস হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে যেমন

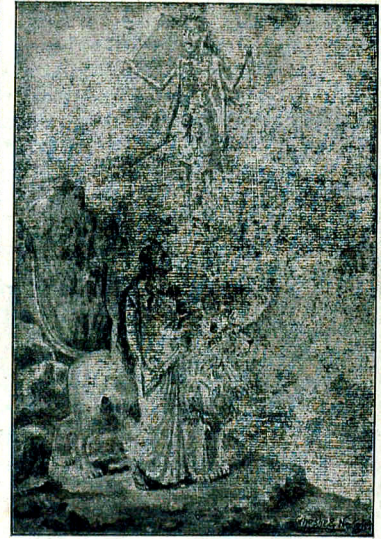
কংসবধ একটা রূপক, যজ্ঞত: যোগসাধনার ইহা প্রকট নিদর্শন, তজ্জপ চণ্ডীও, রূপকজ্ঞানে মাতৃসিদ্ধ হওয়ার যে নিগূঢ় সাধনা, তাহারই বিশেষ বর্ণনা মাত্র।

ভাগবতের দশস্কন্ধে আছে—শৌরী বহুদেব মথুরা নগরীর রাজকন্যা দেবকীকে বিবাহ করিয়া, নিজদেশে আগমনার্থে রথে আরোহণ করিয়াছেন, নৃপতি উগ্রসেনের পুত্র কংস, ভৃত্য দেবকীর ক্রিয়-সাধন চিন্তা অশ্বদ্বন্দ্বী ধারণ করিয়া সারথি হইয়াছেন, সহসা দৈববল্য হইল—“রে মূর্খ, যাহাকে বহন করিতেছে, তাহার অর্চন গর্ভস্থ সন্তান যে তোমার দমনকর্তা।”

কংস এই ঘটনা হইতে বহুদেবের শত্রু হইলেন, এবং এই দম্পতিকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া একে একে সকল সন্তান বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইলেন।

ইহার তাৎপর্য্য এই—উগ্রসেন অজ্ঞান। অজ্ঞান অহঙ্কারের স্রোত, কংসরূপ অহঙ্কার দেহরূপ হস্তের সারথি, সেই রথে বাহুদেবরূপ মণ্ডল ও দেবকী-রূপ ভক্তির বিগ্রহ করিতেছে, উভয়ের মিলনে যে তত্ত্ব প্রকাশ হইবে, তাহাতে অহং যে নশ পাইবে, তাহা অবধারিত। কংস সতর্ক হইলেন, দেবকীর পুত্রপুত্র বিনাশ করিলেন। ইহা পঞ্চতত্ত্ব, জীবের ভোগ উপাদান। কিন্তু যত সন্তান নিহত পাইল, মহামায়া সংকল্পণ করিয়া এই গর্ভ রক্ষা করিলেন, ইহা হইতেই চৈতন্য বিকাশ, সত্ত্বমে ময়া কংসকে বৃদ্ধ করিল, অহংকে বিগ্রহা ধরিল, অন্তরে ক্রুদ্ধতত্ত্ব অহং লয় হইয়া গেল। কংস

বন্দের ইহাই অধ্যাত্ম উপাখ্যান। চণ্ডীতে আছে :— সমাদি উভয়েই মায়ের চরণে সমান ভাবেই পূজালাই। বাগোচির মনস্তত্ত্ব চৈতন্যবশে সুরথ নামে এক ছিলেন, মায়ের সন্তান ছোট বড় নাই। রাণা—রাণাজ্যন্তই হইয়া বনগমন করেন। চৈতন্য সুরথ রাণা অনাতাগণ কর্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়া



চণ্ডীর অবতরণ

দেববংশ সন্ত, সুরথের পিতামহ, ইনি সন্ত-রাণাজ্যন্ত হন, সনাতির পুত্র কনর ধনলোভবশতঃ দ্বীপাদিপতি ছিলেন, একদিকে এই কুল তাঁহাকে বিভাজিত করে—উভয়েই কিন্তু মোহ-আভিভ্রাতা শ্রেষ্ঠ নৃবনি, অন্যদিকে বৈরাগ্য বশতঃ স্বীকৃতির সপক্ষের আকর্ষণ বিবাহিত,

এই হুঃ-দূর করার অসমর্থ হইয়া, তাঁহারা মেঘসন্নিহিত শরণাগত হন। মেঘঃ শেষে বজ্র। জীবনযন্ত্রে দীপ্ত শিবা জাগ্রত করিয়াই, উভয়ে এই মোহস্বপ্নের মূল তত্ত্ব অবগত হ'লেন:—

“জানিনামি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।

বলাশক্ত্য মোহায় মহামায়া প্রযুক্তি।

জানিগণের চিন্তাও বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া মোহে নিমগ্ন করেন, অতএব এই মহামায়ার দয়া না হইলে মুক্তি অসম্ভব।

মেঘঃ সূর্য্য রূপায় ইহার জ্ঞানলাভ করিলেন, মোহে বিদ্রুত হইল, দেবী রাজাকে পূর্ব্বরাজা লাভের বর দিয়া, আশীর্বাদ করিলেন:—

মৃত্যু ভুয়ঃ সংপ্রাপ্য জন্ম দেবাবিবর্ত্ততঃ।

সাবর্ণিকা নাম মহর্ভগান্ ভূবি ভবিষ্যতি॥

মৃত্যুর পর বিবর্ত্তন হইতে জন্ম লাভ করিয়া পৃথিবীতে সাবর্ণি নামক মহ হইবে।

বৈশ্ব “আমি আমার” এই অহঙ্কার-মুক্তির কামনা করায়, দেবী বলিলেন:—

তং ব্রহ্মস্মিৎ সন্নিষ্টো তব জ্ঞানঃ ভবিষ্যতি।

তোমার ইচ্ছাযথার্থী বর দিতেছি, তোমার জ্ঞান হইবে।

মুগ্ধা হুগা-প্রতিমা গঠন করিয়া—উভয়ে নদীতীরে নিরাহার, বসন্তাচার ও সমাহিত হইয়া পূজা করেন। ইহা পরকালেই হইয়াছিল—চতীতে আছে।

“শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিক”।

রাজা সুর্য্য ও সমারি মেঘঃ সূর্য্যের রূপায় যে মৃত্যুচেতন, মহাবাহু, তত্ত্ব-নিষ্ঠ চণ্ডমুখ বদনের বিবর্ত্ত ভনিলেন, তাহা শক্তি রূপায় আশ্ব-কলুব কয়ের মূর্ত্ত—তপ্তার হোমকুণ্ডে বধন প্রযুক্ত হইয়া, তখন নিঃশব্দে দ্বিবা শক্তির হস্তে বিবিধ গাণের মূর্ত্তি বিস্তারিত হয়।

আমরা নিজ দেহরাজ্যের ঈশ্বর হইয়াও বাসনা ও অহং-এর দাস হইয়া আছি—আম্রার স্বাধীনতা অপমত হইয়াছে, শক্তির হাতে আত্মোৎসর্গ করণে শক্তি নানা মূর্ত্তিতে—জগজ্জ্যোতির সাক্ষ্য পাপশাশি বিম্বিত করেন, চতীতে ইহার মূর্ত্তি বিবর্ত্ত পাওয়া যায়। তাই হুগাংসবের সময়, কলারূপকাল হইতে চতীপাঠের বাধ্য আছি।

গীতার নিকাম যোগের কথা বড় করিয়া বলা হইয়াছে, কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রের দ্বারা, বাহিত পুস্তির অভাবে জীবের নিকাম কর্ম্ম মুখের কথা মাত্র, তাই দেবতার কাছে সাধকের প্রার্থনা—

“এগং দেহি জ্ঞয়ং দেহি বশো দেহি বিয়োজবি।”

জীবনের সম্পদ, বশঃ, সবই মায়ের আশীর্বাদ মোহে বধন দ্বিগিয়া দূরে তখন জীব ইহা বিম্বিত হয়, হুগাংসা মন তখন শক্তিকে অধিকার আনিয়া অহংয়ের পরিতোষ সাধনেও কুণ্ঠিত হয় না।

দৈত্য নিষ্ঠুর দেবীকে বলিয়াছিল—

“পরমেশ্বর্য্যমতুল্যং প্রাপ্যাস্যে মৎপরগ্রহণ্যং।”

এই জুর পাপগ্রহঃ ক্ষুদ্রের রক্ত মায়ের কুজুতী হইতে নিধম কালীশক্তির আবির্ভাব হয়:—

“বিচিত্র খট্টাধরা নরমালা বিভূষণা।

দ্বীপচন্দ্রপরিধানা শুদ্ধমাংসহতীভবরা॥”

এই কালীশক্তিই সাধকের উৎকট পাপ বিনাশ করিয়া, দেহরাজ্যে ঈশ্বরের সিংহাসন পাতিয়া দেন—আত্মসাধন রহস্ত এমন সহজ সহজ ভাবে বিবৃত করা বোধ হয় ভারতেই সম্ভব হইয়াছে—এক তন্ত্র আশ্রয়েই ইহার জ্ঞান আয়ত্ত করার বিধির পরিবর্ত্তে, জীবনের অমৃত্যু দ্বিবা বাহাতে ইহা আয়ত্ত হয়, এইরূপ, ষাটী তন্ত্রের মতে শক্তি আরাধনা, যড়চক্র ভেদের অস্ত্রাধারের মধ্যে চতীর মহিমা উপলব্ধি করার ব্যবস্থা আছে। অধিকারী ভেদে পুরাণমতে হুগাংসবও সামাজিক

বিধানে দেবী আরাধনার আয়োজন ভিন্ন ভিন্ন হইলেও, শক্তির উদ্যোহন সর্ব্বক্ষেত্রে প্রযুক্তা রাখা হইয়াছে। বোণী চতীপাঠ করিতে করিতে, কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগাইয়া দেবী-শক্তির মর্ম্ম গ্রহণ করেন; পুরাণ, শিবশক্তির বিশ্রামস্থান বিম্বমূল—এই কল্পনা, তৎস্থানে দেবী রচনা করিয়া, ঘটে মাতৃশক্তির আবাহন করেন; গৃহস্থ মুগ্ধা মূর্ত্তি রচনা করিয়া, বিশ্বরূপের শাখা আনিয়া মায়ের নবপত্রিকা প্রবেশরূপ মঙ্গল-

কর্মে ঢাক ঢোল শব্দে চতীমণ্ডপ স্থাপিত করিয়া তুলেন। ব্রাহ্মণের কণ্ঠে আশ্রম চতীপাঠ, মন্ত্রের ছন্দে ছন্দে ‘ওঁ বাহা’ আভতির পূর্ণ ধ্বনি, শরতের আকাশে মাতৃসাধনার যে পবিত্র চিত্র অঙ্কিত করে, তাহাতে নিতান্ত অপৌত্তলিকের অন্তরও কি এক অতীন্দ্রি় ভাবে ও রসে বুদ্ধ হইয়া উঠে। ইহা মাতৃশক্তির অংগরণ:—

যা দেবী সর্ব্বভূতেশু মাতৃরূপং সমৃতি।

নমস্তুটে। নমস্তুটে। নমস্তুটে নমো নমঃ ॥

রামপ্রসাদ

—:—

শরতের প্রভাতে খরনী বাজাইয়া ভিখারী গান ধরিত:—

গিরিবর আর আমি পারি না যে,

প্রবোধ দিতে উদ্যোগে।

উমা কেন্দ্রে করে অভিমান, নাহি করে গুজু গান,

নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে।

প্রভৃতি,

বাল্যকালে কোমল অন্তরেও পানের অর্থ এমন জাঁক দিয়া বসিত, যাঁরা আর কুলিবার উপায় ছিল না।

চৌক-ঢাকা বলদের মত ভবের গাছে ঘুরিয়া মরার হুংটা প্রত্যক্ষ হইত, কিন্তু ভবের গাছটা তখনও তেমন স্পষ্ট হয় নাই, তবে হুগা হুগা বলিয়া পাপী তরিয়া যায়, এমন অনির্দলচরী ভাবে ধ্রুয় ভরিত, তখন কে জানিত ইহাই ভক্তির অঙ্গুর!

ইহা বড় অল্পশক্তির পরিচয় নয়। অধ্যাত্ম-তত্ত্ব গভীর এবং নিগূঢ়, কিন্তু রামপ্রসাদের “প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী, কর্ম্ম-ভূরি দে না কেটে।

প্রাণ বাবার বেলা এই করে না, যেন ব্রহ্মরত্ন,

যায় গো ফেটে ॥”

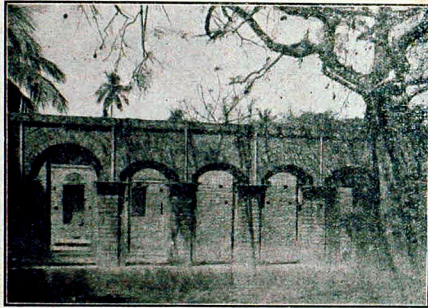
এই চরণটা তার স্বরে গাহিতে গাহিতে কৃষকের চক্ষু জল, নাবিকের সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠা আর আমাদের মত অল্পবয়স্ক বালকদের অন্তবেও, ব্রহ্মরত্ন জাঁক হইয়া মরণের লক্ষণ বড় ঘোরতর, বড় পুণ্যের সূচ্য, এই ধারণা বহুমূল হইয়া যাওয়া, লক্ষ্মণীয় নামে প্রাণে নতুন স্পন্দন অহুভব করা, রামপ্রসাদের ইহা যে কি অপারিবার আশীর্বাদ—যা হা আত্মও ভাবিয়া ভাবিয়া বিভোরেই হইয়া যাই। ঠাকুর দেবতার চরণে দ্বিবার পূজাধরী এই সিন্ধ মাতৃচক্র সম্বন্ধের চরণোদ্যোজেই সমপিত হয়।

ইহারাই তো ভগবানের প্রত্যক্ষ বিয়,

ইহাদের দয়ায় ঈশ্বরাত্মক জাতি। কঠোর বেদের স্বক্কে যেখানে স্বাক্ষর দেয়, সে কঠোর কি মাছের? স্বয়ং দেবতা না হইলে, দিব্যাত্মকতার সিদ্ধ মন্ত্র কে উচ্চারণ করিতে পারে? ঠাকুর রামকৃষ্ণের মত শ্রীশ্রীরামপ্রসাদের মূর্তি পাইলে, দেববিগ্রহের মতই বাংলার ঘরে ঘরে ইহাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া, গ্রামে গ্রামে রামপ্রসাদের মন্দির রচনা করিয়া জাতিকে এই দেবতার চরণে পুষ্পাঞ্জলী দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে! রামপ্রসাদ মাতার প্রতিমা

দেখা দিলি, আমার কেন দিবি না।" এই যে শ্রীভগবানের উপর সম্বন্ধের মত করিয়া সাধন-ভঙ্গী, ইহার মূল তো রামপ্রসাদ—দুঃখ হয়, রামপ্রসাদের স্থিতি-উৎসবে জাতির প্রাণ আজও তেমন উত্ত্বঙ্গ নয়, রামপ্রসাদের চরণে বাঙ্গালীর প্রজাতির আজও অজস্রধারে বসিত নয়!

রামপ্রসাদ জাতির গুরুমূর্তি! কেমন করিয়া দীক্ষা দিলে জাতির প্রাণ ঈশ্বরময় হইবে, সে সিদ্ধকৌশল রামপ্রসাদের ছিল, মা তাহাকে এই



রামপ্রসাদের ভিটা।

পূজা করিতে করিতেই তো গাছিয়াছিলেন—“তারা আমার নিরাকার।”—সাকার নিরাকার তবের সহজ বৃত্তি, রামপ্রসাদই জাতির কর্তৃপ্রথম প্রদান করেন—হালিসহরে যে মন্দের প্রথম স্বাক্ষর, রামমোহন সে বাণীর প্রতিপল্লি তুলিয়া গাছিয়াছিলেন—“আবাহন বিলম্বিত কর ভূমি কার!” রামকৃষ্ণের দীক্ষা রামপ্রসাদের প্রেরণায়, ইহা কি বেহ অস্বীকার করিবে? “মা তুই রামপ্রসাদকে

সিদ্ধবিদ্যা হাতে ধরিয়া শিখাইয়াছেন! আত্ম আদর্শ-বাদী আচার অচর্য্যত্বের ব্যবস্থা দেখিলেই, অঙ্গ-সংস্থার বলিয়া নাদিকা কুণ্ডন করেন, বলা বাহুল্য, এই সব আত্মগতী বিজ্ঞানের জীবন দিয়া, দেশের কোন উপকারই হয় না। রামপ্রসাদ বিগ্রহের পুদতলে বসিয়া” অমন্তের অহুত্ব পাইতেন। তাঁরই যুগের কথা “বনের পুষ্প, বেলের পাতা, মাগো, আর দিব আমার

মাথা”—তবুও তিনি বৎসরে বৎসরে মৃত্তিকা প্রতিমা মাথায় করিয়া, “কালী নাম পেয়ে বলল বাজারে” শ্রামা পূজার বিপল্লন দিনে, শিবের গলি দিয়া গঙ্গাতীরে যাইতেন, তাঁর কণ্ঠশব্দে বাঙ্গালীর প্রাণ পেয়ে তরুণিতে মাতিয়া উঠিত, শিখার এমন উৎকণ্ঠ বিধি উপেক্ষার বস্তু নহে!

রামপ্রসাদ জানিতেন—তিনি কেমন করিয়া মাঘের দেখা পাইলেন, “জিহ্বাবন যে মাঘের মূর্তি” তিনি কেমন করিয়া জ্যোতিষ্ময় রূপ ধরিয়া তাকে ধৃত করিলেন, সকল সংশয় দূর করিয়া, মানব-মূর্ত্তিত তিনি কেমন করিয়া তাঁর বেড়া বাধায় সাহায্য করিলেন! এই সকল জাগ্রত অহুত্বের অধিকার যে পথ ধরিয়া লাভ করিয়াছিলেন, সেই সিদ্ধ নীতিই তিনি জাতির সপ্তপে অধিকৃত পরিস্ফুট করিয়াছেন, তাই সংস্র সংস্র পুরুষ নারী আজ মাঘের কল্যাণ সিদ্ধ, বাংলায় তত্ত্ব-সাধনার অপূর্ণ মহিমা এই ভূমিত বৎসরের শূন্যগত প্রবল পাক্ষাত্য জ্ঞানের চাকচিক্যে একটুও মলিন হয় নাই।

১১১১—১১১৩ বৃষ্টাব্দের মধ্যে রামপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। বাংলার ইহা সাক্ষ্যগুণ। তখনও বাংলার পল্লীতে বাঙ্গালীর কমনীয় জন্মবৃত্তির ক্ষুদ্র বিধানের উপায়গুলি অস্বাভাবের পীড়নে লোপ পায় নাই। হালিসহর কুমারহট্টের অন্তর্গত একটা বঙ্কিম গ্রাম ছিল কুমারহট্ট সংস্কৃত চর্চার বিশিষ্ট কেন্দ্র বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। গ্রামের কুমার ধোণা, ইহারও পণ্ডিতগণের মধ্যে নিরন্তর দার্শনিক চর্চা অব্যব করিয়া তর্ক শাস্ত্রের কূট প্রশ্ন ও মীমাংসার সূত্রগুলি কঠোর করিয়াছিল এই সময়ে নানাবিধ কিম্বদন্তীও আছে। হালিসহরের শিবের গলি সমাধি প্রাঙ্গণাঙ্গণের বাসস্থান, উপবন, সুরাবার, দেবালয়, গৃহশ্রেণী প্রভৃতি গ্রামের শ্রী

সম্পাদন করিত, গঙ্গাতীরে ব্রাহ্মণের প্রাতে সন্ধ্যায় বসিয়া সন্ধ্যা বন্দনা করিত। ধর্মভাবের দ্যোতনায় হালিসহর তখন মত্ত মুখরিত। রাম-প্রসাদের পিতার নাম রামরায় সেন। তখনকার লোকে ব্রাহ্মমূর্ত্তিতে উঠিয়া, নিতা প্রাতঃস্নাত্য সমাপন পূর্ব্বক, উদ্যানে পুষ্পচয়ন করিয়া ধর্ম-জীবনের অঙ্গ প্রাতঃসন্ধ্যাদি নিয়মিত ভাবে পালন করিয়া চলিত, জানি না কোন অভিধানে আজ আমরা পূর্ব্বপণনের অন্ততলীয় স্বর্ঘ্যদেবের সৌন্দর্য্য উপভোগে বঞ্চিত, কোন অভিধানে বিধগ-কাকলীর মধ্যে প্রভাত বন্দনায় আমাদের কণ্ঠ মুখরিত নহে, আমাদের ধর্ম, জীবনের অপরিভাষ্য অঙ্গ বলিয়া আর আমরা ধরি না। হয়তো আমরা অধিক সম্পদ অর্জন করিয়াছি, লোক-মাছ পাইয়াছি, লোকনেতা হইয়াছি, কিন্তু অতী-ক্রিয় জগতের যে মধু আবাদ, যাহার পরশে জীবন অমৃতময় হয়, মৃত্যু পদচুপন করিয়া ফিরে, সে জীবনের পথ হারায়াছি। লোকের কাছে মূগে হাসি, কিন্তু আড়ালে বসিয়া আমাদের চক্ষু কাটিয়া জল বাহির হয়, যেন কি হারায়াছি, কি ছিল আজ আর নাই, সেই সম্পদের সন্ধিতে এই সব সিদ্ধ মহাপুরুষগণের স্থিতি অরণ্যে আবার জাগ্রত হয়, কিন্তু যেমন করিয়া দ্বন্দ্ব কলিলে ইহা আবার ফিরিয়া আসে, তেমন করিয়া আমরা আর কিছু করিতে পারি না, ইহা কি মৃত্যুর লক্ষণ নহে!

রামপ্রসাদ পিতার সহিত ফিরিতেন, প্রাতঃসমীরে ছলিয়া ছলিয়া শিশিরসিক্ত উদ্য যেন তাহাকে আহ্বান করিত, উষারগোজল রক্তজবা হাসিয়া তাহার হাতে উঠিয়া আসিত, বিবর্তকমূলে ভক্তিত মাথা ঠেকাইয়া, উদ্ধবাহ তুলিয়া শাখা হইতে নবপত্র বাছিয়া সাজি ভক্তি করিতেন।

তারপর চণ্ডীমণ্ডপে ধূপ পূনার গন্ধে চন্দনচর্চিত স্থানান্তিত পুষ্পপত্র পিতা যখন মায়ের চরণে অঞ্জলী দিতেন, রামপ্রসাদ দেখতেন, মায়ের মুখ প্রসন্ন হইতেছে, চক্ষু যেন ক্রমশঃ স্ফুট, শরীর যেন জ্বলিয়া উঠে, আর সর্কশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ, শিবের বসন্ত জননীর রক্তাশ্রু চরণমুগ্ধল, মরি মরি উঠা কি মাটার, এমন রাঙা, এমন তাজা, এমন কোমল, প্রক্ষুটিত পদ্মধূপগন্ধে মাতাল ভ্রমর যেমন টলিয়া টলিয়া পড়ে, রামপ্রসাদের মনস্কমর তরুণ মাতাল হইয়া পড়িত।

ষোড়শ বর্ষ বয়সে পিতৃবিয়োগ হইলে রামপ্রসাদের মাথায় সংসারের ভার আসিয়া পড়ে। অশৈশব মাতৃদাম্পত্য ক্রোড়ে বসিয়া, বিশ্বমাতৃকাকে যেমন আপন বোশে অহুভব করিয়াছিলেন, যৌবনে সে আত্মীয়তা যেন আরও নিবিড় হইয়া উঠিল, দুঃখে বিপদে তাঁর সাহায্য ছিল, মায়ের নিকট গিয়া আশ্রয় করা, এই সময় তাঁর জ্যোতিঃ দর্শন হয়, রামপ্রসাদ আপনভোলা, প্রেমমাতোয়ারা হইয়াই চলিতেন কিরিতেন, সংসারের কাজকর্ম সারিতেন, মায়ের পূজায় ছিল তাঁর প্রবল অনুরাগ, মন্দের সঙ্গে গুণ গুণ করিয়া তিনি গান গাহিতেন, তখনও যে ধ্বনি আবার বৃদ্ধ-বনিতাকে পাগল করার মত স্বপ্নষ্ট হইয়া উঠে নাই, কলিকাতার চাকুরী করিতে গিয়া প্রসাদের হাতে দিবসের অঙ্কের সহিত বাহির হইল—

“আমায় দে না তবিলদারী।

আনি নিমক-হারাম নই শরীরী।”

মায়ের দয়া মৃদুভাষী হইয়া রামপ্রসাদকে ঘরে ফিরাইয়া আনিল। বনিব ইহাতে জুড় হইলেন না, রামপ্রসাদের জ্ঞান ত্রিশটাকা মাহাত্ম্য বন্দোবস্ত করিয়া মাতৃদাম্পত্যের পূজা করিলেন, প্রসাদ মুক্ত বিহব্দের ছায়, বাংলার আকাশে বাতাসে মাতৃ-

মহিমার সিক্ত মস্ত ছড়াইয়া দিলেন। তাঁর জীবনের ইতিহাস লেখা আমার উদ্দেশ্য নয়, আর সে স্থানও “প্রবর্তকে” সংস্থান হইবে না, মাতৃদাম্পত্যের কয়েকটা অহুভবের কথা উল্লেখ করিয়া বন্ধদের তত্ত্বপূর্ণ—জ্ঞাতীর গুরু প্রসাদের পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া দ্বন্দ্ব হইব।

সংসারে আমবা শিবি ভালবাসিতো। এই ভালবাসাই আমাদের মূল ধন—যাহা দিয়া ইশ্বরবস্ত্র পরিদ করি। সে বস্ত্রকে কেহ পিতৃ-মাতৃবৎ—কেহ প্রভু বন্ধু, কেহ বা প্রাণের প্রাণ, অন্তরের অন্তর বলিয়া অহুভব করে।

দাস্ত, দয়া, বাৎসল্য, শৃঙ্গার চারি রস।

চারি ভাবের তরুণ রস কৃষ্ণ তাঁর বশ।

রামপ্রসাদ ভগবানকে মাতৃকণ্ঠে ভালবাসিয়া-ছিলেন। সে যেন মায়ের নিকট আশ্রয় ধরে, অভিমান করে, আদরে সোহাগে গলিয়া যায়, অন্যভাবে ঠোট ফুলাইয়া কাঁদে, কটু চ্যনে গঞ্জন দেয়, রামপ্রসাদের জীবনে মায়ে ব্যাটার এই অনির্লক্ষ্যনী লীলা-মাদুরীই দৃষ্টিয়া উঠিয়াছে, ভাব ভক্তি, স্নেহ প্রেম—বিশ্বজননীর সহিত মানব শিশুর এই মধুর সংঘর্ষের বিচিত্র অভিযুক্তি সাধন-জগতে যুগান্তর আনিয়াছে—দুইশত বৎসর পূর্বে দেবতার সহিত মানবের এমন জীবন-যোগের সাফল্য পরিচয় একপ্রকার দুল্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, ঐতিহ্যের পর দ্বিবা মঞ্চ তত্ত্বের অনাবিল নিদর্শন রামপ্রসাদের জীবনই দিনের মত পুষ্ট হইয়াছে।

রামপ্রসাদ ত্রিশটাকার বৃত্তি লইয়া হালি-সংরে ফিরিলেন। পঞ্চমুখীর আসন পাতিয়া বসিলেন, গুরুদত্ত সাধনমন্ত্র দিবানিশি জপ করিয়া, পরম নিষ্ঠা সহকারে হুলাচীর পালন পূর্ষক ষড়চক্র ভেদ করিলেন, জগতের সকল বিষয়

তাঁর নিকট সহজ হইয়া উঠিল, তিনি দুঃখে অধীর হইলেন না, বিষয় লোভে আসন ছাড়িলেন না, মায়ের মৃদু চাক্ষুষ করিয়াও অসাধারণ হইলেন না, পবিত্র গাহন্য জীবনের সকল বর্ধই পালন করিলেন। কোথাও রুদ্ধতা নাই, কোথাও অস্পষ্টতা নাই, বরং তাঁর দিব্যাহুভবের কথা সকলে তেমন করিয়া প্রত্যয় করিত না, যেমন ঈশ্বরপথের পথিক হইলে, সাধকের জীবনে যে গাঞ্জীয়া, যে অসাধারণত্ব, তাঁর জীবনে তেমন কিছুই দেখা যায় নাই, পুত্র কলার পিতা হইয়া গাম্ভীরা কাঁধে গদাধার করিয়া, বাজার হাট করিয়া, যেমন লোক সংসারবাসী নিঃস্বপ্ন করে, রামপ্রসাদ তাহাই করিতেন। রামপ্রসাদের ইহাই বিশেষত্ব, বাংলার জাতীয় জীবনে তাঁর এইটুকু দান যে কি অমূল্য, তাহা আজ নির্ণয় করা যাইবে না, বর্ধজীবন যেদিন সহজ হইয়া সকল অবস্থার ভিতর দিব্যাহুভবের পরশ লোকে অহুভব করিবে, সেই দিন দেশ বৃষ্টিবে, রামপ্রসাদ জ্ঞাতীর ভবিষ্যৎ পঠনের কি অটল ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

সাধন সহায়ে তাঁর স্বয়ংগত বিকসিত হইয়া ছিল, বিস্তৃত চক্রে কুণ্ডলিনী খেলা করিত, তাই কঠোর মধু করিত, সে মাতৃমন্ত্র শুধু মাতৃগুণ স্তবিত না, দেবতার আদিয়াও কান পাতিতেন। রামপ্রসাদ গদাধার সারিয়া যে দিন স্তবিলেন, একজন রমণী তাঁর গান শুনিবার জ্ঞান বহুগুণ অপেক্ষা করিয়া শেষে কাশীতে অন্নপূর্ণার মন্দিরে গিয়া গান শুনাতে বলিয়া গিয়াছেন, প্রসাদের অন্তরে প্রভাত্যের হোমজুও ধূপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, তিনি তেমন গাম্ভীরা কাঁধে কাশী যাত্রা করিলেন, ত্রিবেণীর ঘাটে মায়ের অন্তরবাণী শুনিয়া আবার বাড়ী ফিরিলেন,—এইরূপ সরল শিশুর মত

স্বয়ংগত ছিল বলিয়াই, রামপ্রসাদ মায়ের দেখা পাইয়াছিলেন।

ত্রিবেণীর ঘাটেই গান ধরিলেন—

“আর কাজ কি আমার কাশী।

মায়ের পদতলে পড়ে আছে, গদা গদা বারানসী।

জন্মকালে, ধানকালে আনন্দসাগরে ভাসি।”

রামপ্রসাদ মুক্তি মোক্ষের তোয়াক্কা রাখিতেন না, তাঁর মাতৃচরণে নিষ্ঠাই চতুর্দর্শন ফল ছিল; সাধনার এই নিগূঢ় মর্ম অজ্ঞাত থাকায় অনেকেই সাধনপথে ব্যর্থ হন, ভক্তি যেমন বলেন, কৃষ্ণ-ভক্তির ফল রক্তজন্ম, রামপ্রসাদও তেমনই মায়ের রক্তবৎসল ভিন্ন অন্য কামনা রাখিতেন না। তিনি গাইয়াছেন—

“কাশীতে মরিগে শিব দেন তত্ত্বমসি।

ওরে তত্ত্বমসির উপরে সেই মহেশ্বরমহী।”

নিজেই ইষ্টকে এমন করিয়া না দেখিলে, কি ইষ্ট-দর্শন মিলে?

ভাব যতক্ষণ না স্বস্তর হয়, ততক্ষণ দূর প্রত্যয়ে সন্ধাননি সাধনা পায় না, দক্ষিণেশ্বর ভাবনাধারী সিক্ত হইয়াও ঠাকুর ভাবিতেন—যাহা দেখিলাম, যাহা শুনিলাম, যাহা স্পর্শ করিলাম, এ সব কি সত্য না স্বপ্ন? তারপর ব্রাহ্মণী আদিয়া, বৈধী সাধন প্রথায় সেই সব অহুভবের বিষয় যখন বাস্তবরূপে দেখাইলেন, তখন ঠাকুরের অন্তর বাহির আনন্দে ভরিয়া গেল। রামপ্রসাদের কাশীযাত্রাও ভাবে-ভাবে শেষ হয় নাই, শেষে তিনি কাশী গিয়াছিলেন, বিশেষত্ব দর্শন করিয়া দ্বন্দ্ব দ্বন্দ্ব করিয়াছিলেন—

শিব দ্বন্দ্ব, কাশী দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্ব দ্বন্দ্ব গো আনন্দমহী।

কিন্তু কাশীতে মরিয়া শিবের শরীরে মিশাইতে তিনি চাহেন নাই, মায়ের চরণধূলায় অভিনাথ ভিন্ন তাঁর অন্য কামনা ছিল না, সাধকের ইষ্ট

ভিন্ন অন্য কামনা রাখিতে নাই, প্রসাদের জীবনে
এ দৃষ্টান্ত সফল হইয়াছে।

মায়ের শরণ লইয়া প্রসাদ স্থখ চাহেন নাই—

মন ক'রনা স্থবের আশা।

যদি অভয় পদে লবে বাসা ॥

ধর্মসাধনার পথ যে কি কঠোর, কি দুঃখময় তাহা

তিনি জানিতেন, বর্ণ করিয়াই গাহিতেন :—

“আমি কি দুঃখেরে ডরাই



রামপ্রসাদের পঞ্চবটী।

প্রসাদ বলে, ব্রহ্মমহী বোঝা নামাও কণেক জিরাই।

দেখ স্থখ পেয়ে লোকের গর্গ করে, আমি করি

দুঃখের বড়াই ॥”

এমন ‘শুক’ মাঘ্য না হইলে, কি জাতীর জীবনে

অমর শক্তি সঞ্চার করা মাঘ্যে কল্যাণ ?

প্রসাদের কথা কত বলিব ? তাঁর অধ্যাত্ম-

দৃষ্টি অক্ষুর হওয়ায়, বড় দর্শনে যাহা না গিলে

সহজ ভাষায় গানের জলে, সেই সব নিগূঢ় বিষয়

বলিয়া গিয়াছেন, দেহতত্ত্ব, যচ্চক প্রভৃতি ছুর্তোদা
তত্ত্বের সরল ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

“ও মন যচ্চক রথমধ্যে শ্রামা মা মোর বিরাজ করে।

তিনটে কাছি কাছাকাছি, মুক্ত বাধা মূল্যধারে ॥”

বিভোর হইয়া পঞ্চবটীমূলে, গানের জলে যখন

নুতন বেদ রচনায় তাঁর জীবন ভোর হইয়াছে,

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বিষয় প্রলোভনে প্রসাদের চিত্ত

হরণ করিতে চাহিয়াছেন, প্রসাদ সে দিন উপেক্ষা

করিয়া গাহিয়াছেন :—

মন হারালে কাজের গোড়া।

তুমি দিবা নিশি ভাব্‌তো বসি,

কোথায় পাবে টাকার তোড়া ॥

চাকি কেবল ফাঁকি মাত্র

শ্রামা মা মোর হেমের গড়া ॥

রামপ্রসাদের যে অভাব ছিল না তাহা নহে, তিনি

অভিমান করিয়া গাহিতেন :—

আমি তাই অভিমান করি

আমায় করেছ গো মা সঙ্গারী ॥

অর্থ বিনা বার্থ যে এ সংসার সবারি।

কিন্তু ইহাতে তাঁর অভাব-বোধ ছিল না :—

“যদি রাখ পদে, থেকে পদে, পদে পদে বিপদ

মারি”—মহারাজ প্রসাদের মহত্ব মুক্ত হইয়া এক

শত বিখ্যাত নিকর জন্মী দান করিয়াছিলেন।

কবিতা আছে, নবাব সিরাজুদ্দৌলা পঞ্চাশ, তাঁর

গানে মুক্ত হইয়া এক নৌকায় তাহাকে লইয়া

জল বিহার করিয়াছিলেন।

প্রসাদের ভক্তি-ভোরে মা বাধা পড়িয়াছিলেন,

প্রসাদের হস্তে অহায্যা গ্রহণে মায়ের রসনা বিবৃত

হইত, রক্তজ্বর চরণ মেলিয়া গ্রহণ করিতেন,

মায়ের সহিত প্রসাদের জাগ্রত পরিচয় পরবর্তী

মাতৃসাধনায় নুতন বিশ্বাস ও বল সঞ্চার করিয়াছে।

প্রসাদের আশীর্বাদ মাধ্যম বহিয়াই কমলাকান্ত

সিদ্ধ, ঠাকুর রামকৃষ্ণ মাতৃপ্রেমে উন্মাদ, তারা-

পীঠের রামাক্ষ্যাপা কৌলশ্রেষ্ঠ। প্রসাদ মাতাল

বলিয়া লোকে পরিহাস করিত, তাঁর যে উত্তর—

তিনি দিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে কি মনে

মত্ত থাকিতেন, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়।

স্বরা পান করি না রে স্থখ খাই কুতুহলে।

আমার মন মাতাল যেতেছে আজ

মদ মাতালে মাতাল বলে ॥

মায়ের উপর অভিমান করিয়া গাহিতেন :—

ডাকি বারে বারে মা মা বলিয়ে

মা কি রয়েছ চক্ষুর্গর্গ খেয়ে ?

মা বিদ্যামানে এ হুং সন্তানে

মা যোলে কি আর ছেলে বাঁচে না !

মায়ের সহিত প্রসাদের এই মনে অভিমান, কক্‌শোপ-

কখন, সকল লোকে প্রত্যয় করিত না, অনেকের

দ্বারগা ইহার মধ্যে প্রসাদের অনেকখানি ভান

আছে, কিন্তু সকলে তত্ত্বিত হইল, যে দিন তিনি
মাতৃপ্রতিমা মাধ্যম করিয়া, গঙ্গাবক্ষে অবতরণ
করিয়া গাহিলেন :—

নিতান্ত যাবে দিন, এ দিন যাবে, কেবল

যৌষণা রবে গো।

হাজার হাজার লোক সে দিন—জামা পূজার ভাসান

দেখিতে গঙ্গাতীরে উপস্থিত, প্রসাদের বিস্ময়

হইবার কথা প্রচার হওয়ায়, সকলেই এ দৃশ্য

দেখার জন্য উল্লসিত হইল, প্রসাদ আবক্ষ জলে

দাঁড়াইয়া পাশাঘতেরী করণ কর্তে গাহিলেন :—

“এসেছিলাম ভবের হাটে, হাট ক'রে বসেছি ঘাটে।

গুমা শ্রীহৃদ্য বসিল পাট নায়ে লবে গো ॥”

চক্ষে তাঁর অজস্র অশ্রু গড়াইয়া পড়িল, দর্শক-

বৃন্দের কণ্ঠেও হাহাকার উঠিল—সদ্যকার আঁধারে

জল তখন কালো মিশ্র, গগনের নক্ষত্র-প্রতিবিম্বিত,

রামপ্রসাদের কণ্ঠ ফীণ হইয়া আসিয়াছে :—

দশের ভরা ভরে নায় ছুগী জনে ফেলে যায়।

ওমা তাঁর ঠোঁটে যে কড়ি চায় দেখোখা পাবে গো !

কি মর্মেছে ডা অভিমান ! জনমণ্ডলী নির্বাক,

মস্ত-মুগ্ধ, প্রসাদের কণ্ঠে ভৈরব-পঞ্জিল—বায়

যেন শুভ, স্রোত রুদ্ধ—

“প্রসাদ বলে পাশা মেয়ে, আসন দে মা ফিরে চেয়ে

আমি ভাসান দিলাম গুণ পেয়ে ভবান্নবে গো ॥”

এ কি মৃত্যু ? ভাষা মুক। প্রসাদের জীবনের

কথা এইখানেই মহিমাযুক্ত হইয়া, কল্যাণকাল

পর্বাৎ জাতিকে মাতৃপ্রেমে উদ্ভূত করিবে।

প্রসাদের ভিটা আজও অনাদরে উপেক্ষিত—

রূপের অর্থাৎ এই সিদ্ধকক্ষে মা ঢালিয়া, বাঙ্গালী,

ধাতু পাশাঘাতের মৃতি স্বাণে কত মন্দের সৌধ

নির্মাণ করিতে পার, আর প্রসাদের ভিটায়

একটা স্থিতি-স্তম্ভ রচনার আয়োজন করিতে

পার না ?

রামমোহন

—:—

একদিকে স্বর্গাণ্ড হইল, অত্রদিকে স্বর্গোদয়ের
যত্ন দেখা দিল। রামপ্রসাদ যেমন মাতৃপ্রেমে
বিস্তার হইয়া, প্রেম-ভক্তির অশ্রুমালা পুলায়
পরিয়া, লোকগুরুর আসনে উপবেশন পূর্বক,
ধর্ম-জীবনের গ্রন্থীতে গ্রন্থীতে যে অন্ধ সংস্কার
সঞ্চিত ছিল, অগ্নি-শলাকা দিয়া জ্বাতির অন্ধ-
চক্ষু উন্মীলিত করিলেন, সেইরূপ তাঁর অত্মজ্ঞানের
বৎসরেই আর একজন মহাপুরুষ বাংলার অবতীর্ণ
হইয়া, এই ঈশ্বর-প্রত্যয়ের চাপরাশ বৃকে পরিয়া
জাতিকে ধর্মসাধনার নূতন পথ দেখাইলেন!

রামপ্রসাদ হিন্দু ধর্মের মধ্যে একান্ত পৌত্তলিক
ভাবে ঈশ্বরোপাসনার প্রথম কটাক্ষ করেন।
তাঁর মত গরীব গৃহস্থের পক্ষে এ বড় কম
নির্জীকতার পরিচয় নয়, তিনি স্পষ্ট সহকারেই
গাইতেন:—

“মাতৃ পামাণ মাটির মৃতি কাজ কিরে তোরা

সে গঠনে?”

তুমি মনোময় প্রতিমা গড়ি, বসণ্ড ছবি পল্লাসনে।”

বাহু পুঞ্জার আড়রের হইতে জাতিকে মুক্তি
দেওয়ার জন্ত, তাঁর কণ্ঠেই প্রথম এই কথা
উচ্চারিত হয়:—

“আল ঢাল আর পাকালা, কাজ কিরে তোরা আরোজনে
তুমি ভক্তি স্থাপাইয়ে, তাঁরে তপ্তকর আপনমনে।”
সর্ববস্তুর ভগবান দর্শনের নির্দেশ দিতেও
তিনি কহুর করেন নাই:—

“তুমি কহ্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম,

মহ্ম-কথা বুঝা গেছে।

ওমা তুমি ক্ষিত, তুমি জল,

ফল ফলাছে কলা পাছে।

তুমি শক্তি তুমি ভক্তি

তুমিই মুক্তি, শিব বলেছে।

ওমা তুমি হুং, তুমি হুং,

চণ্ডীতে তা লেখা আছে।”

ঈশ্বরের সর্বোৎসাহ দ্বারা দূর করিবার জন্ত, শাস্ত্র-
মুক্তি সহ তাঁর পানের মধ্যে এমন নির্দেশ ছুরি
ছুরি মিলে। তীর্থ, ধর্ম্ম সফল ও জ্ঞাতির ভ্রাতৃ
দ্বারা বাহাতে বিদূষিত হয়, তাহার জন্তও
তিনি গাইয়াছেন:— “কি কাজ রে মন যেয়ে
কাশী?” “নানা তীর্থ হাটিলে শ্রম মাজ পথ হেটে”
প্রভৃতি ভাষায় তৎকালীন লৌকিক আস্থার
উপর নির্ভর কঠোরভাবে করিয়াছেন। রামপ্রসাদ
কেবল পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে, লোকাচার ধর্ম্মের
বিরুদ্ধে, তীর্থাদির উপর লোকের আস্থাদির
দিকে কটাক্ষপাত করিয়া কান্স হন নাই, বোদাদি
শাস্ত্রের উপরও টিপ্সনী করিয়াছেন:—

“বেদে দিল চক্ষে ধূলি, যড়দর্শনের সেই অন্ধওলা”
এইরূপ বাক্য সেই যুগে বলা বড় সহজ ছিল না।

আর কি বৈদিক পূজা আছে মা!

আমার হৃদয় নাই, অংশ খুটেছে।

শ্রীশ্রী জগন্নাথ তীর্থ যাত্রা সে সময় পরম ভাগ্যা
বলিয়া গণ্য হইত, রামপ্রসাদ ভক্তির বলে বলীয়ান
হইয়া গাইলেন:—

“মন কি মাঝি জগন্নাথ

খাতি আনন্দ বাজারে ভাত ভক্তিরেখে আপন মাথে।

আমিন, ১৩৩১]

রামমোহন

৩৩১

জগন্নাথ আশ্চর্য্য, ছবিপদ্মে তাঁর ধাম।

পূর্ব হবে মনস্বাম ভক্তলে তাঁরে অস্তরেতে।”

রামপ্রসাদের কণ্ঠ শুক হইতে না হইতেই,

কল্প বিধাণ রামমোহনের কণ্ঠে বাজিয়া উঠিল। পারেন না।

আজ জীবনের যেটুকু উৎকর্ষের লক্ষণ দেখা যায়,

তাঁহা প্রসাদ ও রামমোহনের অধ্যাত্ম বলে যে

সাম্প্রদায়ের কণ্ঠে শুক হইয়াছে, একথা কেহই অস্বীকার করিতে

পারেন না।



রাজা রামমোহন রায়

প্রসাদ ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন,
রামমোহন বলভক্তের মত বাংলার স্থপ হিন্দু-
সমাজক্ষেত্র লাঙ্গলের ফলায় তুলিয়া ধরিলেন।

প্রেমভক্তির অশ্রু দিয়া গড়িতে চাহিয়াছিলেন,
রামমোহন জ্ঞান-গজা হস্তে সেই কাজ সিদ্ধ করিতে
উদ্যত হইয়াছিলেন। তিনিও সুগৌরী-শক্তি

রামমোহনের পিতৃকূল বৈষ্ণব
ছিল, মাতৃকূল শাক্ত। রাম-
মোহনের মাতার ধর্ম্ম-বিশ্বাস—
রামমোহনকে অধিকার করিয়া-
ছিল। ধর্ম্ম বিষয়-বিশেষে
আশ্রিত হইয়া, উপাসককে
অহরের সন্ধান দেয় না, ইহা
বুঝিয়াই রামমোহন পৌত্তলি-
কতার বিরুদ্ধে যাত্রাভ্রমণ হইয়া-
ছিলেন। তিনি গভীর শাস্ত্রাদি
অধ্যয়ন করিয়াই নূতন ধর্ম্ম-
তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছিলেন,
ইহার মূল কিন্তু সাধনা যে
কল্পপ্রবাহের মত তাঁর অন্তরে
প্রবাহিত ছিল, সে সন্ধান কেহ
দেন নাই; তবে তাঁর জন্ম-
বিবরণের তথ্যই পরিয়া বুঝা
যায়, বাংলায় যে বৈষ্ণব ও
শক্তি সাধনার সিদ্ধনীতি
প্রচলিত ছিল, তাঁর প্রভাব
তিনি জীবন দিয়া গ্রহণ করিয়া-
ছিলেন। আরও বিচিঞ্জ এই,
রামপ্রসাদের মৃত্যু বৎসরের
শেষেই তিনি জন্মগ্রহণ
করেন এবং প্রসাদ বাহা

জগাইয়া রাখার জন্ত যে সাধনা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ধর্ম-বিশ্বাসের ভিত্তিপাত দেখিয়া বুঝা যায়। আমি এই ক্ষেত্রে রামমোহনের বিস্তৃত জীবন কথা লইয়া আলোচনা করিব না, কেবল তাঁর ধর্ম-জীবনের আদিপট্টদূর উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইব।

রামমোহন রায় সমাজ-ও-ধর্ম-সংস্কারের জন্ত যে ভাবের উপাসনা ও রীতি নীতির প্রবর্তন করেন, তাহা হুবহু মহানির্বাণোক্ত তত্ত্বমত। অনেকের ধারণা রামমোহনের পর এই তত্ত্ব লিখিত হইয়াছে, ইহা ভ্রান্ত কথা—তা ছাড়া রামমোহনের অধ্যাত্ম সাধনার সহকারী ছিলেন প্রশান্ত তান্ত্রিক হরিহরানন্দ। রামমোহন কুলচাঁর ধর্মে আস্থা রাখিতেন। তন্ত্রের যথাবিধি পূর্ণাভিষেকের পর, সাধককে ব্রহ্ম-মন্ত্র দেওয়া হয়, রামমোহন ব্রহ্ম-মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়াই, দেশকে ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝাইয়া, এই সার্বজনীন সনাতন ধর্মের পুত্র প্রতিষ্ঠা মানসে ব্রহ্ম সমাজ স্থাপন করেন। তাঁর উপাসনার মন্ত্রগুলিও মহানির্বাণ তত্ত্ব হইতে গৃহীত, এমন কি তিনি যে প্রতি সোমবারে উপাসনা করার রীতি করিয়াছিলেন, তাহাও তন্ত্রমুখ্যমত।

“প্রদোষেহঃ পঠৈরিত্যং সোমবারে বিশেষতঃ।
 আবহেৎ বোধয়েৎ প্রাজ্ঞো ব্রহ্মনিষ্ঠান্ সবাঙ্কবান্।”
 তিনি এই নব সমাজ হিন্দু জাতির মধ্যে ঠাক দিয়া যাহাতে বসিতে পারে, তাহার জন্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত তর্ক বিতর্ককালে, তন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। পূর্বেরই বলিয়াছি—ব্রহ্মশক্তিযুক্ত চৈতন্য, ব্রহ্মসাধনা শক্তিসাধনারই নামান্তর। রামমোহন এই সাধনায় ভক্তদের উত্তম বৈশিষ্ট্য বুঝা করিয়া আসিতে বলিতেন, তাৎপল্য চর্চণ করিয়া, ঈশ্বরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে বলিতেন। সাধনায় এইরূপ ভঙ্গী তয়েই আছে, তবে তিনি তন্ত্রকে আধুনিক সর্বজন-গ্রাহ্য করার জন্ত যত্ন করিয়াছেন, বাস্তব সাধনা যতই নিগূঢ়, গুহ্য হউক না—জাতির জীবনে ব্যাপকভাবে ধর্মভাব সঞ্চার করিতে হইলে যেক্রম ব্যবস্থা হওয়া উচিত, রামমোহন তাহার যত্ননা করিয়াছেন, পরবর্তীযুগে নানাভাবে ইহা বিস্তৃত মণ্ডিতে, শক্তিত সমাজের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা দেখিলে রামমোহনের অসাধারণ প্রতিভা ও শক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়, এই জন্তই রামমোহন বাংলার যুগশ্রু, সমগ্রজাতির পূজা ও আরাধ্য দেবতা!

সাধক কমলাকান্ত

১২১০ সালে অধিকা কালনা হইতে সাধক কমলাকান্ত বর্দ্ধমানে আসিয়া উপস্থিত হন। ইহার পূর্বে পরিচয় এখনও অজ্ঞাত। তিনিও “কালী থাইয়া কালী” হইয়াছিলেন। শক্তিময় আধার লইয়া, প্রতি বৎসর শ্রাম্যপুজার রাত্রি তাঁর মুখে মায়ের বাণী নির্বৃত্ত হইত। সমস্ত বর্দ্ধমান যেন ছলিয়া উঠিত। বর্দ্ধমানাধিপতি তেজশ্রুত প্রথম তাঁহাকে সভাপণ্ডিত পদে বরণ করেন। কথিত আছে, তিনি কোন সময়ে দস্যুহাতে পতিত হন, দস্যুগণ যখন তাঁর শির লক্ষ্য করিয়া লাঠি উঠাইয়াছে, কমলাকান্তের কণ্ঠে নিতীক স্বরে মায়ের নাম সঞ্চার দিয়া উঠিল :—

“আর কিছু নাই শ্রামা—কেবল তোর ছুটি চরণ রাস্তা”
 মৃত্যুর কাল যবনিকা গেলিয়া, সভাই সম্মানের নয়নে মায়ের অভয় পদ ভাসিয়া উঠিল, দস্যুগণ স্তম্ভিত হইয়া কমলাকান্তের চরণপূজা মাথায় তুলিয়া, তাহাকে নিরাপদ স্থানে পৌছাইয়া দিল।
 কমলাকান্ত গৃহী ছিলেন। বাংলার তন্ত্র-সাধনায় গাহ'রা জীবনই প্রশস্ত বলিয়া কোল সাধকেরা প্রায় গৃহী হইতেন। মাতৃপ্রেমোন্মত্ত কমলাকান্ত সংসারী হইলেও, চির সন্মারবিরাগী ছিলেন। তাই যখন স্ত্রী-বিয়োগ হইল, তিনি গাহিলেন, “কালী সব ঘুচালি লেটা”—অথচ পত্নীর প্রতি তাঁর অহরহরের অন্ত ছিল না।

মরণকালে তাঁহাকে গঙ্গাতীরস্থ করণ উদ্যোগ

হয়, মাতৃকোড়ে আশ্রিত শিশু, বড় গঙ্গা গাহিলেন :—

“কি পরজ কেন গঙ্গাতীরে যাব।
 আমি কেলে মায়ের ছেলে হয়ে, বিমাতার কি শরণ লব !!”

তগবানের সহিত এমন আত্মীয়তা বাংলাদেশেই দেখা যায়, ঈশ্বরতত্ত্ব নিত্য, তাই সর্বব্যবহার সাধক অটল, মরণজয়ী বীর—এই সাধনার কোন বাঁধা-ধরা বিধি নাই। ভাবমুগ্ধে থাকাই আলল কথা, প্রশাদও যেমন বলিতেন :—

“ওরে মন বলি তত্ত্ব কালী, ইচ্ছা হয় যে আচারে’
 কমলাকান্তও গাহিতেন :—

যেকপে যে জন, করয়ে ভজন, সেইরূপে তার
 মানসে রয়।
 কমলাকান্তের ছবি সরোবরে, কমল মাঝারে
 হয় উদয়।

বাংলার তন্ত্রসাধকের জীবন-পরিচয় একে একে দিতে হইলে, একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া যায়। ক্ষুদ্র “প্রবর্তকে” সে আশা বুঝা—আমি নিম্ন কোল মহাপুরুষগণের চরণে প্রণাম করিয়া, এই আশীর্বাদ প্রার্থনা করি, জাতির জীবনে যেন মাতৃভক্তি জাগ্রত হয়, জাতি যেন প্রেমভক্তির পরশে অমরত্ব লাভ করে, স্বয়ং নিষ্কল্য করিয়া, ভায়ে ভায়ে বুকভরা আলিঙ্গন দিয়া, শক্তিপীঠ বাংলায় যেন মায়ের মহিমা প্রকটিত করিয়া তুলে—
 ইহাতেই জাতি ধ্বংস হইবে।

বঙ্কিম চন্দ্র

মাতৃস্বাধীনতার আশ্বাস পাইয়া বঙ্কিম “বন্দেমাতরম্” পরিচয়, তারপর তিনি দশভূজার যে প্রতিমা
নগ্নের স্তম্ভে স্থাপিত হইয়াছিলেন। তিনি ‘দেশমাতার’ দেখিয়াছিলেন, তাহা চির জীবন্ত মূর্তিতে,



স্বপ্নি বঙ্কিম চন্দ্র

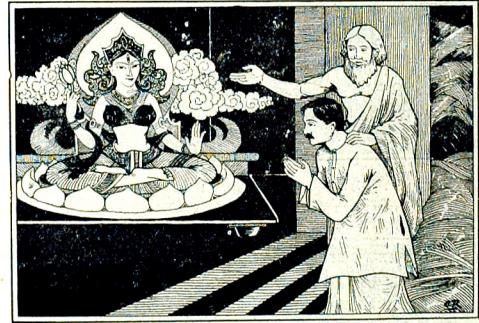
জীবন্ত মূর্তির সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। আনন্দ-বাহালী জাতির অন্তরে ভক্তি ও শক্তি জাগ্রত
মঠের মাতৃদর্শন করিয়া নব, দেশশক্তির সাক্ষাৎ রাখিলে।

আখিন, ১৩৩২]

বঙ্কিম চন্দ্র

৩৬৫ ২

দুর্গার কালস্রোতের ভীম তরঙ্গবক্ষে ভেলায়
চক্ষিয়া ভাসিতে ভাসিতে তিনি দেখিয়াছিলেন,
কত নকত্র উঠিতেছে, নিভিতেছে, আবার
উঠিতেছে। যখন একান্তই একা বলিয়া ভয়
হইল, তখন মাতৃহীন শিশুর আকুল কণ্ঠে মা মা
রব কনিয়া তরঙ্গমল্ল জল রাশির উপরে স্ববর্ণ-
মণ্ডিত শারদীয়া প্রতিমা ভাসিয়া উঠিল—বঙ্কিম]



‘মা’ যা ছিলেন।

চিনিলেন—“এই স্ববর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা।”

বঙ্কিম চাহিয়াছিলেন, এই মাতৃপ্রতিমার
পদপ্রান্তে ছয় কোটি মৃগ লুটাইতে, ছয় কোটি
কণ্ঠে মন্ত্র উচ্চারণ করাইতে। ছয় কোটি প্রাণ
জানিয়া ইহা যদি সিদ্ধ না হয়, দ্বাদশ কোটি চক্ষে
অশ্রুপ্রবাহ স্রষ্ট করিতে। তাঁর আশা ছিল, “ছয়
কোটি সন্তান যার, তাঁর ভাবনা কিসের?”

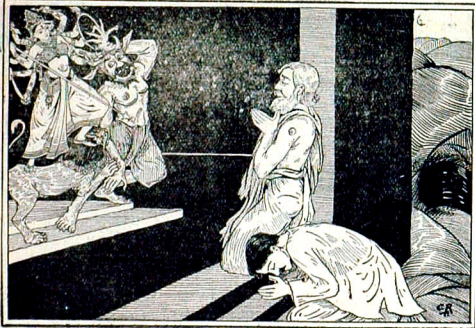
কিন্তু যে মূর্তি ভুবিল—মাথকের প্রার্থনা—উচ্চ
হইতে উচ্চতর গ্রামে উঠিল—নয়নে জলধারা

বহিল—মাতৃভক্ত সন্তান শপথের পর শপথ বাগী
উচ্চারণ করিলেন, “এবার হস্তস্থান হইব, সংপথে
চলিব, তোমার মুখ—রাখিব” “এবার আপনা কুলিব,
মাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব, অর্থ, আলস্য,
ইন্দ্রিয়ভোগ ত্যাগ করিব।”

তবুও মা উঠিলেন না। মাথক কালঘোতে
ঝাঁপ দিয়া—দ্বাদশ কোটি ভূত্রে মাতৃপ্রতিমা
উদ্ধার করিতে চাহিলেন, যে মাতৃহীন তার। জীবনে
কাজ কি? পৃথার পূর্বের চিত্র আঁকিলেন,



‘মা’ যা হইয়াছেন।



‘মা’ যা হইবেন।

‘দেখক জাগ হাড়িকাটে পড়িল, সংকীর্ণি খণ্ডে বলি হইল, পুরা বুদ্ধকায়ের ঢাক বাজিল’—কিন্তু মা উঠিলেন না।

বকিম—এই মাতৃপ্রতিমার বোধন বসাইয়া গিয়াছেন। মাতৃপুঞ্জার আয়োজন বাঙ্গালী করিবে কি না জানি না—রামপ্রসাদ যে মায়ের রূপ দেখিয়াছিলেন, বকিম সে রূপ দেখেন নাই, রামকৃষ্ণ যে জগন্নাথীর পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলী দিয়াছেন, বাঙ্গালী সে জননীর আরাধনা করিতেছে না—কে দরাইয়া দিবে—মাতৃপুঞ্জার নব তত্ত্ব? কোন পথে আমরা মাতৃময় হইয়া, বিস্তৃত আধারে মায়ের বিস্তৃত স্তম্ভির আসন স্থাপিত করিব—আজ পূজামণ্ডপে মাতৃমায়ের জয় দিয়া

সেই পথেই যে বাহির হইতে চাই, তাই পাই—

‘জয় জয় জয় জয় জগন্নাথী!’

‘জয় জয় জয় বঙ্গ জগন্নাথী!’

আমার মতাদেশী মাতৃপ্রতিমা—কি জগজ্জননী বেশে সনাতনধর্মে দীক্ষা দিয়া জগৎকে কোল দিবে? মাতৃস্বের অমর বন্ধনে বিশ্বকে স্নেহে প্রেমের ডোরে বাঁধিয়া বিপলিতদ্রব্বে গাহিবে—

‘আমরা নিলেছি আজ মায়ের ডাকে!’

এক মিলনের মহাবেঙ্গ মাতৃকোড়—শক্তিনিক সন্তানদেহই ইহাতে অপিকার, মাতৃজক্তি লাভের জগতই আমাদের এই পুঞ্জার আয়োজন, এস মাতৃচরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রার্থনা করি—

‘প্রিয়দায়ে জগন্নাথ: শৈলপুত্রি বহুধরে।’

দক্ষিণেশ্বর

ঠাকুরের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরের পুণ্যানুষ্ঠিত জয় মনকে সমধিক নিরুণ্য করে। বাঙ্গালীর ইহা বুন্দাবন, ঠাকুরের পদে পূর্ণ এই স্থান ধজ হইয়াছে, দক্ষিণেশ্বরের রক্ত: মাথিয়া কত নারী পুরুষ ধজ হইবে।

বৃগু যুগান্তরের সাধন-শক্তি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের মধ্যে সহস্রবল কমল বিকশিত করিয়াছিল, কুণ্ডলিনী শক্তি সধা জাগ্রত থাকি, প্রেম ও শক্তি রক্তভাব হইয়া মুমুর্ষু জামুর্ভূতিকে নব জীবন দান করিত—দক্ষিণেশ্বরের অমৃত প্রবাহ বৃষ্টি কোনদিন শুষ্ক হইবে না।

ঠাকুর চাহিতেন—জজ্ঞা জক্তি। রামপ্রসাদের আব্দার ঠাকুরের মধ্যে এমন জীবন্ত, এমন সরস, মধুময়, দীপ্ততরকে তাঁর এত নিকট ও সহজ মনে হইত, যে স্বকোমলমতি শিশু যেমন মাতৃসেহ

চাহিলেই মা আসিয়া কোলে দেয়, ডাক দিলেই তিনি যেমন কার্ণাভর হইতে ছুটয়া আসিয়া সন্তানকে বুকে ধরিবার গুজ সত্য প্রস্তুত, এইরূপ মনে হইত। কে কি বলিল, ঠাকুর দৌড়াইবেন মায়ের কাছে, কি খাইবেন, কি করিবেন, কি করা উচিত, সব মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া করা চাই—জীবনের সহিত উগরানের এতখানি নিবিড় পরিচয় যেখানে সিদ্ধ, সে স্থান যে ঐক্যে হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

ইই মূর্তির নিকট হইতে ঐক্যজিহ্বা চাওয়া দুয়ের কথা। তিনি মায়ের কোন রূপ অসাধারণ দর্শনাদি করিতে চাওরাকেও পছন্দ করিতেন না। মায়ের জৈখাময় বিরাট মূর্তি দেখিলে, জক্তি ভয়ানক হইয়া পড়ে, মাতৃপরিধানে সন্তান সহজ ভাবে যেমন হাসিয়া বেগিয়া বেড়াইয়া বেড়ায়, সেইরূপ

তিনি চাহিতেন, “খাওয়ান, পরান, ভালবাসার” মাকে “ভূমি আমি” ভাবে দেখিতে—শ্রীতপবানের সহিত এতখানি বিনিময় পরিচয় না হইলে, সবখানি দিয়া দিয়া প্রেমের অহুত্বিত সম্ভব হয় না।

তত্ত্বের সর্ব প্রধান মন্ত্র আত্মসমর্পণ। দক্ষিণেশ্বরে এই মন্ত্রের সাধন সর্গাঙ্গমুদ্ররূপে প্রতিফলিত হইয়াছে, জননার ইচ্ছা ব্যতীত অগতির অজ্ঞ কিছুই অস্তিত্ব তিনি একবারেই অস্বীকার করিতেন।

সাধন ভঙ্গন করিলেই বেঁধের লাভ হয় তাহা নাহে, কেননা তাহা হইলে তো সকলেই করিত। ইহাও ঐশ্বরের ইচ্ছা। তবে জীবের মধ্যে পুরুষকার বলিয়া এমন একটা গুণ আছে, তাহাও মায়ের গুণ, মা যাকে দয়া কখনো, এইসব যোগান দেন, মানবের স্বাধীন ইচ্ছার মুক্তিকরুণীয়া তিনি গল্পজলে বলিতেন—“মা যে লখা দড়ি দিয়ে গরু বেঁধেছে, তাই গরুটা অনেক দূরে চরে, ইচ্ছা হয় তো দড়িটা আরও লম্বা করিয়া দিতে পারেন, চাই কি গরুর ফাঁস খুলেও দিতে পারেন।” তেমনি ইহাকে স্বাধীন ইচ্ছা বল, সর্গোচ্চা-মরী মায়ের উপর এমন দৃঢ় প্রত্যয় ছিল বলিয়াই, তিনি মাতৃদর্শন করিয়া লগৎকে সার্থক করিয়াছেন।

ঠাকুরের জীবনে কোন সাধনাই অসুখ ছিল না, বিরাট আধারে ভারতের সাধন-তত্ত্বকেই শোধান করার কাজ যেন তাঁর আবির্ভাব। বেধান্তের “নেতি, নেতি” ভাব তাঁর ভাল লাগিত না; সব “হিতি, ইতি” করিয়াই তিনি চলিতেন—ক্লিভন মায়ের মূর্তি, এ দর্শন তাঁর হইয়াছিল, কাজেই কিছু ছাড়ার ভার তিনি দেখান নাই, মায়ের ইচ্ছা ঠাকুরের মধ্যে জীবন্ত মূর্তিতে প্রকাশ পাইয়াছিল।

এই মহাশক্তির আবির্ভাব সর্গগটেই সম্ভব হয়, জীব যদি বাসনা ও অঙ্কার পরিত্যাগ করে। অঙ্কার ত্যাগের লজ্জ—আত্মসমর্পণ। তার পর মায়ের চরণে জীবনের সব চালিতে ঢালিতে

বাসনার ভাঁড় শূন্য হয়; সে বাসনা শুধু কতক-গুলি স্থল জীবনের অভিশাপ নহে। তিনি বলিতেন, যখন বাসনা জাগে, তখন সারি সারি নানা বৃত্তি ঈশ্বরই এইগুলি ফুটে, কান যায় তো কানন যায় না, একের পর আর এক আসিয়া উপস্থিত, যেন একটা অগণ্য শুমাল। খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া চলার দরকার, স্থল বাসনা ছাড়িল তো বৃক্ষ বাসনা ছাড়িতে চাহে না, নারীসন্তোষণ-পুণ্য পরিত্যক্ত হইল, কিন্তু সৌন্দর্য-ভোগ, বিতৃষ্ণ ভাবে বদ-বহস্ত-কৌতুক-পরিচয় প্রকৃতির ছন্দবেশ লইয়া পরিষ্কার মূর্তিতে দেখা দিল, সাধক ভাবিলে ইহাতে দোষ কি? কিন্তু ইহাও যে বাসনার ছন্দবেশ, আরও অধিক বিপজ্জনক, মায়ের দয়া না হইলে বুঝা যায় না। এইগুলিও যদি যায়, তবে আর রহিল কি—জীবন আলস্যায় হয়, তরুণা আকার লইয়া মায়ামোহে জব্দ অধিকার করে—সাধনার এইসব দুস্বাহুভূতির তত্ত্বগুলি তাঁর জীবনে এমন সুচারু মূর্তিতে ফুটিয়াছে, যাহা ভবিষ্যতের দৃষ্টিতে দিনের মতই আলো দেয়।

ঠাকুর সত্যের বংশের বয়সে কলিকাতায় আসেন। একটা কথা আছে, “উত্তি মুণা পত্তনেই বুঝা যায়”—এই গ্রামা বাগের জীবন আশ্রয় করিয়া যে কত বৃহৎ শক্তির লীলা চাইবে, তাহা তাঁহার বাগা জীবন হইতেই বুঝা গিয়াছিল। ঐশ্বর-প্রত্যয়ের অহুত্বিত তাঁর বাগা জীবনে বহুক্ষেত্রে প্রকাশ পাইয়াছিল, যে সকল কথার আশিয়া যখন তিনি “চাল কালা বাধা” দিয়া নিষিদ্ধে নারাজ হইলেন, জ্ঞানোদয়ে মাতৃব যাহাতে কৃতার্থ হয়, এমন শিক্ষা চাহিলেন, তখন হইতেই উন্নত সাধন তত্ত্বের তিনি যে যোগ্য আধার, এ বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ ছিল না। তিনি

তিনাছাশি—গদাবারি ব্রহ্মবারি, সিদ্ধ জীবনেও ছিল না। অঙ্গসংস্কার বহিরা যেগুলি ত্যাগ তাঁর এ ভাব মলিন হয় নাই। গদাভয়ের ছড়া করিতে হইবে, তাহার মূলে যে কি সত্য নিহিত দেখিলে তিনি তার উপর পা দিতে শক্তির থাকে, তাহা আবিষ্কার করিতে করিতে যদি হইতেন, তাঁর দৃঢ় ধারণা গদাবারি পানে দেহ উত্থাপের ত্যাগ করা যায়, তবেই বৃক্ষ শক্তির নিমন্ত্ণ হয়, গদাভীরে বাস করিলে মাতৃবের সাক্ষাৎকার হয়, নতুবা প্রাচীন আগার আচরণের

মূল অর্ধে দ্বন্দ্বময় না করিয়া, গুণা সহকারে ঐ সত্যের প্রতি অনায়া জীবনে কোন হুকুমই দেয় না, বয়ঃ আয় যাহা ত্যাগ করা যায়, পরিণত বয়সে তাহার পুনরাবর্তন ঘটে, এক্ষণ দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

ঠাকুর সত্যনিষ্ঠা সকল বিষয় আত্ম-পতীকার কটীপাথরে বাচাই করিতে করিতে, যাহা ছাড়িবার ছাড়িয়াছেন, যাহা গ্রহণ করিবার তাহা গ্রহণ করিয়া ভবিষ্যতের পথ পরিষ্কার করিয়াছেন, কিন্তু সকল বস্তুই যে অথবা বিশেষে অমৃতের মত উপকারী, তাহা তাঁহার জীবন-সাধনার আশ্রয় প্রত্যক্ষ করি।

তিনি পুণ্ডর আদ্যে বসিয়া, আসন-ভক্তি, অঙ্গভাস, করভাঙ্গ প্রভৃতি করিয়া ভূতভক্তি ব্রজ প্রাণায়াম করিতেন। তিনি অটল বিশ্বাসবলে অহঙ্কর করিতেন, যেন মুগধার হইতে কুণ্ডলিনী সুস্বাদু-মার্গ দিয়া সহস্রাধারে উত্তীর্ণত্বেন—

সত্যই কুণ্ডলিনী শক্তি যে যে স্থান অস্তঃকরণে ধর্ম্যভাব অকুরিত হয়। এই আন্তিকা-বুদ্ধি ছিল বলিয়াই, তিনি সব কাজেই গভীর অধ্যাক্ষ অহুত্বিত পরশ পাইতেন। দক্ষিণেশ্বরে আসিতেও তাহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। শূদ্রের অন্নভোজন করিলে ব্রহ্মশাস্তি হ্রাস হয়, এই পূর্ণ ধারণা দৃব করা তাঁর পক্ষে সহজ ছাড়িয়া দিতেন, তাহা যেন অবিদ্য হইয়া



শ্রীশ্রীমন্তক

অস্তঃকরণে ধর্ম্যভাব অকুরিত হয়। এই আন্তিকা-বুদ্ধি ছিল বলিয়াই, তিনি সব কাজেই গভীর অধ্যাক্ষ অহুত্বিত পরশ পাইতেন। দক্ষিণেশ্বরে আসিতেও তাহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। শূদ্রের অন্নভোজন করিলে ব্রহ্মশাস্তি হ্রাস হয়, এই পূর্ণ ধারণা দৃব করা তাঁর পক্ষে সহজ

তাহাকে হুকা করিত। হিন্দু সাধনার এই নিত্য পদ্ধতি তঁা পূজার অঙ্গুষ্ঠানে সকলেই করেন, কিন্তু এমন করিয়া ইহার বলন্ত অহুত্বিত করজনের হয়, ইহা বিশ্বাসের বল ভিন্ন অঙ্গ কিছু নহে।

জগদধার পূজার চতুর্থাংশে শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষা লইতে হয়। কেনারাম ভট্টাচার্য্য নামে জনৈক তান্ত্রিক গুরুর নিকট ঠাকুরের দীক্ষা হয়, দীক্ষার মন্ত্র কথিতে কথিতে তিনি কবাবেশে সমাদৃত হইয়াছিলেন—ইহাও মন্ত্রজপে গভীর আত্মাই পরিচয়। ঠাকুরের পূজা ত্যাগ হইয়াছিল, মন্ত্র ত্যাগ হইয়াছিল, কোন কষ্টই ছিল না, কিন্তু এইগুলি ছাড়িয়া নিত্যানন্দে বিভোর হওয়ার এই পূর্ণাঙ্গুষ্ঠানগুলির প্রতি তাঁর অকৃত্রিম নিষ্ঠাই যে পরবর্তী সিদ্ধ ভীবনের অটল ভিত্তি, ইহা কে অস্বীকার করিবে?

মাঘের প্রস্তরময়ী মূর্ত্তির পূজা করিতে করিতে, তাঁর নিকট তাঁর জ্যোতিষ্মতী চিন্ময়ী মূর্ত্তি সূটরা উঠিত। তিনি গগনভেদী স্বরে “মা” “মা” বলিয়া চাঁৎকার করিয়া উঠিতেন, তার পর ‘বখন সেই মূর্ত্তি নিরন্তর দর্শনের পথে বাধা পাইতেন, তখন তাঁর চক্রে অবিশ্রাম ক্রমধারা বহিত, তিনি মাতৃদেহী শিশুর মত আচ্ছাড় কাছাড় করিতেন, তাঁর তখনকার সেইরূপ ভাববিস্ময় মূর্ত্তি দেখিয়া অনেকেরই ভাবিত, পূজারীর মাথা ব্যাগণ হইয়াছে, কিন্তু তিনি আকুল অন্তরে ডাকিতে ডাকিতে, কীভাবে কীভাবে বারবার চিন্ময়ীমূর্ত্তির সাক্ষ্য পাইতেন। সেই মাতৃমূর্ত্তির সুগ চাহিয়াই তিনি দেখিতেন, ভনিতেন কি ভুবন ভূগান হাদি, কি অমৃতশীতল বাণী—এই জননীমূর্ত্তিই ঠাকুরকে মানুষ দিচ্ছেন, মানুষের বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিতেন। ইহা কি স্বভাববিনয়ী ব্যাপার, তাহা জ্ঞান্য বৃথান বার না।

অন্তর-দেবতাকে তিনি অস্তরে দেখিয়াই আত্ম হন নাই। মাঘের মন্দিরে গিয়া ছায়ার বন্ধ করিয়া, বড় কাতর ভাবে ভোগের থালা লইয়া মাঘের সন্মুখে ধরিতেন। তিনি স্পষ্ট দেখিতেন, মাঘের চক্রে হইতে জ্যোতিঃ নির্গত হইয়া আরাধ্য দ্রব্য স্পর্শ করিতেছে, মাঘের স্রীঅঙ্গের প্রভাব মন্দির আলো হইয়াছে। এই দিবা দর্শনের আবেগ কি তিনি সহ্য করিতে পারেন? চাঁৎকার করিয়া কীদিয়া উঠিতেন; কোন বন্ধ অঙ্গে কোন বন্ধ পরে দিতে হইবে, তাহার আর খেয়াল থাকিত না। মন্দিরের কর্ণচাঁচীয়া, পূজার ব্যাঘাত হইতেছে মনে করিয়া মগুর বায়ুকে এক কথা ভনাইয়া দেয়। তিনি স্বচক্রে ঠাকুরের পূজা দেখিয়া অঙ্গ সঞ্চরণ করিতে পারেন নাই। ইহার পর হইতেই ঠাকুরের সহিত তাঁর ক্রিষ্ণ সখ্য স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন। দেবতার মতই ভীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত মগুর ঠাকুরকে ভক্তি করিতেন, অন্তরের অমুগাধ প্রভা ঢালিয়া পূজা করিতেন।

নৈমিত্তিক ভক্তি অধিক দিন ঠাকুরের জন্মের স্থান পালক না। ভক্তি শাস্ত্রের যে সর্ব্বপ্রাচ্যে রাগাধিক্য ভক্তি, তাহা জাগ্রত হইল।

অম্বরাগের আগুন জলিল, তাহাকে আর পুণি ধরিয়া চলিতে হইত না, চেষ্টা করিয়া কিছু করিতে হইত না, কে যেন, বাধা করাইবার তাহা করাইয়া লইত, তিনি এই সময়ে স্পষ্টই বৃষ্টিতেন, তাঁর ভীবনের উপর নিষেধ আর কোন কষ্টই নাই, সবই জগদধার ইচ্ছা। মাঘে মাঘে অগ্নিঃ জাগিত, শশ্যের হইত, তখন কীদিয়া বলিতেন— “মা, এমি হইতেছে, কিছুই জানিনা, বাধা করাইবার তাহা করা, বাধা শিখাইবার তাহা শিখা, আমায় হাত ধরিয়া লইয়া চু।”

“জানায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে—

যেখানে যাই সে মাঘ সাথে, বলতে হয় না জোর ক’রে।”
আশ্বমঘর্ষণের এই চরম অবস্থায় ঠাকুর যখন উঠিলেন, তখন তাঁর নিত্যক্রিয়া বন্ধ হইল, পূজার ফুল লইয়া নিজের মাথায় ঢাপাইয়া, কীমতিতে হাসিতেন, আনন্দে নিত্য করিতেন, কেহ কিছু বলিলে মাঘের মন্দিরে গিয়া তাহা জানাইতেন, তার পর মাঘের সুখের কথা লইয়া, ফিরিয়া আসিয়া লোকদের উত্তর দিতেন।

ঠাকুরের এক গুল্লতাত পুত্র হলধর মন্দিরে থাকিতেন। তিনি কাণীকে ভ্রমোদগমমতী বলিষ্ঠা ছিলেন, ঠাকুরের কথাটা যেমন ভাল লাগে নাই, নিম্ন মাঘের নিকট আত্মার জুড়িয়া দিলেন, মা যেহেতু, সন্তানকে সত্য তত্ত্ব কি তাগ ব্রতায়ী দিলেন। ঠাকুর বালকের মত দোড়াইয়া হলধরের কাঁধে চাড়িয়া বলিলেন—“মা আমার তামসী। মা আমার জিগ্ৰগমতী, আমার শুভ সবওগমতী”— তাঁর চক্রে দৃষ্টি ও বাণবল্লভ সারল্যা দেখিয়া সবলেই স্তম্ভিত হইল—মাতৃসাধনার জয়কেন উড়াইয়া, জীবন দিয়া জগদধার পাঙ্কায়, জলম দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, যৎপরূপে তিনি বৃষ্ণান্তর আনিয়াছেন।

ঠাকুরের জীবনের বিশেষ ঘটনা, তাঁর পরিচয়। তিনি মাতৃপ্রায়ে উদ্ভাদ হইয়াছিলেন, সকলেই জানিয়াছিল এ বোগ সারিবার নহে, অনেক কবিরাজী তৈলদ্রাঘির ব্যবস্থা করিয়াও, ঠাকুরের উদ্ভাদনা দূর হয় নাই, মদ খাইয়া গোক মাতাল হয়, তিনি মাতৃপ্রেমমত্তা নিরন্তর পানে কেমন মাতাল হইবেন, ইহা সহজেই অমুমান করা যায়। কিন্তু ঠাকুর কিছু দিনের জ্ঞান প্রকৃতিত হইলেন, তাঁর স্বভাব ভাব দেখিয়া আত্মীয় স্বজন বিবাহের ব্যবস্থা করিলেন, তিনি আশক্তি ভুলিলেন না,

কিন্তু পাত্রী আর মিলে না, তখন তিনি নিজেই সন্ধান দিলেন কোথায় পাত্রী মিলিবে। ঠাকুর বিবাহ করিয়া আবার দক্ষিণেশ্বরে ফিরিলেন, আবার উদ্ভাদ হইলেন, তাঁর কণ্ঠে নিরন্তর ‘কাশী কাণী’ শব্দে মন্দির উদ্ভান গগনব্যং কীপিয়া উঠিল, সকলেই হতাশ হইল, ঠাকুর রাগশনি ও মগুরাণুর হননধনে পড়িয়াও যে কিছু করিতে পারিলেন না, ইহা লইয়া লোকে মানা প্রসঙ্গ ভুলিয়া আলোচনা জুড়িয়া দিল—তন্ময় হইয়া হাদি-কান্না-মৃত্যু নানা ছন্দে আনন্দময়ী সহিত একাত্ম হইয়া পঞ্চদশদিন কাটাতে পারিলেন।

নৈমিত্তিক ভক্তির বরে ঠাকুরের আন্তরিকতায় সাধনার ছায়ার সহজে বৃষ্ণিষিল, তিনি অধ্যাত্ম জগতের অপূর্ণ দর্শনাদি দেখিয়া বিভোর হইয়াছিলেন, কিন্তু বিশ্বনিরস্তার এই অধ্যাত্ম উন্নতিপথেরও একটা ছন্দ আছে, জন্ম আছে, সেই ছন্দ ও জন্মগুলি যদি কোন কারণে অঘাত করা হয়, তবে বহুই সাধকের ইচ্ছাশূন্য হইত। না, পুনরায় তাগকে নীচে নামিয়া দেই সব পরিত্যক্ত পরগল পুণ্য বরিয়া লইতে হয়। ঠাকুরেরও তাহাই ঘটিল। আধারের পরিপূর্ণ প্রভুত্ব অজাবে, তাঁর জীবনে যে সমুদ্র দর্শন ও অহুত্বিত হইয়াছিল, সেইগুলির প্রতি তাঁর মনস্ব উপস্থিত হইল, কখন কখন মনে হইল, হঠাৎ ঐ সব মাথার গোশনালে দেখিয়াছি, অথবা স্বপ্নদৃষ্ট, বড় অশান্তি উদ্বেগের মধ্যে তিনি কাগদাশান করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁর বিরা উদ্ভাদনার লগ্ন সফল তাহাতে সুর হইল না। ঠাকুরের জীবন যেন দুই ভাগে বিভক্ত হইল, একদিকে শশ্যের, বাধা বাধা হইতেছে, তাহার সত্যানুদ্যান স্পৃহায় কাতর হইয়া পড়িল, আর এক দিকটায় যেন তাঁর বিনা চেষ্টায় কি যেন কি সব ঘটনা ঘাইতে লাগিল। এতদিন তাঁর

মনে কোন প্রশ্নই জাগে নাই, আজ সব কিছু ভাবের মধ্যেই, সংসার উচ্চ গলায় যেন এগ্নি করিয়া উঠে—“তুমি কি পাগল হইলে!” ঠাকুর বড় অশান্তিতে পড়িলেন। ঠিক এই সময়ে দক্ষিণেশ্বরের সাধনমূর্ত্তি ব্রাহ্মণীর আগমন হয়, ইনি বিবিধপুস্তক ঠাকুরকে সঙ্গে ও সহজিয়ায় শীকা দিয়া, পূর্ণাহুতীর সমুদয় তরুণীর সত্যতা দেখাইয়া দেন, বলিতে হইলে ব্রাহ্মণীই, ঠাকুরের সাধনমার্গের সত্য সাহায্য, বাংলার সাধনতর এই রমণী তিনজনের মধ্যে সকার করার উদ্দেশ্যে নাকি শ্রীভগবানের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া ঘুরিতেছিলেন, ছইজনের সাফাভাবে ঠাকুরকে আশিয়া ধরিলেন। গোয়ার সাহোদয় নিশ্চিত হইল, বাংলার তরু সহজিয়া দিবাধারের স্থান পাইয়া, অমৃত সকার করিল, হারক বনিগড় হইতে উদ্ধৃত হইয়া অহরীর হস্তে পরিত্যক্ত হইয়া কীর মৌলিক সৌন্দর্য লাভ করিল—দক্ষিণেশ্বরের এই ব্রাহ্মণী-ঠাকুরের সম্পর্কিত ঘটনাবলীর সবখানি যদি পাওয়া বাইত, তাহা হইলে, আজ আর তরু সহজিয়ার রহস্য গোপনপুত্রে থাকিয়া বিলাস ও সংশয়ের অনো-আধারে অশুভ হইত না। কিন্তু তাহা জানিবার উপায় নাই, ঠাকুর যতটুকু প্রসঙ্গক্রমে বলিবার তাহা বলিয়াছেন, এবং সাধারণের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট বলিয়াই বোধ হয়।

ঠাকুর ব্রহ্মসম্মার নিকট তত্ত্বসাধনার ত্রুটি হইবার ভয় মায়ের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন, অগম্যধার আশা লইয়া তিনি এই রহস্যময় কুণ্ডলার পথে বীরের মহতী অগ্রসর হইলেন, ঠাকুরের দিবাভাব দর্শনে ব্রাহ্মণী পুণিকৃত হইলেন, তাঁর জীবনলব্ধ তপস্বী অক্ষতরে ঠাকুরের মধ্যে ঢালিয়া দিলেন, ঠাকুর কি আগ্রহে, কি তাঁর অহুত্রে এই পথে যে জীবন ঢালিয়াছিলেন, তাহা তিনি নিজেই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

ব্রাহ্মণী পরমাংসাহে তত্ত্বসাধনার চক্ষুপা এয়া সমূহ আহরণ করিলেন, পঞ্চমুখীর আসন বাহিলেন, ঠাকুরকে লইয়া চৌবজিখানা তত্ত্ব নির্দেশিত সাধনাই একে একে করাইয়া বাইতে লাগিলেন, ঠাকুরও ক্ষিপ্ততার সহিত সবই নিশেধ করিলেন। ব্রাহ্মণী বিশ্রুত হইলেন, অন্তরে তাঁর উৎসাহের অবধি রহিল না। পরিশেষে, একদিন নিশাযোগে, এক স্ত্রময়ী বোড়নী বুঝতীকে উলঙ্গ করিয়া, ঠাকুরকে উলঙ্গ হইয়া তাহার কোলে বসিতে বলিলেন, তিনি সখ্য শিল্পের মত গিয়া উঠিয়া বসিলেন, বসিবারাজ তাঁর সমাধি, ব্রাহ্মণী তখন বলিলেন—“হইয়াছে, কিরা পূর্ণ হইয়াছে!” ঠাকুর আশ্রয় হইয়া অগম্যধার চরণে বার বার প্রণাম করিলেন। তাঁর পর ব্রাহ্মণী নরকপালে মৃত হইয়া ঠাকুরকে খাইতে দিলেন, তিনি নির্জিকার চিত্তে ভোজন করিলেন। গলিত আমমাংস মুখে ঢুলিয়া ধরিলেন, তাঁহার ঘৃণা হইল, ব্রাহ্মণী তখন নিজেই কিয়দংশ ভক্ষণ করিয়া বলিলেন—“ঘৃণা থাকিলে নয় না, এই দেখ আমি খাইতেছি”—ব্রাহ্মণীর এই অবস্থা দেখিয়া ঠাকুরের মধ্যে প্রচণ্ড চট্টাভাবের উদ্ভাবনা জাগিয়া উঠিল, তখন তিনি মা মা বলিয়া সে মাংসও ভক্ষণ করিলেন। এইরূপে তত্ত্বাভিষেক হইয়া, “বোনি” মাত্র ব্রহ্মযোগি—এই বোধ তাঁর পাকা হইল, এইলক্ষ্য তিনি নিজের জীবিতের আর উপগত হইতে পারেন নাই, তত্ত্বের এই মহাসাধনার মাতৃভাবই জাগার, লোকের মনে দ্রাক্ষা ধারণা, যে তত্ত্বের বীরভাব সাধন করিতে হইলে শক্তি এতল করিতে হয়, ঠাকুর এই পথে সিদ্ধি পাইয়া জানাইবেন, যে ইহা জুল তত্ত্বসিদ্ধি নির্ভর করে মাতৃভাবধারণনে, সকল প্রবৃত্তির ক্ষয় মাতৃপ্রেমে, অগম্যমী অনবিকারী তত্ত্বসাধকদের ব্রহ্ম অবনত সাধন পদ্ধতির প্রচলন থাকিলেও, তত্ত্বের উদ্দেশ্য

যে মহান ও উচ্চ ঠাকুরের জীবন দিয়া তাহা ব্রহ্মমণ্ডিত হইয়াছে। তত্ত্বসাধনাকে ঠাকুর সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তত্ত্বসাধন ঠাকুরের সাধনার মহিমাদিত হইয়াছে। তত্ত্বোক্ত ক্রিয়াসকলের অহুতানে যে সব অগাধারন অহুতুতি জাগে, সেগুলি প্রতীকৃত না হইলে ও ইহাদের বিচিত্র ভাবের ঠিক ঠিক অভিজ্ঞতা না জন্মিলে, উত্তরকালে সাধনমার্গে, মনের পতন হইতে পারে। তরু জীবনকে উদাত করে, কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগাইয়া দেয়, কিন্তু চেষ্টা ও উদ্যম যথোপযোজ্য প্রায় স্বপ্নফল না—জগদধা যদি হাত ধরিয়। লইয়া যান তবেই সিদ্ধি, নতুণা ভাল করিতে গিয়া আমরা প্রায় সর্বক্ষেত্রে মন্দ কলই পাইয়া থাকি।

তত্ত্বসাধনার পর ঠাকুরের, পূর্ণের যে সকল অহুতুতি প্রত্যক্ষ হইয়াছিল, সেগুলির উপর তিনি অধিকার স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন; তিনি ইচ্ছামাত্র কুণ্ডলিনী শক্তিকে সহস্রারে উঠাইয়া দিতেন, এবং কোন্ কোন্ এয়া উন্মোচিত হইয়া কি কি ভাবের সৃষ্টি হইতেছে, তাহা বেশ স্পষ্ট করিয়া বুঝিতেন, শবির বেগা জ্ঞানের আলোয় উজ্জ্বল মধুঘর হইয়া উঠিয়াছিল।

এই সময় মায়ের বিবিধ মূর্ত্তি তাঁর সম্মুখে উদ্ভাসিত হইত। তিনি একদিন বোহিনী মূর্ত্তির সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন, অশুর্ষে জগদবীর্য বুঝতী গলাবক হইতে উঠিয়া, তাঁর সম্মুখে, অনিন্দ্যস্বন্দর সন্ধান প্রদর্শন করিলেন, তখন দিলেন, তারপর কবাল বন্দন বিস্তার করিয়া এল করিলেন, সৃষ্টি স্থিতি লয়ের দেবীমূর্ত্তি নানাভাবে তাহাকে দেখা দিতেন, তিনি কুণ্ডরের উজ্জিষ্ট ভক্ষণ করিতেন। শিবাকে নিজের হাতে ঝাড়াইতেন—তাঁর স্বভাব বালকের মত হইয়াছিল, তত্ত্বসাধনার চরমফল বাহা তাহা তাঁহাতে স্পষ্ট হইয়াছিল।

এইবার অধ্যাক্ষেত্র-ছাড়াইয়া বাস্তবজীবনে, মাতৃসাধনার যে দিব্যরূপ প্রকাশ হইয়াছিল, সেই পূণ্য প্রসঙ্গটুকু বলিয়া ঠাকুরের অমৃতসন পূণ্য কথার উপসংহার করিব।

তরু ও সহজিয়ার শিদ্ধ হইয়া তিনি—ভৈরবী ও তাঁর মাতৃলপুত্র কলরকে লইয়া নির-অমৃতমুনি কামারপুত্রের আসিলেন। শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীর বয়স তখন চতুর্দশ বৎসর মাত্র। ঠাকুরের প্রচণ্ড উন্নততার কথা তাঁর কর্ণে পৌছিয়াছিল, কিন্তু এই প্রথম স্বামীসন্দর্শনে তাঁর মনে এক অকৃতপূর্ণ-ভাবের উদয় হইল। ঠাকুরের দিব্য সঙ্গ—কাম-কলুধরান দাম্পত্যজীবনের পরিচয় পাইয়া, গ্রাম্য বলিষ্ঠার সরল পরিচয় স্বয়ংগত মনে, প্রেমের পরিপূর্ণ ঘটনবস্ত, আনন্দে ও উৎসাহে উপস্থিয়া পড়িল, তিনি নিঃসংশয় হইলেন, স্বামী—মাধব নহেন, যেবর্তা, ঠাকুরের নিঃস্বার্থ ভালবাসার আশ্বাস পাইয়া বুঝিলেন—“যেখানেই থাকি না, কৃপা পাইবার নহে, চরণপদ্মে আমার স্থান হইবে।”

ঠাকুর পুনঃ কলিকাতায় ফিরিলেন। শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরাণী এতদিন নিকটস্থ কালাধামন করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামী সন্দর্শনের পর, চিত্ত তরু পুনঃ দর্শনের তাঁর আকাঙ্ক্ষা, আকুল হইল, তিনি কতবার মনকে প্রবেশ দিয়া বলিলেন—“দয়াময়! তিনি, প্রতীক্ষা করি, একদিন ডাকিবেন!” কিন্তু জ্বর বধন নবাহরণে উদ্ভূত হয়, তখন কি আর মানা মানে! তিনি সুরোগের সন্ধান আবেদন করিতে-ছিলেন, কাঙ্ক্ষনের বেগে পূর্ণিমা পল্লীভ্রমকে লোকের নিকট বড় পুণ্যদিন বলিয়া গণ্য হয়, এইদিন প্রেমের ঠাকুর শ্রীগোপাল নববীণে জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালীকে ধাক্কা করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে গ্রামের বহুলোক গঙ্গা ঘাটের জল বাহির হইল, শ্রীমাও পিতার অমৃতমুনি হইলেন, সকল বন্দোবস্ত হ্রিহ হইলে,

একদিন যুগান্তে পল্লবের কলিকাতার দিকে যাত্রা করিলেন।

পথপ্রবেশে তিনি অল্পক্ষণ হইয়া পড়েন, তখন যাত্রা করিয়া বালিকা মূর্তিতে শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরানীর সেবা করেন, ক্রান্ত রূপ অবস্থায়, ভুলি করিয়া তিনি বহন করিলেখের আদিয়া পৌঁছিলেন, তখন ঠাকুর বড় বাত হইয়া পড়িলেন, নিজের ঘরেই তাঁর থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, পথা ও ঔষধাদির বন্দোবস্ত করিয়া নিজের হাতেই পরিচর্যা করিলেন, পতি সোহাগে সতীর অন্তরে স্বর্গের আনন্দ উল্লাস উঠিল।

এইবার ঠাকুরের জীবনে জগজ্জননীর সত্য পরীক্ষা আরম্ভ হইল। যে “যোনি” মূর্তি তিনি “ব্রহ্মযোনি” বলিয়া পূজা করিতেন, মাতৃমূর্তির সত্য যথ বোধে ত্রিকোণ জ্যোতির্বিদ্যে কেন্দ্রে প্রভাবিতী প্রকাশ করিতেন, আর দ্বিবা ভাবের চরম পরীক্ষায় তিনি অনার্যে সত্য মূর্তিতে বাহির হইয়া মাতৃমহিমার বিজয় কেতন উড়াইলেন, বৃদ্ধি জাতির তত্ত্ব ঠাকুরের জীবনকে কেন্দ্র করিয়া বিস্তৃত হইল। গঙ্গাবতির পূর্ণে যদি কলুর ক্ষয় হয়, হয় রাস্তরক্ষা বহিলে তবে মহাপাত্র ক্ষয় হইবে না কেন? বল ভাই “জর রাস্তরক্ষা”।

যোড়গুণী ব্রহ্মী ব্রীকে পার্শ্বে লইয়া শয়ন করিলেন, নবাবরাজার উদ্যমস্তি শক্তিক্রপা মহাবোধী তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া ঠাকুরকে যেন জিজ্ঞাসা করিতেন—“আমাকে তোমার কি মনে হয়!” হায়রে ভাষা যে মুক্তি হইয়া পড়ে, ব্রহ্মানন্দময়ী মায়ের প্রেমে যাত্রা অঙ্গ গলিয়াছে, তারি কি আর স্থল সঙ্কোচের স্পৃহা থাকে, তিনি অজ্ঞান বধনে বলিলেন ঐ যে, যে মা মন্দিরে, সে মা এই দেহে, সাক্ষাৎ “আনন্দময়ীরূপ বলিয়া তোমাকে সর্বত্র। সত্য সত্য দেখিতে পাই”।

যাত্রার নিরন্তর দ্বিবাভ্রাঘের বিমল স্পর্শ। মায়ের বিমল আশ্রয়ে জগদময়ীর বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, অথচ কি এই দিন ধৃত হয় নাই!

নিজিত মায়ের দিকে চাহিয়া ঠাকুর বিচার করিয়াছেন “এই জীশরীর পথম উপদেশ, জীব ভোগের জ্ঞান লাগিত। মন! চাও কি এই ভোগ, না সন্তানমনস্করী মায়ের প্রেমময় মূর্তিতে বিভোর থাকিবে!” একবার বৃদ্ধি হাত উঠাইলেন কিন্তু ভিতরের টান বড় প্রবল, মন বৃদ্ধি হইয়া গেল, তাঁর সে সমাধি তারপর দিন পর্য্যন্ত ভাঙেন নাই। শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরাণী এই দিন হইতে সতর্ক হইতেন, ঠাকুরের ঘন ঘন ভাব সমাধি যেহেতু যেহেতু তাঁর আশ্রয় পর রাজি কাটিয়া যাইত। ঠাকুরের সংঘর্ষ আর ভাঙ্গিল না কিন্তু ইহার জন্ত তিনি প্রশংসা করিতেন, শ্রীমারই অধিক। বিবাহের পর জগদধাকে ঠাকুর জানাইয়া দিলেন যে, মা আমার জীবিত হইতে কাণ্ডাব দূর করিয়া দে, ছেলের আশ্রয় মা তুলিয়াছিলেন। শ্রীমায়ের বিমলমূর্তি ঠাকুরের দ্বিবা সংঘের পথম সহায় হইরাছিল, এক শয্যায় শয়ন করিয়াও, তিনি নিরন্তর চিত্তে জগদধার ধ্যানে বিভোর থাকিতেন।

এই বার ঠাকুর চরম ব্রত সমাপন করিলেন, একদিন রাত্রিযোগে শ্রীমাকে আগনে বসাইয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিলেন—জ্যোত্স্ন মাতৃপ্রেমি। লইয়া সাধকের সে দিন যে উল্লাস তাহা বর্ণনা করার সাধ্য কার আছে? প্রহরের পর প্রহর কাটিয়া যাত্রা, ঠাকুর ভাব বিভোর, কণ্ঠে অশ্রুচরিত বহন “হে সর্বমঙ্গলের মঙ্গলরূপ, হে সর্বকর্ম নিপার কারিণী, হে শরৎপারিণী ব্রিনয়নী শিবমোহিনীগৌরী, হে নারায়ণী, তোমাকে প্রণাম, তোমাকে প্রণাম” এই সদয় হইতে শ্রীমা ঠাকুরের পার্শ্বে আদিয়া বসনই শয়ন করিতেন, ঠাকুর মৃতের মত নির্লিপ্ত

সমাধিতে ভুবিয়া বাইতেন। মা ইহা দেখিয়া, ইহার পর হইতে নববৎসনার শয়নের ব্যবস্থা করিলেন!

ইহা কি ইঙ্গিত! এতবড় আশ্চর্য্য জীবনের নিদর্শন পাইয়াও জাতি কি নিরন্তর হইবে না! হইবে—মাতৃসাধনার জীবন চানিয়া দাও, প্রসাদের মত, ঠাকুরের মত, মায়ের চরণে সব দিয়া নিশ্চিন্ত হও, মাতৃপ্রেম হ্রাস পাগল হও, আর গাও “আমার দেমা পাগোল করে।” তারা-পীঠের মাতৃদিক আর এক কেপার কথা, মুমূর্ষুজাতির কর্ণে তুলিয়া বলি “ওরে পাগলা, মা থাকতে কি ছেলে মরে? মায়ের ছেলে হইয়া মায়ের কোলে বসিতে পারিলে, মায়ের কার বাপের সাধ্য। পুরাতন হইলে খোলস বদলাইতে পারে, বশের দ্বারা জাতির দ্বারা অকুর থাকে। মায়ের ছেলে মরে না।” তাই আমরা মরিনা, তত্ত্ব, সাহসিকতার সাধন ক্ষেত্রে, বাস্তবী যদি আশ্রয় নির্ভয়ে মায়ের কোলে উঠিয়া বসে, তবে বড় গলা করিয়া গাহিব:—

যারে শয়ন যারে কিরি।
ওরে গৌর বনের বাপের কি দার দারি।

ঠাকুর তোমার শীলা কেহ বুলিল কি।
গৈরীকের পতাকা উড়াইয়া আজ যে শোভাযাত্রা বাহির করিয়াছ, সে পথে, মাতৃদিক সন্ধান শক্তি-মুখি পার্শ্বে রাখিয়া যে নব সমাধি পত্তনের স্তম্ভনা দেখাইলে, তাহা সুসিদ্ধ করিবে কি? আমার তুমি পাগল করিয়াছ—কামকাকনে দূরে পাশের কথা, মাথার বহিয়া আজ যে শোভনের ব্যবস্থা জাতিতে নূতন পথে তুলিয়া ধরার ক্ষেত্রে নিরাঙ্ক, তাহা যে আমার বড় আশ্রয়ে তলাইয়া দেয় প্রভু—বিবদের শেষে রজনীর আশ্রয় অর্ধ-শতাব্দী ধরিয়া রহিল, আশার নববশে নূতন মূর্তিতে দ্বারদ আদিত্যের তেজস্ব্যোতি লইয়া বাংলায় আকাশে উদয় হও, পুরাতন খোলস পরিয়া পড়ুক, নবচেতনার, নূতন পর্য্যায় জাতি উঠিয়া দাঁড়াক, নূতন ময়ে জগদময়ীর পদে তাদের প্রভাবিতী সমর্পিত হউক—ও রাস্তরক্ষায় অর্পণমস্ত।

উপসংহার

স্বামীজী, অরবিন্দ, চিত্তরঞ্জন, গান্ধী

দক্ষিণেশ্বরের সাধন-স্থান অসমিত হইল।
অসমিত স্থানের বিকীরণশক্তিদের দেশের আকাশ বিচিত্র বেশে শোভা পাইল, স্বামীজীর কণ্ঠে নূতন ধ্বক উচ্চারিত হইল—বিশেষ বাংলায়, ব্রতপ্রাপ্ত জীবনময়ের পরশে উদ্ভূত হইয়া উঠিল।

ঠাকুরের অশ্রুজল হইলে বাংলার সাধন-তত্ত্ব বিরূপ প্রবহমান, তাহার বিশদ বিবরণ আজ দেওয়া

সম্ভব নয়, আমাদের “প্রবর্তকের” পাতাও ভরিয়া উঠিল, অসম্পূর্ণ লেখনী—জাতির প্রাণে কেবল ব্রহ্মসাধনার আশাসটুকু দিয়াই! সার্থকতা চায়, ইহার অধিক দেওয়া মাগেও তো স্ক্রায়া না!

ঠাকুর স্বামীজীর মধ্যে তাঁর সিদ্ধ শক্তি সফল করিয়া তখন বাঘ, ছয়দাস কালও স্বস্থ শরীরে অবস্থান করেন নাই, শ্রীশ্রীজীবনের বিমল মূর্তি

বিস্ময়, হইল, স্বামীজী সেই শক্তির ফলিতমুখি, সমগ্র বিশেষ শক্তির মহিমাই প্রচার করিলেন। প্রচার কাহা শেষ করিয়া, ভয়ানক হইয়া যখন কলিকাতায় ফিরিলেন, তখন তিনিও তদীয় শিষ্যগণের মধ্যে সেই অমর বীণা সঞ্চার করিয়া, জাতিকে ধর্মপ্রাণ নাতে উদাত্ত করিবার জন্ত বাৎসল্য হইয়া উঠিলেন।

স্বামীজীর আদেশ পালনে কৃষ্ট প্রকাশ করিয়া, তাঁর শিষ্য যখন উত্তর করিয়াছিলেন, “স্বামীজী আমি কি প্রচার করিব? আমি কি জানি?” শক্তির বরপুত্র হস্তার দিয়া বলিয়াছিলেন, “এই কথাই প্রচার করো!” কিন্তু তাহার উত্তরেও যখন শুনিলেন, যে সে ব্যক্তি আরও সাধনা চাহে, আরও আত্মাহুতি চাহে, নিজের মুক্তি-পথ প্রশস্ত না করিলে অপরের মুক্তিবান্ধা ঘোষণা করা কিরূপে সম্ভব হইবে—ইত্যাদি, তখন তিনি ক্লিষ্ট কঠোর কষ্টে পঞ্জিয়া উঠিলেন—বলিলেন, “নিজের মুক্তি লক্ষ্য রাখিয়া অগাহিলে—নরক হইবে। যদি উক্ত ঈশ্বরানুভূতি চাও, নিজের মুক্তি কামনা পরিভাগ্য কর, ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা—অপরের মুক্তিসাধনায় জীবন দিতে যদি নরক ভোগ ক্রটিতে হয় তাহাও শ্রেয়, যাও কাজ কর, ফলের প্রত্যাশী হইও না।” তার পর তিনি নিজের শক্তি সঞ্চার করিয়া বলিলেন—“বাও, প্রভু তোমার পক্ষেতে থাকিবেন।” কি জলন্ত আত্ম-বিশ্বাস, শক্তির অভাবনীয় আত্মপ্রকাশ!

স্বামীজী ঠাকুরের সম্পর্কে শক্তি ও প্রেমের মূর্তি ব্রহ্ম হইতে পারিবাছিলেন—তাই লোক-হিতৈষণায় পাগল হইয়া বলিতেন,—

“Strength man! Strength is what is wanted”—পুরুষের মত নিক্রম কর্মযোগে জাতিকে উত্তর করিয়া তুলিতে তাঁর আত্মদান—দক্ষিণেশ্বরের অকীর্তি।

ঠাকুরের তপস্যা-ক্লম-মুখিতে সেদিন বাংলায় মূর্তি হইয়াছিল, একদিকে সনাতন গাঁইয়া ধর্মের অক্ষয় বীজ সাধু নাগ মহাশয়, অপরদিকে তাগ বৈরাগ্যের বিজয়বৈজয়ন্ত্রী স্বামী বিবেকানন্দ, একজন ভাববত প্রেমে উদ্ভাস, অজ্ঞান মাছের মতো ভগবানকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য উদ্ভূত, দুই জীবনেরই মূল ভিত্তি ছিল তাগ ও প্রত্যক্ষ ঈশ্বরানুভূতি—আজ সে স্বর্ণের স্মরণ কোথায় লুকাইল?

স্বামীজীর শেষ বাণী ছিল—“If we can awaken her once more to the consciousness of her infinite strength in the Sanatan Dharma, we will know that our Lord and ourselves were not born in vain.”

বিশ্বাস-শ্রদ্ধা-নিষ্ঠা, ত্যাগ-বৈরাগ্যের প্রদীপ্ত ভাস্কর, শক্তি প্রেমের নিখুঁত দেবতা—শক্তির বাণী কর্ণে শুনাইয়া অস্থিত হইলেন, সে অমর বীণা ভাবময় মূর্তিতে ভারতে নৃত্য-প্রাণ সঞ্চার করিল, বাংলার এই সাধনার প্রবাহই নানা মূর্তিতে ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করিল, যে প্রেম, যে শক্তি জগজ্জননীর দান, তাহা দিয়াই, জাতি-দেশ-মুক্তির আরোহণে আকুল হইল। সাধনার লক্ষ্য উচ্চ হইতে নিয়ে নামিয়া পড়িল, পৃথিবী দেবতার এই আশীর্বাদ বর্ষণ নিমিয়ে আত্মস্থ করিয়া অধিকতর উর্ধ্ব হইলেন। কিন্তু অন্যশক্তির উৎসমুখ রুদ্ধ হইয়া পড়িলে, জাতি আবার যে ভিতরে সেই ভিতরেই পতিত হইল—ভাগবত শক্তি ও প্রেমের অভাবে—দীর্ঘদিন অনাশ্রিত ঘটিলে মাতীর বুকে যেমন বিদীর ঘন, মাগের জীবনেও তেমনি একটা হাধাকারের আর্তনাদ শুনা যাইতেছে, ধর্মপিপাসা চরিতার্থ করার এক কোঁটা জলও আজ চূর্ণাপা।

সাধনার লক্ষ্য—প্রেম ও শক্তি। বিনা শক্তিতে প্রেম অবধারণ হয় না। সেইজন্য শক্তির উপাসনা প্রথম সাধ্য! তত্ত্ব ও বৈষ্ণব সহজিয়া ইহার পূর্ণ-নির্দেশ আছে। বাংলায় এই সাধনার ব্যাপক প্রচারও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সাধন-ক্ষেত্রে বাসনা ও অহংকারের নিরসন না হওয়ায়, অহুতির পর অহুতির স্তরে উত্তীর্ণ হইয়া

দ্বন্দ্বিতা করিয়া, সহজিয়া বৈষ্ণব সাধনার সিঁচ হইয়াছিলেন। তিনি অতীতের সমস্তাঙ্গুল সাধনার আবর্ত উন্মিত করিয়া, বিভ্রত সাধা বস্তুর উচ্চা করিয়াছেন, একদে ইহা আয়ত্ত করার উপায়-পথ, আত্মসমর্পণ। তন্ময়ের শক্তি, সহজিয়ার প্রেম, ভক্ত পথের ইষ্টরূপ লক্ষ্য—কালী ও কৃষ্ণ। এই কালী কৃষ্ণের সামগ্র্যময় আর এক বিরাট রূপ আছে; অধ্যাত্মসাধনায় গীয়া আপনাকে ঢালিয়া পূর্ণযোগসিদ্ধির লক্ষ্যে যাওয়া করিয়াছেন, তাহার অনায়াসে আমার এই সঙ্কেতপূর্ণ কথার মর্মবোধ করিবেন, সে যোগ গীতার পুরুষোত্তম যোগ—তত্ত্ব ও সহজিয়ার সমন্বয়; গীতার ভগবান ব্রীক্ষ, আত্ম-সমর্পণ যোগের মধ্য দিয়া। পুরুষোত্তম দর্শনের নির্দেশ দিয়াছেন,—দক্ষিণেশ্বরের পর বাংলায়, এই অধ্যাত্ম-যোগই পূর্ণতা বিধানের সিঁচ পথ।

সে ১৯১০ খৃষ্টাব্দের কথা—জাতীয় জীবনের মর্মে মধ্যে বাংলার সিঁচ তত্ত্ব প্রেম ও শক্তি সঞ্চার করিতে যে শ্রীভাগবৎ-মুক্তি আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁর মূরবাহী আমরা এই তত্ত্বাহুতির দৃষ্টি দান করিয়াছে, আমি স্পষ্ট দিনের মতই দেখিতেছি, তত্ত্ব ও সহজিয়া সাধনার পরম সম্পদের অধিকারী হইয়া, “কৃষ্ণকালী” প্রকাশের ক্ষেত্রান্তরে যে বিরাট পুরুষোত্তম-তীর্থ, জাতিকে সেই পথে অভিযান করিতে হইবে।

সাধনার সঙ্কেত পাওয়া গিয়াছে, শ্রীশ্রীস্বরবিন্দের অখচিত কণ্ঠায় সাধনার ছায়ার গুলিয়াছে, তত্ত্ব সহজিয়ার নিখুঁত সাধনার সঙ্গে সঙ্গে, হৃদয়হৃদয় মানসবৃত্তির ওলট পালটের অনেক রহস্য জানার জন্ত আমাদের সাধনার ভার নিজের উপর গ্রহণ করিয়াই তাঁর আহ্বানের অর্থদণ করিতেছি—দেখিয়াছি বাহা, তাহা আজ তো প্রকাশের দিন নহে—আমার কণ্ঠ এই—



স্বামীজী।

থাকে না, দিয়া দর্শনায় বিহুত লাভের দিকেই ঝোক দেখা যায়, ঠাকুরের জীবনসাধনায় সাধ্য তন্ময়ের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্পন্ন হইয়াছিল, তিনি ভাবাবেশে যে দিব্য-দর্শন অহুতভাদি, পাইয়া-ছিলেন, তাহা আত্মপ্রত্যয় গোচর করার জন্ত, মাগের আবেশে,—আত্মটানিক ধর্মাহুতরগে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তন্ময়ের বিদ্য, শাস্ত্রীয় বিধানাঙ্গসারে



শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ

পানেই নীরব উহক। ঠাকুর গ্রাস করিয়াছিলেন ক্ষেত্র সৃষ্টির সাকল্যে যে সার্থক করিতে হইবে। অতীতের বিচিত্র সাধনা, বিস্তৃত প্রেম ও শক্তির বিগ্রহ মূর্তি হইয়া জাতিকে দগ্ধ করিয়াছেন, সেই ঠাকুরের ঐতর্য্যমূল্যুতির ভিতর দিয়াই শ্রীশরৎচন্দ্র সাধ্যবস্তুর অবিকারী হইয়া, বিরাট পুরুষোত্তম-যোগের পথে জাতিকে অলক্ষ্যে টান দিয়াছেন। তন্ময় বিস্তৃত শক্তি; বৈকল্য সহজিয়ায় বিস্তৃত প্রেম লাভ হয়, কিন্তু এই দুয়ের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া, দিয়া ভোগাভ্যাস এই জীবন-

ক্ষেত্র সৃষ্টির সাকল্যে যে সার্থক করিতে হইবে। ঠাকুর "ঘোনি" যাত্রা মাতৃঘোনি দর্শন করিয়াছিলেন, তন্ময় পরম সিদ্ধ এইখানেই। ঐতিহ্য কৃষ্ণ-প্রেমে বিভোর হইয়া নিজকে প্রকৃতিতত্ত্বে লীন করিয়াছিলেন, সহজিয়ার ইহা পরমাহুতি। ততঃ কিম্—জাত কি লয় চায়? না—গীতায় ইহার সামঞ্জস্য আছে। পুরুষোত্তমের সাধনায়—তন্ময় সহজিয়ার চরম পরিণতি লাভ করিয়া সাধু্য দেবতা হইবে, শক্তি জ্ঞান-প্রেমের ঘন-

মুক্তি, সে সাধনার জগৎ কিছু গ্রহণ করিবে না, ধ্বাও মাথায় বহিলান, তাঁর অন্ত্যস্থান তিরো-সিদ্ধ জীবনে সিদ্ধ প্রকাশের লীলা-ঐশ্বর্য্যে ধানের মর্খকথা মুন্সিলাম, ভারতের সিদ্ধপ্রেমের জগতে স্বর্ণ রচনা করিবে। "প্রবর্তক" আজ অনবদ্য বিহুতিমুক্তি মহাশ্রীর চরণতলে বসিয়া সমস্ত সাধন তত্ত্বটা নিজের মদ্যে সংহরণ রুতার্থ হইলাম। এই ভাগবত প্রেম ও শক্তির করিয়া নিঃসঙ্গ—কিন্তু ইষ্ট স্বরূপ লক্ষ্যের অভিসারে উপাদানে এই সব সিদ্ধ মহাপুরুষেরা নূতন



দেবশঙ্কর চিত্তরঞ্জন

তার এই যাত্রা জয়যুক্ত হইবে, সে প্রেম ও ভারত নিখণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। শক্তির অবদানে জীবন আমাদের পরিপূর্ণ। হানাতাবে তাহাদের অন্তরঙ্গ জীবনসাধনার ইঙ্গিত। সাধনার ক্ষেত্র এই পবিত্র বাংলাদেশ, প্রেম ইচ্ছাভাবী পরিশ্রুতিভাবে "প্রবর্তকের" বৃকে শক্তির এক একটা বিগ্রহমূর্তির আবির্ভাব ও আঁকিতে পারিলাম না। হে আমার লয়, বিশ শতাব্দীর পঁচিশ বৎসর দরিয়া লক্ষ্য ভগবান, হে আমার পুরুষোত্তম, তোমার করিতেছি। শক্তি প্রেমের পরশেই দেবশক্তি আশীর্বাদ সর্বত্র জয়যুক্ত হউক, সর্ব-চিত্তরঞ্জনের আগরণ, সে আগ্রহ জীবনের চরণ ক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্ররূপে দর্শন করিয়া, সর্ব জীবের



মহাত্মা গান্ধী

পরশু মাথায় বহিয়া, দিয়া প্রসাদার ভাষা দীনহীন
কাম্বল বেণে তোমার দেবার অধিকারটুই
তুণ্ড প্রার্থনা করি।

ও কালিকাঠে নমঃ !
ও শ্রীকৃষ্ণ অর্পণমন্ত্র !!
ও শান্তিঃ !! শান্তিঃ !! শান্তিঃ !!!

বিশেষ উল্লেখ্য

৩ ই আশ্বিন (২০ সেপ্টেম্বর) হইতে ২১শে আশ্বিন (৫ই অক্টোবর) পর্যন্ত আমাদের কার্যালয় বন্ধ থাকিবে।
সেই সময় যেসব চিঠি পত্র আসিবে তাহার কাজ চুটির পরে করা হইবে।
এই সংখ্যা “প্রবর্তকে” ক্রমশ-প্রকাশ কোন প্রবন্ধ দেওয়া হয়নি। কার্তিক মাসের প্রবর্তকে সে সব লেখা
যথারীতি বাহির হইবে। ইতি

কর্মকর্তা
“প্রবর্তক”

নবরাত্রি

বাংলার দুর্গোৎসব ভারতীয় উৎসব। দরিতে প্রবৃত্ত হয়, ইহা বীরভাবের সাধনা। শারদীয়া
পারিলে, শক্তিসাধনার উদ্ভব রহস্য ইহার মধ্য
হইতে ছানিয়া লওয়া যায়। বাংলায় প্রতিমা নিষ্কাণ
করিয়া দুর্গোৎসবের আয়োজন বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
দেবীপূজকে সমগ্র ভারতে এই সময় শক্তি আরাধনার
দ্যোতনা জাগে, বোধহয় বাংলা ছাড়া মুষ্টি গঠনের
সমরোহ বাপার আর কোথাও নাই। প্রতিমা-
পূজার বিরুদ্ধে ঝগড়া, তাঁহারাও বাঙ্গালীর কল্পনার
মূল যদি দেখেন, তাগা হইলে শিল্প ও বিজ্ঞানের
সমাবেশ দেখিয়া ইহার প্রশংসাই করিবেন। তজ্জি
বিশ্বাস থাকিলে শিল্প বিজ্ঞানের অতীত, অধ্যাত্ম
দর্শনের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিবেন।

দুর্গোৎসবের তিনটি স্তর। একটা নিম্নতম
শক্তি আরাধনার স্তর। একটা শক্তি পূরণের স্তর,
আর অপরটা সামাজিক গাংড়া উৎসবের স্তর। শক্তি-
আরাধনাকামী নবরাত্রি সাধনার, জপ ও ধ্যানযোগে
বহুচক্র হেদের জন্ত প্রেরণ করেন।

আমাদের শাস্ত্রে উক্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ বলিয়া
দুইটা কালভেদ আছে। দক্ষিণায়ণ দেবনিজার
কাল। আষাঢ় মাসের শরদ একাদশী হইতে
কার্তিক মাসের উষান একাদশী পর্যন্ত এই কাল
গণ্য হইয়া থাকে। এই জন্ত ইহাকেই দেবীপূজ
বলে, শ্রীজগদ্ধাত্রী মূর্তির আরাধনা। শক্তিসাধনার
সমাপ্তি, তারপরই ঠাকুর রাসকৃষ্ণ উঠিয়া, দিবা-
ভাবের প্রেরণায়, জগৎকে আগাইয়া তুলেন।
তত্ত্বসাধক—সহজ বাহা তাহা মাথা পাতিয়া
গ্রহণ করিতে রাজী নহে, তাই বেবনিজার কালই
দেবীপূজার প্রশস্ত কাল বলিয়া শক্তিসাধনার

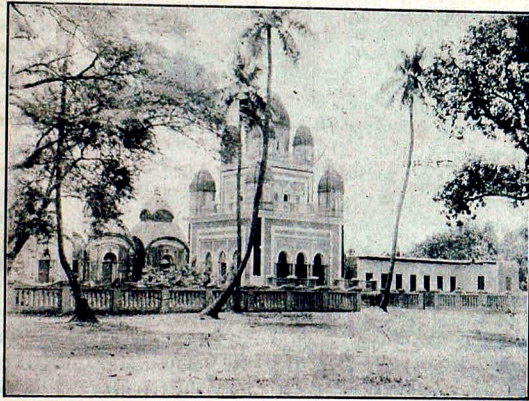
নবরাত্রিকা আন করাইয়া—ঢাক চোপ বাজাইয়া,
গৃহস্থের অঙ্গনে নারী পুরুষের মিলিত কর্তে যখন
দেবীর সযজ্ঞনা মন্ত্র স্বরায় দিয়া উঠে, সত্যই

তখন দ্বন্দ্বযে অকৃতপূর্ণ শক্তির সন্ধান হইয়া থাকে।

“ও চিত্তকে চল, চল চল শীঘ্র ক্রমবধিক
পূজালাভে প্রবিশ।.....ও পূজা পরমা শক্তি
যমেব শিববল্লভ। কৈলোকে। দ্বারহেতু বনবতীর্ণ
মুগে মুগে।”

বেধন—বড় জাঁকাল ব্যাপার। নিচুক শক্তি-
সাধনার প্রবৃত্তি বীরাঙ্গ—উদারগও হকারে হকারে
ময় ও প্রাণায়াম সহকারে হস্ত কুণ্ডলিনীকে

আত্মা বিবাহার সহিত সংযুক্ত হয়, অতএব
বাংলায় জগৎসংসার ব্যাপারটি কতবড় ধর্মসাধনার
বিষয়, এবং ইহা কি কৌশলে, দেশের সর্বশ্রেণীর
উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা দেখিলে
লোকশিক্ষার কি নিপুণ দক্ষতা লইয়া আমাদের
পূর্বপুরুষেরা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেন, তাহা
ভাবিয়া সন্দেহ স্বতঃই মাথা উঠাণের চরণে নত
হইয়া পড়ে।



জাতীয় সাধন মন্দির (প্রবর্তক সম্মত)

আগাইবার ভক্ত যথাবিধি চণ্ডীপাঠ, সাংঘম ও
ঐকান্তিক আত্মসাধনার নিয়ম থাকেন। সেহ-
ন্থাবস্থিত কুণ্ডলিনী শক্তি প্রায়ত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড-
বাসিনী কুণ্ডলিনীর সহিত যখন যুক্ত হয়, তখনই
তো জগৎসংসারের চূড়ান্ত হইয়া যায়, শক্তি শক্তির
দ্বার মূলে তখনই, যখন কুণ্ডলিনী স্পর্শে দেহস্থিত

পৌরাণিক শক্তি-সাধনা—শাক্ত বিশ্বব্রহ্মলুপ্তে
যেদী রচনা করিয়া, যথার্থ্যিতি চণ্ডী হোম দ্বারা
যটে পটে দেবীর পূজা সাধন করেন। গৃহস্থের
তো কথাই নাই, শুদ্ধ প্রতিপদ হইতে পূজামণ্ডপে
ব্রাহ্মণের কর্ত্তে চণ্ডী পাঠের ধ্বনি, শরতের প্রথম
রৌদ্রময় প্রাঙ্গনে, মৃৎপতিবার অঙ্কে পোড়ায়

তুলি বলাইতেছে, চাগড়ির আঁকিতেছে—কুলবালারা
গৃহকন্দীধিতে বাত, মা আদিবেন, ইংসাংহের আর
সোমা নাই।

দেবনিজার কালে, শক্তির আরাহনহেতু পূজা-
টার এত জাঁকজমক, আর সেইটাই মানুষের
ধর্মাত্মরূপের সত্য পরিচয়। মা ঘৃণাইবেন কি ?
সদা জাগ্রত থাকিয়া—ঈশ্বরসাক্ষাতকারের ক্ষেত্রে
আমার সবধানি উঠাইয়া রাখুন, আমি যেন
নির্বীণ না হই, শক্তির অভাবে ব্যাপি যেন আমার
আক্রমণ না করে, রূপ, বস, ঐশ্বর্যে মত্তিত হইয়া
মাঘের বাসু ভাবকের প্রজ্ঞা হইয়া সজ্জনে বাস
করিতে পারি, জীবনের দিকে এতবাণি বোঝ
যেদেশের, সেই দেশেরই এমন দারুণ অধঃপতন
বিষয়ের বিষয় নহে কি ?

দেবতার নিদ্রাকালেই পাগের অভ্যর্থনা হয়।
বিষ্ণু যোগনিজার অবিকৃত হইলে, তাঁর কর্ণমূল
হইতে মধু-কৈটভের উৎপত্তি হয়। নিরলস জীবনে
আত্মিক প্রভাব স্থায়ী হয় না। এককালে
দেবতাদের উদাসীতোই অস্বদশক্তি প্রবল হইয়া
জীবনের পূর্ণাঙ্গ করিয়াছিল, তেজস্বিকোটি দেবতা
এক হইয়া, জীবনের সবধানি নিয়োগ করিয়া
শক্তির উদ্বোধন করিয়াছিলেন—জগৎমাংসে আছে,
অষ্টনারিকা ও চামুণ্ডা, শুভ নিশ্চয় রক্তবীজ
প্রভৃতি গ্রহণের পাণাসুর নিধন করিয়া দেবতাদের
নিয়ামক করেন। ঐশ্রীদেবী পূজার এই অষ্টনারিকা
ও চামুণ্ডার পূজা হইয়া থাকে। নবরাত্রির সাধনায়
মাঘের নববিধ শক্তির জাগরণ সম্ভব করিয়া জুগিতে
হয়।

বর্ষান্তে শরতের তীক্ষ্ণ সূর্য্যাকিরণ সলল বৃক-
পক্ষে বড় অপূর্ণ শোভার সৃষ্টি করে, সাধক এই
অষ্টনারিকা ও চামুণ্ডা শক্তির বিস্তৃত স্বরূপ। পত্র
দেখিয়া নবপল্লব সংগ্রহ করিয়াছেন, জগৎসংসারে

যে পূজা হয় তাহা এই নবরাত্রির পূজা। এই
নব পরিক্রমা হইতেছে, কদলী, কচু, হরিদ্রা, জয়ন্তী,
বেল, দাড়িম্ব অশোক, মানবচূ ও খাজ। অষ্টনারিকা
—ব্রহ্মাণী কালী, জগী, কাঙ্কিকী, শিবানী, রক্তদন্তিকা,
শোকরহিতা, লজ্জী—ও স্বয়ং চামুণ্ডা।

কদলী ব্রহ্মাণীর নিদর্শন। কচু কালীর, কালী
যেমন বক্র দেবতা, কচুও তেমনি আশাড়, লঙ্কাকে
ছিঁড়ার মত, কচুর পাতা বাতাসে বেশ ঘেঁষ
থায়, সাধক তাই বোধ হয়, কচুগাছ কালীর
বিভূতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। শরতের হলুদ গাছ
পূর্ণমৌরনা, রূপে ও বর্ণে, জগীর বিভূত স্বরূপ
গুণীতা হইয়াছে। জয়ের অধিভূত দেবতা কাঙ্কিক
জয়ন্তী ফুলের রং কাল নীল ও রাঙা, যেন মনু-
পুচ্ছ, সূতরাং জয়ন্তী কাঙ্কিকী শক্তির যে নিদর্শন
হ'বে, তাহা আর বিচিৎ কি।

শিবরূপ শিবের প্রিয় বস্ত্র তাই বিহবাণা নব-
পত্রিকার মধ্যে শিবাবীর স্থান পাইয়াছে। রক্তদন্তিকার
সহিত দাড়িম্ব বৃক্ষের মৌগদুস্তের কথা বলিয়া
বুঝাইতে হইবে না, শোকরহিতা অশোকের শাখায়
আশ্রয় করিয়াছেন, খাজ যে লজ্জী ইহা অব্যাহিত।
রক্তবীজ বৃক্ষের ব্রহ্ম দেবীর সলল প্রদান যার
হইতে লাগিল, যেমন দেখিলেন অম্বরের এক এক
কোঁটা রক্ত, এক একটা অম্বর উৎপন্ন হয়, তিনি
রক্ত ভূমিতে পতিত হইতে না
দিয়া দান করিবার ইচ্ছা করিলেন, কালীকে
বলিলেন—“ভূমি মৃৎ ব্যাদান করিয়া সব রক্ত শোষণ
করিয়া লও,” কালী হইলেন ষ্টা-করা দেবতা,
ইহাই চামুণ্ডা মূর্তি, মানপাতা ব্যাদান-মূর্তি বলিয়া
ইহা চামুণ্ডার নিদর্শন। *

গৃহস্থের পূজামণ্ডপে, সৃষ্টি সহিত জড়াইয়া
বিধব্রহ্মনীর মূর্তিপূজা—কৃত্তিকার বিষয়; ধর্ম, স্বাস্থ্য
—মাটির সহিত এতবাণি পরিচয় স্থাপন করিয়া

বাংলার দুর্গাৎসব যে ক্রমে জাগির উৎসবরূপে
একদিন জীবিয়া উঠিবে, ইহা অবশ্যম্ভাব্য।

আমাদের প্রবর্তক সত্বে, এই বৎসর নবরাত্রি
পালনের ব্যবস্থা হইয়াছে। শক্তির উদ্বোধন-
করে, পূজা পাঠ, হোম পুষ্পাঞ্জলি দিয়া আত্মশক্তির
স্পর্শ লাভের এই শুভ আয়োজন ভগবানের
আশীর্ব্বাদে শুভফল প্রদান করুক।

শক্তির শোভন না হইলে দিবাজীবনের আশ্বাদ
শূন্য, কুণ্ডলিনী প্রতি আধারে বিরাজিতা, চাই উদ্যম
উৎসাহ, আত্মস্থ হইয়া বীরপ্রিয়ীর সন্ধিপুত্রের যদ
আমরা চানুগা শক্তিকে জাগাইতে পারি, তাহা
হইলে এক পশের বোকা নামাইতে না নামাইতে
অল্প মুহুর্তে পাপ বে আমাদের ঘিরিয়া ধরে,
তাহা হইতে মুক্তি পাইব, পাপ রক্তবীজের জাতি,
ফুল হইতে মুক্তি পাই, সূক্ষ্মভাবে ইহা আক্রমণ
করিবে, সূক্ষ্ম বীজ ধ্বংস কর, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হইয়া
তোমার অন্তঃস্থ করিবে—ইহা হইতে চূড়ান্ত পরিহরণ
মা যদি চানুগার বেশে আমার কলুষ ধ্বংস করেন—

তবেই সম্ভব, নতুবা অনন্ত পাপস্রোতে আমরা
চিরদিনই স্রোতশৈবাল দলের মত ভাসিয়া ভাসিয়া
বেড়াইব, মূল্যধারে জাঁক দিয়া, উর্দ্ধদশা কুণ্ডলিনীকে
সহস্রারে উঠাইতে পারিব না—আমরা বাংলার
ঘরে ঘরে, এই বৎসর দুর্গাপূজার আয়োজন বাহাতে
সম্ভব হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে বলি—মায়ের
দয়া না হইলে আমাদের মুক্তি নাই, মুক্ত জীবনেই
প্রেমের আশ্বাদ, শক্তি প্রেমের ক্ষেত্রেই পুষ্পোৎসবের
লীলা—“ভোগ্যঃ যোগ্যহতে”; তাই বিশ্ববাসীকে নিয়ন্ত্রণ
করিয়া বলি, এস ভাই, অখিলব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী
মহাকুণ্ডলিনীকে জাগাইয়া আমরা দিব্যশক্তির আধার
হই—ভায়ে ভায়ে মিলিয়া ম'য়ের স্বর্ণবেদী রচনা
করি, অল্পলীপূর্ণ ফুল বিবদল লইয়া এস মাতৃচরণে
অর্ঘ্য অর্পণ করিয়া বলি :—

প্রণতপাং পেশীং বং দেবি।

বিখ্যক্তিগ'রিদি।

ত্রেণোকাবাগিনানীভো লোকানাং

বরদা ভব ॥

ভ্রম সংশোধন

৩২২ পৃ: ১৪ লাইনে 'কুঠারের' স্থলে 'ঠাকুরের' হইবে।
৩২৩ ,, ৩৫ ,, 'ফাকা' ,, 'কাঁচা' হইবে।